ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষা

[Historical and Critical Studies in Indian Dance]

ডঃ শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়

এম. এ. (ডবল), বি. টি., পি. এইচ. ডি.

প্রাক্তন অধ্যাপক ও নৃত্যবিভাগের প্রধান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা * * ১৯৯৭

:: উৎসর্গ ::

শ্রীমতী কণিকা মুখোপাধ্যায়কে—

॥ প্রাক্‌-কথন ॥

একদা ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে, আমার গবেষণা নিবন্ধের ভূমিকায় লিখেছিলাম—

"ভারতীয় নৃত্যের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। অথচ এই ঐশ্বর্যপূর্ণ নৃত্যের ইতিহাস-ভিত্তিক সমীক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মূল্যবান ও প্রাণবান শাখা এই নৃত্যকলা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে স্বরু হয়ে এই নৃত্যধারা আজও নানা শাখা-প্রশাখায় প্রবহমান। এই প্রবহমান ধারাগুলিকে ধরে যথাসম্ভব তথ্য নিয়ে, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় আমার এই গবেষণা সমীক্ষা একটি বিনীত প্রয়াস। ভারতীয় নৃত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রারম্ভিক কাজ করা হলো এই সমীক্ষার মাধ্যমে। ভারতীয় নৃত্যের মূল ধারাগুলিকেই এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সমীক্ষার পরিধিতে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে—আদিম যুগ, সিন্ধুসভ্যতার যুগ, বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ, প্রাক্‌-ভরত, ভরত ও উত্তর-ভরত যুগ, অনুচিন্তা গোষ্ঠী, উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধ। অর্থাৎ ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণ পর্ব (Revivalist Movement) পর্যন্ত। সূচনা পর্ব থেকে স্বরু করে প্রতিটি অধ্যায়ে ক্রমশঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তথ্যসহ নৃত্যের মূলধারা ও উপধারাগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালের মার্চে লিখলাম—

"ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষা" নামে যে মালাটি গেঁথেছি, তার মূল সূত্রটি আমার, আর বিভিন্ন তথ্যের ফুলগুলি চয়ন করেছি বিভিন্ন স্থান থেকে। যথাস্থানে তার স্বীকৃতিও দিয়েছি। আমার গবেষণা নিবন্ধটিকে (Ph. D. Thesis) অবলম্বন করে পরবর্তীকালের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে। এতে অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর ধরে প্রবহমান ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার রূপ-রেখাটি আঁকবার চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০ সালে নৃত্য বিভাগে অধ্যাপনা করতে গিয়ে, বিশেষ করে নাচের 'থিওরী' পড়াতে গিয়ে যেটা সবচেয়ে বেশী অভাববোধ করেছি, তাহলো—ভারতীয় নৃত্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। তখনই মনে মনে স্থির করে ফেলি এই অভাবটা যদি কিছুটা অন্ততঃ দূর করা যায়, সেই চেষ্টা করবো। তাছাড়া আমার ছাত্রজীবনে পঞ্চাশের দশকে, শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত দুই খণ্ড "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" পড়ে অনুপ্রাণিত

হয়েছিলাম। ঐ সময় আমার নৃত্যগুরুদের কাছে—কথাকলি, কুচিপুড়ি রবীন্দ্রনৃত্য প্রভৃতি নাচ শেখার পর্ব চলছে। এই ফলিতচর্চার (Applied), সঙ্গে সঙ্গে নাচ নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনা সুরু করি। তারই ফলশ্রুতি, পরবর্তীকালে নৃত্যের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৭৬ সালে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি পাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে দেশে এবং বিদেশে নৃত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে অজস্র গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখেছি এবং এখনো লিখছি। সেই বিষয়ে একটি মাত্র চিঠি এখানে উল্লেখ করছি।

১৯৮৭ সালে জাপানী ভাষায় অনুদিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে (যা রবীন্দ্র-গবেষণা খণ্ড নামে পরিচিত), আমার ইংরেজী প্রবন্ধ "Tagore's Achievement for Experimental Neo-Classical Dance form of India"—জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কাজুও আজুমা। তাঁর বাংলা ভাষায় লেখা চিঠিটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

To Dr. Sankar Lal Mukherjee

আপনি কেমন আছেন? আপনার পত্র ও প্রবন্ধ যথা সময় পেয়েছি। সেই প্রবন্ধ পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তারপর থেকে আমি এই প্রবন্ধ জাপানী ভাষাতে অনুবাদ করে প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করেছি।

অবশেষে Daisambummei Publishing Company আপনার লেখা জাপানী ভাষাতে প্রকাশ করতে রাজী হয়েছেন।

Daisambummei প্রকাশক এই কয়েক বৎসর ধরে জাপানী ভাষাতে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করছেন। ১০ খণ্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে। সম্প্রতি একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হবে। শেষের খণ্ড অর্থাৎ দ্বাদশ খণ্ড হচ্ছে রবীন্দ্র-গবেষণার খণ্ড। আমি এই রচনাবলীর একজন সম্পাদক। আমি সকলের কাছে আপনার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকে এই গবেষণা খণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছি। সকলে রাজী হয়েছেন। কয়েক দিন বাদে এই প্রকাশক আপনাকে ইংরেজীতে আনুষ্ঠানিক পত্র দিচ্ছেন।

আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন।

ইতি

আজুমা

জাপানী ভাষা ছাড়াও চীনা ভাষা এবং রাশিয়ান ভাষায় আমার নৃত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ অনুদিত হয়েছে। অনেককে নাচের বই লিখতেও সহায়তা করেছি। অনেক ছাত্র-ছাত্রী আমার অধীনে নৃত্য-বিষয়ে গবেষণা করে **Ph. D.** ডিগ্রি পেয়েছেন। এখনো অনেকে গবেষণা করছেন আমরই অধীনে। অথচ নানা কারণে আমার নিজের বইটি লেখা হয়ে ওঠেনি এতদিন। ইতিমধ্যে নৃত্য বিষয়ে অনেক তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব, গবেষক ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই তাড়া দিচ্ছেন বইটি প্রকাশের জন্য। অগত্যা আলসেমি ত্যাগ করে আমার গবেষণা নিবন্ধটিকে অবলম্বন করে বর্তমান গ্রন্থটির জন্য প্রস্তুতি নিই।

এবার একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক্। নৃত্য বিষয়ে আমার ভাবনা-চিন্তা আজকের নয়। এর সূত্রপাত ১৯৪৮ সাল থেকে। ঐ বছর আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। এবং এ সময়েই সম্ভবতঃ উদয়শঙ্করের নৃত্য-বহুল ছায়াচিত্র 'কল্পনা' কলকাতায় আসে। এই কল্পনা দেখে আমি অভিভূত হই। সম্ভবতঃ আমার শিল্প সাধনার গতি-প্রকৃতি তখনই নির্ধারিত হয়ে যায়। আমি জীবনে 'বায়োস্কোপ' কম দেখেছি। কিন্তু 'কল্পনা' আমার জীবনে রেকর্ডবার দেখেছি (এগারবার বিভিন্ন স্থানে) বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। এমনকি নৈহাটী থেকে বর্ধমানে গিয়েও একবার দেখেছি। যাই হোক মন স্থির করে ফেলি নাচ শিখবো।

কিন্তু চাইলেই তো তখনকার দিনে নাচ শেখার তেমন সুযোগ ছিলনা। তাই তখন চিন্তা হলো কোথায় শিখবো? নৃত্যগুরু কোথায় পাবো? আগে অবশ্য স্কুল জীবনে ছবি আঁকা, তবলা বাজানো, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া-এগুলি মোটামুটি চলছিলো। কিন্তু আমাদের বংশের কেউ আমার আগে নাচ শেখেনি। তাছাড়া নাচ শেখার ব্যাপারে আমার মায়ের (লাবণ্য প্রভা দেবী) খুবই আপত্তি ছিল। তাঁর ধারণা, নাচের লাইন ভাল নয়। কিন্তু গান-বাজনা চর্চায় তিনি কখনো আপত্তি করতেন না। কারণ তখনকার দিনে আমার মামা-বাড়ীতে ছিল গান-বাজনার বিপুলায়তন চর্চার সুন্দর পরিবেশ। তাছাড়া, আমার দাদা শান্তিময় মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রের বেতার শিল্পী। বৌদির ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা। যাইহোক, বাবা (কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়) শেষ পর্যন্ত আমাকে নাচ শেখার অনুমতি দিলেন দুটি শর্তে। এক, আমি মন দিয়ে লেখাপড়া করবো। দুই, নেশা-ভাঙ করবো না।

এই দুটি শর্তই আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছি জীবন-অপরাহ্ন পর্যন্ত।

আমার নাচ শেখার সূত্রপাত ভাটপাড়া 'গীতায়তন' সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে। তখন ওখানে গান শেখাতেন কমলেশ ভট্টাচার্য, সেতার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, এস্রাজ গোবর্ধন ভট্টাচার্য, তবলা নীরদবরণ এবং নাচ শেখাতেন নটশ্রী দেবপ্রসাদ বসু। তিনিই আমার প্রথম নৃত্যগুরু। উনি শেখাতেন মূলতঃ রাবীন্দ্রিক নৃত্য, সৃষ্টিশীল নৃত্য (Creative Dance), লোকনৃত্য, আইরিশ ব্যালের ভঙ্গি ইত্যাদি। তারপর কথাকলি নাচ শিখি গুরু গোপাল পিল্লাই এবং কুচিপুড়ি নাচ শিখি আর. এস. আনন্দম্-এর কাছে। এটা মোটামুটি ১৯৫৩-১৯৫৫ সালের ব্যাপার।

এরপর প্রচুর নাচের অনুষ্ঠান করেছি এবং নাচ শিখিয়েছি বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সংস্থার আহ্বানে, তার থেকে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি এখানে।

ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘের মহুয়া নৃত্যনাট্য (১৯৪৯-৫০) রক্সিতে, ইষ্টার্ন রেলওয়ে শিল্পী পরিষদের প্রযোজনায় কল্যাণী কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯৫৪), 'বঙ্গদর্শন' নৃত্যনাট্যে মাইকেলের ভূমিকায় নৃত্যাভিনয়, ভাটপাড়া গীতায়তনের "শ্রাবণ গাথা" —ছবিঘর সিনেমায়, বর্ধমানে বিচিত্রা হলে এবং বিহারের ভুজুড়িতে লোকশিল্পী পরিষদের 'পৃথিবী' নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ, পূর্ব পাকিস্তানের নীলফামারীতে নৃত্যানুষ্ঠান, হুগলী মহসীন কলেজ ও হুগলী গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজে পড়ার সময় "শিল্পী ও পাষাণ" নৃত্যালেখ্য, বহরমপুরে ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘের কন্‌ফারেন্সে কুচিপুড়ি ও অন্ধ্রের লোকনৃত্যে অংশগ্রহণ প্রভৃতি। রঙ্গমঞ্চে আমার শেষ নৃত্যানুষ্ঠান হয়েছিল ১৯৫৯ সালে বি. টি. কলেজে। অর্থাৎ ১৯৪৯-১৯৫৯ পর্যন্ত দশ বছর অজস্র নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। এতো গেল নৃত্যের ফলিতচর্চার (Applied) দিক।

স্কুলে শিক্ষকতা করতে গিয়ে নাচ ছাড়তে হয়েছিল। তখন সেতার শিখতে সুরু করি প্রখ্যাত বংশীবাদক প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এককথায় বলা যায় চারুকলার (Fine Arts) প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটু একটু বিচরণ করেছি। যদিও এক্ষেত্রে আমি পণ্ডিত বা গুরুজী নই। শিল্পের এই ফলিত-চর্চার পাশাপাশি ঔপপত্তিক দিকের চর্চাও চালিয়ে গিয়েছি।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্যবিভাগে অধ্যাপনা করার সময় আমার পরিচিতি ছিল একজন নৃত্যতাত্ত্বিক ও নৃত্যগবেষক হিসেবে। এখানে তখন নাচ শেখাতাম না। নাচ পড়াতাম। এবং নিজে নৃত্য বিষয়ে গবেষণা করতাম ও ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা করাতাম। এ সব ব্যাপারে এখনো আমি ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করি ও উৎসাহ দিই। আমার অধীনে নৃত্যের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে ৬।৭ জন Ph. D. করেছেন। এখনো ৬।৭ জন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই রকম একটা মানসিকতা থেকেই নাচের ধারাবাহিক ইতিহাস ও তার মূল্যায়নের জন্য এবং অধ্যাপক বন্ধুদের উৎসাহে, গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ অনুরোধে "ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষা"র কাজে হাত দিই। এই গ্রন্থ মূলতঃ ভারতীয় নৃত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের (আদিম যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছরের) একটা কাঠামো মাত্র। ভবিষ্যতের নৃত্য-গবেষকরা হয়তো এই কাঠামো ও তথ্যগুলিকে কেন্দ্র করে নৃত্যকলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে পারবেন, এই আশা রাখি।

আমি যখন পাতিপুকুর আদ্যনাথ শিক্ষামন্দিরে প্রধান শিক্ষকের কাজ করি, তখনই আমার নৃত্যগবেষণার কাজ সুরু হয়। ঐ সময় আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টার-মশায় ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের অধীনে নৃত্যের ইতিহাস বিষয়ে গবেবণা সুরু করি। তিনি ছিলেন তদানীন্তনকালের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের **Head of the Deperment of Drama** এবং **Dean of the Faculty of Fine Arts.**

গবেষণা বছর খানেক চলার পর, আমার দুর্ভাগ্য, মাষ্টারমশায় হঠাৎ প্রয়াত হন। আমি তখন গবেষণা ব্যাপারে যেন অথৈ জলে পড়ে গেলাম। তারপর অনেক টানা পোড়েনের পর সিদ্ধান্ত হয়—তদানীন্তনকালের রবীন্দ্রভারতীর নৃত্যবিভাগের প্রধান কে. সি. বালকৃষ্ণ মেননের অধীনে আমাকে দেওয়া হয়েছে। সেই সূত্র ধরে মেননদার সঙ্গে দেখা করি। মেননদা বললেন, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করুন। গৌরীদা তখন নাটক বিভাগের রীডার। গবেষণার গাইড হিসেবে মেননদার নাম থাকলেও, আসল গাইড হলেন গৌরীদা। তাঁর দুর্লভ পরামর্শে, উৎসাহে এবং হাতে-কলমে শিক্ষা পেয়ে,

আমি আবার নতুন উদ্যমে গবেষণায় মনোনিবেশ করি। এ ব্যাপারে গৌরীদার কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এর পর একটানা প্রায় পাঁচ বছর ন্যাশানাল লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে নৃত্য ও নৃত্যের আনুষঙ্গিক বিষয়ে পড়াশুনো সুরু করি। পড়াশুনোর সুবিধার জন্য National Library-তে Reading Room-এ Alcove No. 22 পেয়ে যাই। ঐ সময় অনেক মহার্ঘ বই পেতে ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ, লেখক সুভাষ সমাজদার এবং নকুল চট্টোপাধ্যায়—এঁদের তিনজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে থিসিস্ জমা দিই ১৯৭৫ সালে। Ph. D. হলাম ১৯৭৬ সালে। তারপর এতদিন বাদে ঐ Ph. D. Thesis-কে অবলম্বন করে পরবর্তীকালের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, নানা পরিবর্তন, নানা পরিবর্ধন ও নানা সংযোজনের মাধ্যমে গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এবং প্রয়াত উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বর্তমান উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (প্রয়াত), ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, শ্রদ্ধেয় অমিতাভ চৌধুরী (সাংবাদিক, ছড়াকার), ডঃ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য প্রমুখ।

বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে উৎসাহ দিয়েছেন—অধ্যাপক কাজুও আজুমা, (জাপান), ডঃ জিয়াং পিঙ্ (বেজিং, চীন), ডঃ দানিলচুক (মস্কো), এ্যান হাচিনসন (লণ্ডন), রুডলফ্ এবং জন বেনেশ (লণ্ডন), রুডলফ্ লাবান (নিউইয়র্ক) প্রমুখ।

আমার সতীর্থ বন্ধু ডঃ নরেন ভট্টাচার্য এগিয়ে না এলে হয়তো এই বই এত তাড়াতাড়ি প্রকাশিতই হতো না। তাই নরেনকে জানাই আমার প্রাণভরা ভালবাসা। এছাড়া—বন্ধুবর ডঃ নির্মল মুখোপাধ্যায়, স্নেহভাজন ডঃ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীর্থ বন্ধু অখিলরঞ্জন ঘোষাল, কালিদাস বসু, একদা সহকর্মী বন্ধু ডঃ শচীন রায়, অনিল ভৌমিক, নৃত্যবিদ্ বালকৃষ্ণ মেনন (প্রয়াত), মণি বর্ধন (প্রয়াত), মণিশঙ্কর (প্রয়াত), আম্মিনি, এস. মেনন, অনাদিপ্রসাদ,

তরুণ গাঙ্গুলী (প্রয়াত), গুরু বিপিন সিং, গুরু গোবিন্দন্ কুট্টি, এন. কে. শিবশঙ্করণ, বেলা অর্ণব, ডঃ প্রদীপ ঘোষ, ডঃ সনৎ কুমার মিত্র, ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রণয় কুমার কুণ্ডু, বুদ্ধদেব রায়, শান্তিনিকেতনের ডঃ সিতাংশু রায়, অধ্যাপক প্রশান্ত ভঞ্জ, ডঃ প্রবীর ভট্টাচার্য, এবং ডঃ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা সব সময়ই বই প্রকাশের জন্য তাগাদা দিয়েছেন, তাঁরা হলেন—ডঃ ইন্দ্রানী রায় (দূরদর্শন কলকাতা/দিল্লী), ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তী (আগরতলা), ডঃ সন্ধ্যা নন্দী, ডঃ অভিজিৎ রায়, অরুন্ধতী রায়, চৈতালী ঘোষ, ডঃ মালা মজুমদার, ডঃ তপা সেনগুপ্ত, শুক্লা পালিত, জয়ন্ত মুখার্জী প্রভৃতি।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড-এর বর্তমান কর্ণধার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। এই গ্রন্থ প্রকাশে তিনি সহৃদয় সহযোগিতা করেছেন। তাঁর জন্য রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ আশীর্বাদ। শ্রীস্বদেশ রঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ রায় ও শ্রীকাশীনাথ পাল এবং ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড-এর অন্যান্য সমস্ত কর্মীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই নির্ধারিত সময়ে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। তাই এঁদের জানাই আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসাযুক্ত আশীর্বাদ।

তাছাড়া যাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় বইটি মুদ্রিত হলো—সেই নায়ক প্রিণ্টার্সের মালিক শ্রীশঙ্কর প্রসাদ নায়ককে জানাই আমার স্নেহসিক্ত আশীর্বাদ।

৭নং পাইকপাড়া রো,
কলিকাতা-৩৭
১লা বৈশাখ ১৩০৪ সাল
(১৪ই এপ্রিল ১৯৯৭ সাল)

শ্রীশঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়

॥ সূচীপত্র ॥

।। ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষা ।।

।। সূচনা ।।

ভারতীয় নৃত্যের সার্বিক মূল্যায়নে, শিকড় সন্ধান করতে হবে নৃত্যতত্ত্ব মীমাংসার মূল সূত্র ধরে এবং তা অবশ্যই ইতিহাসকে ভিত্তি করে। কারণ, যে কোন শিল্পকলার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাটি জানতে গেলে তার ইতিহাস চাই। সু-প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সামগ্রিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে দেখা যাবে, একদিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক জীবন, আর্থনীতিক পরিবেশ, রাষ্ট্র গঠন ও ঐতিহাসিক নায়কদের উত্থান-পতনের ইতিহাস আছে, তেমনি পাশাপাশি রয়েছে ভারতের নানামুখী রুচি-সংস্কৃতির সামাজিক পরিবেশে জীবন-সাধনার একটি বিশিষ্ট ইতিহাস। এই বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকাতেই ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে (Perspective) নৃত্যের ঔপপত্তিক (Theoretical) অনুশীলন না হলে, নৃত্য-সাধনার রূপটি কোনদিনই পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

মানুষের সমাজে এখনো যত প্রকার শিল্পকলা জীবন্ত আছে, তার মধ্যে নৃত্যকলা যে প্রাচীনতম, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। শিল্পতাত্ত্বিক বিচারে নৃত্যের প্রাচীনতা অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হলেও ভারতীয় নৃত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি বিষয় এখনো প্রায় অনালোচিত রয়ে গেছে। তার কারণ, আমাদের দেশে নৃত্যের ফলিত চর্চা (Applied) যতদূর প্রাধান্য পেয়েছে, সেই তুলনায় ঔপপত্তিক দিকের আলোচনা ততটা প্রাধান্য পায়নি। এবং পায়নি বলেই প্রায় উপেক্ষিত এবং স্বল্পালোচিত অথচ ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভারতীয় নৃত্যকলার ঔপপত্তিক বিষয়ে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, একদা যা ছিল একান্তভাবে 'গুরুমুখী' নৃত্যচর্চা, তা এখন 'আকাদেমিক' পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া, নৃত্যের 'থিওরী' যে অন্যান্য শিল্পকলার তুলনায় এখনো অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত, এই কথাটি অপ্রিয় শোনালেও, সত্য। সুতরাং ফলিত ও ঔপপত্তিক—উভয় বিষয়ের

মধ্যে আনুপূর্বিক ইতিহাস ধ'রে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য স্থাপন করা যায় কিনা, ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষার প্রয়াস এইখানেই।

ভারতীয় নৃত্যতত্ত্ব মীমাংসার মূল সূত্র ঃ

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে নৃত্যকলা একটি মূল্যবান ও প্রাণবান শাখা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে সেই নৃত্যধারা প্রবহমান। এই প্রবহমান ধারার ঐতিহ্যপূর্ণ রূপটি যে, নানা মাধুর্যে, বলিষ্ঠতায় ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ব্যঞ্জনায় এখনো সমাজে জীবন্ত রয়েছে, সেই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্যের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি রাগিণী দেবীকে হাতে লিখে যে প্রশংসা-পত্রটি দিয়েছিলেন, তার অংশ বিশেষ হলো—

" The ancient art is still a *living tradition* in India with its varied grace and vigour and subtleties of dramatic expression."[১]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যে কত বড় সত্য এবং সুদূর প্রসারী, তা আমাদের আলোচনায় ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখি, 'living tradition' কথাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনা বহন করছে। অতীত ঐতিহ্যবাহী, নানা বৈচিত্র্যে ভরা এই 'জীবন্ত' নৃত্যধারাকে জানতে গেলে তার উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা দরকার।

ভারতীয় নৃত্যের উপাদান বিভাগ ঃ

মানুষের সমাজে যেমন জাতি ও প্রজাতি লক্ষণ নির্দেশ করা ছাড়া ব্যক্তি পরিচয় দেবার অন্য কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নেই, তেমনি ভারতীয় নৃত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই জাতি ও বিশেষ বিশেষ প্রজাতি লক্ষণ নির্দেশ করা বিশেষ জরুরী। নৃত্য সমীক্ষার ক্ষেত্রে, নৃত্যের শ্রেণীবিন্যাস, সংজ্ঞা প্রকরণ, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি নিয়ে নৃত্য বিচারের জন্য, মূল নৃত্যধারার গতি-প্রকৃতি জানতে হবে। এবং এজন্যই নৃত্যের মূল উপাদানগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১। Dance Dialects of India—Ragini Devi (Vikas Publication—Delhi —1972) প্রাক্ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের স্তর বিন্যাস ও সমীক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত উপাদানগুলিকে মূলতঃ দুই ভাগে বিভাজন করা যায়। যেমন :

(১) মৃতধারার উপাদান। (Static বা স্থাণু)

(২) জীবন্তধারার উপাদান। (Dynamic বা গতিশীল)

ভারতীয় নৃত্যের উপাদান

নৃত্যের **মৃতধারার** উপাদান।
পরোক্ষ, স্থাণু, অপরিবর্তনীয়,
(Indirect) (Static) (Unchangeable)

(যুগে যুগে প্রচলিত ছিল যে নৃত্যধারা, তার পরিচয় বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

(১) নৃতত্ত্ব (Anthropology), নৃ-বিজ্ঞান বা নৃ-জাতি বিজ্ঞান (Ethnology), জাতি বিদ্যা, মানব জাতিতত্ত্ব।

(২) প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology)।

(৩) ভাস্কর্য (Sculpture)।

(৪) চিত্রকলা (Painting)।

(৫) শিলালিপি / লেখমালা (Inscription)।

(৬) প্রাচীন পুঁথি (Classical Volumes or Scriptures)।

প্রভৃতির মাধ্যমে।)

নৃত্যের **জীবন্তধারার** উপাদান।
প্রত্যক্ষ, গতিশীল, পরিবর্তনীয়
(Direct) (Dynamic) (Variable)

(বর্তমানে, সমাজে প্রচলিত আছে, এমন নৃত্যধারার সন্ধান পাওয়া যায়—

(১) আদিবাসী নৃত্য (Tribal Dance)

(২) লোকনৃত্য (Folk Dance)।

(৩) ধ্রুপদী / মার্গ / শাস্ত্রীয় / উচ্চাঙ্গ নৃত্য (Classical Dance) প্রভৃতির মাধ্যমে।)

হাজার হাজার বছর ধরে প্রবহমান নৃত্যধারা যা নানা যুগে, নানা পরিবর্তন, নানা পরিবর্ধন ও নানা সংযোজনের মাধ্যমে আমাদের বর্তমান যুগে এসে পৌঁছেছে ; তাকেই আমরা বলতে চেয়েছি নৃত্যের **'জীবন্তধারা'**। যেমন, এই মুহূর্তে যদি আমরা ভারতের কোন পাহাড়-পর্বত ঘেরা অরণ্য অঞ্চল বা

দূরের কোন গ্রামীণ অঞ্চল অথবা বড় কোন নগরে যাই, তাহলে দেখতে পাবো, একই সময়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে আদিবাসীনৃত্য, লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের এই মূল তিনটি ধারাই জীবন্ত ভাবে সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। আর যুগে যুগে যে নৃত্যধারাগুলি একদা সমাজে প্রচলিত ছিল কিন্তু নানা কারণে সেগুলি আর এখন দেখা যায়না অথচ যার খণ্ডবিচ্ছিন্ন পরিচয় শুধুমাত্র সঞ্চিত হয়ে আছে নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভাস্কর্য, চিত্রকলা শিলালিপি, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতির নানা তথ্যের মধ্যে, তাকেই বলতে চেয়েছি, উপাদানের দিক থেকে '**মৃতধারা**'।

এই জীবন্ত ও মৃতধারার উপাদানগুলি একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ যুগে যুগে ঐ জীবন্ত-ধারা থেকেই তো উপাদানগুলি মৃতধারায় সঞ্চিত হয়েছে। এই দুই ধরনের উপাদানের সমন্বয়েই সার্থক নৃত্যের ইতিহাস তৈরী হতে পারে। এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই ছড়িয়ে থাকা জীবন্ত ও মৃতধারার উপাদান সংগ্রহ করে, তারই ভিত্তিতে ভবিষ্যতে ভারতীয় নৃত্যের পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের স্তর বিন্যাসে এবং সমীক্ষার ক্ষেত্রে এই জীবন্ত ও মৃতধারার উপাদান-গুলির বিশ্লেষণ অপরিহার্য বলে মনে করি। কারণ, আগেই বলেছি, যুগে যুগে ঐ জীবন্তধারা থেকেই উপাদানগুলি মৃতধারায় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে বিভিন্ন স্তরে।

মৃতধারার উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

নৃতাত্ত্বিক উপাদানঃ প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Paleolithic Age)। মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তিই তার জীবিকা। এ যুগের মানুষ মূলতঃ '**শিকারজীবী**' (Hunter)। পশুপালন বা কৃষিকাজ সম্বন্ধে মানুষের তখন কোন ধারণাই ছিল না। শিকার ভিত্তিক (Hunting / Hunter Dance) নাচগুলি এ যুগের সৃষ্টি। এরপর নব্য-প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। এ যুগে মানুষ—বন্যপশুকে বশ করে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে। তাই এ যুগের মানুষ হয় **পশুপালক** (Shepherd / Pastoral Dance)। কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষদের সময়কাল। এঁদের আদিবাসী নৃত্যকলার মধ্যে পশুপক্ষীর গতিভঙ্গি অনুকরণ করে নাচের প্রবণতা লক্ষ্যণীয় (Imitative / Mimetic Dance)।

যেমন সিংহলের 'বন্নম্' নাচগুলিতে ময়ূরের গতি, সর্পের গতি, গজের গতি প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। তারপর তাম্রযুগ (Dravidian Age) মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সময়কাল। খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বছর আগেকার সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা বিস্তারের সময়। মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে কৃষির আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। আধুনিক যুগের কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস কৃষি ব্যবস্থার প্রচলনের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। এ যুগের মানুষ হলো **'কৃষিজীবী'** (Agrarian / Peasant Dance) হরপ্পায় প্রাপ্ত বিরাট শস্য ভাণ্ডার প্রমাণ করে কৃষি ভিত্তিক সমাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। কৃষি-ভিত্তিক নাচ (Harvest Dance) সেই যুগের স্মৃতি বহন করছে। এভাবে শিকার ভিত্তিক নাচ, পশুপক্ষীর গতিভঙ্গির অনুকরণ মূলক নাচ ও কৃষিভিত্তিক নাচগুলি সমাজে প্রচলিত ছিল। সেই যুগগুলি এখন নেই কিন্তু সেই সব নাচের স্মৃতি পরিবর্তিত আকারে সমাজে থেকে গেছে নানা ভাবে। সুতরাং দেখা গেল,' **পৃথিবীর প্রাচীনতম নাচ হলো শিকার ভিত্তিক, প্রাচীনতর নাচ পশুপালক ভিত্তিক এবং প্রাচীন নাচ কৃষিভিত্তিক।**

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান : সিন্ধু সভ্যতার সময়কার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত (দৃষ্টান্ত Copper Dancing girl—সিন্ধুসভ্যতার যুগ) নৃত্যশীলা ব্রোঞ্জের নারী মূর্তি ও বিভিন্ন শীলমোহর থেকে জানা যায়, ভারতে কম করেও পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই বৃহত্তর অর্থে লোকনৃত্যের বা উপজাতীয় নৃত্যের প্রচলন ছিল। বিশেষজ্ঞরা ঐ মূর্তিটিকে বেলুচিস্থানের অথবা উত্তর পশ্চিম ভারতের কোন উপজাতীয় মহিলার মূর্তি বলে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং ঐ সময় যে কৃষি ভিত্তিক সমাজ ছিল, ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত 'শস্যভাণ্ডার' তার প্রমাণ।

ভাস্কর্য উপাদান : পৃথিবীর কোন দেশেই ভারতের মতো এত নৃত্য-ভাস্কর্য নেই। ভারত এই উপাদানে গর্ব করতে পারে। নৃত্যের ইতিহাস রচনায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য খচিত নৃত্য-ভাস্কর্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতে যত ভাস্কর্য আছে, তারমধ্যে একটি বৃহৎ অংশ নৃত্য-ভাস্কর্য। যুগে যুগে প্রচলিত নৃত্যধারার বিভিন্ন আঙ্গিক প্রকরণগুলি পাথরের গায়ে খোদাই হয়ে আছে মণ্ডনকলার সুপরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে। যেমন, ওড়িষ্যার কোনারকের সূর্যমন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি

মন্দির, উত্তর ভারতের খাজুরাহো, দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে বৃহদেশ্বর, চিদম্বরম্ প্রভৃতি অজস্র মন্দিরে নৃত্য-ভাস্কর্যের রূপ রেখাটি যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। অর্থাৎ যা ছিল একদা গতিশীল শিল্পকলা (Dynamic Art) তা স্থাণু (Static) হয়ে আছে। চিদম্বরম্ মন্দিরে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্গত ১০৮ প্রকার করণের অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গি শ্লোকসহ উৎকীর্ণ রয়েছে। নৃত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে তা মহার্ঘ। ভারতীয় ভাস্কররা নিশ্চয়ই তাঁদের নিজ নিজ যুগের নাচের যে রূপ দেখেছেন, তার অনুপম ছন্দ পাথরে খোদাই করে রেখেছেন এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন আছে।

চিত্রকলার উপাদান ঃ

নৃত্যের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে আঁকা চিত্রকলার ভঙ্গিগুলি উপেক্ষণীয় নয়। অজন্তা-ইলোরার দেওয়াল চিত্র ছাড়াও রাজপুত চিত্রমালা, মোঘল চিত্রমালা, ক্যাংড়া চিত্রমালা, বাঘগুহার চিত্রমালা প্রভৃতির সঙ্গে অন্যান্য আঙ্গিকে নৃত্যের অজস্র উপাদান ছড়িয়ে আছে, যার মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ লোকনৃত্যের স্মৃতি বহন করছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, সেই সব যুগের চিত্রশিল্পীরা যে সকল নাচ দেখেছিলেন, তার কিছু রূপ তাঁরা তুলিতে অক্ষয় করে রেখেছেন। যেমন, ক্যাংড়া চিত্রশৈলীতে রাগ-বসন্তের নৃত্যচিত্র, রাজপুত মিনিয়েচার পেন্টিং-এ মেঘরাগের রূপায়ণ, নৃত্যভঙ্গিমা, মোঘল চিত্রকলায় মল্লার ও বসন্ত রাগকে কেন্দ্র করে নৃত্যের কিছু লাবণ্যময় ভঙ্গি, অজন্তার ১নং গুহায় মহাজনক জাতক অবলম্বনে চিত্রকলার নৃত্যভঙ্গি, দাক্ষিণাত্যের সিত্তানাভাসাল গুহায় নৃত্যভঙ্গিযুক্ত চিত্রকলা প্রভৃতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন যুগের নৃত্যের উপকরণ পাওয়া যায়।

শিলালিপি বা লেখমালার উপাদান ঃ

ভারতীয় নৃত্যের অজস্র উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে নানা স্থানে, নানা শিলালিপিতে। যেমন, ভুবনেশ্বরের উদয়গিরিতে কলিঙ্গরাজ খারবেলের (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) হাতীগুম্ফা লিপিটি ওড়িশী নাচের প্রাচীনতা প্রমাণ করে। তাছাড়া তাঞ্জোরের চোল রাজা রাজরাজেশ্বর (১০০৪ খ্রীঃ) যে মন্দির নির্মাণ করান, তাতে চার শত দেবদাসীকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এঁদের বিনা ভাড়ায় বাসস্থান বা নিষ্কর জমি দেওয়া হয়েছিল। এ রকম অজস্র তথ্য

ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শিলালিপিতে। (যথাস্থানে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে।)

প্রাচীন পুঁথির উপাদান ঃ

নৃত্যকলা যতটা প্রাচীন, নৃত্যকলা বিষয়ক বইগুলি ততটা প্রাচীন নয়। এবং প্রাচীন নয় বলেই গোড়ার দিকের নাচের উপাদান ঐ সব বইয়ে তেমন পাওয়া যায় না। নাচ, যে সমাজে প্রচলিত ছিল, এটা জানা যায় আভাসে ইঙ্গিতে। ভারতে লিখিত সভ্যতার সূত্রপাত ধরা হয় বৈদিক যুগ থেকে। অথচ তার আগেও তো নাচ ছিল, তবে তা ছিল অলিখিত। সুতরাং বই আকারে নাচের প্রথম উপাদান পাওয়া যায় বেদ থেকে। তারপর রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নৃত্যের প্রচুর লিখিত উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। ওড়িশী নাচের অনেক উপাদান পাণ্ডুলিপি থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নাচের নির্দিষ্ট (Specific) নাম প্রথমে আমরা পাই হরিবংশ পুরাণে। এতে রয়েছে আসারিত নাচ, হল্লিসক নাচ, ছালিক্য নাচ; দণ্ডরাসকম্ নাচ প্রভৃতি। কালিদাসের কাব্য-নাটক এবং ঐ সমসাময়িক অনেক গ্রন্থে নৃত্য বিষয়ক উপাদান পাওয়া যায়। ঐ সব যুগের নাচগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ঐগুলির বেশীর ভাগই লোকায়ত সমাজের নাচ। প্রাচীন ভারতে নাচের যে কি বিপুলায়তন চর্চা ছিল, তা জানা যায় খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা বা সংকলন করা ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটি থেকে। এই গ্রন্থটিকে আমরা নৃত্য ব্যাকরণের প্রথম প্রামাণ্য দলিল বলে অভিহিত করতে পারি। (যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)। এ ছাড়া ভরতের অনুসারী গোষ্ঠী, যেমন সার্ঙ্গদেবের "সঙ্গীত রত্নাকর" নন্দিকেশ্বরের "অভিনয় দর্পণ", কোহল-মতঙ্গদের গ্রন্থ, শাণ্ডিল্য, যাষ্টিক প্রভৃতির এমন অজস্র গ্রন্থে নৃত্যের উপাদান ছড়িয়ে আছে।

মৃতধারার উপাদানগুলি এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো মাত্র। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত আছে। এবং এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার যে, মৃতধারায় যত রকমের উপাদান পাওয়া গেছে তার সিংহভাগ লোকপ্রভাবজাত নৃত্যের থেকেই উদ্ভূত বলে আমাদের বিশ্বাস। এর পর জীবন্তধারার আলোচনায় লোকনৃত্যের গুরুত্বের কথা বিশ্লেষণ করলেই এই কথার যাথার্থ প্রতিপন্ন হবে।

ভারতীয় নৃত্যধারার গতি প্রকৃতি

(নৃত্যে পিরামিড্ তত্ত্ব)

ভারতীয় নৃত্যের ভিত্তিভূমি - (অনুভূমিক স্তর থেকে ধীরে ধীরে উঠে গেছে সূক্ষ্ম স্তরে।)

আদিবাসী (Tribal) > আধা-লোক (Quasi-Folk) > লোক (Folk) > আধা লোক আধা উচ্চাঙ্গ (Classico-Folk) > উচ্চাঙ্গ (Classical) > নব-উচ্চাঙ্গ (Neo-Classical)

লোকনৃত্য সকল প্রকার নাচকে বিধৃত করে আছে অগ্রপশ্চাতে। আদিবাসী নৃত্য ←——— লোকনৃত্য ———→ নব্য-উচ্চাঙ্গ নৃত্য
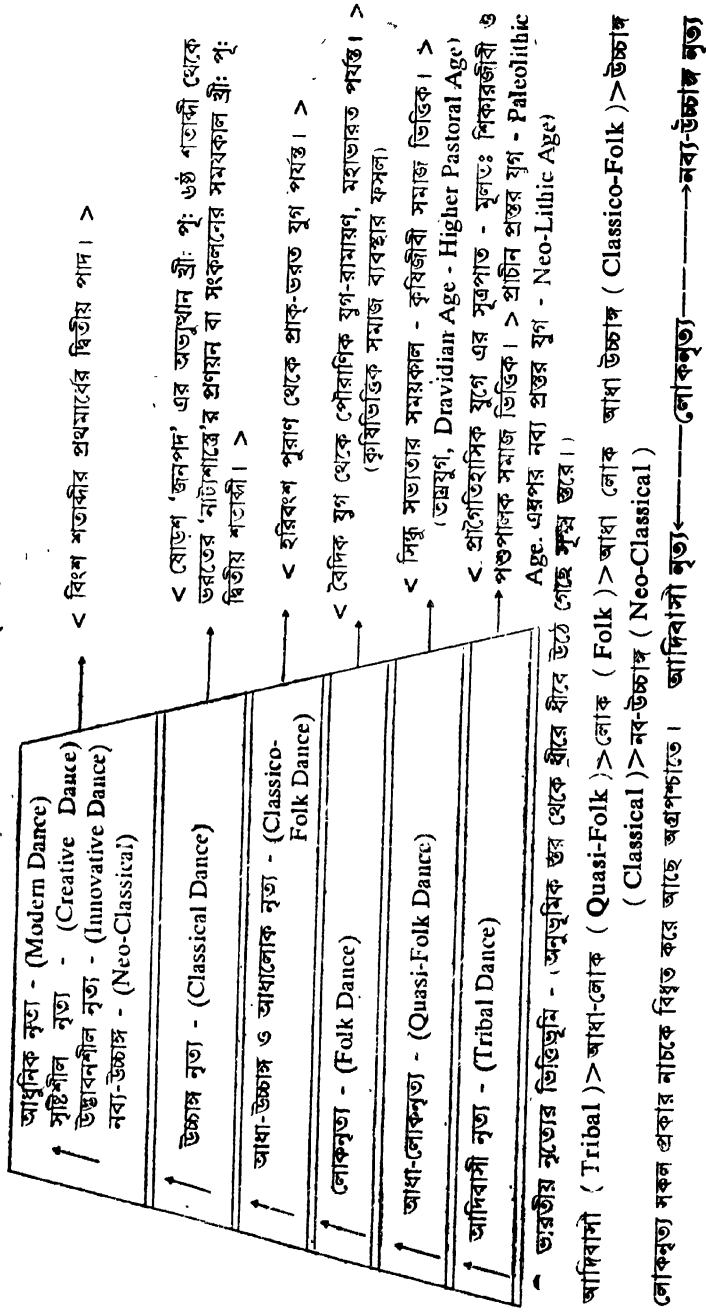
জীবন্ত-ধারার উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় নৃত্যের জাতি ও প্রজাতি লক্ষণ ঃ

অতীত ঐতিহ্যবাহী, নানা বৈচিত্র্যে ভরা ভারতে প্রচলিত জীবন্ত নৃত্যধারাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন আদিবাসী নৃত্য, লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় / ধ্রুপদী / উচ্চাঙ্গ নৃত্য। এই প্রধান তিনিটি ধারায়, **তিনটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।** যেমন :

(১) **আদিবাসী নৃত্যে** (Tribal Dance) আদিবাসী ও উপজাতীয় সমাজ।

(২) **লোকনৃত্যে** (Folk Dance) গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক গণসমাজ।

(৩) **উচ্চাঙ্গ নৃত্যে** (Classical Dance) নগর কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজের চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে।

উক্ত তিনটি মূল ধারার সঙ্গে আবার সংযোগ রক্ষাকারী (Connective) আরও তিনটি উপধারা আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে তেমন স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও, এই উপধারা তিনটি কম মূল্যবান নয়। এই তিনটি উপধারা হলো—

(১) **আধা-লোক নৃত্য** (Quasi-Folk Dance) এটা আদিবাসী ও লোক নৃত্যের মাঝামাঝি অবস্থা।

(২) **আধা-শাস্ত্রীয় ও আধা-লোক নৃত্য** (Classico-Folk Dance), এটা লোক নৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মাঝামাঝি অবস্থা।

(৩) **নব্য-উচ্চাঙ্গ নৃত্য** (Neo-Classical Dance) এটা বর্তমানে Modern Creative, Innovative নাম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ এই নব্য-উচ্চাঙ্গ ধারার পাশাপাশি খাতে বয়ে চলেছে আধুনিক (Modern) বা সৃষ্টিশীল (Creative) নৃত্যকলার ধারা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত সকল প্রকার ধারা-উপধারার মধ্যে লোক-নৃত্যের উপাদানগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। এখানেই ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে লোকনৃত্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে নৃত্যের ইতিহাসে 'লোকনৃত্য' কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; ভারতীয় নৃত্যের ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যেই এই নাচের উদ্ভব, নানা শাখা-প্রশাখায় তার বিস্তার এবং অন্যান্য প্রচলিত নৃত্যের সঙ্গে লোকনৃত্য যে ঘনিষ্টভাবে কখনো প্রত্যক্ষ,

কখনো পরোক্ষভাবে যুক্ত, এই মূলসূত্রটি অনুধাবন করে দেখা প্রয়োজন। তাহলেই লোকনৃত্যের সংজ্ঞার স্বরূপ ও পরিধির পরিচয় পাওয়া যাবে। এবং এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় নৃত্যের শিকড় সন্ধান করতে হবে আদিবাসী নৃত্যের উৎসমূলে।

এতক্ষণ আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে নৃত্যের জাতি ও প্রজাতি লক্ষণের মধ্য দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, ভারতীয় নৃত্যের রূপ-রেখায় মূল তিনটি নাচে (আদিবাসী, লোক ও উচ্চাঙ্গ) তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলনের ফলে এই নৃত্যধারাগুলির শ্রেণীবিন্যাস, সংজ্ঞা প্রকরণ, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি নিয়ে নৃত্য বিচারের জন্য কতকগুলি সূত্রের সন্ধান করা গেছে। এই অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, ভারতীয় নৃত্যের জগতে লোক-নৃত্যের স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর পরিধি কত ব্যাপক ও বহুধা বিভক্ত।

মানুষ যখন ক্রমবিকাশের স্তরে শিকারজীবী থেকে পশুপালক এবং পশুপালক থেকে কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হলো, সেই কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই লোকনৃত্যের জন্ম। অরণ্য ছেড়ে মানুষ যখন বাইরে এসে চাষ-আবাদ করে লোকালয় সৃষ্টি করে বসবাস সুরু করলো, তখন থেকেই বলা যায় সে "লোক" পর্যায়ভুক্ত হলো। ইউরোপীয় ফোক্ (Folk) এবং ভারতীয় "লোক" এই দুইটির মধ্যে ধ্বনিসাম্য লক্ষণীয়। 'ফোক'-এর প্রতিশব্দ রূপে 'লোক' শব্দটিকে গ্রহণ করা যায়। দুটি শব্দের মধ্যে ধ্বনি সাম্যের সঙ্গে অর্থ-দ্যোতনার দিক দিয়েও সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। এভাবে ধ্বনিসাম্য ও অর্থ-দ্যোতনায় 'ফোক' ও 'লোক' শব্দ দুটি পারিভাষিক প্রতিশব্দ রূপেও গৃহীত হতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত সূত্র ধরে এক কথায় বলা যায়—গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ দ্বারা চর্চিত নাচই "লোকনৃত্য"।

আগেই বলেছি, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে নৃত্যকলা একটি মূল্যবান ও প্রাণবান শাখা। এই শাখারই অন্তর্গত 'লোকনৃত্য' হলো সার্বিক লোকায়ত সমাজ-সংস্কৃতির একটি মৌল উপাদান। এই মৌল-উপাদানটি ভারতের জাতীয় সংহতিতে, ঐক্য স্থাপনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে। কারণ, এর শিকড় প্রত্যেক প্রদেশেই প্রোথিত, যদিও তা ভিন্নতর রূপ ও বৈচিত্র্যে বিরাজ করছে। কিভাবে ভারতের সকল প্রকার নাচের মধ্যে লোকনৃত্যের মৌল-উপাদান সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে, সেটা জানতে

পারলে এর পরিধি বিস্তৃতির সূত্রটি বোঝা যাবে। তার আগে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, আপাত দৃষ্টিতে সকল আদিবাসী নৃত্যকে বৃহত্তর অর্থে লোকনৃত্যের পার্যায়ভুক্ত বলে মনে হলেও, সকল লোক-নৃত্যকেই কিন্তু আদিবাসী নৃত্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। এই দু'টির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে হবে। এবং অনুধাবন করে দেখতে হবে, আকাদেমিক দিকেও লোকনৃত্যের ঔপপত্তিক ও ফলিতচর্চার ব্যাপারে সার্বিক-ভাবে মূল্যায়ন কতখানি প্রয়োজন। সুতরাং লোকনৃত্যকে মাঝখানে রেখে, অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর ধরে প্রবহমান ভারতীয় নৃত্যের গতি-প্রকৃতি অনেকটা এই রকম :

Tribal Dance > Quasi-Folk Dance > Folk Dance > Classico-Folk Dance > Classical Dance > Neo-Classical Dance > Modern, Creative and Innovative Dance.

উক্ত ধারাবাহিকতায় দেখা গেল, নাচের মধ্যমণি হলো 'লোকনৃত্য'। লোকনৃত্য মাঝখান থেকে একদিকে আদিবাসী নৃত্য, অপরদিকে নব্য-উচ্চাঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য কোন সূত্রের টানা-পোড়েনে যেন সকল নাচগুলিকে বিধৃত করে আছে। অর্থাৎ লোকনৃত্যের একটি বাহু আদিবাসী নৃত্যের দিকে প্রসারিত, অপর বাহু নব্য-উচ্চাঙ্গের দিকে বিস্তৃত। সুতরাং লোকনৃত্য অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র বলা যায়। যেমন :

আদিবাসী নৃত্য←————————লোকনৃত্য————————→নব্য-উচ্চাঙ্গ

সুতরাং দেখা গেল, বৃহত্তর অর্থে লোকনৃত্যকে বলা যায়, অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ স্বরূপ একটি মূল্যবান জীবন্ত উপাদান।

যদিও নৃত্যের জীবন্ত ধারার বিভাজন নিয়ে নানা বিতর্কের অবকাশ আছে এবং তা থাকতেই পারে, তবু এটুকু বলা যায় যে, প্রচলিত প্রধান তিন ধারার মধ্যে আদিবাসী নৃত্য কি ভাবে লোকনৃত্যে পরিণত হলো এবং লোক-নৃত্য কিভাবে ধীরে ধীরে উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পরিশীলিত হলো তার ইতিহাস ব্যাপক ও বহুধা বিভক্ত। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, আদিবাসী নৃত্য থেকেই গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য পরম্পরায়, স্থানীয় প্রভাবে (Local influence) লোকনৃত্যগুলি গড়ে উঠেছে। এবং পরবর্তীকালে আদিবাসী নৃত্যের আচার-অনুষ্ঠানের (Rituals) সঙ্গে যুক্ত

হয়েছে ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি বিষয়ের প্রভাব। এর পরের পর্যায়ে (ষোড়শ জনপদের সময় থেকে) লোক নৃত্যই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উপযোগী মার্জিত, পরিশীলিত হয়ে দেখা দিয়েছে ধ্রুপদী / শাস্ত্রীয় / মার্গ / উচ্চাঙ্গ নৃত্য রূপে। ভারতে ষোড়শ জনপদের, অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত লোকনৃত্যের মূল ধারা অব্যাহত ছিল। তারপর বিপুলায়তন পরিবর্তন ঘটে গেছে। (এই পরিবর্তনের কারণগুলি যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে)। ষোড়শ জনপদ —কোশল (অযোধ্যা প্রদেশ), মগধ (দক্ষিণ বিহার), অবন্তী (মালব), বৎস (এলাহাবাদ), কাশী (বারাণসী), অঙ্গ (পূর্ব বিহার), বৃজ্জি (উত্তর বিহার), মল্ল (গোরক্ষপুর জেলা), চেদি (যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল), কুরু (থানেশ্বর, দিল্লী, মিরাট), পাঞ্চাল (বেরিলি, বুদাউন, ফরাক্কাবাদ), মৎস (জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), অশ্মক (গোদাবরী তীর), গান্ধার (পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি), কাম্বোজ (দক্ষিন পশ্চিম কাশ্মীর ও কাফিরস্তানের অন্তর্গত)। এছাডাও তক্ষশীলা (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), বৈশালী (মজঃফরপুর জেলা) কপিলাবস্তু (নেপালের তরাই অঞ্চল)। এই সময়েই (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) লোকনৃত্য খোলস ছাড়িয়ে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের দিকে যাত্রা করেছে। উচ্চাঙ্গ নৃত্যের জন্ম বলা যেতে পারে নগর বা জনপদকে কেন্দ্র করেই।

যদিও আদিবাসী নৃত্য, লোকনৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে কোথায় কোথায় সাযুজ্য এবং পার্থক্য রয়েছে, তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় ; তবু এই প্রসঙ্গে দুইটি উপপাদ্য বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে।

(১) ভারতে বর্তমানে প্রচলিত 'ক্ল্যাসিকাল' নাচগুলির উৎপত্তির মূলে লোকনৃত্যের উপাদানগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে এবং এখনো করছে।

(২) 'ক্ল্যাসিকাল' নাচের শৈলীকেও (Style) লোকনৃত্য প্রভাবিত করে থাকে।

প্রথম উপপাদ্য বিষয় ঃ

(১) মণিপুরী ঃ প্রচলিত ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির উৎপত্তির মূলে

লোকনৃত্যের উপাদানগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আরও সোজাভাবে বলা যায়, সব ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির জন্ম হয়েছে লোকনৃত্য থেকে। যেমন ভরত নাট্যম, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী ও কুচিপুড়ি প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির মৌলভঙ্গি বা বুনিয়াদি ভঙ্গিগুলি (basic movement) এসেছে লোকনৃত্যের ভঙ্গিগুলি থেকে। উদাহরণস্বরূপ সংক্ষেপে বলা যায়, যেমন, মণিপুরী নৃত্যের বুনিয়াদী ভঙ্গি যে চালী, তার উপাদানগুলি এসেছে মণিপুরে প্রচলিত লোকপ্রভাবজাত ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যের টুকরো-টুকরো ভঙ্গি থেকে। এই চালীগুলি (চারী) আগে শিখে নিয়ে তবে মণিপুরী ক্ল্যাসিকাল নাচ শিখতে হয়। এজন্যই এগুলিকে 'basic movement' বলা হয়েছে। মণিপুরেব বিখ্যাত 'লাইহরওবা' (Religious folk dance) নৃত্যের বিশেষ কতকগুলি ভঙ্গি এবং উপজাতীয় নাগা নৃত্যের ঢিমা লয়ের কিছু কিছু ভঙ্গি ঐ 'চালী'র মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। ফলিত চর্চায় তা ধরা পড়ে। এই চালীগুলির সাহায্যেই তো মণিপুরী 'classical form' তৈরী হয়েছে। এই তৈরীর ব্যাপারটা ঔপপত্তিকভাবে অতটা দেখানো সম্ভব না হলেও, ক্রিয়াসিদ্ধভাবে দেখানো সম্ভব। এই দেখানোর সম্ভাব্যতা রয়েছে নৃত্যের 'পাদকর্ম', 'হস্তকর্ম', এবং বিভিন্ন ভঙ্গির প্রয়োগ কৌশল বা পদ্ধতি (Techuique) বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এছাড়া, মণিপুরী নৃত্যে আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্য করা যায়—হরিবংশ পুরাণের যুগের লোকপ্রভাবজাত নৃত্য আসারিত, হল্লিসক, ছালিক্য, দণ্ডরাসকম্ প্রভৃতি নাচের মণ্ডল (circular movement), অর্ধমণ্ডল (semi-circular movement) প্রভৃতি আঙ্গিকগুলির প্রয়োগ-পদ্ধতি এখনো 'রাস' নৃত্যে খুব সুন্দরভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছে। এ ছাড়া লোকপ্রভাবজাত 'clock-wise' এবং anti-clockwise' Movement-ও দেখা যায়।

(২) **কথাকলি :** এভাবেই লক্ষ্য করা যায়, কেরালায় "কথাকলি" নাচের উদ্ভবের মূলেও রয়েছে প্রায় ২০ রকমের "কলি" নামধারী লোকনৃত্যের উপাদান। যেমন, কোলকলি, ভেলকলি, ভট্টকলি, পুলোয়ার কলি, কৈকোত্তি-কলি, শাস্ত্রকলি, সংজ্ঞকলি, এঝুমাট্টাকলি প্রভৃতি লোকনৃত্যের ভঙ্গিগুলিই পরিশীলিত আকারে এসে 'কথাকলি' উচ্চাঙ্গ নাচকে তৈরী করেছে। কথাকলির basic movement কে বলা হয় 'কলাসম': জানা যায়, উত্তর কেরলের

একজন গোষ্ঠীপতি রাজা ছিলেন ভেত্তাথুনাড়ু। তিনিই সম্ভবতঃ নৃত্যাচারণার ক্ষেত্রে লোকায়ত নৃত্যের উপাদান ভঙ্গিগুলিকে নিয়ে 'কলাসম' তৈরী করেছিলেন। তাছাড়া কেরালার সামাজিক (পারিবারিক) লোকনৃত্য "কুম্মি", দ্রাবিড় প্রভাবজাত লোকনৃত্য "মুডিএট্টা" এবং "কৃষ্ণনাট্যম্", "রামনাট্যম্" "কালীআট্টম" থেকেও কলাসমের ভঙ্গিগুলি এসেছে।

(৩) **ভরতনাট্যম্ঃ** কথাকলির মতো ভরতনাট্যম্ নাচটির উৎপত্তির মূলেও রয়েছে তামিলনাড়ুর প্রচলিত বিভিন্ন লোকনৃত্যের প্রভাব। যেমন সাদিরনাট্য, কুরুভঞ্জী নামে লোকায়ত নৃত্যের ভঙ্গি। প্রাচীনকালের লোক প্রভাবজাত কংসনাটকম্, মীনাক্ষীনাটকম্ প্রভৃতির ভঙ্গি, সর্বোপরি ভ্রাম্যমান লোকনৃত্য "জিপসী" থেকেও ভরতনাট্যমের 'basic movement' বলে পরিচিত "আদাউ"গুলির সৃষ্টি হয়েছে। এই আদাউগুলির সমাহারেই ভরতনাট্যম্ উচ্চাঙ্গ নাচের বিষয়সূচী (Item)—আলারিপু, যতিস্বরম্, বর্ণম্ পদম্, তিলানা প্রভৃতি তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, উচ্চাঙ্গ নাচগুলি তৈরী হওয়ার মূলে উপাদান হিসেবে কাজ করেছে লোকপ্রভাবজাত নাচের ভঙ্গিগুলি।

(৪) **কুচিপুড়িঃ** কুচিপুড়ি নাচের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণাজেলার কুচেলাপুরম্ নামক গ্রাম থেকে এই নাচের উৎপত্তি হয়েছে বলে এর নাম "কুচিপুড়ি"। একদা অন্ধ্রের ভ্রাম্যমান লোকনৃত্য নাট্যদলের শিল্পীরা "শিবালিয়া" নামক একপ্রকার লোকনৃত্যের মাধ্যমে শিবের লীলাকীর্তন করতেন। তাছাড়া, আমাদের বাংলার লোকনাট্য 'যাত্রা'র মতো অন্ধ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে, মহীশূর, কর্ণাটক অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যনাট্য 'যক্ষগণ' থেকে নানা ভঙ্গির মিশ্রিত উপাদান কুচিপুড়ি উচ্চাঙ্গ নাচে এসে মিশেছে। এই শিবালিয়া যক্ষগণ ছাড়াও অন্ধ্রের বিখ্যাত "নত্তুভমেলা", "ব্রাহ্মণমেলা" ও "ভাগবতমেলা" প্রভৃতি লোকপ্রভাবজাত নৃত্যের উপাদানগুলি পরিশীলিত হয়ে কুচিপুড়ি নাচকে সমৃদ্ধ করেছে।

(৫) **ওড়িশীঃ** কুচিপুড়ির মতো ওড়িশী নৃত্যের ক্ষেত্রেও এই লোকপ্রভাব-জাত উপাদান-স্বীকরণ লক্ষ্য করা যায়। এই লোকনৃত্যের ভঙ্গিগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ হয়েছে মন্দিরে চর্চিত 'মাহারী'দের (দেবদাসী) নাচের আঙ্গিক এবং 'গুটিপু'দের (ছোট ছোট ছেলে যারা মেয়ে সেজে নাচে) নাচের ভঙ্গিগুলি। গুটিপু নৃত্যের উৎস তো গ্রামীণ পরিবেশের 'আখড়া'গুলিতেই খুঁজে

পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ঐ সকল নাচের ভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন মন্দিরের নৃত্যভাস্কর্যের স্থিতিশীল (static) ভঙ্গিগুলি এবং নানা ব্যঞ্জনায় সেগুলিকে গতিশীল (Dynamic) করে তুলেছেন এ যুগের নৃত্যগুরুরা। তাইতো, ওড়িশী নৃত্যের বর্তমান পরিশীলিতরূপে Sculpture কে Dynamic form-এ দেখছি। সুতরাং ওড়িশী নাচেও স্থানীয় লোকনৃত্যের বিভিন্নভঙ্গির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই নৃত্যের পাদভেদ, চারী, ভ্রমরী, ভঙ্গি, হস্ত সঞ্চালন, উঠ, বৈঠ, স্থানক প্রভৃতি নৃত্যভঙ্গিগুলিতে এই লোকায়ত প্রভাব লক্ষণীয়।

(৬) **কথক ঃ** কথক নৃত্যেও লোকনৃত্যের ভঙ্গির প্রভাব রয়েছে। 'কথকতা' থেকে কথক নৃত্যের উদ্ভব ঘটেছে। 'কথকতা' থেকেই 'কথক' শব্দটি এসেছে। অতীতকালে লোকশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে কথক ঠাকুররা রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবত গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনীকে উপাদেয় বা চিত্তাকর্ষক করে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গির সাহায্য নিতেন। সেই ভঙ্গিগুলিই আরও পরিশীলিত হয়ে কথক নাচে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া একদিকে যেমন গুজরাটের লোকনৃত্য 'দণ্ডরাসকম্' (যাকে আমরা বাংলায় বলি 'কাঠিনৃত্য') নৃত্যের ভঙ্গি থেকে ঘূর্ণনের ভঙ্গিগুলি কথক নাচকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া মুঘল যুগে উজবেকিস্তানের লোকনৃত্যের ঘূর্ণন-এ মধ্যপ্রাচ্যের নাচের ঘূর্ণন, দরবারের বাঈজীদের মাধ্যমে ক্রমে ভারতীয় কথক নৃত্যে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। এই ঘূর্ণনগুলি লোক-প্রভাবজাত। এ ছাড়া লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর অঞ্চলের বিভিন্ন লোকনৃত্যের ভঙ্গি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে উক্ত দুটি ঘরোয়ানার কথক নাচে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। এভাবেই বিভিন্ন লোকনৃত্যের মৌল উপাদান স্বরূপ ভঙ্গিগুলির দ্বারা যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যগুরুদের প্রচেষ্টায় মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে আমাদের ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির শিকড় হলো লোকনৃত্য। ঐ শিকড় থেকে রস শোষণ করেই ক্ল্যাসিকাল নাচের বৃহৎ বনস্পতির বর্দ্ধন সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় উপপাদ্য বিষয় ঃ

ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল নৃত্যের বিভিন্ন শৈলীকেও (Style) লোকনৃত্য

প্রভাবিত করেছে। যেমন, ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে তামিলনাড়ুর ভরতনাট্যম্, অন্ধ্রের কুচিপুড়ি ও ওড়িষ্যার ওড়িশী নৃত্য একই পূর্বঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত। ঔপপত্তিক দিক দিয়েও এই তিন ধরনের নৃত্যধারার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। কারণ এই তিনটি ধারাই ভরতের নাট্যশাস্ত্র-কেন্দ্রিক করণ-প্রকরণে সিদ্ধ এবং নাট্যশাস্ত্রের অনুচিন্তা গোষ্ঠী দ্বারা সমৃদ্ধ। তবে এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা হলো—

(ক) স্থানীয় লোকপ্রভাবজাত (Regional or Local influence) পদ্ধতিতে এবং (খ) প্রতিভাধর গুণীগুরুদের ব্যক্তিগত (Personal) শৈলী-স্বাতন্ত্র্যে (Style)।

সুতরাং ঐ সব ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির আঙ্গিক বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ঐ ব্যক্তিগত শৈলীস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় আশেপাশের লোকপ্রভাব জাত নৃত্যগুলির প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং দেখা গেল নাচের Style পরিবর্তনেও লোকনৃত্যের প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া, লোকনৃত্য শুধু যে ক্ল্যাসিকাল নাচগুলিতে উপাদানই যোগাচ্ছে তা নয়, Style-এও পরিবর্তনও আনছে। এও লক্ষ্য করা গেছে, অন্ধ্রের কৃষ্ণা জেলার কুচেলাপুরম্ গ্রামে যা ছিল একদা স্থানীয় লোকনৃত্যের পর্যায়ে, তাই কালক্রমে বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানীতে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উপযোগী হয়ে কুচিপুড়ি ক্ল্যাসিকাল নৃত্যে নতুন form-এ দানা বেঁধে উঠেছে। 'শিবালিয়া' নামক ভ্রাম্যমান লোকনৃত্য থেকেই কুচিপুড়ি নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে ধরা হয়। তাছাড়া কুচেলাপুরম্ নামক গ্রাম থেকেই কুচিপুড়ি নাচের চর্চার সূত্রপাত হয়েছে। সুতরাং পুরো পটভূমিকাটাই লোকায়ত। এভাবেই আমরা দেখতে পাই খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ষোড়শ জনপদকে কেন্দ্র করে তখন লোকনৃত্যগুলি পরিশীলিত হয়ে classical form-এ দানা বেঁধে উঠেছে। যার ফলশ্রুতি দেখি, এর চারশত বছর পরে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে নৃত্য ব্যাকরণ ইত্যাদি মহার্ঘ উপাদানে সমৃদ্ধ এই নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য দলিল বলা যায়। এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রায় বাইশ শত বছর আগের তৈরী নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখিত নৃত্য ব্যাকরণের অনেক 'term' (প্রকরণ) এখনকার প্রচলিত অনেক লোকনৃত্যে দেখা যায়, যেমন, বাউল ও ছৌ নাচে। (এ প্রসঙ্গে আলোচনা যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে।)

এ ছাড়া, নাচের স্টাইলের পরিবর্তনে ভৌগোলিক কারণের সঙ্গে ঐতিহাসিক কারণকেও যুক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—অন্ধ্রের বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভাগবতুলু অর্থাৎ ভাগবতমেলার নৃত্যশিল্পীরা তামিলনাড়ুতে চলে যান। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন 'নায়ক' বংশের রাজা অচ্যুতাপ্পা নায়ক (১৫৬১—১৬১৪ খ্রীঃ)। রাজা ঐ ব্রাহ্মণ ভাগবতুলুদের "অগ্রহারম্" অনুদান (অনেকটা নিষ্কর জমিদান) দিয়ে তাঁদের নৃত্য শিল্প-চর্চায় ও সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেন। ফলে তাঁরা খুশি হয়ে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ ঐ অগ্রহারম্ বা ভূমিদানের ফলে যে জায়গাটির উদ্ভব হল, তার নাম দিলেন "অচ্যুৎপুরম্"। এই অচ্যুৎপুরমই বর্তমান 'মেলাতুর'। এই মেলাতুর স্থানটি ছিল, ভরতনাট্যম্ নৃত্যের পীঠস্থান তাঞ্জোরের ১০ মাইল দূরে। তেলেগু ভাষায় লেখা "যক্ষগণ" নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে এই মেলাতুর এবং তার সংলগ্ন গ্রামগুলি একদা মুখরিত হয়ে উঠতো। এতে অংশগ্রহণ করতেন ব্রাহ্মণমেলা নামক সম্প্রদায়—এঁদেরই উত্তরপুরুষ ভাগবতমেলা। অন্ধ্রের কুচিপুড়ি নাচের ছিল পর পর তিনটি ধারা—নত্তুভমেলা, ব্রাহ্মণমেলা ও ভাগবতমেলা। (যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা আছে।) সুতরাং অন্ধ্র থেকে যাঁরা মেলাতুর বা অচ্যুৎপুরমে ক্রমে বসবাস শুরু করলেন তাঁদের সঙ্গে কুচিপুড়ি নৃত্যের একটি ধারা চলে এলো এখানে। নৃত্যগুরুর মধ্যে সিদ্ধেন্দ্র যোগী অন্ধ্রে রয়ে গেলেন। বাকী দুই গুরু তীর্থ নারায়ণ যাতি ও ভক্ত ক্ষেত্রয় এই দলের নেতৃত্ব দিয়ে অন্ধ্র ছেড়ে মেলাতুরে চলে এলেন। কুচিপুড়ি নৃত্যের এই ধারাটির প্রভাবে ১০ মাইল দূরের তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম প্রভাবিত হলো। দীর্ঘদিন তাঞ্জোরের ভারতনাট্যম শিল্পীরা মেলাতুরে এসে ভরতনাট্যম্ অনুষ্ঠান করেছেন, আবার মেলাতুরের শিল্পীরা তাঞ্জোরে গিয়ে কুচিপুড়ি নৃত্যানুষ্ঠান করেছেন। এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটলো। ধীরে ধীরে উভয়ে উভয়ের নৃত্যশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হলো। ফলে দেখা গেল ভরতনাট্যমে দুটি স্টাইলের পত্তন ঘটলো, অন্ধ্র স্টাইল ও তাঞ্জোর স্টাইল। এইভাবে অন্ধ্রগোষ্ঠী ও তাঞ্জোরগোষ্ঠী দ্বারা চর্চিত ভরতনাট্যম্ দুটি পৃথক স্টাইলের সৃষ্টি করলো। সুতরাং দেখা গেল, একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কিভাবে অন্য নাচের স্টাইলকেও প্রভাবিত করে থাকে।

ভারতীয় নৃত্যের লক্ষণগত সাযুজ্য, পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ঃ

ভারতীয় নৃত্যের জীবন্ত ধারার অন্তর্গত নাচগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা তথা লক্ষণগুলি নিম্নরূপ। আমরা এখানে অতিসংক্ষেপে আদিবাসী নৃত্য, লোকনৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী নৃত্যগুলির মূলগত লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সাযুজ্য, পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করবো যাতে এক নজরে বোঝা যাবে, বৃহত্তর অর্থে লোকনৃত্য, আদিবাসী নৃত্য থেকে 'নিও ক্ল্যাসিক্যাল' নৃত্য পর্যন্ত বিভিন্ন নাচ কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে বিধৃত হয়ে আছে এক অদৃশ্য বন্ধনে। যেমন :—

(1) Tribal > Quasi-Folk > Folk >
Classico-Folk > Classical >
Neo-Classical Dance.

(2) Neo-Classical —
(a) Modern.
(b) Creative.
(c) Innovative.

(3) Neo —
'Revived in modified form'.
'Based upon'.

(ক) আদিবাসী নৃত্য (Tribal Dance)

(১) সময়গত দিক থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

(২) এই নৃত্যে জাতিগত (Racial) প্রাধান্য লক্ষণীয়।

(৩) এতে গোষ্ঠীনৃত্যের (Group বা Community Dance) স্ফুরণ—একক (Solo) বা দ্বৈত (Duet) নৃত্য অনুপস্থিত।

(৪) সামষ্টিক চেতনার (Collective emotions বা Consciousness) বিকাশ লক্ষণীয়—নাচের বিষয়বস্তুতে দলগত টোটেম (Totem) ও ক্লান (Clan) পর্যায়ের বিশ্বাসও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৫) এক্ষেত্রে দর্শকে ও নর্তকে কোন পার্থক্য থাকে না। এই নাচে এঁদের সমাজের সকল স্তরের লোকই অংশ গ্রহণ করে থাকে।

(৬) অনুকরণমূলক যাদুবিশ্বাস (Imitative magic) এই নাচের মূল ভিত্তি স্বরূপ—

(৭) এই নাচ জীবিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত

(৮) এই নাচ মূলতঃ আচার-অনুষ্ঠান মূলক (Ritualistic)।

(৯) এই পর্বের নাচের সঙ্গে ধর্মবোধ (Religion), দেবতাবোধ (God worship) এবং ঐশী উৎপত্তির ধারণা (Divine origin) অনেক পরে সমাজে সংযোজিত হয়েছে।

(১০) এই পর্বে, নৃতাত্ত্বিকদের মতে নাচ-গান-কাজ একই প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এগুলো বিযুক্ত হয়েছে পরবর্তীকালে।

আদিবাসী নৃত্যের শ্রেণীভাগ[১]

একেবারে গোড়ার দিকে।	অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে।
সামাজিক। (আচার-অনুষ্ঠান Ritual)	যাদুবিশ্বাস (ভৌতিক) ও ধর্মমূলক।
(১) জন্ম সম্বন্ধীয়।	(১) পূজা—সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, সর্প, বৃক্ষ, পিতৃ পুরুষ, ভূতপ্রেত।
(২) সংস্কার-সম্বন্ধীয় (স্ত্রী-পুরুষ)।	(২) খাদ্য সম্বন্ধীয়, পশুশিকার। বৃষ্টি আনয়ন, ফসল উৎপাদন।
(৩) বিবাহ সম্বন্ধীয়।	(৩) রোগ সম্বন্ধীয়।
(৪) বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানমূলক।	(৪) মৃত্যু ও মৃতদেহ সম্বন্ধীয় ইত্যাদি।
(৫) যুদ্ধ সম্বন্ধীয়।	
(৬) সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ মূলক। (Anti-Social Dance) ইত্যাদি।	

(খ) আধালোক নৃত্য (Quasi-Folk Dance)

(১) সময়গত দিক দিয়ে সিন্ধু-সভ্যতার যুগ (Dravidian Age তাম্রযুগ —Higher Pastoral Age—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হাজার বছর।)

(২) উপজাতীয় সংস্কৃতির ধারা বিবর্তিত হয়ে এই পর্যায়ে লৌকিক

(১) Tribal Dance and Social Development—W. D. Humbly (H. F. & G. Witherby, 326 High Hobborn, W. C. London, 1926 Page 16-17.

সংস্কৃতিতে রূপ লাভ করে। তবে কিছু কিছু উপজাতীয় উপকরণ ও স্মৃতি এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সজীব থাকে। লোক সংস্কৃতির সঙ্গে আদিম বা উপজাতীয় সংস্কৃতির একাত্মতা কল্পনা করা হলেও, সামাজিক বিবর্তনে লোক-সমাজ ও সংস্কৃতি এই পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, আপাত দৃষ্টিতে সকল আদিবাসী নৃত্যকে বৃহত্তর অর্থে লোকনৃত্যের পর্যায়ে দেখলেও, সকল লোকনৃত্যকে কিন্তু আদিবাসী নৃত্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"Folk culture is quite often mistakenly identified with primitive culture. But folk culture is not necessarily primitive."[১]

এই সময়ের বা পর্যায়ের নাচকে বলা যায়—"Less ritualistic in content". অর্থাৎ আদিম যুগের আচার-অনুষ্ঠানের (Rituals) খোলস ছাড়িয়ে যেন নবতর ভাবে বেড়িয়ে এসেছে খানিকটা ধর্মীয় ও আধাসামাজিক নৃত্য পর্যায়ে। আদিবাসী নৃত্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মার্জিত এবং খানিকটা ধর্মীয় প্রভাব অনুপ্রবেশ করেছে এই নৃত্যে, বহিরঙ্গ রূপে একই রকম মনে হলেও অন্তরঙ্গ রূপে একটু আলাদা হয়েছে এই Quasi-Folk পর্যায়। সামাজিক বিবর্তনে লোকসমাজ ও সংস্কৃতি এই পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একথা আমরা আগেই বলেছি। এই স্পষ্ট হয়ে ওঠার ফলে এই নাচে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখা দিয়েছে যা, লোকনৃত্যের সংজ্ঞা প্রকরণে অতীব জরুরী।

(গ) লোক-নৃত্য (Folk Dance)

(১) সময়গত দিক দিয়ে বৈদিক যুগ। অর্থাৎ মানুষ যখন তাঁর ক্রমবিকাশের পথে শিকারজীবী থেকে পশুপালক এবং পশুপালক থেকে কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হলো, সেই কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই এর জন্ম। বৈদিক যুগ থেকে (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-৫০০) নাট্যশাস্ত্রর যুগে (খ্রীঃ পূঃ ২০০) আসা পর্যন্ত লোকনৃত্যকে অনেকগুলি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। এই অতিক্রমণের ফলে যে রীতির উদ্ভব হয়েছে, তাই এসে নাট্যশাস্ত্রের রীতি, বৃত্তি

(১) The Visva-Bharati Quarterly (Vol—XXV Nos. 3 & 4) "Folklories Background of old Bengali Literature—by Dr. Sukumar Sen.

ও প্রবৃত্তির আকারে পারিভাষিক শব্দে বিধৃত হয়েছে। একটু বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে।

এখানে আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক যুগের পর খ্রীঃ পূঃ ৬০০তে যে ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সূত্রপাত ধরা হয় তাতে ষোড়শ জনপদের সময় থেকেই ভারতীয় নৃত্য পরিশীলিত হতে থাকে। খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২০০ পর্যন্ত এই চারশত বছরে নৃত্যের ব্যাকরণ তৈরী হয়ে গেছে, যা আমরা লিপিবদ্ধ আকারে পেলাম নাট্যশাস্ত্রে (খ্রীঃ পূঃ ২০০) ঐ চারশ বছর ধরে ভারতবর্ষে নাচের যে কি বিপুলায়তন চর্চা হয়েছে, তা আমরা এ যুগে বসে কল্পনা করতে বা **ভাবতে** পারি না। ঐ বিপুলায়তন চর্চার রূপটিই ধরা পড়েছে নাট্যশাস্ত্রে।

বৈদিক যুগ →	**ক্ল্যাসিক্যাল যুগ**	**মধ্যবর্তী**	**নাট্যশাস্ত্রর যুগ**
(খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-৫০০)	(খ্রীঃ পূঃ ৬০০)	(৪০০ বছর)	(খ্রীঃ পূঃ ২০০)

কবিরাজ রাজশেখর খ্রীষ্টীয় ৯ম—১০ম শতাব্দীতে তাঁর বিখ্যাত "কাব্য মীমাংসা" গ্রন্থে রীতি, বৃত্তি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলির অতি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে **বাচন-বিন্যাস-ক্রম** (অর্থাৎ পদ-সংঘটনা) **'রীতি'** বা পদ্ধতি (Style) নামে পরিচিত। **বিলাস-বিন্যাস-ক্রম 'বৃত্তি'** বা প্রয়োগ কুশলতা (Dramatic mode of presentation) বলে পরিচিত এবং **বেশ-বিন্যাস-ক্রম 'প্রবৃত্তি'** (News বা সংবাদ) নামে পরিচিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বেশ, ভাষা, আচার, বার্তা, প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি বলা হয়েছে। অর্থাৎ নানা দেশের বেশ, বিবিধ ভাষা, বিচিত্র লৌকিক ও শাস্ত্রীয় (আচার), কৃষি ও পশুপালনাদির (বার্তা) বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়। বার্তা, প্রবৃত্তি, বৃত্তান্ত—সমপর্যায় শব্দ। এখানে 'বার্তা' শব্দের অর্থ কৃষি-পশুপালনাদি বৈশ্যকর্ম (Agriculture)। এ সকলের জ্ঞানকেই প্রবৃত্তি বলা হয়েছে। আচার্য অভিনব গুপ্তও (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) একথা একটু অন্যভাবে বলেছেন—দেশ বিশেষের বেশ, ভাষা, সমাচারের বৈচিত্র্য-প্রসিদ্ধিই প্রবৃত্তি।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত দৃশ্য কাব্যের রসভাবাদির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে 'বৃত্তি' চার প্রকারের। (১) ভারতী, (২) সাত্বতী, (৩) আরভটী

ও (৪) কৈশিকী। প্রবৃত্তির মূল আশ্রয় হলো বৃত্তি। অতএব বৃত্তির মতো প্রবৃত্তিও চার প্রকারের—(১) দক্ষিণাপথ, (২) পূর্বদেশ, (৩) পশ্চিম দেশ ও (৪) উত্তরভূমি। প্রবৃত্তি অনুসারে এ ভাবেই ভারত ভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কারও কারও মতে—ভরত, সাত্বত, অরভট নামক উপজাতিদের নাম থেকে এই বৃত্তিগুলির নাম হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন—'কেশিক' নামক উপজাতির নাম থেকে এই বৃত্তির নাম হয়েছে।) ভারত ভূমির চার অঞ্চলে চার রকমের প্রবৃত্তির কথা প্রাচীনকালের নাট্য প্রবক্তারা সকলেই স্বীকার করেছেন। এই চতুর্বিধ প্রবৃত্তি হলো—(১) দাক্ষিণাত্যা, (২) আবন্তী, (৩) পাঞ্চালী, (বা পাঞ্চাল মধ্যমা) ও (৪) ঔড্রমাগধী (বা উড্রমাগধী)।

বৃত্তি	প্রবৃত্তি	স্থান
১। ভারতী।	১। পাঞ্চালী	১। উত্তরভূমি
২। সাত্বতী।	২। আবন্তী (উজ্জয়িনী)	২। পশ্চিমদেশ
৩। আরভটী।	৩। আরভটী (ঔড্রমাগধী, ওড়িশা)	৩। পূর্বদেশ
৪। কৈশিকী।	৪। দাক্ষিণাত্যা	৫। দক্ষিণাপথ

এভাবে দেশ ভেদের সঙ্গে বৃত্তি ও প্রবৃত্তিভেদের সম্বন্ধ স্থাপনের বিশেষ প্রয়াস নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। এই সম্বন্ধ স্থাপনের মূলে রয়েছে মানুষের চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা অর্থাৎ এই সকল ভেদ মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভিন্ন লোক বা জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি রয়েছে ; অতএব বেশ, ভাষা ও আচারের (Rituals) যে বহু বৈচিত্র্য থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক। যেমন, ধরা যাক্—**দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তির কথা**। এই প্রবৃত্তি দক্ষিণাপথে প্রচলিত ছিল। দক্ষিণাপথ বলতে বোঝাতো মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, মেকল, পালমঞ্জর, কোসল, তোসল, কলিঙ্গ, যবন, খম, মোসল, দ্রমিড় (দ্রবিড়), কেরল, অন্ধ্র, মহারাস্ট্র, বৈন্না, বামবাসিক প্রভৃতি দক্ষিণ সমুদ্র ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত সকল দেশই দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। দাক্ষিণাত্য প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হলো, এতে আছে কৈশিকী বৃত্তি (স্ত্রীলোক দ্বারা প্রযোজ্য) শৃঙ্গার ও হাস্যরসের প্রাবল্য, শ্যাম অথবা শ্বেতবর্ণের মৃদু-কোমল-সূক্ষ্ম-বিচিত্র-মনোরম বেশ এতে ব্যবহার হয়, তাছাড়া এতে থাকে স্ত্রীলোকের উপযোগী

কান্ত-কোমল পদাবলী ও নৃত্যগীত বহুল সৌন্দর্যোপযোগী (Aesthetic) ব্যাপার এতে প্রচুর ভাবে বিদ্যমান।

তারপর **আবন্তী প্রবৃত্তি**। তৎকালে আবন্তী বা উজ্জয়িনী পশ্চিম ভূভাগের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল। এই পশ্চিমখণ্ড বলতে বোঝাতো আবন্তী, সুরাষ্ট্র, মালব, সিন্ধু, সৌবীর, অমর্ত, দশার্ন, ত্রিপুর প্রভৃতি। এই সকল দেশে আবন্তী প্রবৃত্তি প্রচলিত ছিল। এর বৃত্তি মূলতঃ সাত্বতী, অঙ্গরূপে কৈশিকী। অর্থাৎ সাত্বতী ও কৈশিকী এই দুই বৃত্তির মিশ্রণ। এতে থাকে বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, হাস্য ও শৃঙ্গার রস। গৌর, হেম, রক্ত, পীত, শ্বেত ও শ্যামবর্ণের ঈষৎ, উজ্জ্বল ও অল্প মৃদু বেশ এতে পরিধেয়। সত্বভাব অর্থাৎ শৌর্যবীর্যাদি নানা ব্যাপার প্রদর্শনেই এর প্রধান উপযোগিতা। অবান্তর রূপে নাকি সৌন্দর্য ব্যাপারও প্রদর্শিত হতো।

এরপর **ওড্র মাগধী প্রবৃত্তি**। এই প্রবৃত্তি প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল। প্রাচ্য খণ্ড বা পূর্বদেশের অন্তর্গত ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বৎস, উড্রমাগধ, পুণ্ড্র, নেপালক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্লবঙ্গ (প্রবঙ্গ), মহেন্দ্র, মলদা, মল্লবর্তক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জোতিষ (আসাম), পুলিন্দ, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক ইত্যাদি। এই সব অঞ্চলে ভারতী ও আরভটী বৃত্তি প্রচলিত ছিল। এতে থাকতো করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রস। কপোত (grey), পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও নীলবর্ণের উজ্জ্বল উগ্রবেশ এতে ব্যবহৃত হতো। নানাবিধ বাগ্‌ ব্যাপার ও উদ্ধতকায় ব্যাপার এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হতো।

তারপর **'পাঞ্চাল মধ্যমা প্রবৃত্তি'**। উত্তর ভূমিতেই এই প্রবৃত্তির প্রাধান্য দেখা যায়। উত্তরাখণ্ড বলতে বোঝায়—পাঞ্চাল (পঞ্চতাল), শূরসেন, কশ্মীর (কাশ্মীর), হস্তিনাপুর, বাহ্লীক, মদ্রক, উশীনর ইত্যাদি। গঙ্গার উত্তর দিকে ও হিমাচল প্রান্তে যে সকল দেশ অবস্থিত, সেগুলি উত্তরাপথের অন্তর্গত। এ সকল অঞ্চলে পাঞ্চালী বা পাঞ্চাল মধ্যমা প্রবৃত্তির প্রচলন ছিল। বৃত্তি মূলতঃ সাত্বতী ও আরভটী। অঙ্গরূপে কৈশিকী। বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, হাস্য ও শৃঙ্গারের অল্পাধিক সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই জন্য এ সকল স্থানে বেশভূষারও নানা বৈচিত্র্য। হেম, গৌর, রক্ত, কৃষ্ণ, নীল, শ্বেত, শ্যামবর্ণের দীপ্ত, উজ্জ্বল, উগ্র, উৎকট, হাস্যজনক ও মৃদু মনোরম বিচিত্র বেশ এতে ব্যবহার্য ছিল। সত্বভাব, কায়ব্যাপার ও মধ্যে মধ্যে সৌন্দর্য ব্যাপার প্রদর্শনে এর উপযোগিতা দেখা যেতো। (এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, কেরল প্রদেশ

যদিও দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তির অন্তর্গত শৃঙ্গার রস প্রধান নৃত্যের ব্যাপারে প্রাচীন-কালে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে কেরলের কথাকলি নাচে কিন্তু লাস্য শৃঙ্গার অপেক্ষা বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য প্রভৃতি রসের প্রাধান্য দেখা যায়।)

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বোঝা গেল যে, লোকায়ত নৃত্যের উপাদান-গুলির মধ্যে উপজাতীয় নৃত্যের উপাদানগুলি পরবর্তীকালের 'রীতি' 'বৃত্তি' ও 'প্রবৃত্তি'গুলি গড়ে ওঠার ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে কাজ করেছে। যদিও তা হয়েছে অনেকটা পরিশীলিত আকারে। কারণ ঐগুলি ধীরে ধীরে গ্রামকেন্দ্রিকতা ছেড়ে জনপদ (নগর) কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে পরবর্তীকালে।

(২) আদিবাসী নৃত্য কি ভাবে লোকনৃত্যে পরিণত হলো এবং লোকনৃত্য কি ভাবে উচ্চাঙ্গ নৃত্তে পরিশীলিত হলো, তার ইতিহাস ব্যাপক ও বহুধা বিভক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, আদিবাসী নৃত্যের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য-পরম্পরায় স্থানীয় প্রভাবে (Local influence) লোকনৃত্যগুলি গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে নানা আচার-অনুষ্ঠানের (Rituals) সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় (Religious), সামাজিক ও আর্থনীতিক (Socio-economic) প্রভাব। আরও পরে, এই লোকনৃত্যই আরও পরিশীলিত হয়ে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উপযোগী মার্জিত হয়ে দেখা দিয়েছে উচ্চাঙ্গের নৃত্যে। ভারতে "ষোড়শ জনপদ" এর অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত লোকনৃত্যের মূলধারা অব্যাহত ছিল। তারপর এতে বিপুলায়তন পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই পর্যায়ে লোকনৃত্যের কতগুনি সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। বৈশিষ্ট্যগুলি এই রকম, যেমন এই পর্যায়ের নাচে রয়েছে—

(ক) স্থানগত ও দেশগত প্রভাব (নির্দিষ্ট স্থান ও ভূভাগ)।

(খ) "লোকধর্মী" (Realistic), "নাট্যধর্মী" নয় (Idealistic—Imaginative)।

(গ) "দেশী" পর্যায়, "মার্গ" পর্যায় নয়।

(ঘ) দলবদ্ধতার প্রাধান্য (Group) রয়েছে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Solo) নয়। (পরে অবশ্য এ নাচে Solo বা ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা এসেছে। সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা আসার সময় থেকেই এতে Solo নাচের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।)

(ঙ) এতে মুদ্রাভিনয়ের কোন স্থান নেই। শাস্ত্রীয় প্রভাব নেই।

(চ) এই নাচ মূলতঃ সামাজিক এবং আধা-ধর্মীয় উৎসব প্রধান।

(ছ) এই নাচ ঠিক পেশাদারী নয়, যে অর্থে উচ্চাঙ্গ নৃত্য পেশাদারী।

(জ) এই নাচে ছন্দের গতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আদিবাসী নৃত্য ঢিমা লয় প্রধান। কিন্তু লোকনৃত্যে দ্রুত-মধ্য ও ঢিমা লয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

(ঝ) লোকনৃত্যের বেশীর ভাগই অনুষ্ঠিত হয় গ্রামীণ গান ও গ্রামীণ তালবাদ্যের মাধ্যমে।

(ঞ) একই গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষরা একই সুর ও ছন্দে একাত্ম হয়ে নাচে।

(ট) লোকনৃত্যের পোষাক-পরিচ্ছদও তৈরী হয় একটা বিশেষ আদর্শ ধরে—যাতে গ্রামীণ ভাবটি ফুটে ওঠে। (ইদানীং লোকনৃত্যে নানা আধুনিকতার ছাপ পড়তে দেখা যাচ্ছে—যা বাঞ্ছনীয় নয়।)

(ঠ) লোকনৃত্যের গতি মূলতঃ বৃত্তাকার (Circular) বা অর্ধ-বৃত্তাকার (Semi-circular)। এতে চতুষ্কোণ (Square) বা ত্রিকোণ (Triangular) রচনার প্রয়াস নেই। কোরিওগ্রাফীর (Choreography) বৈচিত্র্য নেই। গতিভঙ্গি অনেকটা আদিবাসী নৃত্যের মতো 'Clock-wise' এবং 'anti-clockwise' (আজকাল অবশ্য 'innovation' এর নামে উক্ত কোরিও-গ্রাফীর নানা বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা চলছে।) লোকনৃত্য মূলতঃ সরল বা Flat, কোন মাত্রা বা Dimension এতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নয়।

(ড) লোকনৃত্যের উৎকর্ষে বাজনার দলের একটা প্রেরণামূলক বিশেষ ভূমিকা থাকে। অনেক সময় বাজনদার নৃত্যশিল্পীকে নাচে উদ্দীপিত (Stimulate) করেন।

(ঢ) এই নৃত্যে নর্তক ও বাদক নাচের সময় সামষ্টিক চেতনায় (collective emotion) এক প্রাণ, এক মন হয়ে ওঠে।

(ণ) গ্রামীণ দলবদ্ধ লোক নৃত্য বেশীর ভাগ সময় গানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হলো—গানের প্রতি পংক্তি ধরে তার ভাবার্থকে হাতের মুদ্রা বা মুখজ অভিনয়ে প্রকাশ করার রীতি নেই। গানটির স্থায়ী ভাব নৃত্যছন্দে প্রকাশ করাই এর মূল লক্ষ্য। এজন্য দলবদ্ধ নৃত্যে মুদ্রাভিনয় দেখা যায় না। যে কোন দলবদ্ধ নৃত্যে পায়ের ছন্দের তুলনায় হাতের ভঙ্গি অনেক কম। অর্থাৎ মুদ্রার-প্রতীকী ব্যঞ্জনা এখানে অনুপস্থিত। এক সঙ্গে খোল

বা ঢোল করতালের ছন্দে নানা ধরনের ভারতীয় লোকসঙ্গীতে বা বাংলার সংকীর্তন গানে গ্রামবাসীরা যে ভাবে গানের ছন্দের উন্মাদনায় মেতে ওঠে, দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্যের আদর্শ হলো তাই। নৃত্য ছন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের উদ্বোধিত করে তোলাই হলো তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। মনের এক স্বাভাবিক আবেগ থেকেই দেহের কাঠামো দোলায়িত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই দোলায়িত ভাব-ভঙ্গিটাই 'লীলায়িত' হয়ে ওঠে উচ্চাঙ্গ নৃত্যে, মণ্ডনকলার সুপরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে।

(ত) লোকনৃত্যের শিল্পীরা মূলতঃ নাচতে-নাচতেই নাচটাকে আয়ত্ব করে। এখানে 'অশিক্ষিত-পটুত্ব' বেশী। পক্ষান্তরে উচ্চাঙ্গ নৃত্য আগে ধারাবাহিকভাবে গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে শিখতে হয়। পরে রঙ্গমঞ্চে নাচবার পারঙ্গমতা আসে।

(থ) লোক নৃত্যকেই প্রথম জাতীয় নৃত্যের মর্যাদা দিতে হয়। কারণ এই লোকনৃত্যের মাধ্যমেই মানুষের (যে কোন জাতির) স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, অভ্যাস, প্রবৃত্তি প্রভৃতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। যার থেকে সেই জাতির আসল রূপ ধরা পড়ে। এতে একটি জাতির ঐতিহ্যও জানা যায়। সর্বোপরী লোকনৃত্য জাতীয় সংহতিতে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে বা পালন করতে পারে।

(দ) জনশিক্ষার কাজেও লোকনৃত্য বিশেষ ফলপ্রদ। যে সব বিষয় শুধুমাত্র বইয়ের মাধ্যমে বা বক্তৃতা দিয়ে বোঝানো যায় না (বিশেষতঃ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জন সাধারণকে) সেই সব বিষয়েও এই নাচ দ্বারা আকর্ষণীয় করে সবার সামনে তুলে ধরে মনে রেখাপাত করিয়ে বোঝান যায়। যেমন গ্রামীণ কথকতায় নৃত্যের লোক প্রভাবজাত অঙ্গভঙ্গি করে বক্তব্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হতো। কথক নৃত্যে, এবং কেরালায় 'অট্টকথা' বা অত্তকথা-র মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রচারের বিশেষ আয়োজন থাকতো। এভাবেই রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষামূলক কাহিনীকে নৃত্যের মাধ্যমে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা হতো।

(ধ) ভৌগোলিক সংস্থানের দিক দিয়েও লোকনৃত্যের কতগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এর কারণ, প্রাকৃতিক অবস্থা ও দেশের আবহাওয়া-জলবায়ু অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা হয় বিভিন্ন প্রকৃতির—কেউ কঠোর,

কেউ বা কোমল, কেউ কষ্টসহিষ্ণু, রুক্ষ, কেউ বা চঞ্চল প্রকৃতির। এবং এই প্রকৃতি অনুযায়ীই সহজাত ভঙ্গিতে তৈরী হয় তাদের নৃত্যভঙ্গিগুলি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মাধ্যমেই বিভিন্ন লোকনৃত্যের সৃষ্টি হয়। তাই অনেক সময় এই লোকনৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে অনেক জাতির ভৌগোলিক অবস্থান বা পরিবেশ জানা যায়। ভৌগোলিক সংস্থানের দিক দিয়ে লোকনৃত্যের ভঙ্গিতে যে পার্থক্য সূচিত হয়, তাতেও প্রাকৃতিক প্রভাব বিদ্যমান। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতিও নাচকে প্রভাবিত করে। যেমন ঃ

(ক) পার্বত্য অঞ্চলের লোকনৃত্য পা তুলে তুলে ফেলে এগিয়ে যাবার ভঙ্গিতে পাহাড়ের লম্বা লম্বা গাছের মাথা দোলানোর মতোই শরীরের উপরের অংশ বেশী দোলে।

(খ) অরণ্য অঞ্চলের লোকনৃত্যের মধ্যে সতর্ক ভঙ্গি, হিংস্র দৃষ্টি, উদ্দাম অঙ্গচালনা ও উঁচু-উঁচু লাফ দেবার ভঙ্গি দেখা যায়।

(গ) সমতল ভূমির লোকনৃত্যে মেয়েদের শান্ত-কোমল ও পুরুষদের ধীরোদ্দাত্ত নৃত্যভঙ্গি ও অঙ্গচালনা এবং আনন্দই থাকে বেশী। অর্থাৎ সমতল-ভূমির জীবনযাত্রা পাহাড় অঞ্চল থেকে অপেকাকৃত সহজ-সরল, সুতরাং এই সহজ-সরল ভাবটি থাকে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে অনেক লোকধর্মী নাচে। (যেমন, ছৌ-নাচ, ঢালি, পাইকান, রাইবেঁশে প্রভৃতি নাচ অনেক বেশী বলিষ্ঠ।)

(ঘ) মরুভূমি অঞ্চলের লোকনৃত্যে থাকে কষ্টসাধ্য ভঙ্গি ও ক্রিয়াকর্ম এবং উত্তেজিত দ্রুত ও ঢিমা ক্লান্ত ছন্দের এক সমন্বয়। অর্থাৎ মরুভূমির কষ্টসাধ্য জীবনযাত্রা ও জীবিকার প্রভাব এই অঞ্চলের নাচের ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়।

(ঙ) সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের লোকনৃত্যে থাকে দেহ ও বাহুর তরঙ্গায়িত ভঙ্গি এবং নারকেল-সুপারী গাছের আন্দোলিত দোলনভঙ্গি। এই নৃত্যে আনন্দ উল্লাস যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই আছড়ে পড়ে। হাওয়াই দ্বীপের "হুলাহুপ" নাচে অনেকটা এই ধরনের দোলায়িত ভঙ্গি দেখা যায়।

(চ) ঘূর্ণী ও ভূমিকম্প অঞ্চলের লোকনৃত্যের ভঙ্গিতে থাকে ঘুরে ঘুরে ভেঙে পড়া ভাব—ইত্যাদি।

(এখানে বিশ্বপ্রকৃতি অঞ্চলভিত্তিক লোকনৃত্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে ভঙ্গি তৈরী করে, তার ইঙ্গিত দেওয়া হলো। এ বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্র-

সমীক্ষা (field work) করে স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে। ভবিষ্যতের নৃত্য গবেষকরা এই ব্যাপারটি ভেবে দেখতে পারেন।)

(ঘ) আধা-উচ্চাঙ্গ—আধা লোকনৃত্য (Classico—Folk Dance)।

এই নৃত্য মূলতঃ উৎসব প্রধান। সময়গত দিক দিয়ে এই নৃত্যধারা অগ্রসর হয়েছে খ্রীঃ পূঃ ৬০০-তে ষোড়শ জনপদের উত্থানের সময় থেকে হরিবংশ পুরাণের সময়কাল পর্যন্ত। (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে খ্রীঃপূঃ ৪০০ পর্যন্ত) সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই খ্রীঃ পূঃ ২০০ শতাব্দীতে ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত বা সংকলিত হয়ে গেছে। এই সময় লোকনৃত্য নানা পরিচর্যার ফলে শাস্ত্রীয় নৃত্যের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। যদিও আমরা জানি, লোকনৃত্যে থাকে লোক মনের সংস্কার প্রথা ও আচারের ছাপ।

তবু নানা পরিশীলনের ফলে লোকনৃত্যে দেখা দিয়েছে দু'টি রূপ। একটি রূপে রয়েছে সহজ-সরল, সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত সমবেত গোষ্ঠী নৃত্যের প্রকাশ, অপর রূপটিতে রয়েছে জটিল তাল লয়, ছন্দে শাস্ত্রীয় আঙ্গিকের গতি-চারী, চলন, উৎপ্লবন, ভ্রমরী, অঙ্গভেদ, হস্তকার্য পুষ্ট লোক সমাজের নাট্যধর্মী নাচের প্রবণতা। পরবর্তীকালে এভাবে ধর্মীয় প্রভাবে লোকনৃত্যে এসেছে শাস্ত্রীয় নৃত্যের মতো খানিকটা প্রথা বদ্ধতা (Codification)। তাই লোকনৃত্য নিজস্ব খোলস্ ছাড়িয়ে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের দিকে যাত্রা করেছে। এই লোকনৃত্য থেকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যে উত্তরণের মাঝামাঝি অবস্থাটাকেই আমরা বলতে চাইছি আধা-উচ্চাঙ্গ আধালোক পর্যায়।

এ পর্যায়ে কতগুলি সুনির্দিষ্ট (Specific) নাচের নাম পাওয়া যায়। যেমন, হল্লিসক নৃত্য, আসারিত নৃত্য, ছালিক্য নৃত্য, খণ্ডধারা নৃত্য, দণ্ডরাসকম্ নৃত্য প্রভৃতির পদ্ধতিগত তথা টেক্‌নিক্যাল দিক্ এ পর্যায়ে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমানে 'মণিপুরী রাস', নৃত্যের ব্যঞ্জনা পাওয়া গেছে হরিবংশ পুরাণের 'রাস' নৃত্যাচারণের মধ্যে। যেমন বর্তমান "কাঠিনৃত্য" এর রূপটি পাওয়া যাচ্ছে পৌরাণিক যুগের "দণ্ডরাসকম্" নৃত্যের মধ্যে। এ পর্যায়ে নাচ মূলতঃ উৎসব প্রধান হয়ে উঠেছে।

'কালীকাচ', 'বাউল' ও 'ছৌ নাচকে এ পর্যায়ে ফেলা যায়। এতে লোকায়ত উপাদানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রথাবদ্ধ নৃত্য ব্যাকরণের বেশ কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। যেমন বাউল নৃত্য। লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত হলেও—বাউল নৃত্যের রীতি পদ্ধতি, আঙ্গিক প্রকরণ উচ্চাঙ্গ নৃত্যের প্রায় অনুরূপ। উচ্চাঙ্গ নৃত্যে থাকে দু'টি ভাগ—নৃত্তাংশ ও নৃত্যাংশ। নৃত্ত হলো তাল-লয়াশ্রিত অঙ্গভঙ্গি। আর নৃত্য হলো রস ও ভাবযুক্ত অঙ্গভঙ্গি। আমাদের সকল উচ্চাঙ্গ নৃত্যেই এই দুটি ভাগ স্পষ্ট। যেমন—কথক নৃত্যে নৃত্তভাগ হলো—বোল-পরণ-তৎকার ইত্যাদি, আর নৃত্যভাগ হলো—গৎভাও বা ভাও বাৎলানো অংশ। ভরতনাট্যমে নৃত্তভাগ—যতিস্বয়ম্, তিলানা, আর নৃত্যভাগ— বর্ণম্, পদম্ ইত্যাদি। মণিপুরীতে নৃত্যাংশ চলে পদাবলী গানের সঙ্গে, আর নৃত্ত চলে শুধু মৃদঙ্গ বাদ্যের সঙ্গে ব্যঞ্জনাহীন শুদ্ধ আঙ্গিকে। কথাকলি নৃত্য-নাট্যে নৃত্ত হচ্ছে তোড়ায়াম্ ও পুরাপাড়ু অংশ, আর অভিনয়কালে মুদ্রা সংযোগে চলে অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্যের ব্যঞ্জনা। কুচিপুড়ি ও ওড়িশী নৃত্যেও—নৃত্ত ও নৃত্য—দু'টি ভাগ দেখা যায়। বাউল নৃত্যেও নৃত্তাংশ হলো 'মাতন' পর্যায়। আর গানের সঙ্গে চলে নৃত্যাংশ। এই নৃত্ত ও নৃত্যাংশে, বাউল নৃত্যে অনেকটাই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নৃত্য ব্যাকরণ অনুসৃত হতে দেখা যায়। যেমন নাট্য-শাস্ত্রের অন্তর্ভ্রমরী, বাহ্যভ্রমরী, অশ্বোৎপ্লবন, মৃগীগতি, বৃশ্চিকচারী, আকাশিকী চারী, ভৌমচারী, স্থানক, বিষ্ণুপাদা, সমপাদা, জনিতা, অড্ডিতা প্রভৃতিচারী সুন্দর ভাবে ব্যবহৃত হয়। ছৌ নাচেও এই ধরনের করণ-প্রকরণ সমৃদ্ধ নৃত্য ব্যাকরণের অনেক কিছুই দৃষ্ট হয়। সুতরাং বাউল, ছৌ প্রভৃতি নাচকে আধা উচ্চাঙ্গ-আধালোক পর্যায়ে ফেলা যায়। ভবিষ্যতের নৃত্যগুরুরা এই বাউল-ছৌ কেও হয়তো আরও মার্জিত—পরিশীলিত করে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারেন। যেভাবে ওড়িশী, কুচিপুড়ি নাচ উচ্চাঙ্গ নৃত্যে এখন আরোহণ করেছে।

(ঙ) **উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় নৃত্য** (Classical Dance)।

প্রাচীন বা কালজয়ী শিল্পকলাকেই সাধারণত 'ক্ল্যাসিকাল' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, সব সময় প্রাচীনতাই ক্ল্যাসিকালের একমাত্র মানদণ্ড নয়। আরও অনেক শর্ত পূরণ হলে তবেই আমরা তাকে ক্ল্যাসিকাল শিল্পের পর্যায়ে ফেলতে পারি। সুতরাং কালজয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে রসোত্তীর্ণও হতে হয়। কাজেই যুগোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটা এর প্রথম শর্ত। তবে এ ব্যাপারে, ক্ল্যাসিকাল

শিল্পের সঙ্গে রোমান্টিক শিল্পেব মূলগত পার্থক্য আলোচনা করলে হয়তো ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হতে পারে। যেমন, রোমান্টিসিজিমের সাধারণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় —রোমান্টিসিজিম্ শিল্পের কাছে আবেগের, প্রেমের ও ঘৃণার, বেদনার ও আনন্দেব, নৈরাশ্যের ও উদ্দীপনার স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুতীব্র উচ্ছ্বাস দাবি করে এবং ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট, ভাঙাভাঙা প্রতিরূপ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, অস্পষ্ট সংকেত, অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি, শক্তিমান এবং এলোমেলো রূপ নিয়েই পরিতৃপ্ত হয়। পক্ষান্তরে ক্ল্যাসিসিজম্ ভালবাসে প্রশান্ত আত্মা, বিজ্ঞ-পরিকল্পনা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিব্যক্তি, (নাচের ক্ষেত্রে ভাব-রস প্রধান expression) সুস্পষ্ট আকার, সুচিন্তিত, সুসামঞ্জস্য, সুপরিস্ফুট মূর্তি এবং রূপ-পরিকল্পনার দিকে বেশী ঝোঁক দেয়। ক্ল্যাসিসিজিমের সঙ্গে রোমান্টিসিজিমের পার্থক্য এইখানেই। সুতরাং ভাবের গাম্ভীর্যে, রসের মাধুর্যে, নান্দনিক দৃষ্টিতে নির্মিত, প্রথাবদ্ধ (Codified) বিশুদ্ধাচার যুক্ত ঐতিহ্যকেন্দ্রিক (Traditional) এক পরিশীলিত, সূক্ষ্ম মার্জিত রুচিসম্মত নৃত্যকেই ক্ল্যাসিকাল নামে অভিহিত করা যায়। এই শর্তগুলি ছাড়াও কতগুলি বিষয়-লক্ষণ আছে, যেগুলি ক্ল্যাসিকাল নাচের সংজ্ঞা প্রকরণের পক্ষে অপরিহার্য উপকরণ।

এই বিষয়-লক্ষণগুলি আলোচনার আগে ক্ল্যাসিকাল নাচের সময়গত দিক দিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার ভাবে বলা দরকার। এখন যে ছয়টা ক্ল্যাসিকাল নাচ (ভরত নাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী ও কুচিপুড়ি) আমরা যে অবস্থায় এখন দেখছি, ঐতিহাসিক দৃষ্টি কোণ থেকে তার বয়স কোনটারই দুই শত বছরের বেশী প্রাচীন নয়। অন্ততঃ ঐসব নাচের যে form-টা এখন মঞ্চে আমরা দেখে থাকি। তবে এই নাচগুলির আগের ধারাবাহিক form চলে আসছে অনেক আগে থেকে। যখন এই নাচের উপাদানগুলি লোকায়ত নৃত্যের উপাদানের খোলস ছাড়িয়ে ক্রমশঃ নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উপযোগী মার্জিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তার সূত্রপাত,—সময়কালের দিক দিয়ে ষোড়শ জনপদের সময় থেকে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সময়কাল ধরে, ভরতের অনুচিন্তাগোষ্ঠীদের (নন্দিকেশ্বর, কোহল, শার্ঙ্গদেব, মতঙ্গ, যাষ্টিক, শাণ্ডিল্য প্রমুখদের) চিন্তা চেতনার ফলশ্রুতি পরম্পরায় পরপর পাঁচটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে। ধাপে ধাপে ক্রমশঃ পাঁচটি পর্যায়ে তা উন্নীত হতে-হতে বর্তমান form এসে দানা বেঁধে উঠেছে। এই পাঁচটি পর্যায় হলো—

(১) ক্ল্যাসিকাল নাচের প্রথম পর্যায় গেছে প্রাক্-ভরত যুগ পর্যন্ত। অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ২০০ পর্যন্ত এই চারশত বছর।

ঐতিহাসিকদের মতে ভারতে "ষোড়শ জনপদ" এর সময়কাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে, যুগটাকে বলা হয়েছে Historical-Age বা Cultural Age বা Classical Period. এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক সময়-রেখা (Time-Scheme) দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বিতীয় পর্যায় গেছে ভরত যুগ এবং তাঁর পরবর্তী অনুচিন্তা-গোষ্ঠীদের প্রচেষ্টা পর্যন্ত। (প্রাচীন যুগে নৃত্য চর্চার ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়—ভরত সম্প্রদায়, নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায়, কোহল-মতঙ্গ সম্প্রদায়।)

(৩) গুপ্তযুগের কাব্য—নাট্যসাহিত্যের অন্তর্গত নৃত্য পরিচয়ে তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষণ স্পষ্ট। (কালিদাসের "বিক্রমোর্বশী" নাটকে উর্বশীর বন্ধু চিত্রলেখা যে নাচ জানতেন, সেই নাচের নাম থেকে বোঝা যায়, সেই যুগের নাচে একটা Specific-technique বা Style গড়ে উঠেছিল। ঐসব নাচের নাম ছিল—দ্বিপাদিকা নৃত্য, জম্ভালিকা নৃত্য, খণ্ডধারা নৃত্য, চর্চরী নৃত্য (চার চরণযুক্ত গানের সঙ্গে যুক্ত নৃত্য), ভিন্নকা নৃত্য, ভলাস্তিকা নৃত্য প্রভৃতি। এছাড়া, এর আগেও নাচের কিছু Specific নাম পেয়েছি হরিবংশ পুরাণে। যেমন, আসারিত নৃত্য, ছালিক্য নৃত্য, রাস নৃত্য, দণ্ডরাসকম্ নৃত্য (কাঠি নৃত্য-যা এখনকার গুজরাটি গরবা ও বাংলার ব্রতচারী নৃত্যে দেখা যায়।), হল্লিসক নৃত্য, বংশ নৃত্য (যা এখনো উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচলিত) প্রভৃতি।

(৪) চতুর্থ পর্যায়ের সন্ধান মেলে 'দাসী আট্টম্' বা মন্দিরকেন্দ্রিক দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতির মধ্যে। দেবদাসীদের দ্বারা চর্চিত নাচগুলির পরিশীলিত রূপই এখন ভরত নাট্যম, ওড়িশী, কুচিপুড়ি নৃত্য-শৈলীতে দেখা যায়। ভারতে নাচের গতিবিধি অনেকটাই—**গ্রাম থেকে মন্দির, মন্দির থেকে রাজদরবার** এবং **রাজদরবার থেকে শেষে জনগণের মঞ্চে চলে এসেছে আধুনিক কালে।**

নৃত্যের গতি-প্রকৃতি ঃ

১। ইউরোপে—**Village > Church > Court > Stage**।

২। ভারতে—**গ্রাম > মন্দির > রাজদরবার > মঞ্চ / মুক্তাঙ্গন**।

(৫) পঞ্চম পর্যায়ের রূপটি দেখা যায়—উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় আধুনিক যুগের পরিশীলিত ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির পুনর্নবীকরণের মধ্যে। একেই অমরা বলতে চেয়েছি নাচের পুনর্নবীকরণ পর্ব বা 'Revivalist Movement'। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, **ভরতের** 'ট্রাডিশান' ছাড়াও পাশাপাশি অন্যান্য নানা 'ট্রাডিশান' **ভারতে** এখনো প্রচলিত আছে।

উক্ত পাঁচটি পর্যায়ে যে লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছে তা সংক্ষেপে এই রকম।

(ক) এই পর্যায়ে ভারতীয় নাচে উচ্চশ্রেণীর শিল্পকুশলতার সঙ্গে যোগ দিয়েছে শাস্ত্রীয় প্রথাবদ্ধ (Codified) বিশুদ্ধাচার।

(খ) শাস্ত্র সচেতনতা এবং নৃত্য ব্যাকরণ শুদ্ধির বিচার প্রবণতা।

(গ) নান্দনিক চেতনায় (Aesthetic) নব নব দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন **ঘরোয়ানা** সৃষ্টি এবং তার মূলে নৃত্যগুরুদের নিজস্ব চিন্তা শৈলীর প্রয়োগ ও বিকাশ।

(ঘ) এই পর্যায়েই মুদ্রা, তথা সাংকেতিকতার সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে।

(ঙ) নৃত্য-নৃত্ত ও নাট্যের পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

(চ) ধর্ম প্রধান মন্দিরকেন্দ্রিক "দাসী আট্যম" তথা দেবদাসী নৃত্যপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই পর্যায়ে ধর্মীয় প্রাধান্য লক্ষণীয়। ভারতের মর্মে মর্মে ধর্ম। কাজেই তখন কোন কিছুকে মর্মাশ্রয়ী করে গড়ে তুলতে গেলে তাকে ধর্মাশ্রয়ী হতে হতো। এজন্যই আমাদের দেশের নাচে ধর্মের প্রভাব এত বেশী। আমাদের দেশের নাচের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করলে দেখা যাবে নাচ প্রধানতঃ গ্রামের আঙ্গিনা ছেড়ে মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। আবার এই নাচই মন্দিরে চর্চিত হয়ে পরবর্তীকালে মন্দির ছেড়ে রাজদরবার হয়ে সাধারণ মঞ্চে এসেছে।

(ছ) নাচের নগরকেন্দ্রিক 'Urbanised form' যখন 'Elitist' দের দ্বারা মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে নতুন 'form'-এ দানা বেঁধে ওঠে তখন নাচের আঙ্গিকে যেমন পরিবর্তন দেখা দেয়, তেমনি বেশ-ভূষা, মঞ্চকলা ইত্যাদিতে নানা প্রকার প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে নব নব রূপকল্প সৃষ্টি করার প্রবণতা এসে যায়। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠে।

(জ) এই পর্যায়ে নাচে কৃত্রিম (Artificial) প্রভাব পড়ে, ক্রমশঃ তা Sophisticated হয়ে ওঠে। তার ফলে নানা উপাদানের মিশ্রণে নৃত্যের জটিল পরিভাষা (Dialects, Terminology ও Vocabulary) তৈরী হয়।

(ঝ) নাট্যশাস্ত্রের নৃত্য ব্যাকরণ তথা করণ-প্রকরণ সমৃদ্ধ নৃত্য রূপায়ণের প্রবণতা এই পর্যায়ে লক্ষণীয়।

(ঞ) এই নাচে ব্যক্তি প্রাধান্য অর্থাৎ একক নৃত্যের (Solo) প্রধান্য চোখে পড়ে। সমাজে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য দেখা দেবার পর থেকেই একক নৃত্য বা **Solo Dance** এর উদ্ভব হয়েছে। কারণ আদিবাসী নাচ ছিল মূলতঃ যুথবদ্ধ সামষ্টিক চেতনায় সমৃদ্ধ অথাৎ **Community dance** বা **Group dance** পর্যায়ের। এই ক্ল্যাসিকাল পর্বে এসে তা বিশেষভাবে গোষ্ঠীনৃত্য থেকে একক নৃত্যে রূপান্তরীত হয়ে—একক কারু-কুশলতা দেখাবার প্রবণতার দ্বারা চর্চিত হতে থাকে।

(ট) এই পর্বে নর্তকে ও দর্শকে পার্থক্য সূচিত হয়।

(আদিবাসী সমাজে সকলেই প্রায় নাচে অংশ গ্রহণ করায় আলাদা দর্শক তেমন থাকে না। কিন্তু ক্যাসিকাল নাচে একজন মঞ্চে নাচে এবং কয়েকশত দর্শক তা দেখে)।

(ঠ) পরম্পরাগত তথা ঐতিহ্যের (tradition) প্রতি অবিচল নিষ্ঠা তথা শাস্ত্রীয় অনুশাসন গোঁড়া ভাবে অনুসরণ করবার প্রবণতা দেখা দেয়।

(ড) এর ফলে বিভিন্ন গুণী গুরুদের চিন্তা-চেতনা যে ভিন্ন ভিন্ন শৈলীর (Style) জন্ম দেয়, তা এ পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই শৈলী থেকেই ঘরানা গড়ে ওঠে! এই ঘরানা দু'ভাবেই হতে পারে—ব্যক্তিক ও স্থানিক। যেমন (১) ব্যক্তিগত ঘরানা, আলউদ্দিন খাঁর ঘরানা। (২) স্থানিক ঘরানা—লক্ষ্ণৌ ঘরানা। যেমন, এখনকার ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী, কুচিপুড়ি প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল নাচগুলি দেখলেই তা বোঝা যায়।

এই তো গেল ক্ল্যাসিকাল নাচের সংজ্ঞা প্রকরণে বিভিন্ন লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। এই ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে আবার কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া দরকার। তাহলে ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির মধ্যে পার্থক্য ও সাযুজ্য কোথায় রয়েছে, তা জানা যাবে। উক্ত নাচগুলির (১) বিষয়সূচী (Item), (২) ধর্মীয় প্রভাব (শাক্ত, বৈষ্ণব ও ইসলাম), (৩) আঙ্গিক (গাম্ভীর্যপূর্ণ, অপেক্ষাকৃত চঞ্চল, লাবণ্যময়, বীররস প্রধান ইত্যাদি), (৪) বাইরের পেভাব, (৫) বিষয়বস্তু (রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-গীতগোবিন্দ প্রভৃতি), (৬) ঐতিহাসিকতা, (৭) বাদ্য-বাদন, (৮) পোষাক-পরিচ্ছদ, (৯) অঙ্গরচনা

(Make up), (১০) স্থানীয় প্রভাব, (১১) ভৌগোলিক সংস্থান ইত্যাদি তুলনামূলক বিষয়গুলির সম্যক আলোচনার মাধ্যমেই সাযুজ্য ও পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ উক্ত বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী ও কুচিপুড়ি নাচ প্রভৃতির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করলে (Comparative study) বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে।

(চ) **নব্য-উচ্চাঙ্গ নৃত্য** (Neo-Classical Dance)

সময়গত দিক দিয়ে বিংশ শতকের ২য় / ৩য় পাদে এর সূত্রপাত। অর্থাৎ আধুনিক যুগ। এই নৃত্যধারাতে লোকনৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের উপাদানগুলির সমন্বয়ে বা রাসায়নিক মিশ্রণে এক অভিনব নৃত্যপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে, যা নিতান্তই আধুনিক ভাবধারায় সৃষ্ট ও পুষ্ট। উদয়শঙ্করের নৃত্যধারা ও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শান্তিনিকেতনী নৃত-ধারাকে এই Neo-Classical পর্যায়ে ফেলা যায়। কেন ফেলা যায়, তা 'Neo' উপসর্গটির অভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলেই বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে। যেমন, Neo-উপসর্গটির অনেক মানে আছে। তারমধ্যে দুটি মানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই মানে দুটি হলো "Revived in modified form" এবং "Based upon."

Neo — Revived in modified form
Neo — Based upon.

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যকে এখানে 'Modify' করে ব্যবহার করা হয়েছে, এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য, মূলতঃ ভারতীয় নৃত্যের উপর ভিত্তি (base) করেই তো এই নবনৃত্য সংগঠিত হয়েছে। এই "Neo-Classical" নৃত্য সংগঠনের পরবর্তী পর্যায় হলো "Modern-Dance", "Creative-Dance", "Innovative-Dance" প্রভৃতির নানামুখী প্রকাশ। এই প্রকাশ বিশেষ ভাবে ঘটেছে ১৯৩৯ সালের পর থেকে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নৃত্যশিল্পীরা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছেন উদয়শঙ্করের নৃত্যশৈলী ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-ভাবনার দ্বারা। যথা স্থানে এ দুটি বিষয়ে আলোচনা করে আমরা দেখিয়েছি এঁদের প্রবর্তিত Neo-Classical form কি ভাবে সব কিছুকে বিধৃত করে আছে। বিশেষ করে ভারতীয় নৃত্যের ধারাবাহিকতায় আধুনিক যুগের ব্যাখ্যায় ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণের (Revivalist Movement) বিশ্লেষণে এই Neo-Classical নৃত্যের উদ্ভব, বিকাশ ও পরবর্তী কালের নৃত্যে এর প্রভাব বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে যথাস্থানে। এখানে আমরা শুধু এই ব্যাপারটা উল্লেখ করলাম মাত্র।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্করের নৃত্যধারায় দীর্ঘদিন ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার সার্থক স্বাঙ্গীকরণ ঘটেছে। এই স্বাঙ্গীকরণ অনেকটা রাসায়নিক মিশ্রণের মতো। এতে একদিকে যেমন রয়েছে ভারতীয় ধ্রুপদী নাচগুলির আঙ্গিক প্রকরণসহ নৃত্যাভিনয় পদ্ধতির আভাস, তেমনি রয়েছে নানা আঞ্চলিক লোকনৃত্য ও বিদেশী নৃত্যের পরোক্ষ নির্যাস। এই নৃত্য-সমাবেশ বা মিশ্রণ এত সূক্ষ্মভাবে হয়েছে যে, তাতে আগের রূপটি হারিয়ে গেছে নব রূপটির কাছে। এ এক অভিনব সৃষ্টি। এই সৃষ্টি প্রবাহ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমাদের দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্যকলা-চর্চাকে প্রভাবিত করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর প্রভৃতির নৃত বিষয়ক চিন্তা-চেতনা প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পরবর্তী যুগকে বিধৃত করে আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই সকল নৃত্যধারার সমন্বয়ে নৃত্যের একটি নতুন form দানা বেঁধে উঠেছে। এই form-টিকেই আমরা Neo-Classical বলতে চাই। এই form থেকেই আবার Modern, Creative, Innovative নাচগুলি গড়ে উঠেছে পরে। এই গড়ায় কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও পরোক্ষ বিদেশী নাচের নির্যাস এসে মিশেছে। যেমন, জাপানের নো (Noh) ও কাবুকি (Kabuki), জাভা-বলীর 'ওয়েয়াঙ' (Waywang), সিংহলের কাণ্ডি (Kandy), আমেরিকার মার্থাগ্রাহামের শৈলী (Martha Graham), রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালী ও ইংলণ্ডের ব্যালের (Ballet) সূক্ষ্ম উপকরণ। এর কারণ আমাদের দেশের নৃত্যশিল্পীদের বিদেশ ভ্রমণের প্রভাব। এটা অতি-আধুনিক যুগের ব্যাপার। অর্থাৎ আধুনিক যুগের দু'টি পর্ব—প্রথম পর্বটি Neo-Classical পর্ব। এবং দ্বিতীয় পর্বটি Modern, Creative, Innovative, Improvisation নৃত্যের চর্চিত পর্ব। এই আধুনিক সৃষ্টিশীল নাচগুলিরও উদ্ভব Neo-Classical নাচ থেকেই।

যাই হোক, ভারতীয় নৃত্যের গতি-প্রকৃতি ও রূপরেখা জানতে উক্ত নাচের সূত্র লক্ষণগুলি প্রাসঙ্গিক ভাবেই অপরিহার্য। এই পর্যন্ত আমরা Tribal থেকে Neo-Classical পর্যন্ত এবং পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ও আভাষিত ধারাগুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করলাম। এরপর প্রতিটি অধ্যায়ে এগুলিকে আরও বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

॥ ঐতিহাসিক সময়-রেখার (Time-Scheme) গুরুত্ব ॥

যদিও আমরা এ ক্ষেত্রে নিছক ইতিহাস লিখতে বসিনি, তবু নৃত্যের ক্রমবিকাশ দেখাতে ইতিহাসকে আশ্রয় করতেই হবে। এবং এজন্যই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের একটি বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য বলে মনে করি। বক্তব্যটি হলো—

"It is the duty of the historian not to let that past be forgotten. He must trace these gifts back to their sources, give them their due place in the *time-scheme*, and show how they inffluenced or prepared the succeeding ages, and what portion of present day Indian life and thought is the distinctive contribution of each race or creed that has lived in this land."[1]

সুতরাং ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই জিজ্ঞাসা হতে পারে, **ইতিহাস তাহলে কি?**—ইতিহাস হলো—পৃথিবীর বৃহত্তম মানব সমাজ কি ভাবে পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম করে বা সামঞ্জস্য বিধান করে বর্তমান সভ্যতায় এসে পৌঁছেছে; আদিম যুগের গুহামানব কি ভাবে আজকের সুসভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই কথা আলোচনাই হলো ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানুষ ও তাঁর আর্থ-সামাজিক (Socio Economic) পরিবেশই হলো ইতিহাসের ভিত্তিভূমি। ইংরেজী 'History' শব্দটি ভাঙলে বোধহয় এই দাঁড়ায়—His (i.e. Man's) + Story = History, অর্থাৎ মানুষের গল্প বা মানুষের অগ্রগতির কাহিনী। তাই বোধহয় বলা হয়—"History is a record of the achievements of Man". (An Advance History of India—Majumder, Dutta and Roychowdhury—Page-9)।

ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা হলো—রাজা-রাজড়ার কাহিনী; এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, নাচের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ দেখাতে গেলে

1. India Through the Ages—Jadunath Sarker. (Sir William Meyer Lecture 1928, Madras University, old Edition S. C. Sarker & Sons, Calcutta, Page—3-4.)

আমরা কোন ইতিহাসকে অনুসরণ করবো। আগেই পরিষ্কারভাবে বলে নেওয়া ভাল যে, রাজা-রাজড়ার উত্থান-পতনের দিনপঞ্জিবাহী ইতিহাস ও শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস ঠিক এক জিনিস নয়। যদিও সংস্কৃতির উপর ভিন্ন ভিন্ন যুগে সেকেলে রাজাদের প্রভাব একেবারে কম নয় তবে এক যুগের প্রচলিত নিয়ম-কানুন পরবর্তীকালের রাজা এসে পাল্টে দিয়েছেন এমন নজির যেমন অজস্র—তেমনি রাজারা আবার রাজকার্য ভুলে শুধু সংস্কৃতিচর্চা নিয়েই সময় অতিবাহিত করেছেন, এমন নজিরও ইতিহাসে কম নেই। প্রাচীন গ্রীস ও ভারতীয় ইতিহাস অনুধাবন করলেই একথার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। আবার দেখা গেছে, রাজার পর রাজা সিংহাসনে এসেছেন, অনেক যুগ পার হয়ে গেছে, তবু সংস্কৃতির ধারাটি প্রায় অব্যাহত থেকে গেছে। আবার এও দেখা গেছে, কোন বিদেশী জাতি হয়তো ভারতে এসেছে, কিন্তু একই সঙ্গে তাদের প্রভাব ভারতের সর্বত্র পড়েনি। এভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখা যায় যে রাজা-রাজড়ার ইতিহাস আর সংস্কৃতির ইতিহাস ঠিক এক জিনিস নয়। রাজা-রাজড়ার উত্থান-পতনের পথ বেয়েই ফল্গুধারার মতো বয়ে চলে, জনজীবনে সংগোপনে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাটি।—

যাই হোক ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাসে ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করে নিয়েই, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি আলোচনা করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। যদিও ইতিহাসের যুগ বিভাগ নিয়ে নানা বিতর্কের শেষ হয়নি, তবু আমরা যথা সম্ভব গোড়ামী ত্যাগ করে এ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বীকৃত ধারাটি নিয়েই অগ্রসর হতে পারি। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত প্রবর ডঃ জিমার (Dr. Heinrich Zimmer) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষাংশে ভারতীয় শিল্পকলার যে ধারাবাহিক তালিকা দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে প্রাণিধানযোগ্য।[১] রাজা-রাজড়ার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতির ধারাটি কি ভাবে বয়ে চলেছে, উক্ত তালিকায় তা সুন্দরভাবে দেখানো আছে। তবে ঐ তালিকাই তো শেষ কথা নয়? তাছাড়া উক্ত তালিকায় বিশেষ করে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিষয়েই

১. The Art of Indian Asia, Vol-I. Dr. Heinrich Zimmer, (Bollingen Foundation—New York, 1960, 2nd edition; Pantheon Books Inc. New-York. Page—390 (Appendix—B)

উল্লেখ আছে। সুতরাং সার্বিকভাবে অন্যান্য শিল্পকলার জন্যও ডঃ জিমারের সঙ্গে ডঃ রমেশ মজুমদার, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, গোপাল হালদার, বিষ্ণু সরস্বতী, গর্ডন চাইল্ড, স্টুয়ার্ট পিগট, প্রমুখদের অবলম্বনে একটি গ্রহণযোগ্য সময়-তালিকা (Time-Scheme) আমরা প্রস্তুত করে উপস্থাপিত করলাম। এতে আশাকরি, এক নজরে, ভারতের যে কোন শিল্পকলার ক্রমবিকাশের ধারাটি পর্যবেক্ষণ করতে এই তালিকা সাধারণভাবে সাহায্য করতে পারবে। (এই প্রসঙ্গে ("An Advance History of India—Majumder, Dutta, Roychowdhury, Macmillan-New York—1965, 2nd edition with correction-দ্রষ্টব্য। তাছাড়া Dr. Zimmer এর "The Art of Indian Asia" গ্রন্থের Vol-II অবশ্যই দ্রষ্টব্য। কারণ উৎসাহী নৃত্য-গবেষকরা উক্ত গ্রন্থে, ভাস্কর্যে ভারতীয় নৃত্যের ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি জানতে পারবেন।)

।। ঐতিহাসিক সময়রেখা ।।

(Time-Scheme)

॥ ইতিহাসের পটভূমিকা ॥

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস মানুষের জীবিকা উপায়ের হিসাব মতো যুগে যুগে বিভক্ত হয়ে আসছে দীর্ঘ দিন থেকে। এই সব যুগ-বিভাগগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুই-তিন যুগের উপায়-উপকরণ রক্ষিত দেখা যায়। কিন্তু প্রতিটি যুগের নামকরণ হয় সেই যুগের মুখ্য হাতিয়ারটি থেকে। এই ভাবেই প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি যুগের নামকরণ হয় সেই সেই যুগের বাস্তব উপকরণের উপর নির্ভর করে।

॥ প্রাগৈতিহাসিক যুগ ॥

প্রাক্-বৈদিক যুগ : (আনুমানিক প্রায় দুই লক্ষ বছর আগে এই যুগের সূত্রপাত)

(১) প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age)

মানুষের ইতিহাস, সুপ্রাচীনকাল থেকে বহুবছর পর্যন্ত প্রায় প্রাঙ্নরের (Hominids) ইতিহাস বলা যায়। এদের করোটি ও নানা চিহ্ন পাওয়া গেছে চীনে, জাভায়, আফ্রিকার টাঙ্গানিকায়, জার্মানীতে। এরপর জন্মাল সজ্ঞান

নৃজাতি (Homo Sapiens)। এ সময় মানুষ পর্বত গুহায় বাস করতো। পাথরের অস্ত্রনির্মাণ করতো। এই পাথরের অস্ত্রই ছিল তাঁর নিজেকে বাঁচাবার প্রধান হাতিয়ার। এ সময়, পশুপালন বা কৃষিকাজ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিলনা মানুষের। মানুষ তখন জীবিকা নির্বাহ করতো খাদ্য আহরণ ও শিকার করে। এই যুগের মানুষ মূলতঃ **শিকারজীবী**। মর্গানের ভাষায় "স্যাভেজারির যুগ", বর্বর যুগ, নিষাদ যুগ।[১] পৃথিবীতে প্রথম শিকার ভিত্তিক নাচের সূত্রপাত এই সময় থেকেই ধরতে হয়।

(২) নব্যপ্রস্তর যুগ (Neolithic Age)

এই সময় মানুষ পাথরে পাথরে ঠুকে আগুনজ্বালা শেখে। বন্য জন্তুদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করতে থাকে এ যুগের মানুষ। তাই এঁদের বলা হয় পশুপালক। বর্তমান কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতির পূর্বপুরুষদের সময়। এঁদের আদিবাসী নৃত্যকলা এখনো সমাজে জীবন্ত। এই যুগ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দশ / বারো হাজার বছর আগে শুরুহয়। এই সময়, থেকেই পশু-পক্ষীর গতিভঙ্গিকে অনুকরণ করে নাচের সূত্রপাত ধরতে হয়।

(৩) তাম্রযুগ (Dravidian Age)

মহেঞ্জোদরো, হরাপ্পা ও চনহুদরো সভ্যতার সময়কাল। অনেকের মতে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বছর পূর্বের সিন্ধু উপত্যকার সময়। এ যুগেই কৃষির আবিষ্কার হয়। মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে কৃষির আবিষ্কার ও কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন এক যুগান্তকারী বিপ্লব বলে বিবেচিত হয়। আধুনিক জগতের কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস কৃষিব্যবস্থার প্রচলনের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। এ যুগের মানুষ হলো **কৃষিজীবী**। হরাপ্পায় প্রাপ্ত বিরাট শস্য ভাণ্ডার (Granary) প্রমাণ করে, মানুষ তখন ক্রমবিবর্তনের পথে "Higher Pastoral" পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতীয় নৃত্যের প্রথম ভাস্কর্য নিদর্শন প্রাচীনতম উপাদান হিসেবে এই সময়েই পাওয়া যায়। নৃত্যশীলা ব্রোঞ্জের নারীমূর্তি এ সময়েরই সৃষ্টি। কৃষিভিত্তিক নাচের উদ্ভব এই সময় থেকেই ধরতে হয়।

---

১. The Origin of the Family, Private Property and the State—F. Engels, 7th edition 1968, Page-23.

(৪) তিব্বত ব্রহ্ম জাতি

আসাম প্রদেশের নাগা, কুকি, খাসি প্রভৃতি পার্বত্যজাতির পূর্বপুরুষদের আগমনের সময়। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক Gisbert Pascaul-এর ভাষায় বলা যায় এই পর্যন্ত "Preliterate" যুগ। অর্থাৎ অ-লিখিত সভ্যতার যুগ। এরপর শুরু হয় "Literate" যুগ বা লিখিত সভ্যতার যুগ অন্ততঃ ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে তো বটেই। (*Preliterate Man—Gisbert Pascaul* দ্রষ্টব্য)।

(৫) বৈদিক যুগ

(খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—৫০০)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ কেটে গেলে কালান্তরের সূচনা হয় বৈদিক আর্যদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে। (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০—১০০০ মধ্যে কোন এক সময়ে আর্যজাতির আগমন ও সপ্তসিন্ধুতে বসতি বিস্তার।) মোটামুটি এই সময় থেকেই ভারতীয় সমাজের এবং জীবন-যাত্রার একটী ধারাবাহিক পরিচয় পাই। এই সময় থেকেই লিখিত সভ্যতার শুরু। এর আগে সবটাই ছিল মৌখিক বা Oral, প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ তাই বেদ। যতদিন বেদের আগের কোন লিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত না হচ্ছে, ততদিন বেদকেই লিখিত প্রাচীনতম গ্রন্থের মর্যাদা দিতে হবে। বেদ রচনার আগে পর্যন্ত প্রায় সবটাই মৌখিক পর্যায়ে ছিল।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো—ঋক্, সাম, যজু, ও অথর্ব বেদের প্রণয়ন এবং এগুলিকে কেন্দ্র করে সংহিতা (বেদের পদ্যাংশ), ব্রাহ্মণ (বেদের গদ্যাংশ), উপনিষদ, আরণ্যক, বেদাঙ্গ—শিক্ষা (উচ্চারণ), ছন্দ, নিরুক্ত (শব্দার্থ), ব্যাকরণ, কল্প যাগযজ্ঞ (বিধান), জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব। উক্ত চতুর্বেদকে কেন্দ্র করে, পরবর্তীকালে আবার গড়ে উঠেছে 'নাট্যবেদ' বা পঞ্চমবেদ অথবা 'গন্ধর্ব বেদ'। ভারতীয় সঙ্গীত তথা নৃত্যের ইতিহাসে এই নাট্যবেদের গুরুত্ব যে অপরিসীম, এ বিষয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে এই প্রসঙ্গে শুধুমাত্র 'অভিনয় দর্পণে'র একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অভিনয় দর্পণ-এর স্রষ্টা নন্দিকেশ্বর 'নাট্য প্রশংসা' বিষয়ে লিখেছেন—

> "ঋগ্‌যজুঃ সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্ব্বণঃ ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥
> পাঠং চাভিনয়ং গীতং রসান্ সংগৃহ্য পদ্মজঃ।
> ব্যরীরচচ্ছাস্ত্রমিদং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ৮ ॥

"ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববেদ হইতে যথাক্রমে পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস সংগ্রহপূর্বক পদ্মযোনি ধর্মকামার্থ মোক্ষপ্রদ এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। নাট্যশাস্ত্রেও (১।১৭) ঠিক ইহার অনুরূপ বর্ণনা আছে। যেমন—

"জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌ বেদাৎসামভ্যো গীতমেবচ।
যজুর্বেদাদভিনয়াম্ রসানাথর্বণাদপি" ॥ ১।১৭ ॥

"ঋক্ বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় (আঙ্গিকাভিনয়) ও অথর্ব বেদ থেকে রস সংকলন করে নাট্যাদি নামক পঞ্চমবেদ রচনা করা হয়। অর্থাৎ ঋগ্বেদ মন্ত্রময়—তাই উহা হইতে পাঠ্য বা বাচিকাভিনয় গ্রহণ করা হয়। যজুর্বেদ ক্রিয়াত্মক—তাই উহা হইতে আঙ্গিকাভিনয় গৃহীত হয়। সামবেদ স্বয়ং গান স্বরূপ—তাই উহা হইতে গীতের সংগ্রহ হইয়াছিল। আর মারণাদি অভিচারকর্ম-প্রতিপাদক বলিয়া অথর্ববেদ রস প্রধান। অতএব উহা হইতে রসগ্রহণ স্বাভাবিক।"[১]

বৈদিক সমাজ

আর্য সমাজ — অনার্য সমাজ (পাহাড়-পর্বত ও বনে বাস)

আর্য সমাজ → ৪টি আর্যসমাজ

৪টি আর্যসমাজ → ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র

- **ব্রাহ্মণ** (যাঁরা যাগযজ্ঞ পূজা করতো)
- **ক্ষত্রিয়** (যাঁরা রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ করতো)
- **বৈশ্য** (যাঁরা কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন করতো)
- **শূদ্র** (যে সকল অনার্য আর্যগণের বশ্যতা স্বীকার করে আর্যসমাজে যোগ দিল)
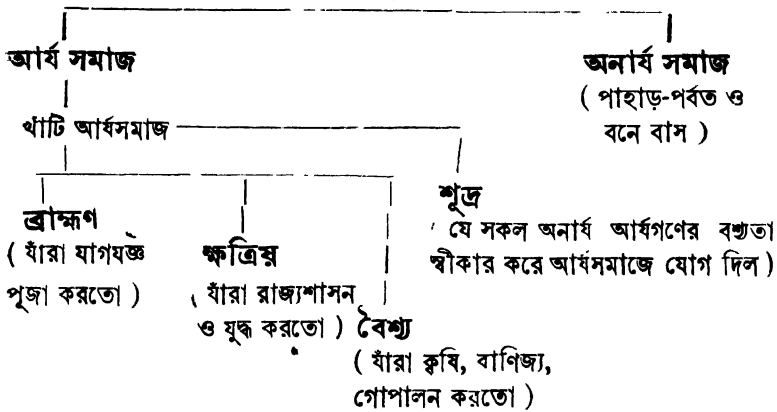
[আমাদের ধারণা বৈদিক "মহাব্রত" অনুষ্ঠানে যে "দাসী" সম্প্রদায় নৃত্যে অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা সম্ভবতঃ ঐ শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকবেন। এঁদেরইতো বলা হয়েছে "ব্রাত্য"। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।]

১। অভিনয় দর্পণ—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী অনুদিত (মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১৩৪৪ পৃঃ ৪—৫।)

(৬) পৌরাণিক যুগ

খ্রীঃ পূঃ ৪০০ - খ্রীষ্টীয় ৪০০ শতাব্দী)

(১) কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, কোশল, কাশী, প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে আর্যদের বসতি বিস্তার।

(২) পূর্বভারতে অঙ্গ, পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (অসম) প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন।

(৩) আর্যদের দাক্ষিণাত্যে বসতি বিস্তার।

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতি ১৮ খানি পুরাণ নিয়ে পৌরাণিক সাহিত্য। রামায়ণে রামচন্দ্র ও সূর্যবংশের কথা, মহাভারতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয়দের কথা ও অন্যান্য পুরাণে এঁদের বিভিন্ন রাজবংশের কথা ও নানাবিধ উপদেশ গল্পাকারে দেওয়া আছে। এ যুগের জ্ঞাতব্য বিষয়—

(ক) রাজসূয় যজ্ঞ। (খ) অশ্বমেধ যজ্ঞ। (গ) স্বয়ম্বর প্রথা।

মহাভারতে দেখা যায়, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। রামায়ণে সীতার ও মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা আছে। (এই পৌরাণিক যুগে ভারতীয় সঙ্গীত তথা নৃত্যকলার প্রভূত চর্চা হয়েছে—যথাস্থানে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো)।

(৭) ঐতিহাসিক যুগ

(খ্রীঃ পূঃ ৬০০ শতাব্দী)

এই যুগকে Historical-Age বা Cultural-Age বা Classical Period নামে অভিহিত করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। এই সময়ে বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবকাল ধরা হয়। এবং এই সময়েই উত্তর ভারতে ষোড়শ জনপদের সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ ষোলটি নগরকেন্দ্রিক পরিবেশে সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতির চর্চা হয়েছে। 'অঙ্গুর নিকায়' অনুযায়ী এই ষোলটি মহাজনপদের নাম— কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, কম্বোজ, এবং গান্ধার। আবার জৈন ভগবতী সূত্র অনুযায়ী—অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালবক, বৎস, ঋক্ষ, কোচ্ছ, পঢ়, ঘোলি, রাঢ়, বৃজি, কাশী, কোশল, অবহ এবং সম্ভুত্তর।

যাইহোক, আজও দেখা যায় ঐ সকল মহাজনপদের অস্তিত্ব অন্যনামে বিদ্যমান। যেমন : —

(১) কোশল—(অযোধ্যা প্রদেশ)।
(২) মগধ—(দক্ষিণ বিহার)।
(৩) অবন্তী—(মালব)।
(৪) বৎস—(এলাহাবাদ)।
(৫) কাশী—(বারাণসী)।
(৬) অঙ্গ—(পূর্ব বিহার)।
(৭) বৃজি—(উত্তর বিহার)।
(৮) মল্ল (গোরক্ষপুর জেলা)।
(৯) চেদি—(যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল)
(১০) কুরু—(থানেশ্বর, দিল্লী, মীরাট)।
(১১) পাঞ্চাল—(বেরিলি, বুদাউন, ফরাক্কাবাদ)।
(১২) মৎস—(জয়পুর)।
(১৩) শূরসেন—(মথুরা)।
(১৪) অশ্মক—(গোদাবরী তীর)।
(১৫) গান্ধার—(পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি) (অধুনা পাকিস্তান)।
(১৬) কম্বোজ—(দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীর ও কাফিরস্তানের অংশ)।

এ ছাড়াও আরও তিনটি অঞ্চলের প্রাধান্য ছিল। (১) তক্ষশীলা—(উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)। (২) বৈশালী—(মজঃফরপুর জেলা)। (৩) কপিলাবস্তু—(নেপালের তরাই অঞ্চল)।

[এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভাল যে, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরতের যে নাট্যশাস্ত্র প্রণীত বা সংকলিত হয়েছিল, তাতে উচ্চাঙ্গ নৃত্যকলার করণ-প্রকরণ সমৃদ্ধ নৃত্য-ব্যাকরণ যা পাওয়া গেছে, তার আগে মনে হয় সেই ষোড়শ জনপদের উদ্ভবকালে ভারতীয় নৃত্যকলা আদিবাসী স্তর অতিক্রম করে লোকনৃত্যের পর্যায়ে ক্রমশঃ মার্জিত হয়ে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উপযোগী পরিশীলিত শাস্ত্রীয় বা ক্ল্যাসিকাল রূপ নিতে শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে আদিবাসী নৃত্য, লোকনৃত্য ও ক্ল্যাসিকাল নৃত্যের মূলগত সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি ধরে গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে মূল সূত্রটি ধরা যেতে পারে। কারণ নৃত্য-ব্যাকরণ তৈরী হতে বেশ সময় লাগবার

কথা। এখানে দেখা যায়, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ক্ল্যাসিকাল যুগ শুরু হবার অন্ততঃ চারশত বছর পরে নাট্যশাস্ত্রের প্রণয়নকাল ধরা হয় খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে নাট্যশাস্ত্রের নৃত্য-ব্যাকরণের সময় কালে। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রে আমরা পাচ্ছি ভারতীয় নৃত্যের চারশত বছরের চর্চিত ও পরিশীলিত উপাদানে সমৃদ্ধ এক প্রধান নৃত্য-ব্যাকরণ পদ্ধতি। (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী—এই চারশত বছর)। ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে আমরা প্রামাণ্য দলিল বলতে চেয়েছি। কারণ এই নাট্যশাস্ত্রের আগে আর নৃত্য-ব্যাকরণ বিষয়ে এমন সুবিন্যস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালের নৃত্য সম্বন্ধীয় সব বইগুলিই নাট্যশাস্ত্রের অনুসারী বা অনুকারী বা অনুচিন্তা-গোষ্ঠীর লেখা গ্রন্থ।

খ্রীঃ পূঃ ৫৬৩—৪৮৩ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত।	গৌতম বুদ্ধের সময়কাল। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত শিল্পকলার উদ্ভব।
খ্রীঃ পূঃ ৫২৬—	প্রাচীন হিন্দু আর্ট ও জৈন আর্ট। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের তিরোধান কাল।
খ্রীঃ পূঃ ৩২৭—৩২৬ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত।	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ (গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের সমন্বয়ে 'গান্ধার' শিল্পের সূত্রপাত)।
খ্রীঃ পূঃ ৩২২—১৮৪ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত।	**মৌর্যবংশ** চন্দ্রগুপ্ত— অশোক—বিখ্যাত অশোক স্তম্ভ—নানা স্তূপ ও নৃত্য ভাস্কর্য এবং অন্যান্য শিল্পকলা।
খ্রীঃ পূঃ ১৮৫/১৮৬	কলিঙ্গের বিখ্যাত জৈনরাজা খারবেলের সময়কাল। ওড়িশার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ে বিখ্যাত খারবেলের শিলালিপি (Inscription) এই সময়ে পাওয়া যায়। উদয়গিরিতে হাতিগুম্ফালিপি থেকে প্রথম ওড়িশী নৃত্যের উপাদান আবিষ্কৃত হয়। যথাস্থানে এই লিপিটির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র রচনার সমসাময়িক কাল এই খারবেলের সময়কালকে ভারতীয় নৃত্যচর্চার স্বর্ণ অধ্যায় বলা যায়। ভারতীয় নৃত্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যাকরণ এই সময় থেকেই পাওয়া যায়।
খ্রীঃ পূঃ ১৮৪—৭৩ পর্যন্ত।	**শুঙ্গ বংশ**—পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, বিখ্যাত সাঁচীস্তূপের নির্মাণকাল।

খ্রীঃ পূঃ ৭৩—২৭ পর্যন্ত।	**কাম্ব বংশ**—বাসুদেব—এই সময়ে নির্মিত ভারহুতের সুদর্শন যক্ষী। বুদ্ধগয়ার অজাতশত্রু তোরণের ভাস্কর্যের নির্মাণকাল।
খ্রীঃ পূঃ ২য়—৩য় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।	**অন্ধ্রবংশ**—এই সময়ে অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়—২নং সাঁচীস্তূপ, মথপক্ক জাতকের কাহিনী অবলম্বনে অমরাবতীর নৃত্যভাস্কর্য, সাঁচীর উত্তর ও পূর্ব তোরণে যক্ষীদের মূর্তি, উদয়গিরির বিদ্যাধর নৃত্যদল, খণ্ডগিরির ভাস্কর্য, রানীগুম্ফা প্রভৃতির নৃত্যভাস্কর্য।
৭৮ খ্রীষ্টাব্দ—২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।	**কুষাণ বংশ**—কণিষ্ক—মথুরায় প্রাপ্ত নেমার পদতলে নৃত্যদল ও সঙ্গীত-শিল্পীদের ভাস্কর্য, এ ছাড়া মথুরায় নাগচম্পা জাতকের কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যদৃশ্য, গান্ধার শিল্পকলার চরম বিকাশ, নাগার্জুন কোণ্ডার ভাস্কর্য, সাঁচীর দক্ষিণ ও পশ্চিম তোরণে উৎকীর্ণ নৃত্যদৃশ্য। তাছাড়া গান্ধার শিল্পের আঙ্গিকে অন্যান্য ভাস্কর্যের সঙ্গে দুইটি বিশেষ নৃত্যদৃশ্য প্রভৃতি এই যুগের ফসল।
২০০ খ্রীষ্টাব্দ—৩২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।	এই সময়কে বলা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এই সময়ে ভারতীয় শিল্পের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই সময়কাল হলো কুষাণ যুগের শেষ ও গুপ্ত যুগের (স্বর্ণযুগ) আরম্ভ—এই মধ্যবর্তী সময়। (বাংলা সাহিত্যেও এমন একটি সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা যায়। অর্থাৎ কবি ভারতচন্দ্রের শেষ ও কবি ঈশ্বরগুপ্তের আরম্ভ—এই মধ্যবর্তী সময়।) তাছাড়া অনেকের মতে দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যবিষয়ক বিখ্যাত তামিল গ্রন্থ "শিলপ্পধিকরম্" এর রচনাও নাকি এই সময়েই হয়েছিল। শিলপ্পধিকরমে তেমন কোন নৃত্য ব্যাকরণের উল্লেখ নেই। 'শিলপ্পধিকরম্', মূলতঃ একখানি তামিল নাটক। এটি রচনা করেন ইলাঙ্গের আদিগল। এই গ্রন্থে 'ইসই' বা সঙ্গীতের একটি অধ্যায় আছে, তাতে গন্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীভুক্ত নৃত্য-

গীত-বাদ্যের আলোচনা সন্নিবেশিত আছে। পরবর্তী-কালে এই নাটকের নানা ভাষ্য রচিত হয়। এই নাটকের নায়িকা মাধবী একজন উঁচুদরের নৃত্যশিল্পী ছিলেন—নাটকের বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। শুধু এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে।

৩২০ খ্রীষ্টাব্দ—৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।	ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ (Golden Age)। **গুপ্ত বংশ**—সমুদ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত—স্কন্ধগুপ্ত প্রমুখদের রাজত্বকাল। এই সময়ের প্রচুর নৃত্য-ভাস্কর্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে গোয়ালিয়রের গন্ধর্ব প্রধান, গোয়ালিয়রের (পাওয়াইয়া)—নৃত্যদৃশ্য, দেওগড়—রামায়ণের নৃত্যদৃশ্য, মধ্যভারতের—বিদ্যাধর সারনাথ—নৃত্য দৃশ্য প্রভৃতি এ যুগের কীর্তি। এ ছাড়া অনেক একক দ্বৈত ও যৌথ বা দলবদ্ধ (Group) নৃত্যদৃশ্যের ভাস্কর্য দেখা যায়।
৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ—১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।	ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যযুগ। এই যুগের অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত যুগ। এই যুগগুলিতে ভারতীয় নৃত্যভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকলার প্রভূত বিকাশ ঘটেছিল। যেমন—ইসলামের অভ্যুদয়—ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও বিজয়ের কাল (৭৫০ খ্রীঃ ১৫৬৫)। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রভাব।
৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ—৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ।	**চালুক্য বংশ**—বিখ্যাত অজন্তা, ইলোরার চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, রামেশ্বর গুহা কৈলাস মন্দির শিব, শিব ভৈরব। নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পীদের ভাস্কর্য ইত্যাদি।
৬০০ খ্রীষ্টাব্দ—৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ।	**পল্লব বংশ**—আইহোল—দুর্গামন্দির। মামল্লপুরম যক্ষী, ঔরঙ্গাবাদ—তারা-নৃত্য ভাস্কর্য।
৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ—১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ।	**পাল ও সেন বংশ** নালন্দা। পণ্ডদকল বিদ্যাধরা, রাজিম—যক্ষী, পণ্ডদকল—শিবনৃত্য, ভুবনেশ্বর পরশু—রামেশ্বর মন্দির, কাঞ্চিপুরম্—কৈলাশ মন্দির।

৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ—৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। **রাষ্ট্রকুট বংশ** - বিখ্যাত এলিফেণ্টার ভাস্কর্য ও ইলোরার কিছু চিত্রকলা।

৮৫০—১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ। **চোল বংশ**—তাঞ্জোর-ভরতনাট্যম্ নৃত্যের পীঠস্থান। খাজুরাহো, ভুবনেশ্বর মুক্তেশ্বর মন্দিরের নৃত্যভাস্কর্য, যোধপুর—নৃত্যদল, চালুক্যায়ন – শিব-পার্বতী; আইহোল-শিব, চোল-শিবনৃত্য প্রভৃতি নৃত্যভাস্কর্য।

১০৭৬—১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। **গঙ্গাবংশ**—কোনারক—সূর্যমন্দির, দেবদাসী, নৃত্যভাস্কর্য, খাজুরাহো—লক্ষণ মন্দির, ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির, খাজুরাহো বিদ্যাধরা, ভুবনেশ্বর—কপিলেশ্বর নৃত্যশিল্পী, সুর্বায়—নৃত্যদল, উজ্জয়িনী—শিবনৃত্য, বিদর—শিব, ভুবনেশ্বর—শিবনৃত্য—**নটরাজ ব্রোঞ্জ** প্রভৃতি।

১১০০—১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ। **হোশল বংশ**—হেলেবিদ ও বেলুর—চিল্লকেশর। আবু-তেজপাল মন্দির, মকরন্দ-নৃত্যশিল্পী প্রভৃতি।

১১০০—১৩৫০ **পাণ্ড্য বংশ**—কেরল ত্রিভিক্রমঙ্গল মন্দির। হেলেবিদ—গণেশ, বেলুর—সরস্বতী, হেলেবিদ—সরস্বতী, সোমনাথ-পুরম্—বিষ্ণুগোপাল, রায়চুর—শিবনৃত্য, বেলুর—শিবনৃত্য, হেলেবিদ—শিবনৃত্য, কাঞ্চিপুরম—ভৈরব, মধ্যভারত—ভৈরব, তাঞ্জোর গজসংহার মূর্তি, **তাণ্ডব নৃত্য** প্রভৃতি।

১৩৫০—১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। **রায় বংশ**—বিজয়নগর শিল্পকলা—কুচিপুড়ি নৃত্যের পীঠস্থান। পালম্পেট—নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পী। পালম্পেট—শিবনৃত্য। শ্রীশৈলম-শিবমন্দির, আবু—আদিপথ মন্দির, **চিদম্বরম—নটরাজ মন্দির**। এখানে ভরতের নাট্য-শাস্ত্রের ১০৮ করণের শ্লোকসহ নৃত্যভঙ্গির ভাস্কর্য নিদর্শন। (নাট্যশাস্ত্রের করণ উৎকীর্ণ)। পুষ্পগিরি—শিবনৃত্য, কুম্ভকোনম্—শিবনৃত্য। **নটরাজ ব্রোঞ্জ**। পৃথিবী বিখ্যাত অতি পরিচিত নটরাজ মূর্তি। বিজয়নগরম্—নৃত্যশিল্পী প্রভৃতি।

১৫৬৫—১৮৫৭ খ্রীঃ	ভারতে পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজদের আগমন—শাসন ও প্রভাব।
	নায়ক বংশ -মাদুরায় শিল্পকলা।
	রাজপুত বংশ—মিনিয়েচার পেন্টিং শিল্পকলা।
	মোঘল যুগ –ভারতীয় নৃত্যের ক্ষয়িষ্ণু কাল। (১৫২৬ – ১৮৫৭ খ্রীঃ)।
	ভারতীয় শিল্পকলায় আধুনিক যুগ শুরু হবার আগে এক নজরে শিল্পকলার রূপরেখাটি এই রকম—
খ্রীঃ পূঃ ৫০০ থেকে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত	ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচীন যুগ।
৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত	ভারতীয় শিল্পকালর মধ্যযুগ।
১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত	মোঘল যুগের শিল্পকলা।
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত	আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার বিকাশ ও বিবর্তন পর্ব।
উনবিংশ ও বিংশ শতক	(১) উনিশ শতকের ভারতীয় শিল্পে নবজাগরণ (Renaissance)
	(২) ভারতীয় নৃত্যের আধুনিক যুগ ও নৃত্যের পুনর্নবীকরণ (Revivalist Movement)
	(৩) বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবন। ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, কুচিপুড়ি, ওড়িশী, যক্ষগণ, ভাগবত মেলা নৃত্যনাট্যের ধারা, কেরালার 'কলি' নাচ, কুম্মি, মেলাতুর, সাদির নাট্য, কুরুভঞ্জি, কৃষ্ণনাট্যম্, মোহিনী আট্যম্, দাসী আট্যম্, (দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতি), ছৌ-নৃত্য, বাউল প্রভৃতি নৃত্যকলার বিকাশ পর্ব।

(৪) নৃত্যের পুনর্নবীকরণে যাঁদের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতীয় নৃত্যে স্বাঙ্গীকরণ), কবি ভাল্লাথোল (কথাকলি নৃত্যের পুনরুজ্জীবন), গুরুসদয় দত্ত (লোকনৃত্য ও ব্রতচারী আন্দোলন)
শম্ভুমহারাজ (কথক)
আমুবি সিং (মণিপুরী)
রুক্মিনীদেবী আরুণডুলে (ভরতনাট্যম্)
বালাসরস্বতী (ভরতনাট্যম্) এবং
(কুচিপুড়ি)
(ওড়িশী)
(ছৌ) ও (বাউল)
(কৃষ্ণনাট্যম্)
(মোহিনী আটাম্)
উদয়শঙ্কর (Neo-Classical এর প্রবর্তক)
এ ছাড়া অনেক বিশিষ্ট গুণী, শিল্পী-সাধকের অবদান রয়েছে এই পর্বের বিশেষ বিশেষ নৃত্যের উদ্ভাবন ও প্রচারে। যথাস্থানে এঁদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু উল্লেখ করা হল মাত্র।

ভারতীয় নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের মূল সূত্রগুলি ঃ

(১) ভারতীয় নৃত্যে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ তথা প্রবণতা—নতুন রূপরেখা।

(২) ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যে লোকনৃত্যের প্রভাব।

(৩) ভারতীয় নৃত্যনাট্যে প্রাচ্য (Oriental) ও পাশ্চাত্য (Occidental) প্রভাব প্রসঙ্গে—ব্যালে (Ballet), কোরিওগ্রাফি, (Choreography), নৃত্য-লিপি (Dance Notation প্রভৃতি।

(৪) বিভিন্ন নৃত্যের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ। (Comparative Study] ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় নৃত্যের উপাদান স্বরূপ নৃত্য-ভাস্কর্যের তালিকা প্রণয়নে নিম্নলিখিত তথ্যের সাহায্য নিয়েছি।

(১) The Art of Indian Asia—Vol-I, Vol.-II.

—Dr. Heinrich Zimmer.

(২) Classical Indian Dance in Liturature and the Arts.

—Dr. Kapila Vatsyayan

(Sangeet Natak Academy—New Delhi 1968—1st edition দ্রষ্টব্য।)

(৩) ভাস্কর্যে ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

ডঃ শঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়।

(রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা—৭ম বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ—১৩৭৬ ১৯৬৯)

প্রথম অধ্যায়

নৃত্যের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (সমীক্ষা)

॥ নৃত্যকলার উৎস প্রসঙ্গ ॥

॥ আদিম ও প্রাগৈতিহাসিক যুগ ॥
॥ নৃত্যের উৎপত্তি। বস্তুবাদী ও ভাববাদী ব্যাখ্যা ॥
॥ ভারতীয় নৃত্যকলার উদ্ভব ॥ নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ?

নৃত্যের জন্ম-রহস্যটি অতীব জটিল। এই জটিলতা ভেদ করে নাচের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞগণ নানা ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা যা-যা বলেছেন তা অনেকটা এই রকম—যেমন, ঐন্দ্রজালিক যাদুক্রিয়া, ভাষাহীন আদিম মানুষের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, শ্রমে নিযুক্ত অঙ্গভঙ্গী, জীবিকা প্রয়াস তথা শস্য উৎপাদন, যৌনাকর্ষণ (Fertility Cult), ঐশী-উৎপত্তি (Divine Origin) প্রভৃতির মাধ্যমেই নাচের উদ্ভব ঘটেছে, ইত্যাদি।

নৃত্যকলার উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত, তা বিশ্লেষণ করলে মূলতঃ দুটি মতবাদকেই প্রাধান্য দিতে হয়। যেমন,

(১) সাহিত্যগত মতবাদভিত্তিক ভাববাদী ব্যাখ্যা।

(২) নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক মতবাদ ভিত্তিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।

নৃত্যের উৎস

সাহিত্যগত উপাদান (ভাববাদী ব্যাখ্যা)	নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (বস্তুবাদী ব্যাখ্যা)
পৌরাণিক ও কিংবদন্তী কেন্দ্রিক কাহিনীর বিন্যাস ও নাট্যশাস্ত্র, 'অভিনয় দর্পণ' প্রভৃতির মাধ্যমে ঐশী উৎপত্তির ব্যঞ্জনা (Divine Origin) প্রভৃতি।	(১) অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাস (Imitative Magic) (২) জীবিকা তথা খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ক্রিয়ায় সামষ্টিক চেতনার স্ফুরণ (Collective Consciousness) প্রভৃতি।

নৃত্যের উৎস সন্ধানে এ যাবৎকাল কেবলমাত্র সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতেই কিংবদন্তী-কেন্দ্রিক পৌরাণিক কাহিনীগুলিই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে

এবং ভারতীয় নৃত্যের অস্পষ্ট ইতিহাস অল্পবিস্তর এই কিংবদন্তীতেই এতদিন আবর্তিত হয়েছে। এতে যে কি ক্ষতি হয়েছে সেই প্রসঙ্গে Dr. V. K. Narayan Menon-এর একটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন

"…most 'historical' studies
degenerate into a mixture of pseudo-legendary
and mythology with large doses of sentimentality
and platitudes."[1]

এমন কি ভারতীয় নৃত্যের ঔপপত্তিক বিষয়ের প্রামাণ্য দলিল বলে পরিচিত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' এবং নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ'-এ নৃত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে কাহিনীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তা হোক। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে, নৃত্যের ইতিহাস রচনায় ঐ কাহিনীগুলিই একমাত্র উপাদান নয়। কারণ কাহিনী বা কিংবদন্তী কখনো পুরোপুরি ইতিহাস-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হতে পারে না। যদিও কিংবদন্তী ও পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপাদান সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তবু নাচের উৎস জানতে গেলে আমাদের মানব-ইতিহাসের গোড়ার দিকে সন্ধান করতে হবে। এই গোড়ার দিকের সন্ধান দিতে পারে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। তাই সঙ্গত কারণেই নৃত্যের উৎস খুঁজে দেখতে হবে নৃতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে। এর সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যকেও যাচাই করে দেখতে হবে। অন্ততঃ প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাক্ বৈদিক যুগ পর্যন্ত নৃত্যের অবস্থা জানতে গেলে তো বটেই।

সুতরাং শুধুমাত্র কল্পনা-নির্ভর কিংবদন্তীকেন্দ্রিক সীমিত চিন্তা এবং ঐশী-প্রেরণাগত (Divine origin) দৃষ্টান্তে নৃত্যের উৎস সন্ধান আগে না করে নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে, মানুষের ক্রমবিকাশের স্তর বিশ্লেষণ করে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে কি ভাবে মানুষ আদিম অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সমাজ-বিকাশের নানা স্তর পেরিয়ে অগ্রসর হলো, (শিকারজীবী, পশুপালক ও কৃষিজীবী) সেই আনুপূর্বিক ইতিহাসের সামগ্রিক 'ক্যানভাস'-এ ফেলে, প্রাচীন মানুষের "টোটেম বিশ্বাস" ও "অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাস"-এর

---

1. A Historical Study of Indian Music—Swami Prajnanananda. (Ananda Dhara Prokashani—Calcutta, 1965. 1st edition—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

মধ্য দিয়ে মানুষের অন্যান্য সৃষ্টিশীল মানস সম্পদের সঙ্গে নৃত্যেরও কি ভাবে উদ্ভব হয়েছিল, তা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। এবং তা দেখতে হবে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকায়। কারণ রাজা-রাজড়ার উত্থান-পতনের ইতিহাস ও শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাস ঠিক এক জিনিস নয়। একথা আমরা আগেও বলেছি। তবু এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, যদিও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের যুগ থেকেই নাচের ভাববাদী ব্যাখ্যা কাহিনী আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এবং পরবর্তীকালে ভরতের অনুসারীরা এই ভাববাদী ব্যাখ্যাকেই স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। তবু অধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়, বিশ্বানুভূতির মধ্য দিয়ে নাচের উৎসধারার দার্শনিক মুল্যায়ন করেছেন। যথাস্থানে সেই আলোচনা সন্নিবেশিত আছে।

আদিম মানুষ শিকারজীবী থেকে পশুপালক এবং পশুপালক থেকে কৃষিজীবীতে উন্নত হয়েছে। এই শিকারজীবী থেকে কৃষিজীবীতে আসতে মানুষকে হাজার হাজার বছর পরিক্রমণ করতে হয়েছে সমাজ বিকাশের নানা পথে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে কৃষির আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা আগেও ছিল, এখনো আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এটা একটা বৈশিষ্ট্য।

নৃত্যের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—(সমীক্ষা):

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, জগতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত নানা শ্রেণী ও জাতির মানুষদের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, কথা ও কাহিনী, শিল্পকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের কারণ নির্দেশ করতে তাঁরা অবশ্য নানা রকম কথা বলেছেন। সেই বিতর্কে না গিয়েও একথা বলা যায় বাহ্যিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের মানসিক কাঠামোটা সব জায়গাতেই প্রায় এক। কেননা সকল মানবগোষ্ঠীই একই ধরনের জান্তববিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, ফলে এক স্থানের লোকের সঙ্গে অপর স্থানের লোকের বিহরঙ্গের পার্থক্য থাকলেও, ভাবগত মিল যথেষ্ট। একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর একটি বিশেষ প্রথা যে কারণে উদ্ভূত হয়েছে, তা যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে সেই জ্ঞানের সাহায্যে অপরাপর দেশের, অপরাপর জাতির

অনুরূপ প্রথাগুলিকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। (একেই শিক্ষার মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলেছে—"Co-relation of Studies.")। যাই হোক, 'যদি আমরা দেখাতে পারি যে, একটি জাতির একটি বিশেষ প্রথার অনুরূপ প্রথা অন্যত্রও বর্তমান, যদি সেই প্রথাটি স্থাপিত হবার পিছনকার উদ্দেশ্যগুলিকে আবিষ্কার করতে পারি, যদি প্রমাণ করতে পারি যে, ঐ উদ্দেশ্যগুলিই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রথার সৃষ্টি করেছে, যে প্রথাগুলির বহিরঙ্গের পার্থক্য থাকলেও মূলগত ঐক্য বর্তমান, যদি দেখাতে পারি যে, ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ থেকে উদ্ভূত প্রথাসমূহ অতীতকালে সার্বিকভাবে বর্তমান ছিল এবং এখনো সেগুলি পশ্চাৎপদ জাতি সমূহের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহলে কোন একটি প্রথার সামগ্রিক অস্তিত্ব বা তার ভগ্নাবশেষ থেকে এটুকু প্রতিপাদন করা যায় যে, সেই বিশেষ প্রথাটি বা তার অবশেষ মনুষ্যজাতির বিবর্তনের এমন একটি পর্যায় নির্দেশ করে, যে পর্যায়টি সমগ্র মানব জাতিকেই একদা অতিক্রম করতে হয়েছিল।'[১]

"(Accordingly, if we can show that a barbarous custom, like that of the priesthood ,of Nemai, has existed elsewhere ; if we can detect the motives which led to its institutions ; if we can prove that these motives have operated widely, perhaps universally, in human society, producing in varied circumstances a variety of institutions specially different but generically alike ; if we can show, Lastly that these very motives, with some of their derivative institutions, were actually at work in classical antiquity ; then we may fairly infer that at a remoter age the same motives gave birth to the priesthood of Nemai.")[1]

উপরোক্ত বক্তব্যের সূত্র ধরে আজও আমরা দেখতে পাই, প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সজীব উপকরণ স্বরূপ 'ট্রাইবাল' সমাজের আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি এখনো সভ্য সমাজের পাশাপাশি চলছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের পাশাপাশি ট্রাইবরা চিরকালই থেকে গেছে এবং আজও আছে।

১। The Golden Bough—Sir James George Frazer. New York—The Macmillan Company—1953, Vol, 1. (Abriged Edition) Page-2.

ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জনজীবনের অসম বিকাশ—"uneven development"। বৈদিক যুগেরও পূর্বে ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানে শক্তিমান রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, তবে মানুষ 'Higher Pastoral' পর্যায়ে উন্নীত হবার পর থেকেই তাঁদের সেই ট্রাইবাল ব্যবস্থায় ভাঙন ধরার ফলে তাঁরা রাষ্ট্রশক্তির অধীন হল। বৈদিক রাষ্ট্রগুলির আশেপাশে নিশ্চয়ই অজস্র ট্রাইবের বাস ছিল এবং এঁদের সামাজিক সংগঠনগুলিকে নিশ্চয়ই বৈদিক রাষ্ট্রশক্তি খুব সুনজরে দেখতো না, তাঁদের দৈত্য, দানব, অসুর, পিশাচ, রাক্ষস, বর্বর প্রভৃতি আখ্যা দিত। তার কারণ ট্রাইবের যে অভ্যন্তরীণ ঐক্যবোধ তার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে ওঠা বড় সহজ ছিল না, কেননা শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মাইনে করা সৈন্যদের দ্বারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দৃঢ়বদ্ধ মানুষদের ঘায়েল করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। সে যাই হোক—এই পিছিয়ে থাকা বর্তমান ট্রাইবাল সমাজের মধ্যেই প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক রূপটি এখনো জীবন্ত। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের লেখক হাণ্টার যথার্থই বলেছেন—

'India thus forms a great museum of races in which we can study man from his lowest to his highest stages of culture. The specimens are not fossils or dry bones, but living communities.'[1]

সুতরাং এই Living Community থেকে অর্থাৎ ট্রাইবাল সমাজের বিভিন্ন জনসমষ্টি যাঁরা এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, তাঁদের নানা ক্রিয়া-কলাপ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার (rituals) অনুষ্ঠান যা এখনো ওদের সমাজে জীবন্ত আছে, সেই উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করেই প্রাচীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের কথা জানা যাবে। অতএব এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক্ নৃতাত্ত্বিকেরা কি বলেন।

নৃতাত্ত্বিক তথ্যে আমরা দেখতে পাই আদিতে সব শিল্পকলাই মানুষের জীবিকা তথা খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল। যদিও আজকের দিনে আমরা নাচ-গান-কবিতা প্রভৃতিকে আলাদা করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তবু মনে রাখা দরকার আদিতে তা ছিল একই সঙ্গে

1. Hunter W. W.—The Imperial Gazettier of India—London 1881, Vol. 4. Page-179.

সম্পৃক্ত। সামষ্টিক চেতনা (Collective consciousness) থেকে ব্যক্তি-চেতনার উত্তরণে তা আলাদা হয়েছে পরবর্তীকালে। আমরা লক্ষ্য করেছি, সমাজ বিকাশের নানা স্তরে শ্রেণী-বিভেদ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনাগুলি ক্রমশঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে এবং এভাবে সমষ্টি থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উত্তরণে যে যে উপাদানগুলি পরিবর্তনের মৌল কারণ বলে স্বীকৃত সেগুলি একে একে বিশ্লেষণ করলেই প্রাচীনকালে অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির মত নৃত্যেরও অবস্থা বা গতি-প্রকৃতি কেমন ছিল তা জানা যাবে।

আদিম সমাজে যাদু বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কি ভাবে ব্রতকথা, আচার-অনুষ্ঠানের (rituals) সঙ্গে নৃত্য-গীত সম্পৃক্ত ছিল এবং কি ভাবে ঐ যাদু বিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও দেবদেবীদের কাহিনী গড়ে উঠলো, তার বিবর্তন অবশ্যই জানা দরকার। কারণ, যে সকল দেবদেবীদের পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাচের উৎপত্তি দেখানো হয়, তারও অনেক আগে মানুষই নাচের সৃষ্টি করেছে এবং তা জীবিকার প্রয়োজনে। একথাটি ভুললে চলবে না যে, নাচের ইতিহাস রচনায় বা সমীক্ষায় বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নাচের অবস্থা জানতে গেলে উপরোক্ত তথ্যের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এবং যায় না বলেই আমরা এবার প্রাগৈতিহাসিক বা আদিম যুগকে যথা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করে দেখবার চেষ্টা করবো।

যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগকে সন-তারিখ দিয়ে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, তবু এ যাবৎ নৃতাত্ত্বিক তথ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো হিসেবে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা দুটো "প্রপোজিশন"-এ আসতে পারি। এই দুটি "প্রপোজিশন" হলো :—

(১) নৃত্যের উৎপত্তির মূলে ছিল অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাস, (Imitative Magic)

(২) আদিতে তা খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল। এবং এই নৃত্যের আঙ্গিকে থাকতো সামষ্টিক চেতনার (Collective emotion) স্ফুরণ। এ যুগের সংস্কৃতি, অবসর বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে ধরা হলেও, আদিম যুগে সেটাই ছিল মানুষের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক প্রেরণা। তখন গান-নাচ-কবিতা ও কাজ ছিল একই প্রেরণার উৎস ও বিশ্বাসের ফলশ্রুতি।

এই প্রসঙ্গে জর্জ টমসন্ বলেছেন—

"The three arts of dancing, music and poetry began as one. Their source was the rhythmical movement of the human bodies engaged in collective labour."[1]

অর্থাৎ নাচ-গান-কবিতা, এই তিন প্রকার চারুশিল্পকলা শুরুতে ছিল এক। এগুলির উৎসে ছিল যৌথ শ্রমে নিযুক্ত মানবদেহের ছন্দযুক্ত ক্রিয়া। গানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে সমাজ বিকাশের অনেক পরে। আরও পরের পর্যায়ে গানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সুর। তখন থেকেই আজকালকার অর্থে কবিতার জন্ম।

প্রাচীন সমাজে তাই নাচ গান শুধুমাত্র অবসর বিনোদন নয়, নিছক সৌন্দর্য উপভোগও নয়। এগুলির উৎসে রয়েছে যাদু বিশ্বাস। এবং এই যাদু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্যহীন অন্ধ সংস্কার মনে করাও ভুল হবে। কেননা, যতদিন পর্যন্ত মানুষের উৎপাদন কৌশল অনুন্নত, ততোদিন কাজের জন্যই যাদু বিশ্বাসের অত প্রয়োজন। এই জন্যই প্রাচীন যুগে গান-নাচ ও অন্ন-আহরণ সত্যিই আলাদা হয়নি। জীবিকার প্রয়োজনে ও নিজ কামনার অনুরূপে মানুষ শুধু ছবিতে নয়, মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে নাচে গানে নানা অনুকৃতিমূলক কাজে জীবজন্তু, বৃক্ষলতা পাতা থেকে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে নিজেদের কবলে আনতে চেষ্টা করেছে। আদিম 'টোটেম' (Totem) বিশ্বাসের মধ্যে শুধু এই সূত্রটি ধরা যায়। এটা শুধু ভারতেই দেখা যায় না। নয়, ভারতের প্রতিবেশী সিংহলের (শ্রীলঙ্কা) 'বন্নম্' নাচে পশুপক্ষী প্রভৃতির অনুকৃতি চমৎকার ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

এই 'টোটেম' বিশ্বাস কি ? প্রাচীন প্রস্তর যুগের 'নিষাদ জীবনের' বিশিষ্ট সামাজিক গড়ন দেখা যায় এই 'টোটেম'-এ। সেই যুগের এক-একটি আদিম উপজাতির (ট্রাইবের) অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুল (ক্ল্যান) উদ্ভূত হয়। অনেক সময়েই দেখা যায়—এ রকম একটি কুল কোনো জীবজন্তুকে কিংবা বৃক্ষলতাকে নিজেদের আদি-পুরুষ বা আদি মাতা বলে জানে, হয়তো সেই কুলের জীবন-যাত্রায় খাদ্য বা সম্পদ হিসেবে প্রথমতঃ ঐ প্রাণীটি ছিল বিশেষ উপযোগী। অবশ্য তারপর থেকে সেই টোটেম পিতা বা টোটেম-মাতা হয়ে যায় পবিত্রতম

1. Studies in Ancient Greek Society—George Thomson. Page 451.

বস্তু, আর তাই টোটেমেরও তা অভক্ষ্য (Taboo)। তার নামেই সেই কুলের পরিচয়। আর কুলস্থ সকলে তার সন্তান-সন্ততি বলে জাত-ভাই, তাঁদের পরস্পরের তাই বিবাহ চলে না। 'তাবু' (Taboo) সেই বিশেষ আদিম বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, ওটা সর্বত্র পালনীয়। শুধু তাই নয়, আসল পিতা ও কুলস্থ পিতৃপর্যায়ের সকলেই তখন হয় পিতা, মাতৃপর্যায়ের সকলেই মাতা। প্রথম দিকে শিকারের প্রয়োজনে কুলবৃদ্ধই তার অভিজ্ঞতার জন্য এই টোটেম-এর নেতা বা কুলপতি নির্বাচিত হতো, এ সব অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের নিয়ে টোটেম পঞ্চায়েত বসতো। জন্মসূত্রেই প্রত্যেকে নিজেকে টোটেমের লোক বলে জানতো, শুধু যৌবনাগমে তাঁদের আবার টোটেমের নিজস্ব প্রণালীতে দীক্ষা না হলে তাঁরা পুরোপুরি টোটেমে গৃহীত হতো না। এই সমাজ পদ্ধতিকেই বলে—টোটেমিক সমাজ। এই সমাজের স্মৃতি আজও আমাদের মধ্যে লোপ পায়নি। হিন্দুদের 'গোত্র'—(গোত্র ও গোষ্ঠ, গো-ধন সম্পর্কিত) এক একটি সমাজ সম্পর্কের পরিচায়ক। টোটেমের জীব পিতাদের কথা বলতে হনুমান-জাম্ববানদের কথা মনে পড়ে আর বিবাহ বা দীক্ষার কথা বলতে, উপনয়ন ও বিবাহের নানা আচার নিয়মের কথা মনে পড়ে। এখনো মালয়ে, মধ্য-আফ্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়, মেরু প্রদেশের অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে, এমন কি আন্দামানেও এই স্তরের মানব-গোষ্ঠী বেঁচে আছে, একথা আমাদের মনে রাখা দরকার। এই যুগের প্রস্তরের অস্ত্র শুধুমাত্র ইউরোপ-আফ্রিকায়-এশিয়ায় নয়, দক্ষিণ ভারতে ও পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায়ও পাওয়া গেছে।

যাই হোক, এই সমাজ গড়ন থেকে আমরা নিশ্চয়ই নিষাদ জীবনের মানসিক চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিচয় পাই। পবিত্র-অপবিত্র, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতিতে ধর্ম নীতির ধারণা দেখতে পাই। এছাড়াও সেই যুগের মানুষের মন বুঝবার মতো আরও চিহ্ন আছে। উত্তর স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে যে সব চিহ্ন আছে (আলতামিরা গুহা ও কোঁ দ্য গ্যোম এ) তাতে দেখা যায়, গুহা গাত্রে ও অন্যত্র তাঁদের আশ্চর্য চিত্র-নৈপুণ্য। হাতিয়ার সুন্দর করে গড়তে দেখে বুঝতে পারা যায় যে, প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের মনে জাগছে প্রথম সৌন্দর্যবোধ। এর পেছনে সে যুগের যাদুর তাগিদও ছিল—শিকারের প্রাণী ও মাতৃকামূর্তির ('ভেনাস'-এর মূল) এ জন্যই প্রাচুর্য বেশী। চিত্রিত মৃগয়ার দৃশ্যের যাদুশক্তি আছে, সেই চিত্রিত যাদুর সাহায্যে

দুর্লভ শিকারের পশুকে ঐ রূপ আয়ত্ব করা যায়। মাতৃকা মূর্তি সুফলা ধরণীরই উদ্বোধক। শিকারের উপর জীবন নির্ভর করতো বলেই, শিকারের পশুর ধ্যানেই তাই তখনকার শিল্পীও মগ্ন।

তাছাড়া আজও আমরা দেখতে পাই আচার-অনুষ্ঠানের (rituals) সূত্র ধরে কোন ছবি, কোন গান, কোন মূর্তি আমাদের চোখের সামনে সেই সব যুগের মানস-ইতিহাসের পাতা যেন একের পর এক উদ্ঘাটিত করে দিয়ে বিস্ময় জাগায়। নিজেদের শিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতি সংস্কৃতি সম্পদের বিচারে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাসকে অনেক সময় আমরা বড় মনে করিনা বটে, কিন্তু যখন এই সব প্রাচীন বা ট্রাইবাল সমাজের গান-নাচ-ছবির পরিচয় নিই, তখন আমরা বুঝতে পারি, সেই সব মানস-সম্পদ তাঁদের জীবন-যাত্রা ও জীবিকা প্রণালীর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পশুপালকের গান নাচ বা কৃষিজীবীর গান-নাচ তাঁর পশুপালন বা তাঁর কৃষিকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা এ ভাবে জীবিকা-প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবে রচিত হয়েছে, ঐ সব মানস-প্রয়াসে তখনকার জীবিকা প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সমৃদ্ধ হওয়াটা কিন্তু জীবন-বিচ্ছিন্ন শিল্পকলা চর্চা নয়, জীবনের দায়ে জীবিকা চর্চার সজীব উপকরণ স্বরূপ ট্রাইবাল সমাজের আচার অনুষ্ঠানগুলি এখনো সভ্য জগতের পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়—একথা পূর্বেই একবার প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে। এবার এই জীবিকা প্রয়াসের মূলে যে প্রেরণা কাজ করছে, সেই প্রেরণা স্বরূপ 'যাদু-বিশ্বাস' প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে। কারণ আদিম যুগের যে কোন শিল্পকলার উদ্ভবে এই যাদু বিশ্বাসের অবদান কম নয়।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের 'ধর্মবোধ' বা 'মতাদর্শ'-এর এক বিশেষ পরিচয় পাই এই যাদু বা ম্যাজিক-এ। অজ্ঞতা, ভয়, আর বিস্ময় থেকে আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে স্বভাবতই নিজের ভাগ্য বিধাতা, ভূত বা দেবতা বলে সন্তুষ্ট করতে চাইতো। এখনো অসভ্য জাতির মধ্যে তাই 'ধর্ম'। এই সন্তুষ্ট করার একটা প্রাচীন কৌশল যাদু বা মন্ত্রতন্ত্র। জীবিকার প্রয়োজনে ও নিজ কামনার অনুরূপে মানুষ শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে নাচে-গানে, নানা অনুকৃতি মূলক কাজে জীবজন্তু, বৃক্ষলতা পাতা থেকে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে নিজেদের কবলে আনতে চাইতো। যে ফল-লাভ তাঁদের অভীষ্ট, সেই ফল-লাভ যেন ঐ

অনুকৃতি-মূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত্ব হয়, লক্ষ্য ও পদ্ধতি যেন অভিন্ন। যাদুর নিয়ম নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়ে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির উদ্বোধন ও অনুশীলন হতো, তাতে মানুষ সত্যিই মৃগয়ায় বা জীবিকা যুদ্ধে এভাবে ক্ষিপ্রতর, কুশলতর এবং বিচক্ষণ শিকারী হয়ে উঠতো। জীবিকা চর্চা হিসেবে নাচ-গান, চিত্র-নাট্য, নানা রীতি-নীতি এ ভাবে গড়ে উঠতে থাকে যাদু বা ম্যাজিককে আশ্রয় করে।

॥ আচার অনুষ্ঠানের যাদু বিশ্বাসমূলক ভিত্তি ॥

শিল্পের উৎপত্তি ও শিল্পসৃষ্টি প্রসঙ্গে (বিশেষ করে আদিম যুগের) যাদু বিশ্বাসের প্রভাব ও প্রেরণা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত বস্তুবাদী কলা সমালোচক ERNST FISCHER বলেছেন[১]—

"We may conclude from a constantly growing wealth of evidence that art in its origins was magic, a magic aid towards mastering a real but unexplored world. Religion, science and art were combined in a latent form—germinally as it were—in magic."

ধর্ম, বিজ্ঞান, ও শিল্প যে ঐ যাদুর মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় ছিল, একথা বলার পর তিনি আবার বলেছেন—

"In all the forms of its development, in dignity and fun, persuasion and exaggeration, sense and nonsense, fantasy and reality, art always has a little to do with magic."

এর পর শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়েও যাদুর কথা বলেছেন—

"Art is necessary in order that man should be able to recognize and change the world. But art is also necessary by virtue of the magic inherent in it."

তারপর বলেছেন—

"Man also dreams of working magic upon nature, of

১। The Necessity of Art—Ernst Fischer (Pelican, original 1964 Pages—13-17.

being able to change objects and give them new form by magic means. This is the equivalent in the imagination of what work means in reality. Man is, from the outset, a magician."

এরপর তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন—

"A new power over nature has been gained, and this power is potentially unlimited. In this discovery lies one of the roots of magic and, therefore, of art."

সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যগুলি এবার ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক। আর্ণষ্ট ফিসারের মন্তব্যের পশ্চাতে পৃথিবী-বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিকদের প্রভাব সুস্পষ্ট। মানুষ যে কেন আচার-অনুষ্ঠান করে, কেন যে তার পুরাতন সামাজিক প্রথাগুলি আঁকড়ে ধরে থাকে, তার উত্তর দেবার চেষ্টা করাটা নাকি একটা নিছক পণ্ডশ্রম একথা বলেছিলেন ডঃ রিভার্স। ফ্রয়েড বলেন—আচার-অনুষ্ঠান বলতে আমরা যা বুঝি, তার পিছনে থাকে একটা বাধ্যতাবোধ, একটা ভিতরের চাহিদা বা তাগিদ। সুসান ল্যাঙ্গারের অভিমত—আচার-অনুষ্ঠান হচ্ছে মানুষের অভিজ্ঞতার এমন একটি প্রতীকী রূপান্তর যা অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত এবং অপরিকল্পিত, যেমন করে পাখী বাসা বাঁধে, কাঠবেড়ালী খাদ্য সংগ্রহ করে, বিড়াল মুখ মোছে। এ যেন অনেকটা সহজ আত্মজ্ঞা বা Intuition। স্যার ফ্রেজার অনেকটা স্পষ্ট করে বলেছেন, যাতে আচার-অনুষ্ঠানের পিছনের মূল উদ্দেশ্য ও কার্যকারণ বুঝতে সুবিধা হয়। তিনি বলেন, এগুলির উৎস হচ্ছে যাদু বিশ্বাস বা ম্যাজিক। পরবর্তীকালে আর্ণেষ্ট ফিসার, ফ্রেজারের বক্তব্যই জোরদার করে সমর্থন করেছেন। যে যাদুকে নিয়ে এত কথা বলা হয়ে থাকে তার মূল ব্যাপারটা কি এবার দেখা যাক।

যাদু বিশ্বাস কি ?

স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সাদৃশ্য ও সংস্পর্শমূলক ধারণাসমূহের সমন্বয়ের নীতিগুলির আদিম প্রয়োগ পদ্ধতির নাম 'ম্যাজিক'। আরও সহজ ভাষায় বলতে গেলে ম্যাজিকের ভিত্তি হচ্ছে সাদৃশ্য জ্ঞান। উদাহরণ না দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না বৈশাখ মাসে তুলসী গাছের মাথায় ঝাঁড়ি দেবার একটি

রীতি বা প্রথার সঙ্গে হয়তো অনেকেরই পরিচয় আছে। একটি মাটির পাত্র ফুটো করে তাতে জল দিয়ে তুলসী গাছের মাথায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ফুটো দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গাছের উপর পড়ে। বুঝতে কোন অসুবিধা হয়না যে, এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি বৃষ্টির কামনায় করা হয়। এই পদ্ধতিটির মূলে যে বিশ্বাসটি নিহিত আছে সেটিকে বলা হয় ম্যাজিক বা যাদুবিশ্বাস। এখানে বৃষ্টির ধারার সঙ্গে পাত্রের ফুটো দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলের পতনের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপরোক্ত পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক জর্জ টমসনের ভাষায়—

"Primitive magic is founded on the notion that, by creating the illusion that you control reality, you can actually control it. It is an illusory technique complementary to the deficiencies of the real technique."[1]

অনুকরণমূলক ও সংস্পর্শমূলক যাদু বিশ্বাস ঃ

উদাহরণ দিলে এই দুটি দিক ভাল করে বোঝানো যাবে। কেউ কেউ হয়তো 'বাণ মারা' নামক বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত আছেন। পল্লী গ্রামে এখনো এই জিনিসটির প্রচলন আছে। শত্রুর ক্ষতি করার জন্য বাণ মারা নামক পদ্ধতিটির উদ্ভব। ধরা যাক আমার একজন শত্রু আছে যাকে আমার মারা প্রয়োজন। আমি তার একটি ছবি আঁকলাম, কতগুলি দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে একটি ভোঁতা ছুরি দিয়ে ছবিটির পেট ফুটো করে দিলাম। এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, যে ঘটনাটির অনুকরণ আমি করলাম প্রকৃতিতেও তা সংঘটিত হবেই। অর্থাৎ আমার শত্রু নিহত হবেই। এ ক্ষেত্রে হত্যার অনুকরণ করা হল। এই ক্রিয়াটির মধ্যে যে বিশ্বাসটি নিহিত রয়েছে তার নাম অনুকরণ-মূলক যাদু বিশ্বাস। কুশপুত্তলিকা দাহ করার বিষয়টিই ধরা যাক। সেখানেও এই একই বিশ্বাস। নকলটা পুড়লে আসলটাও পুড়বে—এই বিশ্বাস।

আরেক প্রকার যাদু আছে যা সংস্পর্শমূলক ইংরেজীতে যাকে বলে 'কণ্টাজিয়াস ম্যাজিক'। ধরা যাক আমার একজন শত্রু আছে, তাকে মারা দরকার। তার পরিধেয় বসনের একটি টুকরো, অথবা তার মাথার দুগাছি চুল

1. Aeschylus and Athens—George Thomson, P.13, (London-Lawrence)

সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলে, এই বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করা হলো যে, অংশকে যখন ক্ষতিগ্রস্ত করা গেছে তখন সমগ্রটিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদিম মানুষের এই বিশ্বাসগুলি এখনো আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। আদিম সমাজে নৃত্যের ব্যাপারে এই যাদু বিশ্বাস কতখানি প্রভাবিত করেছে, এবার কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করবো।

এই প্রসঙ্গে ডঃ নরেন ভট্টাচার্য বলেন[১]

"...the desired objects are attained by ceremonies which are believed to influence the course of nature, 'when a savage wants sun or wind or rain', writes Jame Harrison, 'he does not go to the church and prostrate himself before a false god; he summons his own tribe and dances a sun-dance or a wind dance or a rain-dance. When he would hunt or catch a bear, he does not pray to his god for strength to outwit or out-match the bear; he rehearses his hunt in a bear-dance.'"[2]

অর্থাৎ জেম হ্যারিসন বলতে চাইছেন, যখন কোন আদিম মানুষ রৌদ্র বা বাতাস বা বৃষ্টি চায়, সে কোন গীর্জায় গিয়ে কোন অলীক দেবতার সামনে মাথা নত করে না। সে নিজের দলের লোকদের ডাক দিয়ে রৌদ্রের নাচ বা বাতাসের নাচ বা বৃষ্টির নাচ নাচে (অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গী সহযোগে এই ব্যাপার গুলির অনুকরণ করে)। যখন সে ভল্লুক শিকার বা ভল্লুক ধরার চেষ্টা করে, সে তার দেবতার কাছে সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেনা, তারা ভল্লুক নাচ নেচে শিকারের একটা মহড়া দিয়ে নেয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কিথের একটি বক্তব্যও উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

"Thus at the Mahavrata maidens dance round the fire as a spell to bring down rain for the crops, and to secure the property of the herds, ..."[৩]

১. Indian Puberty Rites...Dr. N. N. Bhattacharyya (Cal. 1968)-P-3-4
২. Ancient Art and Rituals.. Jame E. Harrison (Cambridge 1913) P-30.
3. The Sanskrit Drama—Keith (Oxford 1924) P-26.

অর্থাৎ মহাব্রত-উৎসবে পুরনারীরা যজ্ঞাগ্নির চারদিকে নৃত্য করতেন শস্যোৎপাদন ও বৃষ্টি আনয়নের জন্য। যাই হোক, আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। ডঃ নরেন ভট্টাচার্য আরও বলেছেন—

"Reffering to the rituals of the Potato-dance of the Maori, Thomson says : (It is not possible that the potatoes will be directly influenced by this dance, but it must influenced the dancers themselves. At least they believe that their dance has something to do with the growth of the plants,) and when they tend them with this belief, their self-reliance and capacity certainly increase and this must have some indirect bearing on the growth of the plants, and when they tend them with this belief, their self reliance and capacity certainly increase and this must have some indirect bearing on the growth of vegetation."[1] One thing must be clearly stated that in this connection ; when the mode of production was in the elementary stage, it was impossible to do a work without collective endevour and collective impetus, and that impetus could only be derived from ritual. A. N. Tagore to whom we can indebted for a first hand account of the female dominated rituals of Bengal, expressly states that a ritual is not the affair of an individual it must be a collective enterprise. The same is also the conclusion of J. E. Harrison who says : "One element in the rite we have already observed, and that is that it must be done collectively, by a number of persons feeding the same emotion. A meal digested alone is certainly no rite ; a meal eaten in common render the

1. Studies in Ancient Greek Society—G. Thomson (London- 1949, Page 440.

influence of a common emotion, may, and often does, tend to become a rite."[2]

ডঃ ভট্টাচার্যের উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও টমসন, হ্যারিসন ও অবণীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে তিনি বুঝাবার চেষ্টা করেছেন—আদিম সমাজের (প্রাক্ বিভক্ত সমাজে) সামষ্টিক চেতনায় ব্যক্তি চেতনা আবর্তিত হয়েছে এবং অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাস মানুষের নিজের শক্তিতে চলতে প্রেরণা দিয়েছে। এই অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কিভাবে গান-নাচ-কাজ আদিম সমাজে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত ছিল তা আলোচনা করলেই উক্ত টমসন, হ্যারিসন ও অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য বোঝা যাবে। এবং আরও বোঝা যাবে যে, আদিতে তা খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল।

আলোচ্য পদ্ধতি বা যাদু বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্ম বা বিজ্ঞানের সম্পর্ক নেই। বৃষ্টির প্রয়োজন হলে বৈজ্ঞানিক ভাববেন বৃষ্টির কারণ কি? এবং সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হবার পর তিনি তদনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে বৃষ্টি আনবার চেষ্টা করবেন। আবার যিনি ধর্ম পথের পথিক তিনি আজো দেবতার দুয়ারে মাথা ঠুকে বলবেন' 'হে ঠাকুর বৃষ্টি দাও'। কিন্তু যাদুতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কিছুই করবেন না। একটি ভাঁড় ফুটো করে তাতে জল ভরে গাছের মাথায় টাঙিয়ে দেবেন অথবা ব্যাঙের বিবাহ দেবেন, অথবা নিরাবরণ দেহে মাঠে লাঙ্গল দেবেন। ম্যাজিকে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির স্থান নেই। অর্থাৎ এই ম্যাজিক বা যাদু বিশ্বাস এমন একটি যুগের বা এমন একটি চেতনার ইঙ্গিত দিচ্ছে যেখানে এবং যখন ধর্মীয় বা বৈজ্ঞানিক কোন রকম চেতনারই উদ্ভব হয়নি। অবশ্য বাস্তবে ব্যাঙের বিয়ে দিলেই বৃষ্টি হয় না। শিকারের নাচ নাচলেই শিকার জোটে না। এ ভাবে যাদু বিশ্বাসমূলক অনুষ্ঠানগুলির বিফলতা থেকেই মানুষের চিন্তা দুটি নির্দিষ্ট পথ আশ্রয় করলো। একদল বললো যে, সব কিছুর উপরে এক বা একাধিক আলৌকিক শক্তি ক্রিয়া করছে, সেই শক্তিকে প্রার্থনা ও ভক্তির দ্বারা তুষ্ট করতে পারলে কামনা পূরণ হবে। এই ভাবে জন্মালো ধর্ম, যেখানে মানুষের সর্বপ্রকার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দৈবের ইচ্ছায়—এই রকম বিশ্বাস করা হয়। আরেক দল প্রকৃতির নিয়মকানুন অধিকতর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলো, তাঁরাই হলেন আমাদের বৈজ্ঞানিকদের পূর্বপুরুষ।

2. Ancient Art and Ritual—J. E. Harrison (Cambridge 1913) Page 37.

মেয়েলি ব্রতগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে একটি জিনিস সর্বপ্রথম চোখে পড়ে যে, সেখানে ঈশ্বর, দেবতা বা প্রচলিভ ধর্ম-বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন ব্যাপার নেই। সেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য কামনাপূরণ, ধনবল, জনবল বাড়ুক, সন্তান-সন্ততি হোক, ধানের মরাই পূর্ণ থাক, সিঁথির সিঁদূর অক্ষয় থাক ইত্যাদি। আসলে ব্রতগুলি যাদু বিশ্বাসের ফলশ্রুতি। পূর্ণিপুকুর ব্রতটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, এই ব্রত পালন করবার সময় মেয়েরা ছোট্ট একটি পুকুর খুঁড়ে সেটিতে জল দিয়ে পূর্ণ করে। পুকুরটির মতোই যেন আমি ধন-জন-সন্তান-সন্ততিতে পূর্ণ হয়ে উঠি—ভাবটা যেন এই। একটি অতি সরল, স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাসের উদাহরণ। এই যাদু বিশ্বাস সম্বন্ধে ফ্রেজার বলেছেন, ধর্মের সঙ্গে যাদু বিশ্বাসের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি উভয়েরই পার্থক্য আছে। যাদু বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে জয় করা, তাকে বশ করা, সেখানে ধর্মের উদ্দেশ্য হল দেবতাকে সন্তুষ্ট করে তার কাছে কৃপা ভিক্ষা করা। দুটো নিশ্চয়ই এক জিনিষ নয়। যাদু বিশ্বাসের ভিত্তি হল সাদৃশ্যজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণাসমূহের সাযুজ্য, ইংরেজীতে যাকে বলে 'এ্যাসোশিয়েশন অফ আইডিয়াস' সেখানে ধর্মের ভিত্তি হল প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা—অধিষ্ঠাত্রী চৈতন্য এবং ব্যক্তি—ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দেবদেবী। যাদু বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ধর্মের থেকে প্রাচীন। যে সব জাতি আজও পর্যন্ত সভ্যতার নিম্নতম স্তরে পড়ে আছে, তাঁদের মধ্যে ধর্ম নেই, আছে যাদু বিশ্বাস। এই ম্যাজিক বিশ্বাস আজও পৃথিবীর সকল ধর্মের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে টিকে আছে। এই ম্যাজিক হচ্ছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রাক্-অবস্থা। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কার্যতঃ ম্যাজিক হচ্ছে 'জাল বিজ্ঞান এবং নিস্ফল কলা।'

মাওরিদের আলু নাচ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে জর্জ টমসন বলেছেন,—এটা সম্ভব নয় যে আলুগুলি তাঁদের নাচের দ্বারা প্রভাবিত হবে, কিন্তু যাঁরা এই নাচ নাচছে তাঁরা নিজেরাতো প্রভাবিত হতে পারে। অন্ততঃ তাঁরা বিশ্বাস করে যে তাঁদের নাচের সঙ্গে আলু চারাগুলির বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে এবং যখন তাঁরা এই বিশ্বাস নিয়ে চারাগুলির পরিচর্যা করে, তখন তাঁদের আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পায়, কাজেই কৃষির ক্ষেত্রে এই নৃত্যানুষ্ঠানের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে এটাকে অস্বীকার করা যায় না।[১]

"The Maoris have a potato dance. The young crop is

liable to be blasted by east winds, so the girls go into the fields and dance, simulating with their bodies the rush of wind and rain and the sprouting and blossoming of the crop; and as they dance they sing, calling on the crop to follow their example. (The potato in question is the Spanish potato), They enact in fantacy the fulfilment of the desired reality. That is magic, an illusory technique supplementary to the real technique. But through illusiory it is not futile. The dance cannot have any direct effect on the potatoes, but it can and does have an appreciable effect on the girls themselves. Inspired by the dance in the belief that it will save the crop, they proceed to the task of tending it with greater confidence and so with greater energy than before. And so it does have an effect on the crop after all. It changess their subjective attitude to reality and so indirectly it change relity."

(The Maoris are Polynesians—So are the islanders of the New Hebrides.)[1]

(সিংহলের যাদু বিশ্বাসমূলক নাচ "কোহান্ধ৷ কংকোরিয়া" এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।)

উৎপাদনের উপকরণ আদিম ও পশ্চাদপদ সমাজে নগণ্য, কাজেই সমবেত যাদু অনুষ্ঠানের এই যে প্রেরণা এটাই বোধ হয় আদিম জীবনের উৎপাদন ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আমরা পরে দেখাবো যে নৃত্য-গীত ইত্যাদি আদিম সমাজে শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের বিষয় নয়, এইগুলির সঙ্গে কর্মের যোগ অঙ্গাঙ্গী। আজকের যুগেও এই জিনিসটি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। কোন শ্রমসাধ্য কাজে আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ করলেই দেখা যায় সেখানে

1. George Thomson—Studies in Ancient Greek Society. P. 440.
(1st publishea in 1949—The Camelot Press Ltd. London and Southampton) Lawrence and Wishhap, London 1949.

গান ও কাজ একই সঙ্গে হচ্ছে। ছাদ পেটানোর সময় বা টিউবওয়েল পোঁতার সময় এই বিষয়টা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ম্যাজিক বা যাদু বিশ্বাস প্রাক্-বিভক্ত সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিফলন। এভাবে ভারতীয় আচার অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সবগুলিই বিশেষ বিশেষ যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই সম্পর্কিত ছিল। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই উৎপাদন খাদ্য উৎপাদন ছাড়া আর কিছু নয়।

সে যাই হোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব হিসেবে দেবতাদের কল্পনা এমন একটা যুগে সৃষ্টি হয়েছে, যে যুগে সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এসেছে—উচ্চ নীচের ফারাকটা অধিকতর হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় সভ্যতার নিম্নতম পর্যায়ে আটকে থাকা মানুষদের মধ্যে যাদু বিশ্বাসের প্রাবল্য দেখে এটাই অনুমান করা সম্ভব যে, যাদু বিশ্বাসের উদ্ভব এমন সময়ে হয়েছে যখন গোটা সমাজটাই ছিল একটা অখণ্ড সত্তা, সেখানে উচ্চ-নীচের তেমন কোন ফারাক ছিল না। জেন হ্যারিসন দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন যাদু পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ ঘটতো সামষ্টিকভাবে। আদিম সমাজের চেতনা তাই জমাট সামষ্টিক চেতনা (Collective Consciousness) গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি ব্যক্তির মন যেন একক, একটি গোষ্ঠী মনেরই অংশ, তার স্বাধীন কোন সত্ত্বা নেই। আহার অন্বেষণাদি যত আচরণ আছে সবই সমষ্টিগত ভাবেই সম্পন্ন করেছে। অতএব নৃতাত্ত্বিকদের মতে প্রাচীনকালে শিল্পের জন্ম কোন ব্যক্তি-মনের আত্মসমাহিত ধ্যান-কল্পনা থেকে হয়নি, শিল্প জন্মেছে গোষ্ঠী-মনের সামষ্টিক আবেগ প্রকাশ করার যৌথ চেষ্টা থেকে। এই পক্ষের মূল বক্তব্য হল, আদিম মানুষ দলবদ্ধভাবে আহরণ ও শিকার করেছে, দলবদ্ধভাবে অতি-প্রাকৃত শক্তিকে, দেবদেবীকে, ভূত প্রেতদের তুষ্ট করবার জন্য অনুষ্ঠান করেছে, যৌথভাবে আনন্দ উপভোগ করেছে এবং দুঃখ দুর্ভোগের বেদনা ভোগ করেছে যেন ভিন্ন ভিন্ন দেহের ভিতর দিয়ে একটি মনই কাজ করে গেছে।

খ্রীষ্টোফার কডওয়েল বলেন :

"The world of art is the world of social emotion···of words and images which have gathered as a result of the life experiences of all emotional association common to all,

and its increasing complexity reflects the increasing elaboration of social life."[1]

(অর্থাৎ শিল্পের জগৎ, সামাজিক আবেগের জগৎ-সমাজের সকলের অভিজ্ঞতা-প্রসূত আবেগ প্রকাশক ভাষার ও রূপের জগৎ। শিল্পের ক্রমর্ধমান জটিলতা, সামাজিক জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতারই প্রতিফলন।)

"Thus the developing complex of society, in its struggle with the environment, secretes poetry as it secretes the technique of harvest, as part of its non-idealogidal and specifically human adaption to existence. The tool adapts the hand to a new function, without changing the inherited shape of the hands of humanity. The poem adapts the heart to a new purpose without changing the eternal desires of men's hearts."[2]

(পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে ক্রমবর্ধমান সমাজ একদিকে যেমন নতুন নতুন উৎপাদন রীতির উদ্ভাবন করে, অন্যদিকে তেমনি জীবন যাপনের সঙ্গে অজৈবিক বা মানবিক প্রবৃত্তির অভিযোজন করবার চেষ্টা করে শিল্প সৃষ্টি করে। হাতিয়ার মানুষের হাতের গঠনে কোন পরিবর্তন না ঘটিয়েও হাতকে যেমন নতুন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে, তেমনি শিল্পেও মানুষের বাসনা বা আবেগগুলির কোন পরিবর্তন না এনেও হৃদয়াবেগকে নতুন নতুন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে।)

নৃতাত্ত্বিক E. O. James একটি বড় চমৎকার কথা বলেছেন :

"To eat is to live. Therefore, the main link between man and his environment was food."[3]

কাজেই খাদ্যসংস্থানের জন্য মানুষের যা কিছু প্রচেষ্টা, ওই উদ্দেশ্যে তার নির্মিত ও ব্যবহৃত সমুদয় উপকরণই তার "Material Culture" বা বাস্তব-

1. Christopher Caudwell—Illusion and Reality. P. 27. (People's, publishing house Ltd. Delhi—1956 (Reprinted)

2. Ibid—Page 28.

3. E. O. James—Prehistoric Religion. Page 173-74. (New York—1957.)

সংস্কৃতি। প্রত্নতত্ত্বে Culture বা সংস্কৃতি শব্দটি একটি নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। গর্ডন চাইল্ডের ভাষায় :—

"'A culture is the durable material expression of an adaption to an environment, human as well as physiographical, that enables a society to survive and develop. From this point of view the building, tools, weapons, ornaments, and other surviving constituents are interrelated as elements in a functioning whole."[1]

এছাড়া এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়। প্রাচীন যুগে, অর্থাৎ প্রাক্-বিভক্ত সমাজে, পূর্বোক্ত বাস্তব জীবনোপকরণগুলি ছাড়াও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত আরও বিভিন্ন বিষয় যেমন নাচ-গান এবং অপরাপর যাদু বিশ্বাসমূলক আচার অনুষ্ঠান, এমন কি আদিম চিত্রকলা, ধর্ম ও দর্শন, কথা ও কাহিনী, সব কিছুই খাদ্য উৎপাদনের বা সংগ্রহ পদ্ধতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল। ওগুলি আজকের দিনের মতো শুধু অবসর বিনোদনের বিষয় ছিল না।

প্রধানতম খাদ্য-সংস্থান পদ্ধতির ভিত্তিতে আজকের যুগে টিকে থাকা ট্রাইবদের শ্রেণী বিভাগ করে উপরিউক্ত বাস্তব সংস্কৃতির বা Material culture-এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব এবং তার ফলাফল সমূহকে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার।

আধুনিক নৃতত্ত্বের বহুল তথ্য পর্যালোচনা করে অধ্যাপক জর্জ টমসন্ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যাকে মানব-সংস্কৃতির আদি পর্যায় সংক্রান্ত এক সাধারণ সত্য বলা যায়।

"The three arts of dancing, music and poetry began as one. Their source was the rhythmical movement of the human bodies engaged in collective labour. (একথা আগে একবার প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে)

1. Gordon Childe—Social Evolution. Page 16 (London—1951)

এবং এর পরেই জর্জ টমসন বলেছেন—"This movement had two components, corporal and oral. The first was the germ of dancing, the second of language. Starting from inarticulate cries marking the rhythm, language was differentiated into poetical speech and common speech. Discarded by the voice and reproduced by percussion with the tools, the inarticulate cries became the nucleus of instrumental music.

The first step towards poetry properly so called was the elimination of the dance. This gives us song. In song, the poetry is the content of the music, the music is the form of the poetry. Then these two diverged. The form of poetry unaccompainied by music, is its rhythmical structure, which it has inherited from song but simplified so as to develop its logical content. Poetry tells a story, which has an internal coherence of its own, independent of it rhythmical form. And so later there emerged out of narrative poetry the prose romance and novel, in which poetical speech has been replaced by common speech and the rhythmical integument has been shed—except that the story itself is cast in a balanced, harmonious form."[1]

অর্থাৎ নাচ-গান-কবিতা এই তিন রকম চারু শিল্পই শুরুতে এক ছিল। এগুলির উৎসে ছিল যৌথ শ্রমে নিযুক্ত মানব-দেহের ছন্দ-যুক্ত ক্রিয়া।

নাচের সঙ্গে গানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে সমাজ বিকাশের অনেক পরের পর্যায়ে। আরও পরের পর্যায়ে গানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সুর—তখন থেকেই আজকালকার অর্থে কবিতার জন্ম। এবং এই পরিবর্তনের মূল কারণ হিসাবে জর্জ টমসন বলেছেন—

"...when owing to economic changes the structure of the

1. Studies in Ancient Greek Society—George Thomson, Page 451.

tribe disintrigrates the idea that men and animals are kin decays, and the mimetic rite, with its wild cries, abandoned gestures and ecstatic rhythm, dissolves into a multiplicity of colleteral activities, out of which emerge the arts of poetry, music, and the Dance."[1]

সমাজ বিকাশের পুরোনা পর্যায়ে নাচ গান প্রভৃতি খাদ্য-আহরণ বা খাদ্য-উৎপাদনমূলক কৌশলেরই অঙ্গ ছিল। নৃতাত্ত্বিকরা লক্ষ্য করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার শুম্বা মেয়েরা তাঁদের নাচ শেষ হবার আগে, এমনকি কোদালগুলি পর্যন্ত স্পর্শ করবে না। মিসেস ব্রায়ন স্কট বলেছেন, উত্তর বোর্ণিওতে ডাইকদের মধ্যে কৃষিকাজকে একঘেঁয়ে একটানা শ্রমের ব্যাপার মনে করলে ভুল করা হবে। কেননা তার ফাঁকে ফাঁকে নানান উৎসবের অবকাশ থাকে। আমেরিকার চেইন্নে ইণ্ডিয়ানদের বেলাতেও দেখা যায় কৃষিকার্যের একটি অনিবার্য অঙ্গ হল মেয়েদের 'ফসল নাচ'। যুবতীর দল গোল হয়ে নাচ শুরু করে, পুরুষেরা ধরে গান, যে মেয়েটি নাচের প্রধান অংশ গ্রহণ করে তাঁর হাতের লাঠির ডগায় শস্যের গুচ্ছ বা বাঞ্ছিত ফসল বাঁধা থাকে। অন্ন আহরণের সঙ্গে এসব নাচের নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে।

পশু পালনের সঙ্গে তুলনা তরে কৃষি আবিষ্কার প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টমসন বলেছেন : "So long as they have pasture, cattle feed and breed of themselves, but by comparison with cattle raising the work of tilling, sowing and reaping is slow, ardous and uncertain. It requires patience, foresight, faith. Accordingly, agricultural society is characterised by the extensive development of Magic."[2]

(অর্থাৎ চরবার জমি যখন আছে ততক্ষণ পালিত পশুর দল নিজেরাই চরে খাবে এবং সংখ্যায় বাড়বে। কিন্তু পশুপালনের তুলনায় জমি কোপানো, বীজ বোনা আর ফসল কাটার কাজ অনেক মন্থর, কঠিন অনিশ্চিত। অতএব

1. G. Thomson—Aeschylus and Athens. Page 18. (London and Wishhart—Reprinted 2nd edition—1946.)

2. Aeschylus and Athens—George Thomson—(London···Page—21, 22).

তার জন্য দরকার ধৈর্য্য, দূরদৃষ্টি ও বিশ্বাস। কৃষিভিত্তিক সমাজে তাই যাদু বিশ্বাসের অনেক ব্যাপক বিকাশ। শস্যের কামনায় শস্পাতার ব্রতে একটি অঙ্গ হল নাচ—মেয়েদের নাচ। অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনায়— "সমস্ত রাত দুই দলের নাচ-গান ছড়া কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিকিমিকি।" গণেশ চতুর্থী ব্রতেও এই নাচ, মেয়েদের নাচ বাদ যায় না। ভাদ্র সপ্তমীর দিনটিতে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ী বাড়ী ঘোরে, তার পর পাড়ায় মেয়েরা সকলে মিলে রাত ভোর নাচ আর গান করে। যথাস্থানে অবনীন্দ্রনাথের 'ব্রতপ্রসঙ্গ' নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রাচীন সমাজে গান, কাজ ও নাচের প্রসঙ্গ ঃ

আমাদের আধুনিক কালের ধারণার সঙ্গে হয়তো এই কথাগুলির সঙ্গতি নেই। আদিম সাম্যসমাজ ভেঙ্গে যাবার পরও মানুষের চিন্তায়, কাজের সঙ্গে গান ও নাচের যোগাযোগটির রেশ বহুদিন ধরেই থেকে গিয়েছে। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে সুবিধে হবে অধ্যাপক জর্জ টমসনের রচনা অনুসরণ করলে।

অধ্যাপক টমসন শুরু করেছেন একেবারে গোড়ার কথা থেকে। গান বা সঙ্গীতের জন্ম হল কি ভাবে? গান বা সঙ্গীতের কথা বুঝতে হলে ভাষার জন্ম-বৃত্তান্তও মনে রাখা দরকার। কেননা, বাক্ বা ভাষা ছাড়া গান হয় না। অন্ততঃ আধুনিক যুগের বিশুদ্ধ যন্ত্র-সঙ্গীতের বেলায় যাই হোক না কেন, পুরোনা আমলে ভাষা বাদ দিয়ে গানের কথা ভাবা যায় না। উদ্গীথের শব্দার্থ বিশ্লেষণে ঋষিরাও বলেছেন—বাক্-ই গী। কিন্তু, ভাষার জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করতে হলে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত নিয়েও আলোচনা তুলতে হয়। কেননা, মানুষের পক্ষে পশুজগৎ ছেড়ে আসার পরিচয় প্রধানতঃ দুই দিক থেকে :—

হাতিয়ার আবিষ্কার ও ভাষা আবিষ্কার। জানোয়ারেরা হাতিয়ার বানাতে পারে না, কথা কইতে পারে না—পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষই তা পারে।

মানুষের পক্ষে হাতিয়ার আবিষ্কার এবং ভাষা আবিষ্কার—দুটো খুব স্বতন্ত্র ঘটনা নয়। হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ উৎপাদন কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলো। কিন্তু গোড়ার দিকে কারুর পক্ষেই এই উৎপাদন কাজ একা-একা সম্পাদন করা সম্ভব নয়—দশহাত এক হয়ে এক সঙ্গে কাজ করেছে। আর এরই দরুণ পরস্পরের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিল।

সেই তাগিদেই মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সংযোজিত হতে লাগলো অর্থ: মানুষ আর জানোয়ারের মতো চিৎকার করে না, রীতিমত কথা বলে। পুরো দলের ঐ একান্ত দলগত কাজটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার তাগিদেই মানুষের ভাষা উন্নত হতে লাগলো। তাই গোড়ার দিকে হাতের কাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি।

শিশুরা কথা বলবার সময় খুব বেশি অঙ্গভঙ্গি করে। যদি মানবজাতিরও শৈশবকে পরীক্ষা করা যায় তাহলে চোখে পড়ে কথা বলার সঙ্গে হাত বাড়ানোর যোগাযোগটা কত ঘনিষ্ট। আমরাও হয়তো মুখের কথাকে ভালো করে বোঝাবার জন্যে অল্পবিস্তর হাত নাড়াই—অঙ্গভঙ্গি করি। কিন্তু অসভ্য মানুষের বেলায় ঠিক তা নয়। অন্যেরা যাতে কথাটাকে আরও ভাল করে বুঝতে পারে সেই জন্যে তাঁরা হয়তো নাড়ায় না। কেননা, বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ্য করেছেন যে, ওরা যখন আপন মনে কথা বলে তখনো প্রচুর অঙ্গভঙ্গি করে। আমাদের কাছে কথাটাই মুখ্য, অঙ্গভঙ্গিটুকু গৌণ। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তা নয়। কেননা, হাতের কাজের সঙ্গেই তাদের মুখে ভাষা ফুটেছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি:—

"শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে অভিজ্ঞ আধুনিক পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে, ভাষাসৃষ্টির পূর্বে অঙ্গভঙ্গীই আমাদের মনোভাব প্রকাশের মুখ্য উপায় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহারা উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সময়ে শব্দসম্পদহীন অশিক্ষিত আদিম জাতিগুলির মধ্যে মুখের ভাষা অপেক্ষা মূক অঙ্গভঙ্গীর প্রচলনই অধিক পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত, মূক-বধিরগণ যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে কত অল্লায়াসে নিজ নিজ মনোভাবগুলি প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মূক-বধিরগণের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে সৌকর্য্যবিধানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক প্রকার সর্বজনীন মূক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। লিখিত ও কথিত মুখের ভাষা প্রায়ই মনোভাব প্রকাশ অপেক্ষা আন্তরিক ভাব গোপনের সহায়তা করে, তাহা ছাড়া ভাষাবাহুল্য মানবের ব্যক্তিগতব্যবধান ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলে। কিন্তু অঙ্গবিক্ষেপাত্মক সাঙ্কেতিক সর্বজনীন মূকভাষা ঠিক ইহার বিপরীতধর্মী। ইহা মানবের হৃদগতভাব যথাযথ ও সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করে—ব্যক্তি ও

জাতির সকল পার্থক্য এক বিরাট একত্বের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। অঙ্গভঙ্গীর শক্তি বস্তুতঃ অতি অদ্ভুত। দশটি কথায় যে ভাবটি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত না হয়, একটি ক্ষুদ্র হাতের ভঙ্গীতে তাহা অতি সহজেই ফুটিয়া উঠে। আর নর্ত্তনে ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নেই।[১]

"আদিম মানুষদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরাই গবেষণা করেছেন তাঁরাই বলেছেন —ওদের বেলায় মুখের ভাষাটা অনেকাংশেই হাতের অঙ্গভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক টম্‌সন নজির দিচ্ছেন যে, স্পাইস্‌রাও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের। অর্ধশতাব্দী আগেই এইসব সাক্ষ্যের ভিত্তিত্তে বুশের প্রমাণ করতে চাইলেন, হাতিয়ার ব্যবহারের দরুণ পেশীগুলিতে যে জোর পড়ে তারই প্রতিবর্তী—ক্রিয়া হিসেবে স্বরযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াটি থেকেই মানুষের গলায় ভাষা ফুটে উঠেছিল। তারপর, হাতের কাজের যত উন্নতি হয়েছে ততোই উন্নত হয়েছে স্বরযন্ত্র এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের চেতনাও উন্নত হতে হতে একটা পর্যায়ে পৌছে দেখা গেলো এই প্রতিবর্তী ক্রিয়াটিকেই তাঁরা সচেতন ভাবে ভাবের আদান-প্রদান কাজে নিযুক্ত করতে পারছে।

শ্রমের সঙ্গে ভাষার এই সংযোগটি আজো খুঁজে পাওয়া যায় শ্রমসঙ্গীত যা কাজের গানের মধ্যে। যে সব দেশে কলকারখানার শব্দে শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর একেবারে চাপা পড়ে যায় নি, সেই সব দেশে ঐ শ্রম-সঙ্গীত শুনতে পাওয়া একটুও কঠিন নয়। নৌকো যাওয়ার গান, ধান কাটার গান থেকে শুরু করে ছাদ পেটাবার গান বা শ্রমিকদের পক্ষে প্রকাণ্ড ভারি কিছু টানবার সময়কার গানগুলিকে একটুখানি নজর করলেই বোঝা যাবে, এ সব ক্ষেত্রে কাজ করছে তখন সর্দার দাঁড়িয়ে গানের দায়িত্ব নিয়েছে এবং সে নিজে কাজে হাত লাগাচ্ছে না বলে বাকি শ্রমিকদের মনে কোন বিক্ষোভ নেই। কেননা, তার ঐ গানের দরুণই বাকি বিশজনের পক্ষে অমন শ্রমসাধ্য কাজটা সহজসাধ্য হয়। গান এখানে শ্রমকে সাহায্য করছে—সবাইকেই একসঙ্গে এক তালে একটি করার অবস্থায় এনে প্রত্যেকেরই শ্রম লাঘব করছে। অসভ্য মানুষদের মধ্যে এই শ্রম সঙ্গীতের তাৎপর্য আরও অনেক স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। যখনই তাঁরা কোন শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত হয় তখনই যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁদের মুখে গান জেগে ওঠে। মেয়েরা দৈনন্দিন কাজ গান ছাড়া করতে পারে কিনা সন্দেহ।

১। শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী—অভিনয় দর্পণ (নন্দিকেশ্বর কৃত) ভূমিকা—১ম পৃষ্ঠা।

বুশের প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কাজের তাল থেকেই মানুষের ভাষায় ছন্দের জন্ম হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী কালের গবেষণায়।

কিন্তু শ্রমসঙ্গীতের তাৎপর্য্য—গানের সঙ্গে কাজের আদিম যোগাযোগটির রহস্য স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে আরও কয়েকটি দিকে নজর রাখা দরকার।

প্রথমতঃ—অসভ্য মানুষদের মধ্যে এবং পিছিয়ে পড়ে থাকা সভ্য মানুষদের মধ্যেও—কাজের সঙ্গে শুধুমাত্র গানেরই যোগাযোগ নয়। তাছাড়া নাচেরও যোগাযোগ। বস্তুতঃ আদিতে নাচ ছাড়া গান সম্ভবই নয়। কিংবা ঘুরিয়ে বলা যায়, আদিম মানুষদের মধ্যে নাচ—কাজ—গান সবশুদ্ধ একসঙ্গে মিলে একাকার হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে কতটা ঠিক নাচ, কতটুকু নিছক কাজ এবং কতটুকু শুধুমাত্র সঙ্গীত—এই ধরনের তফাৎ করার চেষ্টাও কৃত্রিম।

দ্বিতীয়তঃ—এই যে নাচ-কাজ-গান এর তাৎপর্য বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় মানুষের পিছিয়ে পড়া অবস্থায় উৎপাদন কাজের পক্ষে নাচ-গান বাহুল্যতো নয়ই, বরং অনিবার্যভাবেই উদ্দেশ্যমূলক ও প্রয়োজনীয়।[১]

... ...

উৎপাদন কৌশলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে দশজন মিলে এক সঙ্গে একই কাজে হাত না লাগালে কাজটাই অসম্ভব। তার কারণ, কাজের হাতিয়ার তখন এমনই স্থুল যে কারুর পক্ষেই একা একটা পুরো কাজ করবার উপায় নেই। তাই সেই অবস্থায় নিজে নিজে কোন কাজ করবার কথা ওঠে না। কাজ যা তা ঐ পুরো দলটারই। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই মানুষের হাতিয়ার ধারালো হয়েছে, উন্নত হয়েছে তার উৎপাদন কৌশল।

উন্নতির একটা পর্যায়ে পৌছে দেখা গেল একজন মানুষ নিজে একটা গোটা কাজ করতে শিখেছে। ওই একটি কাজের জন্য দশজনে আর একসঙ্গে হাত লাগাতে বাধ্য নয়। প্রত্যেকেই যে যাঁর কাজ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে যৌথ প্রেরণার প্রয়োজন যে মিটলো তা নয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করবে, কিন্তু সকলে মিলে যে দল হিসেবে কাজ করবে। বরং যে যার নিজের কাজের দায়িত্ব নিতে পারবার দরুণই যৌথ প্রেরণার প্রয়োজনটা বাড়াবার কথা: এখন

১। লোকায়ত দর্শন—পৃঃ ১৪৭। (১ম সংস্করণ) ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

দশ হাত প্রত্যক্ষভাবে একজায়গায় মিলছে না, তাই মনের দিক থেকে প্রত্যেকের কাজই সাহসের আর বিশ্বাসের চাহিদাটা বেশী হয়েছে।

কিসের সাহস ? কোন ধরনের বিশ্বাস ? যদিও একজনের নিজের উপর গোটা কাজটার দায়িত্ব পড়েছে তবুও আসলে সে একা নয়—দলের সবাই তাঁর সঙ্গে আছে। তারই সাহস। কোন বিশ্বাস থেকে এ ধরনের সাহস পাওয়া সম্ভব ? যাদু বিশ্বাস। (এ বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি।) কাজে বেরুবার আগে সবাই মিলে এক হয়ে একই কামনা করবে। শুধু তাই নয়, সবাই মিলে এক হয়ে একসঙ্গে দেখবে ওই কামনাটি সফল হবার ছবি।

কাজ শুরু হবার আগেই কামনা সফল হবার এই ছবিটি কেমন করে দেখতে পাওয়া সম্ভব ? বাস্তবে নয় নিশ্চয়ই ? কল্পনায় ? তার কল্পনার ঐ ছবিটি দেখবার জন্যই আদিম মানুষের পক্ষে নাচ-গানের প্রয়োজন। পুরো দলকে ডাক দিয়ে তাঁরা এক সঙ্গে মিলে নাচবে আর গান করবে—নাচটার আগাগোড়াই হল কামনা সফল হবার অনুকরণ, গানটার আগাগোড়াই হলো কামনা সফল হবার অনুকরণ। এইভাবে কামনা সফল হবার ছবিটি দেখতে দেখতে পুরো দল মেতে উঠবে, মেতে উঠে কাজে বেরুবে। দলের মাতন—সে তো আর যেমন তেমন নয়। সেই সাহসে বুক বেঁধে বেরুতে পারলে কেউই আর নিরুপায় নয়, দুর্বল নয়। অর্থাৎ কিনা, এই নিরুপায়বোধ বা দুর্বলতাবোধটি মন থেকে কেটে যায়।[১]

আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে সব মানুষের দল পিছিয়ে পড়া অবস্থায় টিকে আছে তাঁদের চেতনায় কাজের সঙ্গে নাচ-গানের সম্পর্কটা কী রকম তা শ্রীমতী জেন হ্যারিসনের উদ্ধৃতি দিয়ে আগেই আমরা বলেছি। অর্থাৎ আদিম মানুষ যখন রোদ, হাওয়া ও বৃষ্টি চায়, তখন সে দেবালয়ে গিয়ে কোন অলীক দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে না। সে ডাক দেয় নিজের গোষ্ঠীকে এবং রোদের নাচ বা হাওয়ার নাচ বা বৃষ্টির নাচ নাচতে শুরু করে। ভালুক শিকার করবার আগে ভালুকটিকে হারিয়ে দেবার জন্য সে তার দেবতার কাছে শক্তি ভিক্ষে করে না, ভালুক নাচ নেচে শিকারের মহড়া দিয়ে নেয়।

শ্রীমতী হ্যারিসন আরও দেখিয়েছেন, মেক্সিকোয় তা রাহু মার-এ নামের

১। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। (১ম সংস্করণ)

মানুষদের মধ্যে 'নাচা' আর 'কাজ করা' দুটি বিষয় বোঝাবার জন্য দুটি স্বতন্ত্র শব্দ নেই। একই শব্দের ও রকম দুটি মানে। দলের নাচে যোগ না দিয়ে যদি কোন ছোকরা বসে থাকে তাহলে বুড়োরা তাঁকে ধমক দিয়ে বলবে, কুঁড়ের মতো বসে না থেকে কাজে লাগছো না কেন? বয়েস বাড়া বোঝাবার জন্য ওরা বলে নাচের সংখ্যা বাড়া, দলের নাচে যোগ দিতে না পারলে মানুষ কপাল চাপড়ে বলে, এ রকম অকর্মন্য হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি?

নাচ-গানের সঙ্গে কাজের এই যোগাযোগ এর মূলে রয়েছে সেই আদিম যাদু বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে মানুষ কল্পনায় জয়ের একটা নকল তোলে। কামনা সফল হয়েছে তারই অভিনয় করে। আকাশে বৃষ্টি চাইলে ওরা দলের সবাইকে ডাক দিয়ে শুরু করবে বৃষ্টির নাচ, আকাশে জলের ছিটে ছুঁড়ে বৃষ্টির নকল তুলবে, বাজনা বাজিয়ে নকল করবে মেঘের ডাক, আর ওরা ভাববে এইভাবে কামনা সফল হওয়ার নকল করে সত্যিই বুঝি কামনাকেই সফল করা সম্ভব হবে।

ওদের কাছে, আসল কাজের সঙ্গে যাদু বিশ্বাসের তফাৎটা তেমন স্পষ্ট নয়। যাদু বিশ্বাস ছাড়া ওদের পক্ষে বাঁচাই কঠিন—কেননা, ওদের হাতিয়ারের অবস্থা এমনই করুণ যে, মন থেকে অন্ততঃ দুর্বলতাবোধটুকু দূর করবার চেষ্টা করা দরকার। দুর্বলতাবোধকে দূর করবার কৌশল ঐ যাদু বিশ্বাস। আর এই যাদু বিশ্বাসই হলো ওদের নাচ-গানের ষোলো আনা।

মাওরিদের মধ্যে এক রকমের নাচ আছে। তাকে বলে আলুর নাচ। ফসলের জন্য পূবহাওয়ার দরকার। তাই ওদের দলের তরুণী মেয়েরা ক্ষেতে গিয়ে নাচতে শুরু করে, নাচের আগাগোড়াই হল ঝড় আর বৃষ্টি, ফুলফোটা আর ফসল ফলবার অনুকরণ। নাচতে-নাচতে তাঁরা গান গাইতে শুরু করে, গানের মধ্যে কামনার প্রকাশ: চারাগুলি যেন তাঁদেরই অনুকরণ করে, অর্থাৎ ঐ মেয়েরা বাস্তবে যা চায় তাই কল্পনায় ফুটিয়ে তোলে নাচের দোলায়, গানের কথায়। দৃষ্টান্তটি সম্পর্কে অধ্যাপক জর্জ টমসনের মন্তব্যটুকু ভাল করে দেখা দরকার। তিনি বলেছেন—আলুর উপর ঐ নাচের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, কিন্তু যে মেয়েরা নাচছে তাঁদের নিজেদের উপর নাচটির যথেষ্ট প্রভাব পড়তে বাধ্য। নাচতে-নাচতে তাঁদের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে এরই দরুণ চারাগাছগুলি রক্ষা পাবে। তারপর ঐ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাঁরা যখন গাছগুলির পরিচর্যা করতে লাগলো তখন তাঁদের আত্মবিশ্বাস আর

শক্তি সামর্থ্য ঢের বেড়ে গিয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ফসলের উপরও নাচটার প্রভাব পড়ে বৈ কি? এই নাচেরই দরুণ বহির্বাস্তবের প্রতি মেয়েদের মনের ভাবটা বদলায়, ফলে পরোক্ষভাবে এই নাচই বহির্বাস্তবকেও বদল করে।

ঠিক একই ধরনের বিষয় চোখে পড়ে বাংলা দেশের ব্রতগুলির মধ্যে। এবং এই ব্রতগুলি অবণীন্দ্রনাথের মতে—'পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধহয়।'

অনুকরণমূলক যাদু বিশ্বাসের কথা আমরা আগেই বলেছি। আদিম অবস্থায় যে কোন শিল্পকলার সঙ্গে এই Immitation বা অনুকরণ গভীর ভাবে জড়িত। এরিষ্টটল এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

I. "Imitation, the common principle of the Arts of Poetry, Music, Dances, Painting and Sculpture. These Arts distinguished according to the Medium of material Vehicle, the Objects, and the Manner of Imitation. The Medium of Imitation Rhythm, Language, and 'Harmony' (or Melody), Taken singly or combined."

II. The Objects of Imitation.

Higher or lower types are represented in all the Imitative Arts. In Poetry this is the basis of the distinction between Tragedy and Comedy.

III. The Manner of Imitation.

Poetry may be in form either dramatic, narrative, Pure narrative (including lyric poetry), or pure drama. A digression follows, in the name and the original home of the Drama.[1]

1. Aristotle's Poetics—(Translated by S. H. Butcher. Introduction by Francois Fergusion—Hill and Wang, New York, 1966, Page 45.

এই ব্রত প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এমনি শস্‌পাতার ব্রত'। সেখানে আমরা দেখি মানুষ শস্যের কামনা করছে, কিন্তু, সেই কামনা সফল করাবার জন্য সে যে নিশ্চেষ্টভাবে কোনো দেবতার কাছে জোড়হাতে 'দাও' 'দাও' করছে তা নয়, সে যে ক্রিয়াটি করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফসল ফলায় যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানা ক্রিয়ায় প্রকাশ করছে। বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্‌পাতার ব্রত ও ভাঁদো, ভাদ্রমাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী শুক্লাদ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্থনষষ্ঠীর পূর্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য—মটর, মুগ, অড়হর, কলাই ছোলা---একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়, পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে এবং ইঁদুর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়, দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে, চার-পাঁচ দিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ-বৎসর শস্য প্রচুর হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্র দ্বাদশীতে এই উৎসব, চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান হয়। নিকানো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন দেওয়া আলপনা, কোথাও মাটির ইন্দ্রমূর্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন আপন শস্‌পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয় তারপর সাত-আট থেকে কুড়ি পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বেদীর চারদিক ঘিরে নাচ গান শুরু করে। উঠোনের এক অংশে পর্দার আড়ালে বাদ্যকার তাল দিতে থাকে -

ভাঁজো লো কলকলানী মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেবো আমরা পঞ্চফুলের মালা।
এক কলসি গঙ্গাজল, এক কলসি ঘি,
বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি ?

এরপর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে মুখে ছড়া কাটাকাটি করে। ···সমস্ত রাত দুই দলের নাচ গান ছড়া কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিকিমিকি। ···এরপর রাত্রি শেষ, মেয়েরা আপন-আপন শস্‌পাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে নদীতে বিসর্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্যের উদ্গমের কামনা সরাতে শস্য বপন ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হলো এবং অনুষ্ঠান শেষ হলো উৎসবের নৃত্যগীতে।[১]

ব্রত প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় সংস্কৃতির

১। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) আশ্বিন—১৩৬৭, পৃঃ ৬০—৬২।

ইতিহাস পুনর্গঠন করবার মালমশলা হিসেবে বাংলার এই ব্রতগুলি সত্যিই অমূল্য। এমন কি এই প্রকাণ্ড লোকায়তিক অনুষ্ঠানগুলির সাহায্যেই বৈদিক সাহিত্যের নানান দুর্বোধ্য তথ্য বোঝবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আল্পনায় একটা জাতির মনের, তাঁদের চিন্তার, তাঁদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূত্রগুলিতেও সমগ্র আর্যজাতির একটি চিন্তা আর উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ-দুয়েরই মধ্যে লোকেরা আশা, আকাঙ্খা, চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দু-এর মধ্যে এই জন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে। নদী সূর্য এমনি অনেক বৈদিক দেবতা, মেয়েলি ব্রতেও দেখি এঁদেরই উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হচ্ছে।"

—(পৃঃ ৪-৫ বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ)।

অবনীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন, বৈদিক সূক্তে উষাকে, নদীসকলকে উদ্দেশ্য করে যে রকম কবিতা রচনা হয়েছিল, খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে প্রায় তারই পুনরুক্তি পাওয়া যায়। (পৃঃ ৫—৬) এবং এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার আর্য-অনার্য মতবাদ সাধারণতঃ আমাদের পণ্ডিতমহলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে— অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলা যায়। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'আর্য এবং আর্যপূর্ব দুজনেরই সম্পর্ক যে-পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন, ধান, সৌভাগ্য, স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস, দুজনে ব্রত করছে যা কামনা করে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। কেবল পুরুষের চাওয়া, আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ, ঋষিরা চাচ্ছেন ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক, ইত্যাদি। আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে—'রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।' এর সঙ্গে পৃথিবী ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম মন্ত্রটি দেখি—

বসুমাতা দেবী গো। করি নমস্কার।
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার ॥

এই যে পৃথিবীতে যা-কিছু তার উপরে ঘোর বিতৃষ্ণা এবং গোকুলে বা গোকুলি বাস, গরুর মুখে দিয়ে ঘাস আমায় যেন হয় স্বর্গে বাস—এই অস্বাভাবিক

প্রার্থনা ও স্বপ্ন, এটা বেদেরও নয়। ব্রতেরও নয়। বৈদিক সূক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দুটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদসূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, উদার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন সবুজের আড়ালে পক্ষীমাতার কাকলি—কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা।[১]

ব্রতের মধ্যে সমাজ-জীবনের কোন পর্যায়ের প্রতিচ্ছবি, সে প্রশ্ন অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ তোলেন নি। কিন্তু তবুও তাঁরই নানা মন্তব্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় ব্রতের সঙ্গে প্রাগ্ বিভক্ত সমাজের যোগাযোগ অন্বেষণ করবার দিকে। প্রথমঃতঃ তিনি বলেছেন, এই আদি-অকৃত্রিম ব্রতগুলি অতি প্রাচীন আর্যরা এদেশে আসবার আগে থাকতেই এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (পৃঃ ৯)। ব্রতগুলি যদি সত্যিই অতো পুরোনোকালের হয় তাহলে তার মধ্যে সমাজ-বিকাশের অতি প্রাচীন পর্যায়ের প্রতিচ্ছবিই খুঁজে পাওরা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ—বাংলা দেশের এই ব্রতগুলিকে বোঝাবার কৌশল হিসেবে তিনি যে পদ্ধতির কথা বলেছেন তারও ইঙ্গিত একই রকম, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজও যে সব মানুষ সমাজ বিকাশের অনেক আদিম পর্যায়ে পড়ে রয়েছে তাদের আচরণ থেকে এগুলিকে বোঝাবার সূত্র পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ বাংলা দেশের লক্ষ্মীব্রতটি বোঝাবার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারের মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশের অনার্যদের আচরণ থেকেই আলো সংগ্রহ করেছেন।[২] বাংলার ব্রতের সঙ্গে এ-জাতীয় আদিবাসীদের ক্রিয়াকর্মের যদি মিল থাকে তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, দু-এর মূলেই অনুরূপ সমাজ বাস্তব। তৃতীয়তঃ ব্রতের সঙ্গে প্রাগ্-বিভক্ত সমাজের সম্পর্কের ইঙ্গিত অবনীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখা যায়—

'একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া, কিন্তু ব্রত তখন যখন দশে মিলে এককাজ এক উদ্দেশ্যে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হলো—একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটি অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। একের সঙ্গে অন্য দশজন কেন যে মিলেছে, কেন যে একের অনুকরণ দশে করেছে,

---

১। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) আশ্বিন ১৩৬৭, পৃঃ ৭।

২। তদেব পৃঃ ২৩—।

সেটা দেখবার বিষয় হলেও আমরা সে-সব জটিল প্রশ্নে প্রথম যাবো না। একজনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুই-ই ক্রিয়া—কামনা চরিতার্থর জন্য, কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর একটি দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত কামনা সফলতাই তার শেষ—এই তফাৎ।'[১]

একের সঙ্গে অন্যদশজনে কেন মিলছে—অবনীন্দ্রনাথ সেই জটিল প্রশ্নে গেলেন না। এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে শ্রীমতী জেন হ্যারিসনের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে। তিনি লিখেছেন—

"One element in the rite we have already observed, and that is that it be done collectively, by a number of persons feeling the same emotion. A meal digested alone is certainly no rite, a meal eaten in common under the influence of a common emotion, may, and often does, tend to become a rite.

Collectively and emotional tension, two elements that tend to turn the simple reaction into a rite, are—specially among primitive peoples—closely associated, indeed scarcely separable. The individual among savages has but a thin and meagre personality—He may make himself excited movement, he may leap for joy, for fear, but unless these movements are made by the tribes together they will not become rhythmical; they will probably lack intensity and certainly permanance."[2]

অর্থাৎ আদিম অনুষ্ঠানের (rite) একটি অঙ্গ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, সেটি হলো তার সম্পাদন যৌথভাবে করা দরকার,—একাধিক মানুষ একই আবেগ অনুভব করবে। একা একা খেতে বসলে তা কথনো অনুষ্ঠান হবে না,

---

১। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) আশ্বিন—১৩৬৭, পৃঃ ১১—১২।

2. Harrison J. E.—Ancient Art and Ritual. (London 1935. Page—37)

একই আবেগের বশে এক সঙ্গে খেতে বসলে তা অনুষ্ঠান হতে পারে এবং প্রায়ই দেখা যায় তা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে।

বিশেষতঃ, আদিম মানুষদের মধ্যে দেখা যায় যে দুটি উপাদান সাধারণ ক্রিয়াকে যজ্ঞে পরিণত করতে চায়,—অর্থাৎ যৌথভাব আর আবেগের চাপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত ও এমন কি অবিচ্ছেদ্য। আদিম মানুষের মধ্যে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব নেহাৎই ক্ষীণ…। সে হয়তো একা একা উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গি করতে পারে, লাফিয়ে উঠতে পারে আনন্দে, ভয়ে কিন্তু পুরো গোষ্ঠী যতোক্ষণ না এই ক্রিয়ায় মেতে ওঠে ততোক্ষণ তা ছন্দোময় হবে না, তার মধ্যে সম্ভবত, তীব্রতা থাকবে না, স্থায়িত্ব তো নয়ই।

নৃত্য বিষয়ে এরিষ্টটলের বক্তব্য ট্রাইবাল সমাজের বা আদিম সমাজের নৃত্যের ব্যাপারে খুবই সুদূরপ্রসারী ও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। নৃত্য প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে তিনি বলেছেন—

"In dancing, rhythm alone is used without 'harmony' fo. even dancing imitates character, emotion and action by rhythmical movement." (Aristotle's Poetics)[১]

নৃত্য—দেহের ছন্দে 'ক্রিয়া, আবেগ, ও চরিত্রের' অনুকরণ। নৃত্যের উপস্থাপ্য হচ্ছে—চরিত্র, আবেগ ও ক্রিয়া, এবং মাধ্যম বা উপাদান পদ্ধতি হচ্ছে 'গাত্রবিক্ষেপ'। (অবশ্য সব রকম গাত্র বিক্ষেপই নৃত্য নয়) যদিও এরিষ্টটলের —এই বক্তব্যকে অনেকেই ভাববাদী দৃষ্টিতে দেখে অভ্যস্ত তবুও বোধহয় অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বক্তব্যের বিচার করা যেতে পারে। এখানে চরিত্র, আবেগ ও ক্রিয়াকে আমরা এভাবেও দেখাতে পারি। এরিষ্টটলের বক্তব্যকে নৃত্যের বস্তুবাদী ও ভাববাদী ব্যাখ্যার মধ্যে সেতুবন্ধ বা যোগসূত্র স্বরূপ ধরা যেতে পারে।

(১) চরিত্রের অনুকরণ—যাদুবিশ্বাস মূলক অনুকরণ ধরা যেতে পারে। (অনুকৃতিমূলক কাজ)।

(২) আবেগ—শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামষ্ঠিক আবেগ (Collective emotion) বলা যেতে পারে।

(৩) ক্রিয়া—কাজ ও নাচ প্রায় সমার্থক ক্রিয়া রূপে ধরা যায়।

1. Ibid—Page—50.

আমাদের মতে নৃত্য বিষয়ে এরিষ্টটলের বক্তব্য বস্তুবাদী ও ভাববাদী ব্যাখ্যায় সেতুবন্ধ বা যোগসূত্র স্বরূপ।

॥ শিল্পতত্ত্বে ও নৃত্যে অনুকৃতিবাদ ॥

যে 'ইমিটেশনের' কথা এরিষ্টটল বলেছেন তা বেশ জটিল এবং শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসে সেই 'ইমিটেশান' বা অনুকৃতিবাদ খুবই প্রাচীন। এই প্রসঙ্গে ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর 'শিল্পতত্ত্ব পরিচয়' নামক গ্রন্থে। এখানে উক্ত গ্রন্থের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন—[১]

'অনুকৃতিবাদ শিল্পতত্ত্ব-শাস্ত্রে সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ বলে পরিগণিত। ইউরোপের প্রথম সভ্যদেশ গ্রীসের এবং এশিয়ার অন্যতম প্রথম সভ্যদেশ ভারতের শিল্পতত্ত্বচিন্তা পর্যালোচনা করতে গেলেই দেখা যায়—উভয় দেশেই শিল্পকে অনুকৃতি অর্থাৎ অনুকরণ ব্যাপারের ফল বলে গণ্য করা হয়েছে। প্লেটো-এরিষ্টটলের অনেক আগেই গ্রীসে শিল্পকে **'মাইমেসিস'** (Mimesis) বলা হয়েছে এবং অনেককাল পরেও শিল্প 'মাইমেসিস্' বলেই বিবেচিত হয়েছে। এই 'মাইমেসিস্' শব্দটিরই ইংরেজী অনুবাদ **'ইমিটেশান'** (Imitation) এবং 'ইমিটেশান' শব্দটির বাংলা অনুবাদ—'অনুকরণ'। অবশ্য 'অনুকরণ' শব্দটিকে 'ইমিটেশান' শব্দটির বাংলা অনুবাদ বললে সবটা সত্যি কথা বলা হয় না। কারণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যকে 'লোকবৃত্তানুকরণ" এবং বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রে শিল্পকে অনুকৃতি বলা হয়েছে এবং সেখানেই 'অনুকরণ' শব্দটিকে এবং পরোক্ষভাবে শিল্পের সংজ্ঞাটিকে পাওয়া যায়।

'মাইমেসিস' বা 'অনুকরণ' বলতে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকাররা ঠিক কি ধারণা করেছিলেন, কিছু কিছু প্রমাণের এবং অনেকখানি অনুমানের সাহায্যেই তা আমাদের গড়ে নিতে হয়। এই কারণে—ঐ ধারণা সম্বন্ধেও কোন ঠিক ধারণা নেই। প্রমাণ ও অনুমান প্রয়োগে সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং মতভেদের কথা আপাততঃ স্থগিত রেখেই, অনুকৃতিবাদের ভিত্তি ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। অনুকরণবাদের ভিত্তিটি সহজেই অনুমান করা চলে। মানুষ রয়েছে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। বাহ্য

১। শিল্পতত্ত্ব—পরিচয়—ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য। (জাতীয় সাহিত্য পরিষদ—কলিকাতা—১৯৬৮, পৃঃ ১৩৪—৩৫, ৪৫, ৪৬)।

পরিবেশ থেকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের প্রত্যয় আসছে ইন্দ্রিয়পথে, প্রত্যয়গুলি এসে মনে জাগাচ্ছে ভাবের আন্দোলন। অন্তরে রয়েছে ভাব, স্মৃতিতে বিচিত্র প্রত্যয় চেতনায় প্রকাশশীলতা—প্রকাশ ক্ষমতা এবং বাসনায় প্রকাশের ইচ্ছা—সমাজের সকলের কাছে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার ব্যাকুলতা। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে স্বরূপতঃ ব্যক্ত করার এই চেষ্টা, অবশ্যই (অভিজ্ঞতার বা উপলব্ধির অনুকৃতি (মাইমেসিস্) রচনা করার চেষ্টায় পর্যবসিত হবে। অর্থাৎ ভাবাবেগের অনুকৃতি রচনা করতে গেলে ভাবের অভিব্যক্তিকে অনুকরণ করতে হবে এবং প্রাকৃতিক বাস্তব এবং জীবনের রূপের অনুকৃতি নির্মাণ করতে হলে বস্তুসদৃশ বা লৌকিক-জীবন সদৃশ জীবনের রূপ অর্থাৎ অনুরূপ বস্তু বা জীবন নির্মাণ করতে হবে। 'অনুকরণ' শব্দটিকে যে এরূপ ব্যাপক অর্থেই—'অনুরূপ রূপ রচনা'—অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে—তাঁর যথেষ্ট প্রমাণ প্লেটো এরিষ্টটলের লেখা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যথাযথ রূপ এবং অনুরূপ বা সম্ভাব্যরূপ এই দুটি শব্দের তাৎপর্য বুঝতে পারলেই আমাদের অনুকরণবাদের আসল বক্তব্য এবং তার যাথার্থ্যের পরিমাণ উপলব্ধি করা সহজতর হবে। অনুকরণ শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে, আমরা যদি অনুকরণ বলতে বিশেষের যথাযথ উপস্থাপনা অর্থাৎ 'যদদৃষ্টং উল্লিখিতং' কথাটার কিছু বুঝি, তাহলে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে শিল্পসৃষ্টি অনুকরণ ব্যাপার নয়, শিল্পের ইতিহাসের প্রথম থেকে আজপর্যন্ত, যথার্থ যথাযথ উপস্থাপনার নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যাবে এবং দেখা যাবে বেশীর ভাগ সৃষ্টিই প্রতিকৃতি নয়—অনুকৃতি-অনুরূপের উপস্থাপনা। কিন্তু অনুকরণ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ অনুরূপ রূপকল্পনা অর্থে ব্যবহার করলে এবং শিল্পকে অনুভূতি বা নির্মিত বললে খুব একটা আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কেন নয়, তা বলার আগে এ বিষয়ে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে মহাশয়ের মন্তব্যটুকু (Essays and Addresses --1921,) মুখবন্ধ হিসেবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অধ্যাপক মারে লিখেছেন--

"The conception of art as mimesis, though rejected by almost all recent critics, has justification and may even show real profundity of insight. Mimesis is, I suspect, not only an essential elements in all art also our greatest weapon both for explaining and for understanding the world."

অর্থাৎ যদিও আধুনিক সমালোচকদের প্রায় সকলেই 'শিল্পে অনুকরণ'—এই ধারণাকে মিথ্যা বলে বর্জন করেছেন, তবে একথা বলতে চাই যে ঐ ধারণার মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে—প্রকৃত এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। আমি মনে করি—অনুকরণ শুধু প্রত্যেক শিল্পিরই অপরিহার্য উপাদান নয়, অনুকরণ জগতের ধারণার ও ব্যাখ্যার পক্ষে প্রধান হাতিয়ার। বলাবাহুল্য অধ্যাপক গিলবার্ট মারে মহাশয়—শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান বলে অনুকরণ ব্যাপারটিকে বহু মর্যাদা দেখিয়েছেন—অনুকরণবাদকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। বাস্তবিকই, যে ব্যাপক অর্থে প্লেটো-এরিষ্টটল এবং ভরত 'অনুকরন' শব্দটি বাবহার করেছেন তাতে, অনুকরশ শুধু পরিদৃশ্যমান জগতের অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর যথাযথ অনুকরণ-হুবহু নকল মাত্র নয়, অনুকরণ আসলে বিশেষের সম্ভাব্য রূপটির—আদর্শায়িত রূপের উপস্থাপনা।

'প্লেটো-এরিষ্টলের গ্রন্থাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে অবশ্যই এই ধরনের কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে, দেখা যাবে 'অনুকরণ' শব্দটিকে তাঁরা 'idealizing imitation of nature' অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। এরিষ্টটলের 'পোয়েটিকস্' গ্রন্থে এমন একাধিক মন্তব্য পাওয়া যায়, যাদের উপরে নির্ভর করে অবাধেই একথা বলা চলে যে—প্লেটো বা তাঁর শিষ্য এরিষ্টটল 'অনুকরণ' বলতে বিষয়ের যান্ত্রিক উপস্থাপনা বুঝেন নি। নতুন কিছু উদ্ভাবনা ও পরিকল্পনা করতে যে মানসিক প্রক্রিয়া আবশ্যক, 'অনুকরণ' শব্দটির তাৎপর্য সেই পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত। আগেই বলা হয়েছে—যে পর্যন্ত আমরা জ্ঞানকে বিষয় সাপেক্ষ বলে স্বীকার করবো—প্রকাশ ব্যাপারকে প্রকাশ্য-বিষয়বস্তুর অধীন বলে মনে করবো—যে পর্যন্ত বিষয় নিরপেক্ষ রূপ বা নির্বিকার রূপের স্বয়ংসিদ্ধ মহিমা বা মূল্য স্বীকার না করবো—শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটিকে 'কল্পনার খেলা' ছাড়া অন্য কিছু মনে করব, সে পর্যন্ত অনুকরণবাদের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব হবে না'।

'প্লেটো চারুশিল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাকে একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, প্লেটো অনুকৃতিধর্মিতাকেই শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ করতে চেয়েছেন এবং যা স্বরূপে অনুকৃতি নয় তাকে তিনি চারুশিল্প বলতে চান নি। রিপাবলিক গ্রন্থের দশম অধ্যায়ের বহুলপ্রচলিত এবং বহুল্লিখিত যে অংশটিতে তিনি শিল্পকর্মের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে দেখা যায়—প্লেটো একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে শিল্পের লক্ষণ বুঝাতে চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন—একটি

মাটির তিনটি রূপ কল্পনা করতে পারি—প্রথম রূপ যা আছে ঈশ্বরের মনে বা প্রকৃতিতে, দ্বিতীয় রূপ যা ছুতোর মিস্ত্রী তৈরী করেছেন এবং তৃতীয় রূপ যা একজন চিত্রকর এঁকেছেন। প্রথম রূপটির কর্তাকে প্লেটো বলেছেন—Nature maker, দ্বিতীয় রূপটির কর্তাকে 'manufacturer' এবং তৃতীয় রূপের কর্তাকে—'imitator'। এই তৃতীয় রূপটি আসলে কোন বস্তু নয়, বস্তুত প্রতিরূপ বা রূপকল্প (image) এবং রূপ কল্পের স্রষ্টারই অপর নাম অনুকর্তা (imitator). আদিবাসী নৃত্যকলার বিশ্লেষণে এই 'অনুকরণ' বা অনুকৃতি ব্যাপারটাকেই প্রধান হাতিয়ার বলে ধরে নিতে হয়।

ঃ আদিবাসী নৃত্য প্রসঙ্গে হাম্বলি (W. D. Hambly) ঃ

আদিবাসী নৃত্যকলা পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া দরকার, এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীততত্ত্ববিদ হাম্বলি (W, D Hambly) বলেছেন—

"The student of primitive music and dancing will have to cultivate a habit of broadminded consideration for the actions of backword races. In other words, he must have imagination and sympathy combined with the power of temporarily dataching himself from his own mental training and view-point."[1]

অর্থাৎ 'broadminded consideration' ছাড়া শুধুমাত্র আধুনিক যুগে প্রচলিত নৃত্য ও গীতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আদিম যুগের সঙ্গীত ও নৃত্যের উপাদানের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করি তাহলে কিছুটা ভুল করা হবে। কারণ সুপ্রাচীনকালের বা আদিম যুগীয় সঙ্গীত তথা নৃত্যের অনুশীলন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাই সুদূর অতীতের পরিবেশ ও বিকাশের উপলব্ধি নিয়েই আমাদের আদিম যুগের সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করা উচিত। এই অভিমত এ যুগের ভারতীয় সঙ্গীত-তাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দও ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন—পাশ্চাত্য সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ মরিয়ম্ সিনাইডার বিশ্বের আদিম সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Primitive music is a seperate field of its own, but to a

১. Tribal Dance and Social Development—W, D. Hambly (H. F. & G. Witherby, 326 High Hobborn, W. C. London, 1926, Page-16-17.)

much greater extent than art music it is bound up with every day life and with many special factors ; Psychological, sociological, religious, symbolic and linguistic."[1]

'আদিম যুগের মানুষ গান করতো ও নাচতো তার মনের কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবকে প্রকাশ করার জন্য এবং তার গানে একটি মাত্র সুর তথা সুরের বারংবার অনুবর্তন বা আবৃত্তি থাকলেও সেই পৌনঃপৌনিকতার মধ্যে কতকগুলির মনোবৈজ্ঞানিকী (Psychological) ধারা ছিল। সে গানের মাধ্যমে অসুখ সারাতো বা ভূতপ্রেত তাড়াতো, সুতরাং সেই অসুখ প্রভৃতি সারানোর পিছনে থাকতো তার একটি মনোবল ও কেন্দ্রগত শক্তি। (আমরা এই মনোবল ও কেন্দ্রগত শক্তিকেই যাদুবিশ্বাসলব্ধ শক্তি বলতে চেয়েছি।) নাচের মধ্যেও তাই। মরিয়স্ সিনাইডাই তাই বলেছেন :--"Music and dancing create movement which generates something that is more than the original movement itself," আদিম যুগের মানুষ প্রাণের উচ্ছ্বাসে গান করতো ও সঙ্গে সঙ্গে সচেতন থাকতো তার মধ্যে কোন এক সুপ্ত শক্তির বিষয়ে। দৈনন্দিন জীবনগতির মধ্যে হয়তো সেই শক্তির প্রকাশকে অনুভব করতে পারতো না, কিন্তু নৃত্য-গীতের সময়ে সেই শক্তির বিকাশকে সে অনুভব করতো রোগ সারানো বা কোন অমঙ্গল দূরীকরণের ব্যাপারেও নৃত্য ও গীতের সঙ্গে তার মনো-শক্তির প্রভাবও সে বুঝতে পারতো। বর্তমান শিল্পসৌন্দর্যের জগতে অতীতের সেই অনুন্নত নৃত্য গীতের কোন মূল্যই হয়তো নির্ধারিত না হতে পারে, অথবা শিল্পের মর্যাদা হয়তো তাকে নাও দিতে পারি, কিন্তু উন্নত শিল্পবিকাশের যে তারা মূল উৎস সে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মরিয়েস সিনাইডার এই মতের সমর্থন করে বলেছেন--

"Nevertheless, even in the oldest culture we find the preconditions of art : the mastery and more or less conscious shaping of the medium of expression. Where the singer, who is at the same time dancing, tries to achieve a certain

১। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—১৯৬১ সংস্করণ—পৃঃ ৭৪।)

regularly of his movements, his singing takes on regular musical forms."[1]

আদিবাসী নৃত্যের মনোবৈজ্ঞানিকী ধারা প্রসঙ্গে গিয়ে এ. আর. ব্রাউন (A. R. Brown) লিখেছেন—

"A recent investigation in the Andaman Islands states that—"The psychology of dancing offers a wide field for study, that has so far as I know, been bearely touched. The dance produces a condition in which the unity, harmony and concord of the community are at a maximum."[2]

ভারতীয় নৃত্যের মনোবৈজ্ঞানিকী ধারা নিয়ে আমাদের দেশেও কেউ কেউ অনুসন্ধান চালিয়েছেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত টাইপ করা একটি ছোট পুস্তিকায় দেখেছি, দেবেন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রস ও ভাবকে নিয়ে মনোবিজ্ঞানের 'Theory of Emotion'-এর উপর নির্ভর করে কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। Applied Psychology বা ফলিত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমীক্ষা হওয়া দরকার। তাহলে নৃত্যের অন্তর্লীন মনোবৈজ্ঞানিক রূপরেখাটি বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। এ বিষয়ে মনে হয় স্বতন্ত্র একটি গবেষণা হওয়া দরকার। (এ প্রসঙ্গে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "Psycho-Analysis of Dances"—Debendra Das Gupta দ্রষ্টব্য।)

॥ আদিবাসীদের জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য বিষয়ক নৃত্য ॥

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, সকল প্রকার আদিবাসীদের মধ্যেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (Dancing from Cradle to grave) নৃত্যের মাধ্যমে নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। এঁদের যেমন জন্ম বিষয়ক নৃত্য আছে, তেমনি রয়েছে মৃত্যু-বিষয়ক নৃত্য। বিভিন্ন দেশের এই নৃত্যগুলির Content প্রায় একই, শুধু formটা আলাদা। আদিম যুগে সকল দেশের মানুষকে একই জান্তব বিবর্তনে আবর্তিত হতে হয়েছে। তাই দেশকাল পাত্র ভেদে কিছু পার্থক্য থাকলেও আদিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। যেমন 'মৃত্যু নৃত্য' তার মধ্যে একটি।

1. Ibid—Page, 75.
2. A. R. Brown—The Andaman Islanders—1922, Page 249, 252 etc.

আত্মাকে তুষ্ট করবার জন্য, অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করবার জন্য, প্রভৃতি কারণে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে বা পারলৌকিক আচার অনুষ্ঠানে নৃত্য অবশ্যই প্রযোজ্য ছিল সেই আদিম সমাজে। এই মৃত্যু-বিষয়ক নৃত্যের উদ্ভব প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে এমন একটি সময়ে এই নৃত্যের উদ্ভব হয়েছিল যখন থেকে মানুষ পরলোক নিয়ে চিন্তা করতে শিখেছে, ভূত, পিশাচ, প্রভৃতিকে ভয় করেছে, এবং সর্বোপরি যাদুবিশ্বাসকেই একমাত্র অবলম্বন করেছে। অথর্ববেদের সময় বা তারও অনেক আগে থেকেই এই সব আচরণমূলক নৃত্যগুলি চলে এসেছে। কারণ অথর্ববেদেই এই সকল ভূত-পিশাচের মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ বেশী। তার আগে ঋক্, সাম, যজু—এই তিনটির যুগে এর প্রভাব কম বলেই মনে হয়। সে যাই হোক প্রায় সব প্রাচীন সভ্য দেশেই দেখা গেছে, মানুষ আত্মায় বিশ্বাস করেছে। তাই আত্মার শান্তি কামনায় নৃত্যগীত করেছে, মৃতের আত্মার আহার্য হিসেবে ভোজ্য দ্রব্য রেখেছে ইত্যাদি। এই প্রথা যেমন ঈজিপ্টে দেখা গেছে তেমনি জাভা ও বলি দ্বীপেও এ ধরনের অনুষ্ঠান দেখা যায়। (রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ধরনের অনুষ্ঠান বলি দ্বীপে দেখেছেন—তার প্রমাণ 'জাভাযাত্রীর পত্র' গ্রন্থের চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যাবে।)

তবে মৃত্যুকে স্বীকার করে নেবার পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য হয়ে এসেছে সামাজিক ও জাতিগত ইতিহাসের ক্রমবিকাশে। Malanesian Window-দের মধ্যে দেখা যায় যে, তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র মৃত স্বামীর হাতে ধরে দেওয়া শস্যটুকুকে সম্বল করে অপেক্ষা করে, কবে সেই শ্রাদ্ধের দিন আসবে— নৃত্য হলে তবে তার মুক্তি। মাওরিওদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়।

'William Ridgway ধারণা করেছেন যে, ট্র্যাজেডির উৎপত্তির মূলেও নাকি এই মৃতকে সম্মান দেখানো আচারের মধ্যেই নিহিত।' (Origin of Tragedy-Cambridge—1910)। আমাদের মনে হয় যে, এমনও হতে পারে যে—মৃতের দুঃখ ভুলবার জন্যই এই নৃত্যের আয়োজন।

তিব্বতের Shoka-দের মধ্যেও এই মৃত্যু নৃত্যের প্রচলন আছে। মৃতের সংকারের সময় কুশপুত্তলিকা (Ephigy) তৈরী করে তাকে ঘিরেই নাচ শুরু হয়। অনেক সময় মৃতের বাড়ীর উঠোনেও এই অনুষ্ঠান হয়। এতে বাজনার সঙ্গে একক, দ্বৈত ও তিনজনে মিলে নাচতেও দেখা যায়। নৃত্যে খুব দ্রুত ও অতি মন্থর—দুই

রকমের গতিভঙ্গিই দেখা যায়। মাদল বাদ্যযন্ত্র গলায় ঝুলিয়ে নৃত্য করতেও দেখা যায়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীততত্ত্ববিদ হ্যাম্বলি (W. D. Hambly) নৃত্যের প্রসঙ্গে কি কি ধরনের নৃত্য আদিম যুগে অনুষ্ঠিত হতো তার একটা তালিকা দিয়েছেন এবং সেই নৃত্যের অনুযায়ী গীতের প্রকৃতিও ছিল বুঝতে হবে। কারণ গান ও নাচ প্রাচীন যুগে কোন আলাদা ব্যাপার ছিল না। যাইহোক তালিকাটি নিম্নরূপ :—

1. Tribal Dance and Social Development—W. D, Hambly, Page-16.
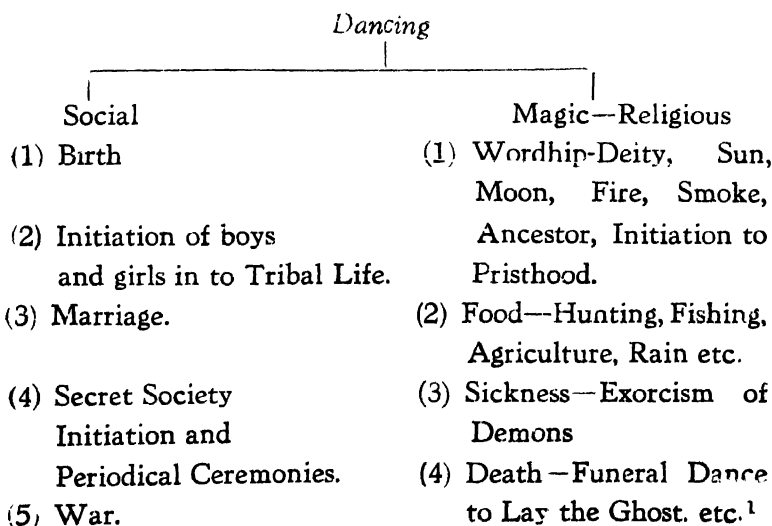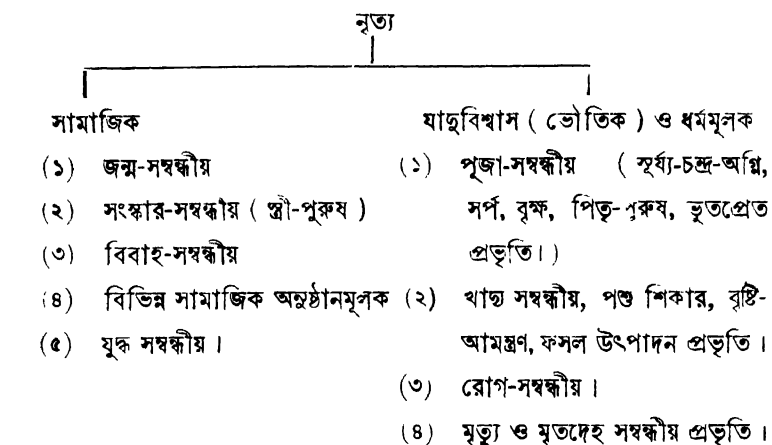
হাম্বলি, আদিবাসীদের সামাজিক পটভূমিকায় বহু ধরনের নাচের আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তাঁর বিস্তারিত আলোচনার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করবো। আমাদের বর্তমান সমাজে 'Anti-Social' শব্দটি 'সমাজ বিরোধী' শব্দরূপে প্রচলিত আছে। নাচের জগতেও যে অন্যান্য নাচের সঙ্গে' 'Anti-Social Dance' আছে একথা হাম্বলি আমাদের জানিয়েছেন নিম্নলিখিত ভাষায় :—

Social and Anti-Social Dances :

Blackmailing Dances of New Guinea recorded by Hardy and Elkingtion—appear to be related to the secret-Society dances of New Britain, for performers, hideously painted and grotesquely attired, visit by night the hut of the person from whom payment is to exterted. On arrival the balckmailers commence a wild fantastic whirl accompanied by song in which threats are shriked until the unfortunate victim consents to make a payment.

In Australia, a form of welcome dance, through certain incidents suggest a war dance, is performed when a wandering Australian tribe enters the preserve of another."[1]

নিউগিনি দ্বীপের আদিবাসী মানুষেরা কি ভাবে উদ্ভট রঙে দেহ চিত্রিত করে বিকট আওয়াজ বা চিৎকার করে এক ধরনের উল্লম্ফনজনিত নাচ নেচে প্রাপ্য টাকা আদায় করে তার বর্ণনার মধ্য দিয়েই Anti-Social Dance—এর রূপটি ফুটে উঠেছে।

বিভিন্ন আদিবাসীদের সমাজে কি ধরনের জন্ম-নৃত্য প্রচলিত দেখা যায়, তার বর্ণনা দিয়েছেন হাম্বলি। তিনি লিখেছেন –

'Dancing from cradle co grave :

Birth : The Kayans of Sarawak, more specially these of the Upper Rejang, sometimes perform a dance which is supposed to facilitate delivery. The actor is usually a female

1. Ibid—Page 25.

friend or relative of the Labouring woman and her dance includes the dressing of an infant. With this she dances before placing the dummy in the type of cradle which a Kayan woman usually carries on her back. An old story relates the origin of this ceremony as follows : A widow died in child birth and the infant was given to a woman who happened to be dancing at the time of the birth. The fact that the child afterwards became influential and prosperous set a precedent for the custom of dancing with an effigy of the newly born child.

Primitive races generally regard twins with superstition, even repulsion and it is no uncommon thing for one or both children to be put to death. The Begesu of Uganda, however, regard a double birth as auspicious and special ceremonial dances are held. The medicine man is called, and after he has sacrificed a goat, some of the blood is sprinkled on each member of the family, also on friends assembled to take part in the ceremonies. During four days, dancing continues which drums are beaten day and night a practice which calls to mind the Hindu birth custom of drum beating to drive away hostile demons……

Performances of dancing boys and musical accompaninments are Persian methods of giving welcome to a baby boy."[1]

জন্মের পর শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে কৈশোর উত্তীর্ণ হয় তখন বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের দীক্ষা-প্রথা প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। আমাদের হিন্দু-সমাজে যেমন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দীক্ষা, উপনয়ন বা পৈতা-অনুষ্ঠান হয়, তেমনি বিভিন্ন আদিবাসী সমাজেও এই দীক্ষা প্রথা লক্ষ্য করা যায়। এই দীক্ষা-প্রথার

1. Ibid—Page 22 and 23.

অনন্দানুষ্ঠানে নৃত্য গীতের আয়োজন থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় হাম্বলির বক্তব্য থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—তিনি লিখেছেন,—

"Initiation" :

Exhausting dances play an important part in many systems of physical training leading to tribal initiation and no doubt the boys feel some incentive to effort on account of the fact that it is at their dances that a girl falls in love and decides which boy she will select as her husband.

Akikuyu boys dance the whole night long before the morning of circumcision, so that they have to face the ordeal when thoroughly tired.

Yet boys during preparatory isolation undergo exhausting dances which are a severe test of physical stamina.

Boys who are about to be incoporated with the *tribal* have a special masked dancing performance to carrry out in front of a large audience."[1]

কৈশোরের দীক্ষা অনুষ্ঠানের পরে স্বভাবতঃই আসে যৌবনের প্রাণ চাঞ্চল্য। এই যৌবনেই ঘর বাঁধবার তীব্রতা অনুভূত হয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিবাহ অনুষ্ঠান। আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের প্রাক্-বিবাহ এবং বিবাহের সময় এই ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হলেও মূল ধারাটি এক। একদিকে যৌবনের জয়গান, অপরদিকে পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে এই নৃত্যানুষ্ঠান আদিবাসী সমাজে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় হাম্বলির বর্ণনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন—

"Sex attraction and marriage."

"The gaiety of sex dancing is seen at its best in certain South sea Islands for example the Marquesas, where the dancing movements are a combination of glide swim and

1. Ibid—Page 24.

whirl, in which every part of the body is in motion at the same time. The young girls very often dance by moonlight in front of their dwellings. There are a great variety of these dances of a romping mischievous kind bringing every muscle into play. Not only do their feet dance but their arms, hands, fingers and even eyes seem to dance.

(নৃত্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গের ব্যবহার আধুনিক যুগের ক্ল্যাসিক্যাল নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও আদিবাসী কোন কোন নাচে তার ইঙ্গিত মেলে। ভাব প্রকাশের জন্য হয়তো তাঁরা কোন জটিল মুদ্রা বা চক্ষু কর্ম তেমন ভাবে করে না যা ক্ল্যাসিক্যাল নাচে করা হয়ে থাকে।)

The damsells wear nothing but flowers and their gala tunics, which make them look like gay insects on the wing.

In Hawaii and other Polynesian Islands the daughters of chiefs used to give an Exhibition Dance, for which their finest dresses were reserved. The performance was designed to bring to notice the daughters of chiefs in order to introduce them to elgible young men of rank and status, who, it was hoped, might be so charmed by their dancing as to become their future husbands......

Although the surroundings of a coral island give an ideal setting for the dance of sexual joy and selection. People of the snowy tundra and mountain waste are by no means slow to discard their far clothing in order to trip a measure, so we find that among Siberian tribes there are very normal uses of music, song and dance, in addition to the mystic performances of the Shaman. At a Yakut wedding there is great feasting followed by dancing and singing, in which young people of both sexes participate."[1]

1. Ibid—Page 26.

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন—

"Dances were also performed for sex attraction, selection of bride or bridegroom, along with songs, which were mostly sung gutturally at first, and then in much higher key. Their dances were mostly in imitation of the movements of the wild animals and songs were reproduced in imitation of the notes of the birds and animals." (Ibid)

শ্রদ্ধেয় হাম্বলির উক্ত কথাগুলির মধ্যে এ্যারিষ্টটলের বক্তব্যের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। অন্ততঃ বক্তব্যের শেষাংশে তো বটেই। শিল্পতত্ত্বের ভাষায় 'মাইমোসিস্' শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। এ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ শব্দটিকে অনুকৃতিমূলক কার্যের পর্যায়ে ফেলে বিচার করা যায়। ভারতীয় সঙ্গীত তত্ত্বেও এই অনুকরণবাদের প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। পশু-পক্ষীর কণ্ঠস্বরের অনুকরণেই নাকি একদা সকল প্রকার স্বরগ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল। এটাই যদি সত্য হয় তাহলে পশুপক্ষীর গতিভঙ্গির অনুকরণে নৃত্যের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে অস্বীকার করা যায় না। শ্রদ্ধেয় হাম্বলির বক্তব্য তাই ভারতীয় চিন্তাধারার অনুসারী বলা যায়। নৃত্য যে অনুকৃতি মূলক ব্যাপার অন্ততঃ আদিম সমাজে তো বটেই, সেটা অস্বীকার করা যায় না। এবং যায় না বলেই শ্রদ্ধেয় হাম্বলির বক্তব্যকে আমাদের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকে সাহিত্যগত উপাদানের ব্যাখ্যার মধ্যে সেতু বন্ধ স্বরূপ ধরা যায়। সুতরাং শ্রদ্ধেয় হাম্বলির অনুকৃতিমূলক বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে তারপর আমরা সাহিত্যগত উপাদান তথা ভাববাদী ব্যাখ্যার সূত্রপাত করবো। নৃত্যের অনুকৃতিমূলক ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন —

"Mimicry of Animals".

"It is not improbable that mimetic dances which are of world-wide distribution have survived from a most ancient means of increasing supplies of game by symbolic magic.

Young girls of the Chukchu trible of N. E. Siberia are fond of performing dances in imitation of the movements of animals and the motions are accompanied by peculiar

guttural noises……The dance and song of the fighting sand-piper is an imitation of the movements and notes of the bird during the pairing season, the seal, wolves and the rain-deer, all of which are accompanied by mimetic dances representing the movements of these animals.

Such totemic ceremonies with their appropriate "emu". "Kangaroo", "Frog" or "opossum" dances are a regular feature of Australian aborigines procedure at the present day "

এই প্রসঙ্গে ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী সিংহলের নাচের জগতে প্রচলিত 'বন্নম' বা 'ওয়ান্নম' নৃত্যানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যায়। এই 'বন্নম' প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নৃত্য-সমালোচক 'Beryl dezoete তাঁর বিখ্যাত, গ্রন্থ Dance and Magic Drama in Ceylon" এ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষও এ বিষয়ে 'গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য' গ্রন্থে কিছু আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উভয়েরই আলোচনা থেকে কিয়দংশ তুলে দিলাম। এক একটি গানের নামে এই নাচগুলির পরিচয়। এই ভাবের আঠারটি গান আছে। এগুলির নাম এঁরা দিয়েছেন **'বন্নম্'** বা **'ওয়ান্নম্'**। যেমন, দাহক (শঙ্খের গোল দাগ) গজ, তুরঙ্গ, উরগ (সর্প), মুখল (খরগোস), উকুসা (ঈগলপাখী) বৈকন্ডী (প্রসিদ্ধ মনি) হনুমা (হনুমান) ময়ূর শ্যাউলা (মুরগী), সিংহাধিপতি (সিংহ), অসদশ (কোন দেবতার নাম), কীরলা (সমুদ্রের পাখী), মণ্ডুক, ইনাডি (কাশ জাতীয় ফুল), সুরপতি, গণপতি উদার (গর্বিতা রমণীর অহংকার)।

এই ১৪টির কতকগুলি তৈরী হয়েছিল জন্তুর চলন বা ভঙ্গি অনুসরণ করে, উপরের নাম দেখে তা বোঝা যাবে। অন্যগুলি তৈরী হয়েছিল তাদের গুণ ও রূপ বর্ণনা নিয়ে, যেমন সুরপতি, গণপতি, উদার ইত্যাদি।

"Wannams are modes of song, description of animals, which are danced and sung against the complicated rhythms of the drums, the object being to give a stylized rendering of the characteristic movements of the bird or animal represented. Some of the drummers in a gradual crecade of rhythm

themselves break into dance, with widely turned out knees.

The wannams are eighteen mostly referring to some animal, horse, snake, elephant etc. The subject for each wannam is very faintly adumbrated in the dance There are certain snake like movements suggesting mudras, with the hands ; also an elephant step, with trunk movements, resembling Kathakali. Kollegoda (জনৈক ভদ্রলোক) thinks the wannams were introduced into Ceylon by the Tamil Kings and compares them with the text of Bharat Natya ")

আমরা আবার হাম্বলির বক্তব্যে ফিরে আসছি। তিনি আরও লিখেছেন—

"Among Indian tribes, as in the case with most primitive people the bodies of animals are credited with having a spirit counterpart which may be invoked by song and dance, hence before commencing a bear hunt the Sionx Indians dance in honour of bear spirits, which are regarded as having a separate and invinsible existence.[1]

শ্রদ্ধেয় হাম্বলি অনুকৃতিমূলক নৃত্য বিষয়ে যা বলতে চেয়েছেন, আমি ঠিক এই ধরনের নাচ প্রত্যক্ষ করেছি ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে, ভূটান সীমান্তে 'টোটো' উপজাতিদের নাচের মধ্যে। জীবজন্তুর গতিভঙ্গি অনুকরণ করে নাচ তৈরী করতে এঁরা খুবই পটু, তা লক্ষ্য করেছি।

আদিবাসীদের মধ্যে সম্মোহন-ব্যাপারে (Magic) ধর্মে, জন্ম ও বিবাহ-উৎসবে, শিকারে, যুদ্ধে, বিভিন্ন ঋতুতে, চিকিৎসা ব্যাপারে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতিতে নৃত্য-গীতের আয়োজন থাকে। তাছাড়া ভূতাপসারণ ও মৃত আত্মার আবাহন ব্যাপারেও নৃত্যগীত প্রচলিত আছে। আদিবাসীরা যে গাছ, পাথর, স্তূপ প্রভৃতির পূজা করে, তারও সঙ্গে থাকে নাচ ও গান। ভারতের আদিবাসীদের নাচেও উক্ত ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করা যায়।

"India, from Ceylon to Tibet, is a region where the devil

1. Ibid. Page—27-29.

dancers, who claim to exercise disease, wear hideous masks with staring eyes…

The Veddas a sly and primitive people of Ceylon, have a sham or medicine man who undertakes special dancing ceremonial to cure sickness to give thanks for success in hunting or to celebrate a funeral……

The Kayans of Borneo give with great dramatic effect a "Dance of the Departure of the Spirit"…a ceremony in which three persons represent the death of one of them and his restoration by the waters of life…Ibid page 30-33).

নৃত্যের অনুকৃতিমূলক ব্যাপারে শুধুমাত্র জীবজন্তুদের গতিভঙ্গিই কাজ করেছে তা নয়, আধুনিক প্রাণীতত্ত্বের গবেষণায় এমন সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যা খুবই চমকপ্রদ। এমন একটি চমকপ্রদ ব্যাপার উল্লেখ করে আপাততঃ এ বিষয়ে ছেদ টানবো। বিষয়টি হলো কীট-পতঙ্গের জগতে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় ব্যবহার এবং তার ফলশ্রুতিতে নৃত্যের ব্যঞ্জনা। এল্. মেরি. বার্কার. (L. Mary Barker.) মৌমাছির ভাষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"Bee Language : For many centuries human beings have wondered at the exceeding complex behaviour of the social insects--the ants, bees, and wasps. In particular they have been amazed by the fact that worker honey bees out of a foraging expedition when they find a rich source of nector or pollen, seem to be able to communicate their information to the other bees in the hive.

The solution to this mystery was discovered some years ago by Prof. K. Von Frisch, of Munich University, when he found that the honeybee has a language which takes the form of a dance performed usually within the darkness of the hive. But sometimes at the entrance to the hive. With these dances the bee which has made the discovery of a good source of honey is able to convey to the other the direction

and distance from the hive in which the food lies. The other bees are also able, from the scent on the "explorers" body, to tell the nature of the food.

Still more recently, the interesting discovery has been made that different types of the bee possess different "dialects". Thus with bees of the European Cornialian type the figure of light (Which is the usual basic pattern) is danced with the two loops almost in top of each other if the source of food is less than about a hundred yeards from the hive ; but if the food is at a greater distance the loops are separated by a straight run. The direction of the run indicates the direction in which food is to be found, and the number of circles completed per minute are proportional to the distanoe of the food from the hive. Although the basic pattern is apparently always the same, it varies from one type of bee to another in minor details. The significant thing. however, is that all over the world, although, "dialect" differ the general pattern does not, bees in short, share a common language

The problem is how the "dance language" arose, and if appears likely that at an early stage of evolution the "dance" was nothing more than the excited movements of the returning bee performed without design. Perhaps gradually the irrelevent movement were eliminated and the "dance" become a means of communication. However, this may be, there can be no doubt that the honey be is the only animal other than man known to have the means of communicating detailed information."[1]

1. Pears encyclopaedia—by L. Mary Barker Sixty Sixth edition (London—1957-58) Page 204.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষই নয়, নানা, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের জগতেও ভাব প্রকাশের জন্য 'নৃত্যের ভাষা' রয়েছে। আধুনিক যুগে আমরা যেমন দেহের বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, মুদ্রার সুচারু ব্যঞ্জনায়, চোখ, ভ্রূ, গ্রীবা, নাক চিবুক প্রভৃতির শিল্পসম্মত 'একস্‌প্রেশন'-এর মাধ্যমে নৃত্যের নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করে থাকি, তেমনি দেখা গেল মৌমাছিদের জগতেও ভাব বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম রয়েছে 'নৃত্যভঙ্গিমা'। মানুষের পূর্ববর্তী নানা জীবজন্তু পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের জগতেও দেখা যায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানসিক বৃত্তি প্রকাশের তাড়নায় নৃত্যের বিকাশ। স্বয়ং প্রকৃতিই বোধহয় তাদের নৃত্য শিক্ষা দিয়েছেন। ডারউইন 'ডিসেণ্ট অব ম্যান'-এ পশুপক্ষীদের নৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশেও সবকালে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনির মধ্যে ময়ূরের নৃত্য খুবই চিত্তাকর্ষক। এ ছাড় রাস্তা-ঘাটে তো হামেশাই দেখা যায় বানর ও ভল্লুকের নাচ। অবশ্য তা কতখানি নাচ তা বিচার্য। তাহলেও পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের দেহও যে নাচের ছন্দে দোলে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। আমরা তার কিছু উল্লেখ করেছি।

এবার মনিপুরের নাচুনে হরিণ প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদনের কিছু অংশ প্রকাশ করে ছেদ টানছি।

"মণিপুরের নাচুনে হরিণ, যাহার দেশীয় নাম সানগাই, তাহাদিগকে কোন কোন প্রাণীবিজ্ঞানী বিস্ময়-হরিণ বলিয়া আখ্যা করিয়াছেন।······বর্তমানে সারা বিশ্বে নাচুনে হরিণের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে চুয়ান্ন, ইহার মধ্যে বারোটি শুধু আলিপুর পশুশালাতেই আছে। প্রাণীবিজ্ঞানীরা জানেন মনিপুরের লোকটক হ্রদের তীরবর্তী কোমল মাটির উপর বনাকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে নাচুনে হরিণ সানগাইদিগের প্রধান আশ্রয় ছাড়া সীমান্তবর্তী বর্মারও অরণ্যে তাহারা আশ্রিত। ভারতীয় বন্যপ্রাণীর রক্ষাবিধি অনুযায়ী মণিপুরের নাচুনে হরিণ সানগাইকে বাঁচাইয়া রাখিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে।······প্রাণী-বিশেষজ্ঞ ই. পি. জি মণিপুরী নাচুনে হরিণ সানগাইয়ের একটি দলকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে দেখিয়াছিলেন। ইহা অবশ্যই চমৎকার এক বিস্ময়ের দৃশ্য।" আনন্দবাজার পত্রিকা · সম্পাদকীয়—৭-১০-৭৬।

(এই ধরনের আরেকটি প্রতিবেদন দেখেছিলাম "The Statesman" কাগজে ৮।৬।৭৬, পৃঃ ৭)

এ পর্যন্ত আমরা নৃত্যের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অনুষঙ্গক্রমে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ

থেকে আলোচনা করলাম। এবার নৃত্যের উৎপত্তির মূলে ভাববাদী ব্যাখ্যার অনুষঙ্গক্রমে এখানে সাহিত্যগত উপাদানের ব্যবহার প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো। কারণ আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সাহিত্যগত উপাদানই হবে মূল আলোচ্য বিষয়।

নৃত্যের সাহিত্যগত উপাদানের সমীক্ষা (ভাববাদী ব্যাখ্যা)

নৃত্যের উৎস প্রসঙ্গে সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত বা সংকলিত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' তারপর নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পন', শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে সাহিত্যগত উপাদান তথা নৃত্য-ব্যাকরণের সন্ধান মেলে। ভারতীয় নৃত্যের প্রামান্য দলিল 'নাট্যশাস্ত্রে'র আগে পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা উপাদান পাওয়া যায়, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য অজস্র গ্রন্থে। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ ধরা হয় 'ষোড়শ জনপদ'-এর উত্থানের যুগ থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কাহিনী ভিত্তিক নৃত্যের উৎস অনেক পরের ব্যাপার। অবশ্য নাট্যশাস্ত্র বা অভিনয় দর্পনের সময়েব আগেই যে ভারতবর্ষে উন্নত ধরনের নাচের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ ঐ বই দুটি। কারণ, উন্নত নাচের পরিপ্রেক্ষিতেই তো এই বই দুটিতে নৃত্য-ব্যাকরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই কাহিনী-ভিত্তিক উপাদানের গুরুত্ব ঐ বই দু'টিতে কম নয়।

খ্রীঃ পূঃ ৬০০	৪০০ বছরের ফলশ্রুতি	খ্রীঃ পূঃ ২০০
(Historical & classical period) (ষোড়শ জনপদ)	(নাচের বিপুলায়তন চর্চার ফসল ঐ 'নাট্যশাস্ত্র')	(নাট্যশাস্ত্রের প্রণয়ন কাল)

নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় আমরা বলবার চেষ্টা করেছি মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব হিসেবে দেবতাদের কল্পনা এমন একটা যুগে সৃষ্টি হয়েছিল, যে যুগের সমাজে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ এসেছে—উচ্চ নীচের ফারাকটা অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং দেবতাকেন্দ্রিক— কাহিনী ভিত্তিক নৃত্যের উৎস তাই জানা যাচ্ছে পরবর্তীকালের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণে। নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পনের আগে

নৃত্যের উৎস প্রসঙ্গে তেমন আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নৃত্যের স্রষ্টা ভগবান নয়, মানুষ। তা সত্বেও ঐতিহাসিক পরম্পরাগত বিচারে এই কাহিনী ভিত্তিক উৎসের কথা আলোচনা না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। যদিও নৃতাত্বিক ব্যাখ্যার সময়কাল ও সাহিত্যগত উপাদানের সময়কালের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, তাহলেও নৃত্যের উৎস প্রসঙ্গে ক্রমবিকাশের স্তর দেখাবার জন্যও এই সাহিত্য গত উপাদানের উল্লেখ প্রয়োজন। এটা কৈফিয়ৎ নয়। এটা সত্য। নাচের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে নৃতাত্বিক সমীক্ষায় সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য রেখেছি। এবার সংক্ষেপে নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাহিত্যগত উপাদানে কি কি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে, তার আলোচনা করবো।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ও নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ' এই দুটি গ্রন্থেই নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রায় সমধর্মী বক্তব্য রয়েছে। স্থানান্তরে আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে শুধু 'অভিনয় দর্পণ' মতে নৃত্যের উৎপত্তির কথা বলবো।

নাট্যোৎপত্তি সম্বন্ধে অভিনয় দর্পণে নন্দিকেশ্বর বলেছেন[১]—

নাট্যবেদং দদৌ পূর্ব্বং ভরতায় চতুর্মুখঃ।
ততশ্চ ভরতঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গনৈঃ ॥ ২ ॥
নাট্যং নৃত্তং তথা নৃত্যমগ্রে শম্ভোঃ প্রযুক্তবান।
প্রয়োগমুদ্ধতং স্মৃত্বা স্বপ্রযুক্তং ততো হরঃ ॥ ৩ ॥
তণ্ডুনা স্বগণাগ্রণ্যা ভরতায় ন্যদীদিশৎ।
লাস্যমস্যাগ্রতঃ প্রীত্যা পার্ব্বত্যা সমদীদিশৎ ॥ ৪ ॥

পুরাকালে চতুর্মুখ (ব্রহ্মা) ভরতকে নাট্যবেদ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণসহ ভরত শম্ভুর সম্মুখে নাট্যনৃত্য ও নৃত্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার পর হর স্বপ্রযুক্ত উদ্ধত প্রয়োগ স্মরণ করিয়া নিজ গণের অগ্রণী তণ্ডুকে দিয়া ভরতকে উহা শিক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। (আর) প্রীতিবশতঃ উহার (ভরতের) অগ্রে পার্বতীকে দিয়া লাস্যের উপদেশ প্রদান করাইয়াছিলেন ॥ ২—৪ ॥

[১] অশোকনাথ শাস্ত্রী অনূদিত—অভিনয় দর্পণ, পৃঃ ২—৪।

এই তো গেল উৎপত্তি প্রসঙ্গ। এরপর কি ভাবে জগতে এই নৃত্যের প্রচলন হল, সেই সম্বন্ধে নন্দিকেশ্বর বলেছেন—

বুদ্ধাহথ তাণ্ডবং তাণ্ডোর্মর্ত্তোভ্যো মুনয়োহবদন্।
পার্ব্বতী ত্বনুশাস্তি স্ম লাস্যং বাণাত্মজামুষাম্ ।। ৫ ।।
তয়া দ্বারবতীগোপ্যস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিতঃ।
তাভিস্তু শিক্ষিতা নার্য্যো নানাজনপদাস্পদাঃ ।। ৬ ।।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্।

অনন্তর তণ্ডুর নিকট হইতে তাণ্ডবের জ্ঞানলাভ করিয়া (ভরতাদি) মুনিগণ (উহা) মর্ত্ত্য মানবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। (আর) পার্ব্বতী বাণাসুরের দুহিতা উষাকে লাস্য শিক্ষা প্রদান করেন ।। ৫ ।।

তিনি (উষা) দ্বারাবতীর (দ্বারকার) গোপীগণকে, তাঁহারা সৌরাষ্ট্রদেশের নারীগণকে ও তাঁহারা আবার নানাদেশের রমণীগণকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

এইরূপে তিনি এই (তাণ্ডবলাস্যাত্মিকা নর্ত্তনকলা) পরম্পরাক্রমে ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই হল নৃত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ভাববাদী ব্যাখ্যার মূলসূত্র। এই রকম কাহিনীভিত্তিক বা ঐশী উৎপত্তিজাত (Divine origin) নাচের থিওরী ভারতীয় বিভিন্ন নাচে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা যে অনেক পরের ব্যাপার তা বুঝতে কষ্ট হয় না! কারণ দেবদেবীর কল্পনা মানুষের মনে এসেছিল অনেক পরবর্তীকালে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে। সেই পরিস্থিতির নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করেছি।

নৃত্যের ভাববাদী ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি

নৃত্যের ভাববাদী ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি তথা নৃত্যদর্শনের রূপরেখাটি মূলতঃ বিধৃত হয়ে আছে নটরাজ 'ঋতুরঙ্গশালা' পালাগানের 'ভূমিকা'র বক্তব্যে, 'নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ'—গানটির প্রতিটি স্তবকে, এবং 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের মাধ্যমে। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে তাঁর নৃত্যদর্শনের কথা নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন।

" 'নটরাজ' পালাগানের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"নৃত্যগীত ও আবৃত্তিযোগে 'নটরাজ' দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।"

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালাগানের এই মর্ম।" [১]

এরপর রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'নৃত্যের তালে তালে নটরাজ'-এর প্রতিটি স্তবকে তাঁর নৃত্যদর্শনের গভীর ব্যঞ্জনা উদ্ভাসিত হয়েছে।[২]

ভারতীয় নৃত্যের সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তি তথা ভাববাদী বিশ্লেষণের মূলে রয়েছে ঐশী উৎপত্তির (Divine origin) কথা সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে নৃত্যের যে উৎপত্তি দেখানো হয়েছে, তার সর্বত্রই প্রায় ঐশী উৎপত্তিকে একমাত্র উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে নৃত্যের উৎস সন্ধানের সঙ্গে মূলগত পার্থক্য এইখানেই। নৃত্য প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গিতেও এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে কবিগুরু লিখেছেন—

'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ, এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে, দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য'।[৩] নৃত্যের এমন একটি সুমিত-সংজ্ঞা বোধ হয় ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

১। রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৬২০।

২। তদেব—পৃঃ ৬২৩ মূল গান---নৃত্যের তালে তালে নটরাজ ....

৩। রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২২২।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের উৎসের মূলে জ. প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করেছেন। সৃষ্টির অভিপ্রায়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন. এখানেই নৃতাত্ত্বিকদের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য। কারণ নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন নৃত্যের উৎপত্তির মূলে জীবিকা প্রয়াস প্রধান। অর্থাৎ তা জীবিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। নৃত্যের উৎসের মূলে আরেকটি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্যদের পার্থক্য দেখি। বিষয়টি হল - নৃত্যের স্রষ্টা সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষরূপ কোন দেবতা নয়। নৃত্যের উৎপত্তির মূলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি কিভাবে নৃত্যের উৎস খুঁজেছে, তা রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন—

"রূপসৃষ্টির প্রবাহই তো বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণুতত্ত্বে সে কথা সুস্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা দেয় না। কিন্তু বিদ্যুৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা মারে তখনি আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনটা দেখা দেয় সোনা হয়ে, কোনটা হয় সীসে। বিশেষ সংখ্যক মাত্রা ও বিশেষবেগের গতি এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত। বিশ্ব সৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছেন, শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। মানুষের সব শিল্পই দেবশিল্পের স্তবগান করেছে। এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে। মানবলোকের সব শিল্পই এই দেবশিল্পের অনুকৃতি, অর্থাৎ বিশ্বশিল্পের রহস্যকেই অনুসরণ করে মানবশিল্প। সেই মূল রহস্য ছন্দে, সেই রহস্য আলোক তরঙ্গে, শব্দ তরঙ্গে, রক্ত তরঙ্গে, স্নায়ুতন্তুর বৈদ্যুৎ তরঙ্গে।[১] এই 'স্নায়ু তন্তুর' বৈদ্যুৎতরঙ্গের কথার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই Ann Hutchinson-এর একটি উক্তিতে। LABANOTATION গ্রন্থে Ann Hutchinson, "*The Nature of Movement.*" প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন—"Movement is the result of the release of energy through muscular

১। রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২২৩।

response to a stimulus (inner or outer). This response produces a visual result in space." [1]

এরপর আবার আমরা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে ফিরে আসছি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ ছন্দরচনায় উপযোগী। ভূতলের টান থেকে মুক্ত করে দেহকে সে তুলেছে উর্দ্ধদিকে। চলমান মানুষের পদেপদেই ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা (Unstable Equilibrium) এতেই তার বিপদ, এতেই তার সম্পদ্। চলার চেয়ে পড়াই তার পক্ষে সহজ। ছাগলের ছানা চলা নিয়েই জন্মেছে, মানুষের শিশু চলাকে আপনি সৃষ্টি করেছে ছন্দে। সামনে-পিছনে ডাইনে বাঁয়ে, পায়ে পায়ে দেহভারকে মাত্রাবিভক্ত করে ওজন বাঁচিয়ে তবেই তার চলা সম্ভব হয়। সেটা সহজ নয়, মানবশিশুর চলার ছন্দসাধনা দেখলেই তা বোঝা যায়। যে পর্যন্ত আপন ছন্দকে সে আপনি উদ্ভাবন না করে সে পর্যন্ত তার হামাগুড়ি। অর্থাৎ ভারাকর্ষণের কাছে তার অবনতি, সে-পর্যন্ত নৃত্যহীন'।......

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। শিল্পই হচ্ছে আত্ম-সংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত। কেননা বিচিত্র তার ছন্দ। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যমান আত্মানং সংস্কুরুতে। শিল্পযজ্ঞের যজমান আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তাকে করেন ছন্দোময়'।......

...'মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয়, তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কোনো জীবে দেখিনে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গির মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করেনি, তাই তার তেমন শক্তি নেই ব্যঞ্জনা নেই।......মানুষ সৃষ্টিকর্তা।

1 Labanotation—Ann Hutchinson. (New York—1961) 1st edition—Page 10.

সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখদুঃখ রাগ বিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। 'আমি ভালবাসি' এই কথাটিকে ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার 'আমি ভালবাসি' এই কথাটাকে 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে, যে সৃষ্টি সর্বজনের, সর্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহশোক দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তিগত সাজাহানকে।'

'নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি, সে কেবল তালের নেশা জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল-দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু এই ভাবাভিব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য, সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।'

'নাচতে দেখেছি সারসকে। এই নাচকে কেবল আঙ্গিক বলা যায় না, অর্থাৎ টেকনিকেই তার পরিশেষ নয়। আঙ্গিকে মন নেই, আছে নৈপুণ্য। সারসের নাচের মধ্যে দেখেছি ভাব এবং তার চেয়েও আরও কিছু বেশী। সারস যখনি মুগ্ধ করতে চেয়েছে আপন দোসরকে তখনই তার মন সৃষ্টি করতে চেয়েছে নৃত্যভঙ্গির সংস্কৃতি, বিচিত্র ছন্দের পদ্ধতি। সারসের মন আপন দেহে এই নৃত্যশিল্প রচনা করতে পেরেছে, তার কারণ তার দেহভারটা অনেক মুক্ত।

'কুকুরের মনে আবেগের প্রবলতা যথেষ্ট কিন্তু তার দেহটাকে বন্ধক দেওয়া মাটির কাছে। মুক্ত আছে কেবল তার ল্যাজ। ভাবাবেগের চাঞ্চল্য-এ কুকুরীয় ছন্দে ঐ ল্যাজটাতেই চঞ্চল হয় তার নৃত্য, দেহ আঁকুবাঁকু করে বন্দীর মতো।'

'মানুষের মুক্ত-দেহ নাচে, নাচে মানুষের মুক্তকণ্ঠের ভাষা। তাদের মধ্যে ছন্দের সৃষ্টিরহস্য যথেষ্ট জায়গা পায়। সাপ অপদস্থ জীব, মানুষের মতো পদস্থ নয়। সমস্ত দেহ সে মাটিকে সমর্পণ করে বসেছে। সে কখনো নিজে নাচে না। সাপুড়ে তাকে নাচায়। বাহিরের উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য দেহের এক অংশকে সে মুক্ত করে নেয়, তাকে দোলায় ছন্দে। এই ছন্দ সে পায় অন্যের কাছ থেকে,

এ তার আপন ইচ্ছার ছন্দ নয়। ছন্দ মানেই ইচ্ছা।[১] মানুষের ভাবনা রূপগ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দোলীলার নটরাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত।'

'মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্যভাষায়। কোনো মানুষের চলাকে বলি সুন্দর, কোনটাকে বলি তার উল্টো। তফাৎটা কিসে। সে কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।'

'পালে-চলা নৌকো সুন্দর, তাতে নৌকোর ভারটার সঙ্গে নৌকোর গতির সম্পূর্ণ মিলন, সেই পরিণয়ে শ্রী উঠেছে ফুটে, অতি প্রয়াসের অবসান হয়েছে অন্তর্হিত। এই মিলনেই ছন্দ। দাঁড়ি দাঁড় টানে, সে লগি ঠেলে, কঠিন কাজের ভারটাকে সে কমিয়ে আনে কেবল ছন্দ রেখে। তখন কাজের ভঙ্গি হয় সুন্দর। বিশ্ব চলেছে প্রকাণ্ড ভার নিয়ে বিপুল দেশে নিরবধিকালে সুপরিমিতির ছন্দে। এই সুপরিমিতির প্রেরণায় শিশিরের ফোঁটা থেকে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সুগোল ছন্দে গড়া। এই জন্যেই ফুলের পাপড়ি সুবঙ্কিম, গাছের পাতা সুঠাম, জলের ঢেউ সুডোল।'

'জাপানে ফুলদানিতে ফুল সাজাবার একটি কলা বিদ্যা আছে। যেমন—তেমন আকারে পুঞ্জীকৃত পুষ্পিত শাখায় বস্তুভারটাই প্রত্যক্ষ; তাকে ছন্দ দিয়ে যেই শিল্প করা যায় তখন সেই ভারটা হয় অগোচর, হালকা হয়ে গিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে সহজে।'

'প্রাচীন জাপানের একজন বিখ্যাত বীর এই ফুলসাজানো দেখতে ভালবাসতেন। তিনি বলতেন এই সজ্জা প্রকরণ থেকে তাঁর মনে আসত

১। সংস্কৃত ছন্দঃ শব্দ বাংলায় হয়েছে ছন্দ। সংস্কৃতে বিসর্গহীন ছন্দ শব্দও আছে। ছন্দঃ এবং ছন্দ শব্দের অর্থ এক নয়। ছন্দঃ মানে পদ্যবন্ধ অর্থাৎ পদ্যের ধ্বনিবিন্যাস প্রণালী। আর ছন্দ মানে ইচ্ছা (যথা স্বচ্ছন্দ, ছন্দানুবর্তন)। মূলে হয়তো দুই শব্দের এক অর্থই ছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'ছন্দঃ' প্রবন্ধ (বিশ্বভারতী, ১৩৫০ মাঘ, পৃঃ ২৯৯-৩০১) দ্রষ্টব্য।

আপন যুদ্ধ ব্যবসায়ের প্রেরণা। যুদ্ধ ও ছন্দে-বাঁধা শিল্প, ছন্দের সুমুৎকর্ষ থেকেই তার শক্তি। এই কারণেই লাঠি খেলাও নৃত্য।'

'জাপানে দেখেছি চা-উৎসব। তাতে চা-তৈরী, চা-পরিবেষণের প্রত্যেক অংশই সযত্ন-সুন্দর। তার তাৎপর্য এই যে, কর্মের সৌষ্ঠব এবং কর্মের নৈপুণ্য একসঙ্গে গাঁথা। গৃহিণীপণা যদি সত্য হয় তাকে সুন্দর হতেই হবে, অকৌশল ধরা পড়ে কুশ্রীতায়, কর্মের ও লোকব্যবহারের ছন্দোভঙ্গে। ভাঙা ছন্দের ছিদ্র দিয়েই লক্ষ্মী বিদায় নেন।'

এতক্ষণ ছন্দকে দেখা গেল নৃত্যে। কেননা ছন্দের প্রথম উল্লাস মানুষের বাক্যহীন দেহেই। তার পরে দেহের ইশারা মেলে ভাষার ইশারায়।'[১]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছন্দ যে সবকিছু বিধৃত করে আছে তার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ উক্ত কথাগুলিতে। সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে ছন্দ তথা নৃত্যের এমন সুন্দর ভাববাদী গভীর অনুভূতি সঞ্জাত ব্যাখ্যা আর কোথায় তেমন দেখি না। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-ভাবনা বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি যথা স্থানে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু দরকার ততটুকুই উল্লেখ করলাম। তবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-ভাবনার অনুষঙ্গ ক্রমে শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা ঠাকুর নৃত্যের উৎপত্তির মূলে যা যা বলেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করে নৃত্যের ভাববাদী উৎস সন্ধান তথা সাহিত্যগত উপাদানের এখানেই ছেদ টানছি। কারণ পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই বিষয়গুলি বিভিন্ন প্রসঙ্গে থাকবে। 'নৃত্যরস' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা ঠাকুর লিখেছেন—

'বিশ্বজগতের মর্মে যে অনাদি চাঞ্চল্য, অস্তিত্বের যে অসীম আবেগ, তাই মিলল এসে পাখির দেহের ছন্দে, মিলল তার মনের চাঞ্চল্যে, মিলল তার প্রাণের আবেগে—বনরঙ্গভূমিতে, তার থেকে দেখা দিল নাচ। আদিম কালে মানুষের অপরিণত মনের প্রকাশ-চেষ্টা ভাষার আঙ্গিক তখনো গড়ে তুলতে পারেনি, বিশ্বপ্রকৃতির থেকে আদিম চাঞ্চল্যের প্রেরণা পেয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। পাখির ভাষার সঙ্গে মিল করে মানুষের এই প্রথম ভাষা। ছন্দের স্বাভাবিক আনন্দ মানুষ পেয়েছে কিন্তু জগতের দোলা খেয়ে, তার সঙ্গে মিশেছে সুখ-দুঃখ বিরাগ অনুরাগে হৃদয়ের দোলা, এই আন্দোলনে সাহিত্যের পূর্বেই নৃত্য হয়ে উঠেছে

১। রবীন্দ্ররচনাবলী—জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ-(পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, ২৫শে বৈশাখ) (চতুর্দশ খণ্ড – পৃঃ ২২৩-২২৫)।

তার ভাষার বাহন। এখনো আফ্রিকায় বহু অসভ্য জাতির মধ্যে নৃত্যের উৎকর্ষ—পরীক্ষা দ্বারা বিবাহের জন্য কন্যানির্বাচন-প্রথা বর্তমান আছে।'

এর থেকে বোঝা যায় মানবসমাজে আত্মপ্রকাশের গৌরব ছিল নৃত্যে। ক্রমে তার আঙ্গিক ও ব্যবহার বিচিত্র হয়ে উঠল। দেখা দিতে লাগল ধর্মানুষ্ঠানের নৃত্য, সম্মোহনবিদ্যায় নৃত্য, জন্ম মৃত্যু বিবাহের ঘোষণাসূচক নৃত্য, যুদ্ধ-অভিযানের নৃত্য। পর যুগে যেমন বাণীবদ্ধ মন্ত্রের নানা গূঢ় শক্তি কল্পনা করা হয়েছে, আদিম মানুষও ভয়ে ভক্তিতে আনন্দে সেই রকমই গূঢ় রহস্য কল্পনা করেছে বিবিধ নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীতে।'…

'সমগ্র জগতের মধ্যে যে হিন্দোল রয়েছে দেহের মধ্যবর্তিতায় তারই বিচিত্র ভঙ্গিমা প্রকাশ পায়। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে গাছের ডালে ফুলের পাপড়িতে পাতার সংস্থানে লিপিবদ্ধ করছে সেই নিরন্তর গতিচ্ছন্দকে। মানুষের কল্পনা সেই গতিশক্তিকেই অনুসরণ করে উদ্বেল প্রাণের বিচিত্র তরঙ্গলীলায়। সাহিত্য যেমন ভাষার যোগে আত্মপ্রকাশ করে, ছবি যেমন রং ও রেখার ভিতর নিজেকে ধরা দেয়, নৃত্য কলাও সেই রকম সুর ও তালের যোগে স্বরূপ নেয়। সুর পিছন থেকে জোগান দিতে থাকে শব্দ জগতের রহস্যময় সেই বাণী যার মোহিনীশক্তি বিশ্বব্যাপী ভাষাতীত গভীর রস-রহস্যকে ব্যক্ত করতে থাকে সাহানা পূরবী ভৈরবীর তানে, যার মধ্য দিয়ে পূর্ণিমা রাত্রির স্বপ্নচ্ছায়া মানুষের মনে মায়া বিস্তার করে, ঝড়ের রাতের তাণ্ডব চিত্তকে আলোড়িত করে, সূর্যাস্তের অবসন্ন নিবিড় আলোর অপূর্ব আভাসে আমাদের মানসজগৎ রঙিন হয়ে ওঠে। নৃত্যও সেই রকম দেহের ভঙ্গীতে ছন্দোবদ্ধ করে পূরবীর বিদায়—ব্যথা, সাহানার করুণ আনন্দ আর ভৈরবীর অনির্দিষ্ট সুদূরের আহ্বান। যে যত বড় রূপকার সে তত গভীর ভাবেই সেই অসীম ছন্দকে দেহের রেখার মধ্যে ধরতে পারে। এ যেন নিঃশব্দ রেখার কবিতা, রেখাই তার ভাষা, দেহের একটুখানি মোচড় যে মীড় লাগায় দর্শকের মনে, সেই মীড়ের মধ্যে নৃত্যরসিকের সৌন্দর্যবোধ দানা বেঁধে ওঠে, আন্দোলিত করে রসপিপাসুর চিত্তকে কখনো বিষাদে, কখনো বা আনন্দ অনুরাগে।'

'মানুষের ভাষা যেমন প্রকৃতির ভাষাতীত কথা খুঁজে পেয়েছে সঙ্গীতের মধ্যে, মানুষের হৃদয়াবেগের গতি তেমনি বিচিত্র তালের ছন্দে আবিষ্কার করেছে জাগতিক গতির সহজ অলংকার শাস্ত্রকে।'……

……'জীব জগতের মধ্যে অহরহ যে নিগূঢ় দ্বন্দ্ব চলেছে অণুপরমাণু থেকে আরম্ভ করে প্রাণীজগৎ পর্যন্ত, নিজেকে টিকিয়ে রাখবার যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ঝড়, তাই প্রাণের বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত অফুরন্ত রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষের চিত্ত সাধনা করছে সেই অসীম গতিশক্তিকে দেহের সীমার মধ্যে অনুভব করতে। শিবের তাণ্ডব হল সেই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিশক্তির প্রত্যক্ষ রূপ। তার মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আবর্ত আমরা দেখি। তাণ্ডবের প্রতি পদক্ষেপের ছন্দে পৃথিবীর ধূলিকণাও যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষের কল্পনা যে কত গভীরভাবে 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট'কে নিরুদ্দেশকে অনুভব করতে পারে, শিবের তাণ্ডবে তারই অদ্ভুত প্রকাশ। এর থেকে বোঝা যায় ভারতীয় নৃত্য একদিন অনঙ্গদহনের অর্থাৎ স্থূল অঙ্গসীমানা অতিক্রমণের পথে আধ্যাত্মিক প্রেরণাতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।'[১]

ভারতীয় নৃত্যের সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে ভাববাদী ব্যাখ্যায় তথা ঐশী উৎপত্তির (Divine Origin) মূলে বিশ্বানুভূতি যে কিভাবে আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর বক্তব্যের মধ্যে চমৎকার উৎসারিত হয়েছে। নৃত্যের উৎস সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি বিস্ময়কর। নৃত্যের এমনতর ব্যাখ্যা বিশ্ব সাহিত্যের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। (রবীন্দ্রনাথের 'নৃত্য-ভাবনা' সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

॥ ভারতের আদিবাসী নৃত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ॥

আদিবাসী নৃত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে Verrier Elwin যথার্থই লিখেছেন—"For the tribal people the dance is not an optional luxury; it is a way of life, a source of life Rhythm and poetry means everything to them. The tribe that dances does not die."[২]

আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে নাচ। তাঁদের জীবনধারণ প্রক্রিয়ার প্রধান উৎস নাচ। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রচলিত

১। নৃত্য—প্রতিমা দেবী। (বিশ্বভারতী—২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৬ প্রথম সংস্করণ, (পৃষ্ঠা ৩—৯)।

২। The Dance in India—Enakshi Bhavani (Taraporeval—Bombay 1st Edition, Prefaces—XVII).

আদিবাসী নৃত্যের সংখ্যা অজস্র। সঠিক সংখ্যা নির্ণয় বোধহয় অসম্ভব। কারণ অনেক আদিবাসী মূল নৃত্যের অনেক ধারা-উপধারা আছে। যাই হোক, এখানে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রতিনিধি স্থানীয় আদিবাসী নৃত্যগুলির কয়েকটির মাত্র পরিচয় দেওয়া হল। আমার ধারণা শুধুমাত্র আদিবাসী নৃত্য বিষয়েই একটি স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে উপযুক্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে। শুধু নৃত্যের ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে যেটুকু দরকার, তাই এখানে উল্লেখ করা হল।

কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলনের অনেক আগে থেকেই আদিবাসীরা নাচতো। মানুষ যখন শিকারজীবী ছিল এবং পরে পশুপালকে পরিণত হয়, তখন থেকেই মানুষের অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে নৃত্যকলারও অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়, আদিবাসী নৃত্যবিশ্লেষণ করলে। আদিবাসী নৃত্যের শিল্পগত রূপ বোধহয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় সময়কাল থেকে। তার অনেক পরে আদিবাসী নৃত্যে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আগে যা ছিল নিতান্তই আচার-অনুষ্ঠানমূলক (Ritualistic)। গোড়ার দিকে, ধর্ম সৃষ্টির আগের পর্যায়ে নিছক জীবিকা প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ঋতু পর্যায়ে শস্য উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে বা নির্ভর করে নাচগুলি গড়ে উঠেছে। অন্ততঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্যে তাই পাওয়া গেছে।

বর্তমানে প্রচলিত আদিবাসী নৃত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এণাক্ষী ভবানী বলেছেন—"Tribal Dances, like the folk dances of India, are full of the same spontaneous freedom and natural grace. They are also seasonal and religious like all rural dances and may be considered the sister dances of peasant India. Living and moving in natural surroundings they are vivid, temperamental, strong often primaval, and filled with the zest of living, costumed for the most part in colourful apparel, these oldest of India's inhabitants have brought to posterity a rich heritage of dance, song and music that are pregnant with their sociological, psychological and historical back-grounds centuries past. There are among these our tribal

people groups that can trace their origins to almost ten to fifteen thousand years ago".[১]

যদিও তিনি বর্তমানে প্রচলিত আদিবাসী নাচগুলির উৎপত্তির সময়কাল ধরেছেন দশ থেকে পনেরো হাজার বছর—আমাদের কিন্তু মনে হয় এরও অনেক আগে থেকেই এই নাচের উৎপত্তি। তার ইঙ্গিত আগে দেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষ একটি উপমহাদেশ। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অন্ত্য নেই। প্রকৃতিবিদ্ ও ভূবিদ্‌রা ভারতবর্ষকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। (১) উদীচ্য বা উত্তরাপথ। (২) দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য। (৩) প্রাচ্য বা পূর্বভারত। (৪) অপরান্ত বা পশ্চিম ভারত। (৫) মধ্যদেশ বা মধ্যভারত।

এই পাঁচটি অঞ্চল জুড়েই প্রাচীন ভারতের আদিবাসীরা ছড়িয়ে ছিল। বর্তমান আদিবাসীদের পূর্ব পুরুষ তাঁরা। মানবজাতির অনেক শাখা প্রশাখা নিয়ে ভারতজনের বিকাশ হয়েছে। এই বিকাশ দু চারশো বছরে হয়নি, হাজার হাজার বছরে হয়েছে। 'আর্য্য' 'দ্রাবিড়' ইত্যাদি নাম ভাষাগোষ্ঠী হিসাবে ধরা হলেও এখন জাতির নাম হিসাবেই চলে আসছে। ভারতবর্ষে আর্যরা আসবার আগে প্রধানত তিনটি জাতির মানুষ এদেশে বাস করতো এবং একদা এঁদেরই জনজীবনকে কেন্দ্র করে সেই যুগের নৃত্যধারা আবর্তিত হয়েছে! এই তিনটি জাতির মোটামুটি পরিচয়—

(১) নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু ঃ

চেহারা খাটো, রঙ, ঘোর কালো, নাক থ্যাবরা, ঠোঁট পুরু, চুল কোঁকড়ানো। (আফ্রিকাতে এখনো এঁদের দেখা যায়। এখানে একটি প্রসঙ্গ মনে পড়ছে, ভূগোল বিজ্ঞানীরা বলেন একদা ভারত ও আফ্রিকা একই স্থলভাগের অন্তর্গত ছিল—পরে প্রাকৃতিক কারণে দুটি আলাদা হয়ে মাঝে আরব সাগরের সৃষ্টি হয়। মানচিত্র দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝা যায়। অবশ্য এই থিওরী নিয়ে বিতর্ক আছে। যাই হোক, সভ্যতা বলতে আজ আমরা যা বুঝি এঁদের তা ছিল না। মনে হয় এরা সমুদ্র উপকূলে বাস করতো এবং মাছ ধরে শিকার করেই জীবিকা নির্বাহ করতো। এখন ভারতবর্ষে এঁরা প্রায় নেই বল্লেই চলে, তবে দক্ষিণ ভারতে ও আসামের কোন কোন অঞ্চলে এঁদের একটু-আধটু অবশেষ এখনো

১। Ibid—Page-201.

দেখা যায়। এঁরাই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী বলে নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

(২) অষ্ট্রিক জাতি ঃ

এঁদের চেহারা কেমন ছিল সঠিক জানা যায় না। তবে মনে হয় আকারে খাঁটো ছিল। গঙ্গার উপত্যকায়, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এরা ছড়িয়ে পড়ে। এবং অনেকে অনুমান করেন ধান ও ফলের চাষ, পান-সুপারি ব্যবহার, এগুলি ভারতীয় সভ্যতায় অষ্ট্রিকদের দান। এখন এই জাতির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই—উত্তর ভারতের সমভূমিতে হিন্দু সাধারণে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

(৩) দ্রাবিড় জাতি ঃ

এঁরা দেখতে লম্বা, সরল নাসিকা ও দীর্ঘ-করোটি ছিল বলে অনুমান হয়। অনেকেই মনে করেন মহেঞ্জোদরো ও হরাপ্পার নগর সভ্যতা এদেরই কীর্তি। হিন্দুদের ধ্যান ধারণা ও ধর্ম চিন্তায় দ্রাবিড়দের অবদান কম নয়।

এই তিনটি আর্যপূর্ব জাতি ছাড়া প্রোটো-অস্ট্রোলিয়েড নামে এক চতুর্থ জাতি ভারতে ছিল বলে অনেকে অনুমান করেছেন। হিমালয়ের পূর্ব-পাদদেশে মোঙ্গলয়েড জাতির প্রবেশ ও মিশ্রণের কথাও বলা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত জাতি কয়টির উত্তরসূরী হলো বর্তমান কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁড়াও, ছত্তিশগড়ি, নাগা, কুকি, খাসি, টোডা, টোটো ইত্যাদি ইত্যাদি এবং বর্তমানে ভারতে আদিবাসী নৃত্য বলতে যা প্রচলিত দেখা যায় তা এঁদেরই অবদান। এবার একে একে উত্তর, মধ্য, পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিন ভারতে প্রচলিত কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় আদিবাসী নাচের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো।

সুপ্রাচীন ভারতের অনুন্নত অধিবাসীরা ছিল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল ও পার্বত্যপ্রদেশে আত্মরক্ষা করে নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রাচীন ধারাকে আজও বজায় রেখেছে। চট্টগ্রাম, নেফা, আসামের আরাকান অঞ্চল, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন অঞ্চল, ত্রিপুরা, ভুটান সীমান্ত ও অন্যান্য অরণ্যপ্রদেশে তাদের কর্মজীবন ও আনন্দানুষ্ঠানে এখনও নৃত্য গীত অব্যাহত আছে। পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা গারো, কুকী, নাগা, কাচারি, লাখের, যোয়ো, ওঁরাও এবং অন্যান্য অধিবাসীদের নৃত্য গীত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। এই আদিবাসী নৃত্যকলাই ক্রমপরিণতি লাভ করে

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতায় শিল্প-সংস্কৃতির সম্পদরূপে একদা আত্মপ্রকাশ করেছিল—একথা ভুললে চলবে না। সুতরাং ভারতীয় অনার্যদের শিল্পকলায় অবদান আর্যদের তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল না।

।। আদিবাসী নৃত্য ।।

উত্তর-ভারত ঃ জিপ্‌সী বা ভঞ্জরা নৃত্য ঃ

জিপ্‌সীরা চিরকাল ভ্রাম্যমান জাতি। সারা পৃথিবীতেই এরা ছড়িয়ে আছে। তাদের এই চলমান জীবনে চিত্তবিনোদনের যতগুলি আয়োজন-উপকরণ আছে, তার মধ্যে নৃত্যই প্রধান, অবশ্য তা সঙ্গীতসহ।

এই জিপ্‌সীদের মধ্যে ধরা হয় পশ্চিমভারত রাজস্থানের ভঞ্জরাজাতি ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লাম্বার্ডিদের (Lambardi)। এদের সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে প্রাচীনকালে এঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করতো। গৃহপালিত পশু ও উটের পিঠে লবণ, আফিং ও শষ্য চাপিয়ে দূর দূর দেশে নিয়ে যেত, ব্যবসা করতো। তাঁদের প্রধান জীবিকাই ছিল এটা। পরে এদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভাঙন ধরে। এরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায়। দলপতির নির্দেশ মেনে চলে বেশীর ভাগ সাধারণ গৃহস্থ জীবন যাপন করে, গরু, মহিষ, পালে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে এরা পূজা করে। অদ্ভুত এদের জীবনধারা।

তারা এই বোহেমিয়ান জীবনে সারা ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত হোলী নৃত্যে মেতে-ওঠে। চৌদ্দমাত্রার নাচের তালে তৃতীয় তালে—ও শেষ মাত্রায় ঝোঁক দিয়ে নাচে (The dancc is usually done to a metre of fourteen counts with the emphasis on the third and last feets.)

ঢোলক বাজিয়ে নাচে, কখনো হাততালি দিয়ে বা কখনো রঙিন ছোট ছোট কাঠি বাজিয়ে নাচে। এঁদের নাচের গতিভঙ্গি বিভিন্ন রকমের। কখনো কুণ্ডলাকৃতি কখনো অগ্রপশ্চাৎ, কখনো ডান-বাম ভঙ্গি। মেয়েদের বেশভূষাতে ঘাগরা জাতীয় পোষাক, রূপো ও পুঁতির গহনা প্রভৃতি প্রধান। পুরুষরা যা পায় তাই পরে।

এদের নাচে যে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব রয়েছে, তা এঁদের রচিত গানগুলি বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যায়। এনাক্ষী ভবানী এঁদের ভাষার একটি গান ইংরেজীতে ভাবানুবাদ করেছেন। গানটি—

How pretty is my heavy dark hair,
How pretty are my sun-scorched arms,
How pretty are swinging jewels on them,
I look at the tanks and the wells full of water
I look at my poor little thirty animal."
"While my cows are quietly grazing,
I braid my thick knotted hair,
While my buffalows are quietly chewing,
I thread pearls into the tussels
That are fixed to the ends of my heavy dark hair."
"The pearls have come from the seas and the rivers,
Long days have we toiled to buy them,
My silver is shinning and weighs exactly
As much as the neck bells of my cow."[১]

॥ হোলী নৃত্য ॥

রাজস্থানের অন্তর্গত মেওয়ার অঞ্চলের ভীল নামের আদিবাসীরা এই হোলী নাচ করে। এই নাচে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব রয়েছে। হোলী নাচ অবশ্য ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। এই নাচ বসন্তকালের। ভীলেরা, আগুন জেলে তার চারদিকে ঘিরে ঘিরে নাচে। হাতে থাকে ছোট ছোট লাঠি। অনেকের হাতে থাকে কিছু শস্য। তাঁদের নির্দিষ্ট দেবদেবীকে ঐ শস্য দিয়ে আরাধনা করে। বড় বড় মাদলের মতো বাদ্য বাজে, ধীরে ধীরে নাচ সুরু হয়। নাচের দ্রুতগতি এলে পুরুষরা মুখে একপ্রকার শব্দ করে চিৎকারের মতো। এই নৃত্যের পদক্ষেপ প্রধানতঃ তিন পা এগুনো, তিন পা পেছোনো। কর্কশ (shrill) চিৎকারের মতো গানের সঙ্গে মহিলারা নাচে অংশ গ্রহণ করে। এই নাচে বীর রসের প্রকাশ বেশী। নৃত্য যখন চরমে ওঠে তখন পুরুষরা ঘুরতে ঘুরতে এক জনে আরেকজনের হাত ধরাধরি করে নাচে। মহিলারা তখন পুরুষদের হাতের উপর লাফিয়ে ওঠে এবং সব শেষে কাঁধে চড়ে। এ এক অদ্ভুত নাচ।

১। Ibid—Page 202.

যদিও এই নাচের নাম হোলী তবু আমাদের ধারণায় হোলীর কোন উপাদানই এতে নেই। রাধা কৃষ্ণও নেই—রং খেলাও নেই। শুধু আছে বসন্ত কালের প্রাকৃতিক সুষমায় মত্ত হয়ে এক অদ্ভুত রূপময় বীররসাত্মক নাচ।

॥ রোমান্টিক নাচ ॥

আদিবাসীদের মধ্যেও নৃত্যে 'রসন্যাস' (**Romance**) দেখা যায়। বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর এলাকার সাঁওতাল সম্প্রদায় পূর্ণিমা রাতে নাচে অংশ গ্রহণ করে। ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড় ঘেরা অরণ্য অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরা প্রাকৃতিক কারণেই একটু—রোমান্টিক। পুষ্ট-পেশাল দেহী পুরুষেরা মাদল নিয়ে সমবেত হয় এক জায়গায়। সেখানে কিছু রঙীন নিশানও উড়ায়। মহিলারা উজ্জ্বল রংয়ের শাড়ী হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত পরে, খোঁপায় ফুল গুঁজে, গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে কাছাকাছি কোন বটবৃক্ষের তলে সমবেত হয়। দূরে দেখা যায় তাঁদের নিজস্ব ধারার শিল্প মণ্ডিত মাটির বাড়ীগুলি। দুই তিন সারি করে হাত ধরাধরি করে তারা দাঁড়ায়। এবং মেয়েরাই প্রথম নাচ শুরু করে মাদল ও বাঁশীর সুরের তাল ও ছন্দে। শস্যের ডালগুলি যেমন বাতাসে নুইয়ে পড়ে আন্দোলিত হয়, তেমনি এদের দেহ সামনে দুলে দুলে নুইয়ে পড়ে, আবার পেছনে ফেরার সময় ক্রমশঃ ওঠে। এ যেন অনেকটা **Wordsworth's Lucy'র Bending Willow** থেকে বিনয় শিক্ষার মতো (**"the girls start moving and bending gracefully in imitation of the swaying corn stalks to and fro, to and fro, to the rhythmic sound of the drums and pipes.**) এ ভাবে বাঁশীর সুর ও মাদলের তালে তালে চাঁদনী রাতে নাচের একটা রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই **Pastoral Dance** হতো নীলের চাষ যখন শেষ হতো তখন অথবা অন্যান্য ফসল তোলার সময়। এ ছাড়া পুরুষরা শিকারী নৃত্যের মূকাভিনয় (**Mime**) করে বীরত্ব ব্যঞ্জক অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা।

॥ মাঘ নৃত্য ॥

বিহারের অন্তর্গত ছোট নাগপুরের সাঁওতালদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোণো অধিবাসী হোলো 'হোস' (**Hos**) সম্প্রদায়। এরা প্রকৃতিকে ভালবাসে অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই। 'দা সাউলী' নামক এক দেবতাকে কেন্দ্র করে

আচার-অনুষ্ঠান মূলক এই মাঘ-নাচ নাচতে এদের দেখা যায়। দেবতার কোন মূর্তি নেই। পুরো এক শালবৃক্ষ হলো এদের দেবতা। এবং তারা বিশ্বাস করে এই শাল গাছই তাদের জমি, গরু-বাছুর, আত্মীয় স্বজন সকলকে রক্ষা করে। সুতরাং এই দেবতার তুষ্টির জন্য ঢোলক বাজিয়ে নাচে। পুরুষেরা ধীর পদক্ষেপে ঘুরে ঘুরে নাচে; মেয়েরা অর্ধ-বৃত্ত রচনা করে কখনো ডাইনে-বামে আবার কখনো সামনে-পছনে গতিভঙ্গি করে নাচে। তারপর মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে—কখনো Clockwise, কখনো Anti-Clockwise পদ্ধতিতে। এই নাচ কিছুক্ষণ দেখার পর একটা এক-ঘেয়েমি আসে।

ক্ষেতে বীজ বোনার সময় এরা দাসাউলীর প্রতি স্তুতি—নৃত্য করে এই কামনায় যেন তাদের ফসল ভাল হয় এবং ঝুম ফসল ঘরে তোলার পরে তারা আবার কৃতজ্ঞতার নাচ নাচে মহা আনন্দ উল্লাসে। এ সময় আনন্দে এদের পদক্ষেপ দ্রুত হয় এবং হাতে তালি দিয়ে সর্বব্যাপী প্রফুল্লতায় যেন সমগ্র সমাজ নেচে ওঠে।

॥ শরহুল নৃত্য ॥ (**Sarhul**)

ছোট নাগপুরের ওড়াওঁদের যুদ্ধ নৃত্য (Martial Dance) হলো শরহুল। প্রথমে রামশিঙ্গা বাজিয়ে সকলকে আহ্বান করা হয়। অতঃপর যুবতীরা দলে দলে দুই তিন সারি বেঁধে নাচ শুরু করে। পুরুষেরা পেছনে দুই তিন সারি বেঁধে ধীর পদক্ষেপে প্রথমে নাচে তারপর নাচের লয় বেড়ে যায়। একদল এগিয়ে এসে, আরেক দল পিছিয়ে গিয়ে রীতিমত একটা যুদ্ধের নকল মহড়ার নাচ যেন এই শরহুল। এই নাচ সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত হয়।

॥ করমা বা করম নৃত্য ॥ (কর্তরমা)

ছোটনাগপুরের কোল সম্প্রদায় বর্ষাকালে (আগষ্টের মাঝামাঝি সময়ে) বিশেষ করে বীজ বোনা এবং ফসল ঘরে তোলার মধ্যবর্তী সময়ে এই করমা নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। তখন হাতে তেমন কাজ থাকে না। গ্রামের বিশেষ-ভাবে নির্দিষ্ট মুক্তাঙ্গন নৃত্যস্থলে ঐ করমা গাছের ডাল কেটে পুঁতে দেয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কাঁধে ছোট লাঠি নিয়ে গান ও মাদলের তালে নাচ সুরু করে—প্রার্থনা জানায় তাঁদের ফসল যেন ভাল হয়। মেয়েরা চাতক পাখীর অনুকরণে ভঙ্গি করে নাচে। এই নাচেও সেই কামনা পুরণের ইঙ্গিত।

।। কোল নৃত্য ।।

বিহারের ছোটনাগপুরের আদিবাসী কোল সম্প্রদায়ের এই নাচও শস্যকে কেন্দ্র করেই। এতে মেয়েদের প্রাধান্য বেশী। অন্যান্য আদিবাসী নৃত্যের মতোই ভঙ্গি এবং সঙ্গে থাকে মাদল জাতীয় বাদ্য ও বাঁশী। নাচের শেষে সকলে নতজানু হয়ে পৃথিবী-মাকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করে যাতে প্রচুর ফসল হয়। এঁরা নিজেদের প্রস্তুত অলংকার পরে নাচে।

আদিবাসীদের নাচ যে নিছক আচার-অনুষ্ঠানমূলক (Ritualistic) তা পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝা যায়। ওদের দেবতা আমাদের মতো কোন মূর্তি নয়। হয় কোন গাছ বা পশু অথবা মাদল বা কোন যন্ত্র। ভুটান সীমান্তে আমি নিজে দেখে এসেছি 'টোটো'দের মধ্যে দেবতা বলতে তিনটে বড় বড় ঝুলন্ত মাদল। এই মাদলকে ঘিরেই এরা বর্ষাকালে নাচে।

।। আদিবাসী নৃত্য—মধ্যভারত ।।

মধ্য প্রদেশে অনেক আদিবাসী ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে। এঁদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ নাচের প্রচলন আছে। মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। এই নাচগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যে লোকায়ত জীবন ধাবা গড়ে উঠেছে তার প্রতিফলন।

(১) গোণ্ডাদের করম বা করমা নৃত্য ঃ

গোণ্ডারা খুবই প্রাচীন জাতি। অনেকের মতে প্রাক্ আর্যযুগের। সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর পূর্বপ্রান্তে মণ্ডলা নামক স্থানে অবস্থিত মৈখাল পাহাড়ে এদের বাস। এ ছাড়া উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশের প্রান্ত জেলাগুলিতে এদের দেখা যায়। এরা প্রকৃতির কোলেই লালিত-পালিত। তাই প্রকৃতিকে এরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। এরা নৃত্যের মাধ্যমে দেবতা 'ভীমসেন'-এর পূজো করে। এই নৃত্যানুষ্ঠান সাধারণতঃ হয় বর্ষাসমাগমে বা নবান্ন উৎসবে বা বিবাহের সময়। কৃষিভিত্তিক সমাজে এ নাচ অপরিহার্য। ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করে বীজ বোনার সময়ও এই 'কর্মানৃত্য' অনুষ্ঠিত হয় সারা রাত ধরে। এর সঙ্গে চলে ওদের নিজেদের ভাষায় রচিত গান।

এই নৃত্যে যুবতীরা একের হাত অপরের কোমরে ধরে সমান্তরাল ভাবে প্রথমে দাঁড়ায়। নাচের সময় কখনো অর্ধবৃত্ত রচনা করে—আবার সমান্তরাল

হয়। সামনে নাচে পুরুষদের দল—তাঁরা বড় বড় মাদল-সদৃশ যন্ত্র বাজায়। বিভিন্ন ছন্দে যুবতীরা পুরুষদের মুখোমুখি হয়—আবার পিছিয়ে যায়। এই হলো নৃত্যের আঙ্গিক। সহজ এবং সরল পদক্ষেপ। দেহ কখনো 'অতি ভঙ্গ' হয় না।

এই যুবতীদের থেকে একটু দূরে আরেকদল পুরুষ একটি বৃত্ত রচনা করে পৌরুষযুক্ত অঙ্গভঙ্গি করে মণ্ডলাকারে নাচে। এই নাচের যখন 'টেম্পো' অবস্থা তখন মেয়েরা তাঁদের চারিদিকে ঘিরে নাচতে থাকে। ঠিক সেই সময় ভাবের আতিশয্যে কোন কোন পুরুষ ভীলদের নাচের মতো কাঁধে চড়ে নানা কসরৎ দেখিয়ে নাচে। তখন বাদ্য-ভাণ্ড তীব্র শব্দে বাজে। অকস্মাৎ কাঁধ থেকে লাফিয়ে পড়ে আবাব বৃত্ত রচনা করে নাচতে থাকে। এই নাচকে বলা যায়—"full of spirit and enthusiasm."

"Like a Game of 'Oranges and Lemon'.

হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে গোণ্ডদের নাচের গুরুত্ব সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—

"Among the tribals of India, the most ancient and the most interesting are the Gonda of Madhya Pradesh, Their culture is very ancient. They ruled over Madhya Pradesh for a long time. 'Gondwana was a land of 36 Gond Samsthanams (Chattis Garh—এদের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'ছত্তিশ গড়ি'). The most famous dance of Gonds is the "Karma" Dance. It is performed in the beginning of rainy season, to propitiate Nature and in order to obtain Good Crops. The Gonds believe that Mother Nature will be pleased by this dance—worship and will bestow fabours upon them."[১]

(এখানেও যাদু বিশ্বাসমূলক কামনা পূরণের ইঙ্গিত লক্ষণীয়) এরপর 'নৃত্যরত্নাবলী' গ্রন্থে উল্লেখিত 'গোণ্ডলি' নাচ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"The 'Gondli' dance described in 'Nritta Ratnavali' and other ancient books is a speciality of the Gonds. From times

১। Nritya Niketan Souvenir (Hyderabad) Page 10-11.

immemorial Andhras have had close connections with the Gonds. Actually Baster which is predominantly a land of Gonds, was part of the region over which Andhras held sway far centuries. As the rulers of Andhra mixed with the rulers of Gonds Samsthanam frequently some important features of Gonds dances were introduced in the Andnra Art. In Adilabad district of Telengana, in Bastar, Siruvoncha and Chanda there are still several families of Gond Rajhas."[১]

॥ **উৎসব নৃত্য** ॥ (**Festival Dance**)

দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মারিয়া-মুরিয়া (Maria-Muria) গোণ্ড অধিবাসীদের এক যৌথ নৃত্য হল উৎসবনৃত্য। এই নৃত্য সন্ধ্যা থেকে সারারাত ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্য সাধারণতঃ এদের সমাজের কোন দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, বিভিন্ন ঋতু উৎসবে, আচার-অনুষ্ঠানমূলক কাজে অথবা বিশেষ করে বিবাহ উৎসবে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই উৎসব নৃত্যগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমাজের সকলে অংশ গ্রহণ করে। এই নৃত্যকে বলা যায় যৌথ নৃত্য (Collective Dance)। রাতে মশাল জেলে শত শত স্ত্রী-পুরুষ মিলে তাঁদের পুষ্ট পেশাল দেহের একটু মোচড়ে যেন মীড় লাগায় সকলের মনে। বাঁশী, মাদল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে বিপুলায়তন শব্দ ও গানের মধ্যে তালে তালে এরা নাচে। মনের উন্মাদনায় নাচে সারারাত ধরে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল পাহাড়ের কোলে সাঁওতালদের বিবাহ উৎসবের নাচ 'বাদ্না'-র কথা। এ নাচের দীর্ঘায়ত রূপটি দেখলে মনে হয় অষ্টপ্রহর কীর্তনের কথা। অষ্টপ্রহর কীর্তন যেমন বিরামহীনভাবে চলে—একদল ক্লান্ত হলে আরেকদল আসরে আসে, তেমনি বাদনা নাচেও দেখেছি, একদল ক্লান্ত হলে আরেকদল এসে সে জায়গা পূর্ণ করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। এই 'বাদ্না' বিবাহ উৎসবের নাচ। বর-কনে মাঝে থাকে। চারিদিকে ঘিরে থাকে বন্ধু বন্ধুনীর দল। একটু দূরেই থাকে মাদল বাদক ও বংশী বাদক। মশালের আলোয় অথবা চাঁদনী রাতে যখন এক রকম সুর করে পুষ্ট পেশাল দেহগুলি

১। Ibid Page-12.

তালে তালে নাচতে থাকে এবং মাদলের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়, তখনকার পরিবেশ ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষকে যেন অন্য এক জগতে নিয়ে যায়। তখন মাদল বাঁশী ও মলের (ঘুঁংঘুঁর) ছম্ ছম্ শব্দগুলি যেন কথা হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন—

মাদল বলে—দিপির দিপাং | দিপির দিপাং | দিপির দিপাং | তাং
বাঁশী বলে—তুতুর তুয়া | তুতুর তুয়া | তুতুর তুয়া | তু
আর মল বলে—ঝিনিক ঝিন্ ঝিনিক্ ঝিন্
শুধবো আজি প্রাণের ঋণ।

এই প্রাণের ঋণ শোধ করার সাধনা বোধ হয় মানুষের চিরন্তন সাধনা। এটা আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা।

মধ্য প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পূর্ণিমা রাতে 'নবরাণী' নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া শক্তিদেবী এবং দণ্ডেশ্বরীর নামে ঐ অঞ্চলের আদিবাসীরা দেওয়ারী নৃত্য, চৈত নৃত্য, গুরু নৃত্য, গোঞ্চো নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান করে বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য। যুবতী ও মহিলারা 'লক্ষ্মীজাগর নৃত্য' করেন প্রচুর ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিকারিণী হবার জন্য। এইসব নাচগুলি আদিবাসীদের সমাজে অনেক পরে এসেছে।

বৈগা উপজাতিদের মধ্যে করমা নৃত্যের প্রচলন আছে। এই বৈগারা নতুন বছর ও দেওয়ালীর সময় 'বাইনা নাচ' নাচে। বৈগা স্ত্রীলোকেরা কাকাতুয়া পাখীর অনুকরণে 'বিলমা', 'সুরা' প্রভৃতি নামের নাচগুলি করে। এ ছাড়া 'আপাড়ি' 'শৈলা', 'দণ্ডপাতা' (কাঠি নৃত্য). 'ছম্‌কা কুণ্ডা শৈলা' (শিকারী নৃত্য) প্রভৃতি নাচও আছে। এই 'শৈলা নাচ' অনেক প্রকার। যেমন বৈঠক শৈলা, অর্তরী শৈলা, শিকাই শৈলা, চক্রসার শৈলা প্রভৃতি। অবশ্য এই নাচগুলি করমা নাচেরই বিশেষ বিশেষ আলাদা রূপ।

বস্তার জেলায় ঘুরিয়া আদিবাসীদের 'মান্ত্রী' নাচ খুবই প্রসিদ্ধ। এই নাচ, পরিপূর্ণ একটি বিবাহ উৎসবের নাচ। এ ছাড়া কিছু ধর্মীয় নাচও আছে। এদের 'বাইসন' (Bison) নৃত্য খুবই জাঁকজমক পূর্ণ। নৃত্যশিল্পীরা বড় বড় বন্য মহিষের শিং মাথার উপরে লাগিয়ে গায়ে ময়ূরের পাখা বা পাখীর পালক দিয়ে সেজে বিপুল বিক্রমে নাচে। এ ভাবে বিভিন্ন নাচের মাধ্যমে আদিবাসীরা শ্রমকে লাঘব করে, প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে।

॥ আদিবাসী নৃত্য—পূর্বভারত ॥

কিরাতার্জ্জুন নাচ—উড়িষ্যার পাইকা নামক আদিবাসীরা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বনে নাচে। এই কিরাতার্জ্জুন নৃত্যের অনুষ্ঠান তারই একটি। এ ছাড়া বিষ্ণুর বাহনকে রূপ দিয়ে 'গরুর পাখীর নাচ' নাচে। এই কিরাত সম্প্রদায় সাধারণতঃ শিকারজীবী। এই নাচের মধ্য দিয়ে শিকারজীবী সম্প্রদায়ের কার্যপ্রণালী ও জীবনগাথা যেমন রূপায়িত হতে দেখা যায়, তেমনি পুরাণ ও কিংবদন্তীর চরিত্রগুলিকে যখন এরা নাচের রূপ দেয়, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই নাচ মূলতঃ আদিবাসী নাচ হলেও সমাজ সংস্কারের অনেক পরবর্তীকালে এগুলির উদ্ভব হয়েছে। কারণ আদিবাসীদের প্রাচীনতম নাচগুলিতে ধর্ম বা দেবদেবীর তেমন কোন স্থান হয়তো ছিল না। ছিল নিছক আচার অনুষ্ঠান। পরে ঐ সব নাচে ধর্ম ও তার হাত ধরে দেবদেবীরা এসেছেন।

॥ মায়াশবরী নাচ ॥

এই নাচকে আদিবাসী নৃত্যনাট্য বলা যেতে পারে। কারণ এই নাচে নাটকীয়তা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আদিবাসী আঙ্গিকে নৃত্যাভিনয় হতে দেখা যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে Rural tribal dance drama." বিখ্যাত সেই কাহিনী, সমুদ্র মন্থনের সময় শিবকে প্রলুব্ধ করার জন্য বিষ্ণু যে মোহিনী মায়া বিস্তার করেছিলেন, তাতে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে শবরী মূর্তি ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট করে কৈলাস অবধি নিয়ে এলে শিব শ্রীকৃষ্ণকে প্রায় হত্যা করতে উদ্যত হন তারপর পার্বতী যখন সকল কথা প্রকাশ করেন তখন এদের মোহভঙ্গ হয়—এই কাহিনী পুরুলিয়ার ছৌ নাচেও অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। আদিবাসীদের এই নৃত্যের মধ্যে যেন কবির সেই বিখ্যাত বাণীই ধ্বনিত হয়েছে 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'।

এই নাচ যদিও আদিবাসীরা করে থাকেন তবু মনে হয় এই নাচকে পুরোপুরি Tribal না বলে বোধ হয় Quasi-folk বলা যায়। কেন বলা যায় তা আগেই Quasi-Folk Dance বিশ্লেষণ করে দেখানো আছে।

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের আদিবাসীরা 'করমা' নাচ করে বসন্তকালের একাদশী তিথিতে। এই 'করমা' নাচ প্রায় সব আদিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত

দেখা যায়। উড়িষ্যার আদিবাসীদের মধ্যে 'যত্নুর নাচ' যৌথ নাচ (community dance) 'বিবাহের নাচ', 'শস্য উৎসবের নাচ', 'হোলি নাচ', 'স্বপ্না নাচ', 'দেশী কর্ম নাচ', 'দাল্খাই নাচ', 'ঘুরখা নাচ', 'কোইকাবাদি নাচ', 'যুদ্ধ নাচ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

আসামের নাগাদের 'বর্শা নাচ', 'খম্বালিয়া নাচ', 'লুইরালিস্ নাচ' এ ছাড়া কুকিদের 'বাঁশনৃত্য' প্রভৃতি প্রধান।

পশ্চিম ভারতে ঐ একই ধরনের 'শস্য উৎসবের নাচ', 'হোলি নাচ' প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে টোডাদের নাচ, দক্ষিণ ভারতীয় গোণ্ডাদের 'দণ্ডবিরা নাচ' এ ছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন সামাজিক নাচও প্রচলিত আছে আদিবাসীদের মধ্যে। সারা ভারত জুড়ে এমন কত অজস্র নাচ, আদিবাসীদের সামাজিক ও বর্তমান ধর্মীয় দিক বিধৃত করে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৃত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (সমীক্ষা)

(সিন্ধু সভ্যতা। প্রাক্‌বৈদিক যুগ)

(আনুমানিক সময়কাল—খ্রীঃ পূঃ ৩০০০)

পটভূমিকা

ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাসে এই সিন্ধু সভ্যতার যুগকে নানা নামে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, আদিম, প্রাগৈতিহাসিক, প্রাগ্‌বৈদিক প্রভৃতি। আসলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের তৃতীয় স্তরে এই যুগের সূচনা। অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নতুন প্রস্তর যুগ, তারপর তাম্রযুগ—এই তাম্রযুগেই সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ধরা হয়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে কৃষিকার্যের আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মানুষের সভ্যতা প্রথম বাঁক ফিরে এক ধাপে অনেক উন্নত স্তরে উঠে যায় কৃষিকর্মের আবিষ্কারের পর। এই আদিম কৃষি সভ্যতাকে নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা বলা হয়। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গর্ডন চাইল্ডের (V. Gordon Childe) মতে সুদূর প্রাগিতিহাসের শেষ রাত্রির আলোছায়ায় নব্যপ্রস্তর যুগের এই 'কৃষিবিপ্লব' ঘটে যায়। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে একেবারে প্রাগিতিহাসের উষাকালে, যখন চাষ করে ফসল ফলানো ছাড়াও মানুষ তামার মত ধাতু ব্যবহার করতে শেখে, দ্রব্যের আদান-প্রদান করে বাণিজ্য আরম্ভ করে এবং চাষ থেকে উৎপন্ন ফসলের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে নগর সভ্যতার কেন্দ্র গড়ে তোলে। প্রথম বিপ্লব ঘটেছিল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দশ-বারো হাজার বছর আগে। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে প্রায় খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বছর আগে। গর্ডন চাইল্ড এই দ্বিতীয় বিপ্লবের সীমানা নির্দেশ করেছেন এইভাবে—পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি ও ভূমধ্যসাগর, পূর্বে থর মরুভূমি ও হিমালয়, উত্তরে বলকান, ককেসাস, হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি (Tropic of Cancer)। পশ্চিমের অংশটিকে ঐতিহাসিকেরা বলেন 'উর্বর অর্ধচন্দ্রভূমি' (Fertile Crescent)। পূর্বের অংশটি প্রধানত ভারতের সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র। (এই সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রেই মূল্যবান নৃত্যভাস্কর্য পাওয়া গেছে। এই ভাস্কর্য সবচেয়ে প্রাচীন নৃত্য বিষয়ক উপাদান।)

॥ **সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র** ॥ (এই স্থানটি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত)

সিন্ধু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র দুটি—হরপ্পা ও মহেঞ্জদড়ো—আমাদের কাছে বেশী পরিচিত। হরপ্পা হল পাঞ্জাবের মণ্টেগোমারী জেলায়, মহেঞ্জদড়ো সিন্ধুদেশের লাড়কানা জেলায়। এই দুটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও প্রায় ৮০টি কেন্দ্র জুড়ে এখানে এক বিশাল সভ্যতার রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উত্তরে সিমলা পাহাড়ের নীচে রূপার থেকে করাচীর প্রায় ৩০০ মাইল পশ্চিমে আরব সাগরের কাছে সুক্‌তানেমদর পর্যন্ত এই সভ্যতার সীমানা প্রসারিত। হিমালয় থেকে আরব সাগর পর্যন্ত নদী-উপত্যকায় কেন্দ্রগুলি সিন্ধু ও ঘগ্‌গর নদনদী মালার ধারাপথে অবস্থিত বলে এই সভ্যতার নাম দেওয়া হয়েছে 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা' বা 'সিন্ধু সভ্যতা'।

হরপ্পা-মহেঞ্জদড়োতে ভূগর্ভ থেকে নগরের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা বেশ বিন্যস্ত ও পরিকল্পনাসম্মত। নগর দুর্গ থেকে আসল নগর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে একটি টানা রাস্তা আছে, পূর্ব-পশ্চিমে আরেকটি টানা রাস্তাকে এ রাস্তা অতিক্রম করে গেছে। নগরের প্রধান রাস্তাটি এর প্রায় সমান্তরাল। রাস্তা-গুলির দৈর্ঘ্য আধ-মাইলের কিছু বেশী এবং প্রস্থে ১৪ ফুট থেকে প্রায় ৩০ ফুট। মোট পথ ও অলিগলিগুলি আঁকাবাঁকা হলেও অন্ধগলি নেই। গলিগুলি ৪ ফুট থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত চওড়া। নগরের রাস্তাগুলির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, এদের ধার ঘেঁষে তলা দিয়ে ড্রেন বা নর্দমা চলে গেছে। সেই যুগের স্থপতি বিদ্যার এ এক অপূর্ব নিদর্শন। ছোট ছোট রাস্তা ও লোকের বাড়ী থেকে ড্রেনের জল এসে ইঁট দিয়ে গাঁথা চৌবাচ্চায় বা মাটির হাঁড়ি কলসী জালায় পড়ার ব্যবস্থা আছে। নগর দুর্গের চারিদিকে কোন প্রাচীর ছিল বলে মনে হয় না।

সর্বসাধারণের ব্যবহারযুক্ত ঘরবাড়ির মধ্যে মহেঞ্জদড়োর বিরাট স্নানাগার, স্তম্ভযুক্ত বড় হল-ঘর (মনে হয় দেবালয়) এবং হরপ্পার বিশাল 'শস্যাগার' বা 'গোলা' অন্যতম। এই শস্যাগার প্রমাণ করে তখনকার মানুষ ক্রম-বিকাশের ধারায় **Higher pastoral stage**-এ উত্তীর্ণ হয়েছে। এক কৃষিভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা তখনকার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। শুধু তাই নয় ঐ স্তম্ভযুক্ত বড় হলঘর যাকে ঐতিহাসিকরা দেবালয় বলে অনুমান করেছেন, তাতে হয়তো নৃত্যগীতের আয়োজন হতো।

॥ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ॥

যে কোন দেশের শিল্পকলার উপর সেই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় নানা প্রভাব পড়ে। যদিও সিন্ধুসভ্যতার যুগে নৃত্যের উপাদান হিসেবে দুটি নৃত্যভাস্কর্য পাওয়া গেছে (তার একটি আবার ভাঙা) তবু যে সমাজ ব্যবস্থায় ঐ যুগের মানুষেরা নাচের চর্চা করেছেন তার সূত্রটি জানা দরকার।

আমরা লক্ষ্য করেছি এই সময় কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং অনুমান করা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বে আদিবাসী আচার-অনুষ্ঠান-মূলক নৃত্য তখনও অনুসৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, নগরের রূপ দেখে সিন্ধু-সভ্যতার নাগরিক জীবনেরও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ঘরের বাসন-কোসন ছিল পোড়ামাটি, পাথর, তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও হাতীর দাঁতের তৈরী। এখানে স্মরণীয় যে নৃত্যভাস্কর্যটি ব্রোঞ্জ নির্মিত। হাতিয়ার (tolls) ও অস্ত্রশস্ত্র অধিকাংশই দেখা যায় তামার বা ব্রোঞ্জের। লোহার ব্যবহার তখনো সুরু হয় নি। এই সব তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র দেখে মনে হয় সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা সেই সময় ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিল।

এখানকার অধিবাসীরা গম, বার্লি, ছোলা প্রভৃতির চাষ করতো। কিন্তু তারা নিরামিষভোজী ছিল বলে মনে হয় না। নানাবিধ প্রমাণ থেকে বোঝা যায় মাছ-মাংসও খেত। খুঁড়বার সময় নানা অঞ্চলের বহু স্থান থেকে মাছ-মাংসের হাড় পাওয়া গেছে। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা নানা রকমের পশুপালনও করতো। যেমন কুকুর, বিড়াল, কুঁজতোলা গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি। উট না পাওয়া যাওয়াতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সিন্ধু-উপত্যকার পরিবেশে তখন উত্তাপ ও শুষ্কতার মাত্রা খুব বেশী ছিল না। আর ঘোড়ার মত গতিশীল জন্তু তারা নিজেদের বশে আনতে পারে নি বলেই আর্যরা প্রধানতঃ ঘোড়ার জোরে তাদের জয় করেছে।

॥ সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ॥

ভারতের ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতার যথেষ্ট গুরুত্বও আছে। প্রথম গুরুত্ব হল : আগে প্রাচীন সভ্যতার দিগন্ত ছিল আর্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় পাওয়ার পরে এখন তা নিঃসন্দেহে আরও প্রায় দুই হাজার বছর পিছিয়ে গেছে। আমরাও তাই নাচের ইতিহাসের প্রামাণ্য উপাদান এ যুগ থেকেই ধরতে পেরেছি।

দ্বিতীয় গুরুত্ব হল : কিছুকাল আগে পর্যন্ত পণ্ডিতেরা মনে করতেন ভারতীয় সভ্যতার উদ্‌যোগপর্বে যা কিছু দান তা প্রধানতঃ আর্য্যদেরই। সিন্ধুসভ্যতা এই ধারণা ভুল প্রমাণ করে তা বদলাতে বাধ্য করেছে। প্রথম, অন্ততঃ এটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে আর্যরা আসবার আগে ভারতের মাটিতে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল এবং তার জন্য বাইরের কোন প্রেরণা তার প্রয়োজন হয়নি। তৃতীয় গুরুত্ব হল : একই সময়ে পৃথিবীর যে সব কেন্দ্রে উন্নত নগর-কেন্দ্রিক মানব-সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তা কেবল পশ্চিম এশিয়া বা নীলনদের উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতও তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। চতুর্থ গুরুত্ব হল, আগে আর্যদের এদেশে আগমনের ব্যাপারটা ধোঁয়াটে তো ছিলই, আর্য্যপূর্ব কালও ছিল গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর্যরা কারা ও কখন এল, এসে বেদ বর্ণিত যে সব নগর দুর্গ ধ্বংস করলো তা কোথাকার ও কাদের, সিন্ধু-সভ্যতার উপাদান থেকে এই সব জটিল সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। আর্যপূর্ব যুগের ইতিহাসের বিরাট শূন্যতা আজ অনেকটা পূরণ হয়ে গেছে। নানা দিক থেকে তাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতা নির্ধারণে এই সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্ব অপরিসীম।[১]

॥ সিন্ধুসভ্যতায় নৃত্যপ্রসঙ্গ ॥

আমরা জানি, ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল কেটে গেলে কালান্তরের সূচনা হয় বৈদিক আর্যদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে। মোটামুটি তখন থেকেই আমরা ভারতীয় সমাজ ও জীবনযাত্রার একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাই। কিন্তু নাচের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে, আর্যদের এদেশে আসবার আগে যে সিন্ধুসভ্যতা ছিল, সেই সময়ের দুটি নৃত্যবিষয়ক উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ এই সময়কে ধরা হয় দ্রাবিড় যুগ, সিন্ধুসভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুকাল। এই সময় মহেঞ্জদড়ো, হরপ্পা ও চন্নহুদড়ো সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহেঞ্জদড়ো ও হরপ্পা থেকে নৃত্য ভঙ্গিমাযুক্ত দুটি মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তি দুটির কথা সংক্ষেপে বিবৃত হল।

॥ ভারতীয় নৃত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ॥

মহেঞ্জদড়োতে নৃত্যভঙ্গিমায় যে মূর্তিটি পাওয়া গেছে তা ব্রোঞ্জ নির্মিত এবং নারীমূর্তি, ডঃ জিমারের মতে মূর্তিটিতে তামার অংশও আছে। মূর্তিটিকে

১। ভারত জনের কথা—বিনয় ঘোষ (বাক্‌সাহিত্য—১৯৬৩, পৃঃ ১৯-২৪)।

চিহ্নিত করা হয়েছে "Copper dancing girl" রূপে। মূর্তির উচ্চতা ৪.২ ইঞ্চি। নৃত্যভঙ্গিমা দেখে মনে হয় যে নৃত্যরত কোন দেবদাসীর মূর্তি।

Copper Dancing Girl

(এখানে স্মরণ করা যায় যে, এর পরবর্তীকালে বৈদিক যুগে 'মহাব্রত' অনুষ্ঠানে দেবদাসীদের নৃত্যের কথা আছে) মূর্তির হাতের বাজু বেশ চকচকে। ডান হাত কনুই বেঁকিয়ে কোমরে স্থাপিত। বাঁ হাত সোজা এসে অগ্রসরমান বাঁ হাঁটুর উপর রাখা। বাঁ হাতে পদ্মকোশ মুদ্রা। পদক্ষেপের ভঙ্গি দেখে মনে হয় ছন্দে ছন্দে নেচে চলেছে।

হরপ্পার বৃহৎ শস্যভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষ-এ আরেকটি নৃত্যরত মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। মূর্তিটি ধূসর রঙের পাথর দিয়ে তৈরী, উচ্চতা ৩·৯ ইঞ্চি।

Gray stone Toroso of dancer

মূর্তির অবয়ব দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এটি নারী মূর্তি। ডঃ ভিমার মূর্তিটিকে উল্লেখ করেছেন এই ভাবে—"gray stone toroso of dancer", মূর্তিটির [illegible]

হাতই প্রায় ভাঙ্গা। সুতরাং হাতের গতিভঙ্গি বুঝবার উপায় নেই। ডান-পা উরু পর্যন্ত আছে, তার পরেই ভাঙ্গা। বাঁ পাও ভাঙ্গা। তবে ভঙ্গিটি দেখে মনে হয় প্রচলিত নটরাজ মূর্তির যেমন বাঁ পা উপরে উঁচু হয়ে থাকে—অনেকটা তেমনি।

এ ছাড়াও হরপ্পার আরেকটি ভাঙ্গা মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি লাল পাথরের তৈরী। মূর্তিটি পুরুষের। দৃপ্ত ভঙ্গি দেখে অনুমান করা যায় নৃত্যরত কোন পুরুষের মূর্তি। কিন্তু মূর্তিটি এমনভাবে ভাঙ্গা যে, হাত-পায়ের গতিভঙ্গি স্পষ্ট বোঝা যায় না। এ ছাড়াও আরও কিছু মূর্তি ও শীলমোহর আছে।

মনে হয় ভারতীয় নৃত্যকলার দৃশ্যমান প্রাচীনতম নিদর্শন বা উপাদান হিসেবে এই মূর্তি কয়টিকে ধরা যেতে পারে। অন্তত: এর আগের যুগের কোন নৃত্যভাস্কর্য যতদিন আবিষ্কৃত না হচ্ছে। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলায় একক, দ্বৈত ও সমবেত বা দলবদ্ধ নৃত্যের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধুসভ্যতার সময়ে প্রাপ্ত এই মূর্তিগুলিতে একক নৃত্যের আঙ্গিকই লক্ষ্য করার মতো। এখানে আমার একটি প্রশ্ন জাগছে—যে যুগে নৃত্যে সামাজিক চেতনা (Collective emotion) দলবদ্ধ নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হবার কথা সেখানে প্রাপ্ত মূর্তি দুটিই একক নৃত্যশিল্পীর কেন? ভবিষ্যতে কোন গবেষক এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন। তবে মনে হয় আমরা যে কয়টি নিদর্শন পেয়েছি তা একক নৃত্যের, তার কারণ শিল্পীরা হয়তো একক নৃত্যভঙ্গিই রূপ দিয়েছেন অথবা দ্বৈত বা সমবেত হয়তো ছিল, আমরা তা এখনো পাইনি। ভবিষ্যতে ঐ সময়কার আরও কিছু নৃত্যভঙ্গিযুক্ত মূর্তি আবিষ্কৃত হলে উক্ত জিজ্ঞাসার মীমাংসা হতে পারে।

যদিও ভারতীয় নৃত্যের জয়যাত্রা ঠিক কবে থেকে সুরু হয়েছিল তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। শুধু সুপ্রাচীন সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জদড়ো ও হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় তখনকার মানুষেরা যে সমাজে বাস করতেন সেই সমাজে চারুকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের চেতনা জাগ্রত ছিল। নৃত্য গীত ও বাদ্যের তাঁরা যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন—'প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু-উপত্যকায় ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেন। এই

খনন ও আবিষ্কারের কাজে তাঁকে সাহায্য করেন স্যার জন মার্শাল, রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী, আর্নেষ্ট ম্যাকে, রায় বাহাদুর ননীগোপাল মজুমদার, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, রায় বাহাদুর দীক্ষিত ও আরও অনেক বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক।

এই আবিষ্কারে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যের উপাদান রয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও মনীষীরা সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ে নানা উপাদানের উল্লেখ করে স্বীকার করেছেন যে সেই সুদূর অতীতে ভারতীয় সমাজে সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। ষ্টুয়ার্ট পিগটও উল্লেখ করেছেন —আর্য সঙ্গীতের চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পাই সিন্ধুসভ্যতায়/ নৃত্যের সঙ্গে করতালির সহযোগ থাকতো। এ ছাড়া ছিল মৃদঙ্গ, বেণু, বা বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণাজাতীয় বাদ্য হার্প তথা রবাবজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, তাতে লীলায়িত হত সাতটি স্বর।[১]

রায় বাহাদুর দীক্ষিত বলেছেন—নৃত্য ছাড়া কণ্ঠ সঙ্গীতেরও যে অনুশীলন হতো সিন্ধু উপত্যকায় অধিবাসীদের ভেতর তা বেশ বোঝা যায়। তন্ত্রীযুক্ত বীণাদি ও চামড়ার তৈরী মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্য তো ছিলই। গান ও নাচের সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষা করতো বাদ্যযন্ত্রগুলি।[২]

ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন, একটি শীলমোহরে স্পষ্টভাবে নৃত্যের প্রতিচ্ছবি খোদাই করা আছে। একজন বাদক, একটি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে আর অন্য সকলে সেই মৃদঙ্গ বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করছে। হরপ্পার একটি শীলমোহরে পাওয়া গেছে একটি বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে একজন মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। (আজকের দিনে যেমন আমরা দেখে থাকি সঙ্গীতের তালে তালে হিংস্র সর্প ও চতুর বানরকে পর্যন্ত নাচানো হয় তেমনি সিন্ধু সভ্যতার যুগের শীলমোহরে প্রাপ্ত মৃদঙ্গ বাদকের পাশে যে হিংস্র বাঘকে দেখা যাচ্ছে তার থেকে মনে হয় সেই যুগে মানুষ ছাড়াও পশুকে বশ করার ক্ষমতা সঙ্গীত ও নৃত্যের ছিল।)

আর একটি শীলমোহরে আছে একটি নৃত্যশীলা নারীমূর্তি। আর একটি দেখা যায় একজন পুরুষের গলায় একটি মৃদঙ্গ ঝোলানো আছে।

১। **Prehistoric India—Stuart Piggot. (1950) Penguin, Page 270-271.**
২। **Prehistoric civilisation of Indus Valley (Madras 1939), Page 30.**
Roy Bahadur Dikhit.

("One Seal has presented a dancing scene. One man is beating a drum and others are dancing to the tune. On one seal from Harappa a man is playing on a drum before tiger. On another, a woman is dancing. In one case, a male figure has a drum hung round his neck."[১])

রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী ব্রোঞ্জের যে নৃত্যশীলা মূর্তিটি ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কার করেন তা সম্পূর্ণ নগ্ন ও হাতে বড় বড় অলংকার থাকায় স্যার জন মার্শাল, আর্নেষ্ট ম্যাকে প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নারী মূর্তিটিকে আদিম অধিবাসীদের শ্রেণীভূক্ত বলেন, কেননা মূর্তিটি দেখতে দক্ষিণ বেলুচিস্তানের অধিবাসীদের মত। নারীর বেশভূষা ও কেশ পরিপাট্যও অনেকটা অনার্যোচিত।[২] ষ্টুয়ার্ট পিগটও দক্ষিণ বেলুচিস্থানের অধিবাসীদের কেশবিন্যাস ও অপরাপর সাজসজ্জা থাকায় এই ধরনের মন্তব্যই করেছেন। তাঁর মতে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার পরিশ্রান্ত বণিকেরা শ্রম দূর করার জন্য দক্ষিণ বেলুচিস্তান থেকে ঐ সকল নারীদের আমদানী করতো।

("But the bronze of the Dancing girl from Mohenjodaro, so closely representing the type of hair dressing and adorment of the Kulli Culture of South Beluchistan, does at least suggest that the merchants returning along the southerly caravan routes may have brought with them girls whose exotic dancing and unsophisticated charms might be thought to tickle the fancy of the tired businessmen of Harappa or Mohenjodaro."[৩]

১। Indian Culture. Vol. IV. Octo, 1937, No. 2 Page 153. প্রকাশিত প্রবন্ধ "The Rigveda & Mohenjodaro."

২। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহাও বলেছেন "A Young aboriginal nautch girl...... Mohenjodaro and Indus Valley Culture in Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, March 1932, No, 1. P.-143.

৩। Prehistoric India, Stuart Piggot (1950), P. 177-178, 186-187.

ডঃ পুশলকরও স্যার জন মার্শালের মতের অনুবর্তী হয়ে নারীমূর্তিকে অনার্যের কোঠায় ফেলেছেন এবং তা থেকে শুধু ডঃ পুশলকরই নন, মার্শাল, রায় বাহাদুর চন্দ, রায় বাহাদুর দীক্ষিত প্রভৃতি প্রাচ্য ঐতিহাসিকরাও পূর্বোক্ত মতের অনুবর্তী হয়ে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নৃত্যকলার বংশগত অধিকারই ছিল অনুন্নত আদিমবাসীদের মধ্যে। এই মতের প্রতিধ্বনিও শোনা যায় বৌদ্ধ ও তৎপরবর্তী সমাজে। কৌটিল্য ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি নৃত্যশীলা নটীদের চরিত্রে দোষারোপ করতে ছাড়েন নি।

"চিরদিনই নট-নটীরা নৈতিক শৈথিল্যের জন্য হেয় ও ধিকৃত। কৌটিল্য ও পতঞ্জলির সময় থেকেই নট-নটীদের চারিত্রিক অখ্যাতি। পতঞ্জলি বলেছেন, নটের স্ত্রী (নটী) যাকেই প্রয়োজন তাকেই ভজনা করে (মহাভাষ্য, ৩য় অধ্যায়)। এই জন্য নটের প্রতিশব্দ 'জায়াজীব' এবং নটী ব্যাপক অর্থে গণিকার সঙ্গে সমার্থক।...সে যাই হোক, ছলাকলায় পারদর্শিনী রঙ্গময়ী নীচজাতীয়া রমণীরা (নটী) প্রাচীন কালে উচ্চবর্ণের পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাতে পারতো এ অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়।[১]

ভারতীয় সমাজে এমন একদিন ছিল যখন গায়ক ও বাদক শ্রেণীকে দেখা হোত ঘৃণার চোখে। এবং সঙ্গীতসেবীরা থাকতেন সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে। অবশ্য বিবর্তমান সমাজের দৃষ্টিতে সত্যকার ভাবে সুরুচির মান নির্ণয় করা কঠিন, কেননা আজ যে আচার-ব্যবহার বা সামাজিক রীতি-নীতি সর্বসাধারণের কাছে আদরণীয়, কাল বা ভবিষ্যতে হয়তো সে সকলই হয় নিন্দনীয়। জগৎ পরিবর্তনশীল এবং ভাল-মন্দের ক্রমবিবর্তমান ধারাই সমাজের প্রকৃতি। কিন্তু মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া নৃত্যশীলা বা নারীর অনার্যোচিত বেশভূষা ও কেশের পরিপাট্য দেখে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে না যে, নটীমাত্রেই ছিল সভ্যতাবিহীন সমাজের অধিবাসী। বরং মহেঞ্জোদড়োর নৃত্যছন্দরত নারীমূর্তি তদানীন্তন সমাজে নৃত্যকলা অনুশীলনেরই পরিচায়ক। তাছাড়া মূর্তিটিতে শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। নৃত্যছন্দও মূর্তিটিতে সরল ও প্রাণবান।

এই নারীমূর্তি ছাড়া লক্ষ্মণ স্বরূপ অপরাপর নটমূর্তির পরিচয় দিয়েছেন।

১। চর্যাপদে লৌকিকতা (প্রবন্ধ) অবন্তী সান্যাল। (মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৫৮, পৃঃ ৫৪০।

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় একটি নটের প্রস্তর মূর্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

"There are two remarkable statuettes found at Harappa··· and the other of dark grey slate, the figure of a male dancer, standing on his right leg with the left leg raised high the ancestor of Siva Nataraja."[১]

ডঃ মুখোপাধ্যায়-এর মতে এই নৃত্যরত নটমূর্তিতে গ্রীকশিল্পের প্রতিফলন হয়েছে এবং তা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। (অবশ্য চিদম্বরম্ মন্দিরের নটরাজ মূর্তি—এই মূর্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করবো।)

যাই হোক ডঃ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহাও গাঢ় পাংশুবর্ণের একটি পাথরের নটমূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। নর্তক ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাম পা সামনের দিকে উৎক্ষিপ্ত। কটিবন্ধ থেকে দেহের উপরিভাগ বামদিকে হেলানো ও দুটি হাত একই দিকে প্রসারিত। মূর্তির ভঙ্গি ছন্দায়িত ও যেন জীবন্ত। মনে হয় মূর্তিটিতে তিনটি মুখ বা মস্তক ছিল। যৌবনোচ্ছল শিব—নটরাজের প্রতিচ্ছবিই তাতে সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন—[২]

"The other Stauatte (Pl. XI) represent a dancer standing on the right leg with the left leg raised in front, the body from the waist upwards bent round to the left and both arms stretched in the same direction. The pose is full of movement. It is inferred···that the figure was three-headed or three-faced

১। Hindu Civilisation (2nd Indian ed. 1950) P. 10.

Dr. Radha Kumud Mukherjee

২। "Mohenjodaro and the Indus Valley Civilisation (প্রবন্ধ)

Dr. Narendra Nath Laha, Indian Historical Quarterly. Vol. VIII, March, 1932, No. 2 P-143.

and in that case it represented the youthful Siva Nataraja, or the head might have been that of an animal ··There is no parallel to this figure among the Indian sculptures of the historic period."

এভাবে নর্তক-নর্তকীর মূর্তি নিঃশংসয়ে প্রমাণ করে যে, সেই সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতায় গীত-বাদ্য ও নৃত্যের অনুশীলন অব্যাহত ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগের নৃত্যপ্রসঙ্গ

॥ বৈদিক আর্যযুগ ॥

(আনুমানিক সময়কাল—খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—৫০০)।

পটভূমিকা ঃ

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নৃত্য সমীক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগ থেকে আরেকটি যুগকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখবার উপায় নেই। কারণ কোন যুগ থেকে কোন যুগই সম্পূর্ণ বিবিক্ত নয়, বরং সম্পৃক্ত। তার কারণ কোন জাতির ইতিহাস যেমন গড়ে ওঠে তার সমাজ আচার-ব্যবহার, শিল্প-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে নিয়ে, তেমনি কোন জাতির সমাজ, আচার-ব্যবহার, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি—এই প্রতিটি ব্যাপারের ইতিহাসও আবার গড়ে ওঠে এদের পারস্পরিক সাহচর্য নিয়ে। সুতরাং আদিম বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বৈদিক বা আর্যযুগকে একেবারে আলাদা করে না দেখে বরং সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনুন্নত থেকে উন্নত গতিমুখী ক্রমবিকাশের পথেই ভারতীয় নৃত্যের সমীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমরা জানি, ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ কেটে গেলে কালান্তরের সূচনা হয় বৈদিক আর্যদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে। মোটামুটি তখন থেকেই আমরা ভারতীয় সমাজ ও জীবনযাত্রার একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাই। শুধু তাই নয়—লিখিত সভ্যতার সূত্রপাতও ধরা হয় এই সময় থেকেই। এ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক Gisbert Pascal তো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে "Preliterate Man" পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন যে বৈদিক যুগের আগের যুগ হচ্ছে (অশিক্ষিতদের) অলিখিত যুগ। সে যাই হোক, এ কথা মনে রাখা দরকার যে 'আর্য্য', 'দ্রাবিড়' এই নামগুলি জাতিবাচক হিসেবে চলে এলেও ঠিক জাতিবাচক নয়—'ভাষাবাচক'। এ প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্ববিদরা মনে করেন, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, পারসী প্রভৃতি ভাষাগুলি কোন একটি অতিপ্রাচীন মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই সব ভাষার মধ্যে বহু শব্দের সাদৃশ্য দেখে তাঁরা এটা অনুমান করেছেন। এই মূল ভাষায় যাঁরা এককালে ভাবের আদান-প্রদান করতেন পণ্ডিতেরা তাঁদেরই 'আর্য' বলেন। মূলত তাঁরা 'শ্বেতকায়' বা 'ককাসয়েড' গোষ্ঠীভুক্ত হলেও, তাঁদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার একাধিক বৈজ্ঞানিক নাম

আছে। এককালে বা একসঙ্গে আর্যরা ভারতে আসেন নি। বিভিন্ন সময় দলে দলে এসেছেন।

সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের আগমনের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিকরা সিন্ধু সভ্যতার কাল নির্দেশ করেছেন আনুমানিক ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ। ভারতের মাটিতে আর্য বা বৈদিক সভ্যতার কাল খুব বেশী হলে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাহলে একথা বলা যেতে পারে যে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—১০০০ বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে দলে দলে ভারতে আর্যদের আগমন ঘটেছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্টিনার হুইলার সিন্ধু সভ্যতার পতন ও আর্যদের আগমন এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছেন। 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চলে (পাঞ্জাব ও তার পরিপার্শ্ব) আর্যরা এসে স্থানীয় অধিবাসীদের সুরক্ষিত নগরে বারংবার হানা দিয়েছিলেন, ঋক্‌বেদে তার বর্ণনা আছে। বেদে এই সব নগরকে 'পুর' বা দুর্গ বলা হয়েছে। বেদের প্রধান দেবতা 'ইন্দ্র' তাঁর অনুগত আর্যদের এই সব দুর্গ ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিলেন, সেই জন্য তাঁকে বলা হয়েছে 'পুরন্দর' (অর্থাৎ যিনি পুর ধ্বংস করতে পারেন।) আর্যপতি দিবোদাসের জন্য দেবতা ইন্দ্র ৯০টি পুর ধ্বংস করেছিলেন এবং স্থানীয় অনার্য-দলপতি শম্বরের শত দুর্গ চূর্ণ করে তিনি আর্যদের জয়যাত্রার সহায় হয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে আর্যরা এই সব পুর, দুর্গ ও নগর কোথায় দেখতে পেলেন ? স্বভাবতই মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরের কথা মনে হয় এবং এই সব নগরের রূপ বেদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়।

॥ বেদের সময়কাল ॥

যে বৈদিক যুগের জীবনযাত্রায় ভারতীয় নৃত্য আবর্তিত হয়েছে তার সঠিক সময় আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে বিতর্ক আছে। সুতরাং অযথা বিতর্কের কচকচিতে না গিয়েও বলা যায় বেশীর ভাগ পণ্ডিতরা যেটা ধরে নিয়েছেন তা হলো মোটামুটি এই—বৈদিক যুগ বলতে দুই-তিনশত বছর বোঝায় না, তারও বেশী বোঝায়। ঋক্‌বেদ ও তার আগের যুগ পর্যন্ত (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে প্রায় ৬০০-৫০০ খ্রীঃ পূঃ) বৈদিক যুগ বিস্তৃত। ঋক্‌বেদের রচনাকাল পণ্ডিতেরা ১২০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ বলে অনুমান করেছেন। ঋক্‌বেদের মধ্যে আর্যদের জীবনধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা

স্বভাবতঃই অনেক আগেকার কালের স্মৃতি বহন করেছে। তাই ঋক্‌বেদের আর্যজীবনের সঙ্গে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য বর্ণিত আর্যদের জীবনযাত্রার বেশ পার্থক্য ঘটেছে দেখা যায়।

বেদের সময়কাল নিয়ে আমাদের দেশী এবং বিদেশী পণ্ডিতেরা নানা মতামত দিয়েছেন। এ সকল পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন—জার্মাণ মনীষী পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার, ডঃ উইণ্টারনিজ, অধ্যাপক ব্লমফিল্ড, শ্রদ্ধেয় বাল গঙ্গাধর তিলক, অধ্যাপক হার্ম্যান জেকব, ডঃ বুলার, রায় বাহাদুর দীক্ষিত, অধ্যাপক কিথ, লুডউইগ, হিলব্যাণ্ড, হুইটনী, ডঃ রাধাকৃষ্ণান, ডঃ যোগীরাজ বসু প্রমুখ। এঁদের মধ্যে একটু সামঞ্জস্য বিধান করে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন—

"Some Indian Scholars assign the Vedic hymns to 3,000 B.C. others to 6,000 B.C. The late Mr. Tilak dates the hymns about 4500 B.C. the Brahmanas 2500 B.C. The early Upanishad 1600 B.C. Jacobi puts the hymns at 4500 B.C. We assign them to the fifteenth century B.C. and trust that our will not be challenged as being too early."[১]

সুতরাং দেখা গেল ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের মতে বৈদিক যুগের মন্ত্রগুলির সময়কাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—পর্যন্ত ধরা যায়।

যাই হোক, এই প্রসঙ্গ আপাততঃ শেষ করি ডঃ যোগীরাজ বসুর মন্তব্য দিয়ে—

"খ্রীঃ ধর্মের বাইবেল, ইসলাম ধর্মের কোরাণ বা ইহুদী ধর্মের 'তালমুদ' (Talmud) বলতে একখানি মাত্র গ্রন্থ বোঝায় এবং তার কাল নির্ণয় করা সহজ ও সম্ভব। কিন্তু সনাতন ধর্মের বেদ বলতে একটি মাত্র গ্রন্থ নয়, একটি গ্রন্থাগার বুঝায় বললেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ বলতে সংহিতা চতুষ্টয়, প্রতি বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থরাজি, আরণ্যক সমূহ ও উপনিষদ রাশি প্রতিবোধ্য, সুতরাং বেদের একটি বিশিষ্টকাল (One particular point of time) হতে পারে না। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন কাল হবে। সেই জন্যই সমগ্র বেদের কাল নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

১। Indian Philosophy—Dr. S. Radhakrishnan, Vol. 1 (1940) Page-67.

তবে পণ্ডিতদের দ্বারা যা সিদ্ধান্ত হয়েছে তা হলো—বেদের সংহিতা ভাগের সূচনা হয় ছয় হাজার খ্রীঃ পূর্বে, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের সূচনা তিন হাজার খ্রীঃ পূঃ উপনিষদের সূচনা এক হাজার পাঁচ শত খ্রীঃ পূঃ এবং বৈদিক বাঙ্ময়ের শেষ সীমা এক হাজার খ্রীঃ পূর্বাব্দ।"[১]

॥ বৈদিক যুগের নৃত্য ॥ (সমীক্ষা) ঃ

ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষালব্ধ উপাদানের পর, সাহিত্যগত উপাদানকেই প্রাধান্য দিতে হয়। এই সাহিত্যগত উপাদানগুলি ছড়িয়ে আছে বেদ, উপনিষদ, সূত্র, কাব্য, মহাকাব্য, পুরাণ, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে।

সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে নৃত্যের যে উৎপত্তি দেখানো হয়েছে, তার সর্বত্রই প্রায় ঐশী উৎপত্তিকে (Divine Origin) এক মাত্র উৎস হিসাবে দেখানো হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে নৃত্যের উৎস সন্ধানের সঙ্গে পার্থক্য এখানেই। মানুষের সমাজে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে মূলতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বৈদিক যুগে মানুষ Higher Pastoral পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ঐ কৃষিভিত্তিক সমাজে শ্রেণীভেদ ও অর্থনৈতিক অসাম্য ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠেছে। সামষ্টিক চিন্তা-চেতনা (Collective Consciousness) ব্যক্তি চিন্তায় ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছে। এই কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষ ক্রমশঃ অদৃষ্টবাদী, ভাববাদী হয়েছে। মনুষ্যত্বের মধ্যে দেবত্বের ছায়া বা আভাস কল্পনা করেছে। গড়ে উঠেছে দেবতা-কেন্দ্রিক অজস্র কাহিনী। এই কাহিনীগুলিই পরে পুরাণ-নামে খ্যাত।

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ কেটে গেলে দেখা দেয় বৈদিক যুগ। আবার এই বৈদিক যুগের মানস জমিতেই পৌরাণিক যুগের অঙ্কুর ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। সেই ধারা খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ঐতিহাসিক যুগ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

নৃত্যের উৎপত্তিতে Divine Origin-এর বক্তব্য পুরোপুরি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও ঐ বক্তব্যের মধ্যে এমন একটি সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে নৃত্যচর্চা ছিল সমাজে সুনাম খ্যাতি ও সম্মানের ব্যাপার।

১ বেদের পরিচয়- ডঃ যোগীরাজ বসু—প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৭, কার্ত্তিক পৃঃ ১৬৮-১৭৩।

(ভারতীয় নৃত্য যে অন্যান্য ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র শিল্পধারার সৃষ্টি করেছে তার মূলে ছিল ধর্মীয় ভাব, আধ্যাত্মিকতা, প্রতীকধর্মিতা এবং সঙ্গে ছিল নান্দনিক দৃষ্টি ও পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। সাধারণতঃ বেদ, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকলের কাছে পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বেদ থেকে উদ্ভূত 'নাট্যবেদ' উপভোগে কিন্তু সেই বাধা থাকলো না। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ কপিলা বাৎসায়ন বলেন—

"Unlike the other Vedas, this Veda (Nātya Veda) was not tabao to the Sudras and its main purpose was to provide pleasure and delight both to the ear and the eyes irrespective of caste."[১]

এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই নাট্যবেদ শ্রুতকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের (Auditory and Visual) মর্যাদা পেয়ে গেছে। যাই হোক এভাবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নাট্যবেদ উপভোগ করার স্বাধীনতা থেকে মনে হয় এমন একটি সমাজ ব্যবস্থায় এই নাট্যবেদ তৈরী হয়েছিল, যেখানে সমাজের যৌথ জীবন (Community life) বর্তমান ছিল। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে শুদ্রদের অধিকার না থাকলেও, নাচ-গান-নাটক প্রভৃতি উপভোগের ব্যাপার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শুদ্ররাও উপভোগ করতে পারতো। এ থেকেই বুঝা যায় সেই যুগে নৃত্যচর্চা ব্যাপক ছিল, অনেকটা যেন সর্বজনীন ভাবেই সমাজে আদৃত হতো।

আমাদের ধারণা নাটক ব্যাপারটা নাট্যবেদ পর্যায়ে আসতে ভরত-যুগ পর্যন্ত লেগেছিল। তার কারণ সাধারণ বেদগুলি যেমন সেই যুগের মানুষের ধ্যান-ধারণার পরিচয়বাহী অপূর্ব গ্রন্থ, নাটক, নৃত্য সঙ্গীতও তেমনি সেই যুগের জনজীবনে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং ছিল বলেই এই শিল্পকলা বেদের মর্যাদা পেয়েছিল। সেই যুগের চর্চার মধ্য দিয়ে নাটক-নৃত্য সঙ্গীতের যে ধারণা চলে এসেছে, পরবর্তীকালে ভরত সেগুলিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সংকলন করেছেন। (যদিও সঙ্গীত ও নৃত্যের মতো নাটক সম্বন্ধে বেদে তেমন কোন সঠিক উল্লেখ নেই তবু বলা যায় নাটক তখন ভ্রূণ (Nucleus) আকারে ছিল।

১। Classical Indian Dance in Literature and the Arts.—Dr. K. Vatsyayan Page-161 (Sangeet Natak Academy—New Delhi-1968.

কারণ ইন্দ্র বেদের দেবতা এবং তাঁর জর্জরোৎসব একটি নাটকীয় ব্যাপার—যে ব্যাপারকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে দেবদাসী নৃত্যের উদ্ভব প্রসঙ্গে ঐ জর্জরোৎসবের কাহিনীটি ফলাও করে বলা হয়।)

ভরতের যুগে যেভাবে নৃত্যের ঐশী উৎপত্তির (Divine Origin) কথা বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তার ব্যত্যয় ঘটলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার কারণ দুটি—

(১) ভরতের সময় পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্যের যে ধারা চলে এসেছে তার মধ্যে ভরত লক্ষ্য করেছেন এক ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শিল্পকলার দ্যোতনা এবং তিনি ভেবেছেন এতবড় ঐশ্বর্যপূর্ণ শিল্পকলা সৃষ্টি করা মানুষের কর্ম নয়—ভগবানই এর স্রষ্টা। অথচ একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে, ভগবানের রূপ তো মানুষই কল্পনা করেছে বা অনুভব করেছে। সাধারণ মানুষের থেকে নানা গুণে উন্নত মানুষের প্রতিচ্ছবিই ভগবান বা ঈশ্বর। এই ঈশ্বরবোধের মধ্য দিয়েই তিনি (ভরত) কল্পনা করেছেন, নাচের উৎপত্তির মূলে ঐশী শক্তি ও প্রেরণাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভরতের সময় দেবতা কেন্দ্রিক শিল্পের উৎপত্তির কথা আরও বেশী বলিষ্ঠভাবে প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। এরও সূত্রপাত কিন্তু বৈদিক যুগ থেকে। এ জন্যেই বৈদিক যুগের নৃত্য সমীক্ষার ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে এর প্রভাবের কথাটিও আগেই সেরে নিলাম প্রাসঙ্গিকভাবে।

(২) যদিও ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে Divine Origin—কে প্রত্যক্ষ ভাবে স্বীকার করা যায় না তবু আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে উক্ত থিওরীর মধ্যে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেখানে নৃত্যচর্চা ছিল অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার। তাছাড়া ধর্মকেন্দ্রিক ও ধর্মপ্রাণিক শিল্প হিসেবে নৃত্য তখন উচ্চপর্যায়ে এসেছে। তাইতো দেখি মর্ত্যে নাচের প্রচলনের আগে শিব থেকে তণ্ডু, তণ্ডু থেকে ভরত, এই ক্রমবিবর্তনের মূলেও রয়েছে ধর্মীয় ও সাহিত্যগত চিন্তা-চেতনার পরম্পরাগত ফলশ্রুতি।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল যে, এই ঐশী উৎপত্তির থিওরী কিন্তু শুধুমাত্র বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদী (Classical Dance & Drama) নাচ ও নাটকের ব্যাপারেই দেখা যাচ্ছে। আদিবাসী নৃত্য (Tribal Dance) ও লোকনৃত্যের (Folk Dance) উৎপত্তির ব্যাপারে এই ঐশী উৎপত্তির থিওরী খাটে না। কিন্তু বাস্তব সত্য হল Tribal, Folk-এর সঙ্গে Classical

এখনো পাশাপাশি দেখা যায়। এবং এগুলির একটা ধারাবাহিকতা এখনো সমাজে বিদ্যমান।

(এই Divine Origin-এর ব্যাপারটা আমরা আধুনিক যুগেও লক্ষ্য করেছি যে কোন পরম্পরাগত (Traditional) নৃত্য ঘরাণার শিল্পীদের মধ্যে। তা ভরতনাট্যমই হোক, বা কথাকলি, মণিপুরী বা কথকই হোক। শিল্পীরা তাঁদের ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ অপেক্ষা শিব-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ, অপ্সরা গন্ধর্ব, প্রভৃতির আবেগকে প্রকাশ করতেই বেশী সচেষ্ট। এবং ঐ সব দেবদেবীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ বা মহাকাব্যিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতির রূপায়ণে শিল্পীরা যতটা আগ্রহী উক্ত দেবদেবীদের সময়কার যুগের সামাজিক সমস্যা (Sociological Problem) নাচের মধ্যে তুলে ধরতে ততটা চেষ্টিত নয়—এখানেই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য)।

যাই হোক, ভারতীয় নৃত্যের সাহিত্যগত উপাদান প্রথমে পাই চতুর্বেদে—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। ঋক্, বেদই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম লিখিত দলিল। এ সময় থেকেই মোটামুটি ভারতীয় সমাজ ও জীবন যাত্রার একটা ধারাবাহিক সঠিক পরিচয় পাই। সুতরাং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় সাহিত্যগত উপাদান ঋক্‌বেদ থেকেই আমরা ধরবো। ঋক্‌বেদ-এ নৃত্যশিল্পীদের উল্লেখ আছে মাত্র। কিন্তু কি ধরনের নাচ তখন প্রচলিত ছিল বা সেই নাচের আঙ্গিক পদ্ধতিই বা কি ছিল, তাও স্পষ্ট নয়। নাচের আঙ্গিক-করণ, প্রকরণ, মুদ্রা প্রভৃতির লিখিত পরিচয় পাই অনেক পরের যুগে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব বেদে ও অন্যান্য সংহিতায় নাচের সাহিত্যগত উপাদান কি কি আছে তার সংক্ষেপিত রূপ তুলে ধরা।

॥ ঋক্‌বেদে নৃত্য প্রসঙ্গ ॥

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম লিখিত দলিল ঋক্‌বেদ। প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থও ঋক্‌বেদ। শুধু কাব্যগ্রন্থ কেন? এতে আছে সেই যুগের ধর্মবোধ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি। এই ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, কবিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই—সে যুগের মানুষ কি দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখেছে এবং কি ভাবে মানুষের জীবন আবর্তিত হয়েছে। (বৈদিক যুগের

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে তা আরও বিশদভাবে জানা যাবে।)

কৃষিভিত্তিক সমাজের সহজ-সরল ও এক শ্রেণীর লোকের অলস জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে যে ভাববাদ আত্মপ্রকাশ করেছে তার কিছু কিছু প্রতিফলন দেখি বেদে।

বেদে যে সকল দেবতাদের নাম পাই তাঁরা সকলেই প্রায় প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক। এইসব দেবদেবীদের কার্যকলাপ অদ্ভুত। এঁরা মানুষের মতোই যুদ্ধ করে, গান গায়, নাচে, এবং মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত জীবনদান প্রভৃতি ক্ষমতা ধারণ করে। এঁরা রথে চড়ে আকাশ যায়, নিজেরা জন্মায় কিন্তু মানুষের মতো মরে না। এঁরা মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে গান-বাজনা-নাচ করে বিবাহ উৎসব এমন কি শব যাত্রায়—এ ধরনের ইঙ্গিত ঋক্‌বেদের স্তোত্রে পাওয়া যায়।

এই সকল দেবতাদের মধ্যমণি হলেন ইন্দ্র। প্রায় এক ডজন স্তোত্রে ইন্দ্রকে নৃত্যশিল্পী রূপে দেখানো হয়েছে। ১ম মণ্ডল, ১০৩ সূক্তে ইন্দ্রকে নৃত্যশিল্পীরূপে দেখানো হয়েছে। উক্ত সূক্তে 'নৃতু' ও 'নৃতো' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ৮।৯২।৩—তে নৃত্ব (নৃত্যয়তি) প্রভৃতি ২।২২।৪-তে ইন্দ্রকে একটি তাৎপর্যমণ্ডিত শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। তিনি নৃত্যশিল্পী, তিনি খাদ্যদাতা (the giver of planteous food) ধনী হবার জন্য তিনি পূজিত হন। এইখানে নৃত্যশিল্পী ইন্দ্রকে খাদ্যদাতারূপেও যে বর্ণনা করা হয়েছে এতে সেই শস্য-কামনা সফল হবার আকাংক্ষার (বিশেষ করে শস্য উৎপাদনে সাহায্যকারী শক্তিরূপে) সঙ্গে কৃষিজীবী সমাজের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ইন্দ্রের সঙ্গে মরুত ও অশ্বিন নামে আরও দুজন নৃত্যশিল্পীর উল্লেখ পাচ্ছি। ম্যাকসমুলার সাহেব একটি চমৎকার শ্লোকের অনুবাদ করে বলছেন—(৫।৫২।১২)
"Maruts dance around the well, desirous of water."

"In the measured steps and wildly shouting, the gleemen have danced towards the well. They who appeared one by one like thieves were helpers to me to see the light."[১]

১। Max Muller—Sacred Books of the East. Vol, 1, P-313 (Verse V.52.XIi)

এই প্রসঙ্গে ডঃ কপিলা বাৎসায়ন বলেন—"They are really the gay dancers, the Kīriṇo nṛtuḥ (V.52.12.) who are the invokers and the leaders of the dance. The verse is the first specific description of dancing in literature where more than in epithet has been used.

In another hymn, too, the Maruts are invoked as dancers and the form nṛtavaḥ is emplyed for them ; in this they are called out for care and friendship, "Oh ye dancers with golden ornaments on your chest, even a mortal comes to ask your brotherhood : take care of us ye Maruts, for your friendship lasts for ever".

The Maruts are here addressed in the plural as a troupe or a company of dancers.[১]

(মরুত হল বায়ু। বায়ু মেঘের বাহন। মেঘে বৃষ্টি হয়। শস্যের উৎপাদন বাড়ে। সুতরাং কৃষিভিত্তিক সমাজে মরুতকে পরম বন্ধু রূপে কল্পনা করার মধ্যেই সেই যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।)

এরপর দেখা যাচ্ছে দ্বৈত দেবতা, অশ্বিন। এঁদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে—"The Asvins are the twin gods to whom singing and dancing are attributed," এদের দ্বৈত হিসেবেই অভিহিত করা হয়। সূর্য্যকন্যার সঙ্গেই এঁরা গান-নাচ করে থাকেন। এঁরাই আবার মরুতকে আহ্বান জানায়।

ইন্দ্র মরুত ও অশ্বিনদের অনেকটা মানুষের রূপে কল্পনা করা হয়েছে, তাঁদের দেবত্ব খর্ব না করেও তাঁরা মানুষের মতোই যেন নৃত্য করেছে।

ঋক্‌বেদের স্তরে ইন্দ্র, মরুত ও অশ্বিনদের নৃত্যশিল্পীরূপে কল্পনার সঙ্গে অপ্সরাদের মিল যথেষ্ট। এই অপ্সরা-গন্ধর্বদের অনুসরণেই উর্বশী, পুরুরব: প্রভৃতি কাহিনী রয়েছে। এঁরাই আমাদের পুরাণের আদি চরিত্র।

এই অপ্সরারা কিন্তু দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। এঁরা ছিলেন একটু

১। Ibid-Page—169

নীচু স্তরের আধা দেবতাদের পর্যায়ভুক্ত (Semi-Devine)। পরে ইন্দ্র যখন দেবরাজ হলেন, তখন তাঁর রাজসভায় প্রিয় নৃত্যশিল্পীরা হলেন অপ্সরারা—এবং সঙ্গীত শিল্পীরা হলেন গন্ধর্ব নামাঙ্কিত কিন্তু পরবর্তীকালে অথর্ব বেদ-এ এইসব Semi-divine—চরিত্রগুলি পূর্ণ দেবতার মর্যাদা পেয়েছে।

এঁরাই মুনিদের প্রলোভিত করেছেন, যুগে যুগে, এঁদের গতিবিধি সর্বত্র (স্বর্গ-মর্ত্য)।

ঋক্‌বেদ ও অথর্ববেদের সময়ে এই অপ্সরাগণ ছিলেন বাস্তবের দৃষ্টিতে খুব উঁচু দরের বারবনিতা। এবং ঋক্‌বেদে উল্লিখিত অপ্সরা এবং বিশেষ করে উর্বশীর মধ্য দিয়েই সেই যুগের পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

ঋক্‌বেদে যে শুধু দেবতারাই নৃত্যশিল্পীরূপে চিত্রিত হয়েছেন তা নয়। বেদের কবির কাছে বিশ্বপ্রকৃতিও লীলাচঞ্চল নৃত্যশিল্পীরূপে ধরা পড়েছে। যেমন, উষা। এই উষা হলেন প্রত্যুষের দেবী। ডঃ কপিলা বাৎসায়ন বলেন—

"The well-known references to USAS as a dancer is not merely an adjective for the rising dawn ; it is one of the first examples in Poetry where dancing is used by the poet in a beautiful sustained image."[১]

বৈদিক যুগে নৃত্যশিল্প যে যথেষ্ট উন্নত ছিল তা উষার কল্পনা থেকেই বোঝা যায়।

বেদের (X.72.VII.) অদিতির জন্ম মুহূর্তে দেবতাদের আনন্দ নৃত্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"Thence as of dancers from your feet, a thickening cloud of dust arose."

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় খোলা জায়গায় নৃত্য হতো এবং তা ছিল সংঘবদ্ধ-ভাবে ঘূর্ণায়মান।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে সেই যুগে একক ও দলবদ্ধ নৃত্যের প্রচলন ছিল।

*** *** ***

এর পরেই দেবতাদের ছাড়া সাধারণ মানুষের নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়! সমাজে নৃত্যের অবস্থা বা রূপ কি রকম ছিল তা এই বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

১। Ibid—Page—170.

বৈদিক সমাজে বিবাহে, শবযাত্রায়, শষ্য-উৎসবে, সাম্প্রদায়িক মেলামেশায়—প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়ে-পুরুষ সকলে মিলে সঙ্গীত ও নৃত্য করতো। ম্যাকডোনাল্ড বেদের (X/18/3) বর্ণনা দিয়েছেন—

"The living from the dead are seperated,
The sacred rite today has prepared far us,
And we are here prepared for mirth and dancing,
Prolonging still the span of our existence."[১]

ঋক্‌বেদের সময় থেকে শবযাত্রায় নৃত্যের প্রচলন ছিল তা জানা যায়। (বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশের আদিবাসীদের মধ্যেও এই শবযাত্রায় নৃত্য দেখা যায়)। দক্ষিণভারতের আয়ার (Aiyyar) সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা আজও দেখা যায়।

বেদে (X/94/IV) দেখা যায় দলবদ্ধ নৃত্যে মেয়েরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নাচছে। বৈদিক স্তোত্রের সঙ্গে নৃত্যের যে গুঞ্জনধ্বনি হতো, তার নাম 'nyūnkha' এ যেন অনেকটা নাগানৃত্যের ওঙ্কারধ্বনির মতো। কাত্যায়নের ভাষ্যে দেখা যায় (1.8.18.) এই ওঙ্কার ছিল মোট ষোলটি।

বর্তমান ভারতে প্রচলিত দলবদ্ধ নৃত্য যেমন—'রাস নৃত্য', যা উত্তরে বৃন্দাবন থেকে দক্ষিণে তামিলনাড়ু, পূর্বে মণিপুর থেকে পশ্চিমে গুজরাট; মালাবার পর্যন্ত বিস্তৃত সেই নৃত্যের উৎসও এই বৈদিক যুগের দলবদ্ধ নৃত্যের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে।

একদিকে পার্থিব দৃষ্টিতে নৃত্য ছিল সামাজিক নৃত্য, আনন্দোৎসবের অঙ্গ, অপরদিকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে নৃত্য ছিল ভগবানের কাছে আত্মবিনোদন, মানুষের কাছে তা আত্মনিবেদন। এই ঋক্‌বেদেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে দৈহিক অঙ্গভঙ্গীর প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে আঙ্গিকাভিনয়ের সূত্রপাত বোধহয় এখান থেকেই।

(Nucleous of the Written literary drama)

বেদ এবং সংহিতার নৃত্য বিষয়ে যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, সেগুলি হলো—

(১) পৌরাণিক দেবতাদের নৃত্যশিল্পী রূপে দেখানো।

(২) তাঁদের নৃত্যের 'ইমেজ' প্রায়শঃ দৃষ্ট।

১। Ibid-Page-171.

(৩) সমাজে নৃত্যশিল্পীদের স্থান। এরা ভগবানে নিবেদিত।

(৪) আঙ্গিকাভিনয়ের সূত্রপাত। ইত্যাদি।

॥ ঋক্ সংহিতায় নৃত্য ॥

বৈদিক গান ও বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী বলেছেন—'বৈদিক সাহিত্যে তথা সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, আরণ্যক ও উপনিষদে, ধর্ম, শ্রৌত ও কল্পসূত্রে শিক্ষায় ও প্রাতিশাখ্যে আভ্যুদয়িক ও আভিচারক প্রয়োগ অনুযায়ী গানের অনুশীলন হতো। গানের সঙ্গে থাকতো নৃত্য ও বাদ্য। কাজেই বৈদিক যুগে সঙ্গীতের পরিপূর্ণ বিকাশ ছিল অব্যাহত। যদিও 'সঙ্গীত' শব্দটির পরিবর্তে তখন গান, উদ্‌গান, উদ্‌গীতি, স্তোত্র, প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার দেখা যায়। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব ও বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিচিত্র রকমের বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। নৃত্যের প্রসঙ্গে ঋক্‌সংহিতার (৪।২০।২২) আছে: 'মর্তশ্চিদ্বো নৃত মোরুক্ম বক্ষস' প্রভৃতি। আচার্য সায়ণ-এর ভাষ্যে বলেছেন: 'হে নৃতবো নৃত্যন্তঃ হে রুক্ষবক্ষসঃ বোচমানক্ষরণং ***'। পুনরায় ৫।৩৬।৬ ঋকে আছে: 'পপৃক্ষেণ্যমি-দ্রত্বেহো জোনৃশ্যানিচনৃতমানো অমর্তঃ। সায়ণ-এর ভাষ্যে বলেছেন: 'নৃতমানোনৃত্যন্ন-মর্তোসরণধর্মা স্বত্বং বসমানঃ' প্রভৃতি ১০।১৮।৩ ঋকে পাওয়া যায়। প্রাঞ্চো অগামনৃতয়েহসায়…। 'সায়ণ এর অর্থ করেছেন' ততঃ উত্তরং বয়ং প্রাঞ্চ প্রাঙ্ মুখাঞ্চনাঃ অয়াম…নৃতয়ে নর্তনায় কর্মণি গাত্রবিক্ষেপায় সুকর্মানুষ্ঠানেয়ে—তিশ্রাবঃ' প্রভৃতি। সুতরাং সামগানেও যে নৃত্যের সমাবেশ ছিল এ সকল বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায়। গীত ছাড়া পৃথক ভাবেও তখন নৃত্যের অনুশীলন হোতো।[১]

বৈদিক 'মহাব্রত' অনুষ্ঠান ছাড়াও নানা যাগযজ্ঞেও গান ও নাচের আয়োজন থাকতো। যাগ-যজ্ঞগুলি সাধারণতঃ স্মার্তকর্ম ও শ্রৌতকর্ম এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। স্মার্তকর্ম, যেমন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বা বৃক্ষরোপণ উৎসব, জলাশয়, প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, উপনয়ন, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি। এর বিধান শাস্ত্রের নাম গৃহ্যসূত্র। শ্রৌতকর্ম, যেমন অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ ও রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ।

১। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পৃঃ ৯৪
(১৯৬১ আগষ্ট—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত)।

॥ গৃহ্যসূত্র ॥

এই গৃহ্যসূত্র-এ নৃত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ কপিলা বাৎসায়ন লিখেছেন[১]

"In the Gṛhya-Sūtras the arts of music and dancing are diligently cultivated, and, at every stage of domestic life, they play an important part ; That dance and music formed an important part of a marriage ceremony is clear from the Aśvalāyana Gṛhya Sūtra where, after the prospective bride is bathed and the high priest offers a sacrifice, a dance of four or eight women (not widows) takes place as part of Indrāṇī Karma ; instrumental music is mentioned in Simantonnayna ceremony (parting of the woman's hair in the middle during the fourth or seventh month of pregnancy)

(এ যুগের প্রচলিত অন্তঃসত্বা মহিলার সাধভক্ষণ বা 'সপ্তামৃত' অনুষ্ঠানের মতো।) Where the wife is asked to sing a song. The very interdiction that the snātaka is not to practise or enjoy a programme of dance or instrumental music goes to show the wide prevalence of these arts and their popularity. Life in this age is so thoroughly ritualized that in all these highly elaborate sacraments the gestures and their significance must have easily been understood and practised. From birth to death at every stage dance is associated with the important ceremonies..................the evidence we gather from these Sutras is valuable in re-creating a social history of customs and manners of this period, many of which are preserved to this day ; but little can be discerned here about the technique of classical dancing.

১। Classical Indian Dance in Literature and the Arts—Dr. Kapila Vatsyayan. (Published by—Sangeet Natak Academy—New Delhi, 1968. Page—181.

In Panini's grammer there is a whole Sutra devoted to the rules for an actor, and the natasutra (IV.3.110-111) is attributed to Silalin.

Vatsyana's Kamasutra of a later date also falls in the category of works describing the social arts. Its sections on dance are indicative of the part played by this art in society."[১]

॥ সামবেদে নৃত্য ॥

ঋক্‌বেদ সবচেয়ে প্রাচীন বলে ধরা হয়। সামবেদে নৃত্য বিষয়ে যা উল্লেখ আছে তার বেশীর ভাগ শ্লোকই ঋক্‌বেদে দেখা যায়। সামবেদ মূলতঃ সঙ্গীতাশ্রয়ী। তাহলেও সামবেদেই নৃত্যকে দুই ভাগে চিহ্নিত করতে দেখা যায়। আমরা পরবর্তীকালে নৃত্যের যে দুই ভাগ 'মার্গী' ও 'দেশী' নামে দেখতে পাই, তার সূত্রপাত মনে হয় এই সামবেদ থেকেই। আমরা যে Classical এবং Popular বা Folk নামে নৃত্যকে আলাদা করে দেখেছি তার সুরু বোধহয় এখান থেকেই।

ডঃ কপিলা বাৎসায়ন বলেন—

...Samaveda contributes greatly to this art by stating the concept of the Margi and Desi types of Music and dancing. This is the first conscious distinction between what was to be termed classical and Popular in years to come.[২]

সামবেদে সঙ্গীত ও নৃত্যকে 'মার্গী' ও 'দেশী' এই দুই নামে ভাগ করা হয়েছে। এটা লক্ষ্য করার ব্যাপার যে ঋক্‌বেদে নৃত্য ও সঙ্গীতের এমন কোন ভাগ নির্দিষ্ট করা নেই। সামবেদ রচয়িতাগণ নাচ ও গানের উপরেই জোর দিয়েছেন বেশী। ঋক্‌বেদ মন্ত্রময়। সামবেদ সঙ্গীতময়।

এই মার্গী ও দেশী পর্যায়ের নৃত্যধারাকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক্।

১। Ibid—Page—181.

২। Dr. Kapila Vatsayan—Classical Indian Dance in Literature and the Art. Page—173

এই মার্গী ও দেশী পর্যায়কে অনেকেই নৃত্য ও নৃত্ত এই দুই নামে ভাগ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই নৃত্য ও নৃত্তের কোন ভেদ সূচিত হয়নি।

'দশরূপক' রচয়িতা ধনঞ্জয় বলেন—ভাবাশ্রয় নৃত্যে পদার্থাভিনয় বর্তমান, উহাই 'মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ। আর তাললয়াশ্রয় নৃত্তের নাম 'দেশী'।

'ভাবপ্রকাশ' রচয়িতা শারদাতনয়—বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। যাহা রসাত্মক, তাহাই বাক্যাভিনয় প্রধান। যাহা ভাবাশ্রয়, তাহাই পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্য ভাবাশ্রয়, নৃত্ত রসাশ্রয়। এই উভয়ই আবার নাট্যের উপকারক।···নটকর্ম ও নর্তককর্ম—এ উভয়ই আবার নৃত্য-নৃত্ত-ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে ভাবাশ্রয় (নৃত্য) 'মার্গ' ও তদ্রহিত (নৃত্ত) 'দেশী' নামে প্রখ্যাত।··· এই নৃত্যের স্বরূপ—গীতের মাত্রানুসারে অঙ্গ-উপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের দ্বারা পদার্থাভিনয়। নাটকাদি দশরূপকে যে 'নৃত্ত' প্রযুক্ত হয়, তাহার স্বরূপ—লয়-তাল-সমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির লয়তাল-বিহীন কেবল বিক্ষেপাত্মক যে অভিনয় তাহাই 'নাট্য'। মোটের উপর—নৃত্ত নটাশ্রিত রসাভিনয়ের ব্যাপার, আর নৃত্য ভাবাভিনয় ও নর্তকাশ্রিত-ইহাই শারদাতনয়ের অভিমত। পক্ষান্তরে "Mirror of gestures" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—রসভাব-বর্জিত নর্তনের নামই নৃত্ত। আবার সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—আহার্য্যাভিনয় বর্জিত আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত কেবল ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্তনের নাম নৃত্য। নৃত্যবিদ্‌গণ ইহাকেই 'মার্গ' শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন। আর আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক—এই চতুর্বিধ অভিনয় বর্জিত সাধারণ পাত্র-বিক্ষেপমাত্রের নামই নৃত্ত। এই নৃত্তই 'দেশী' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। পার্শ্বদেব রচিত 'সঙ্গীতসময়সার' গ্রন্থে নৃত্ত ও নৃত্যের ভেদ বলা হয় নাই। নারদ কৃত 'সঙ্গীত মকরন্দে' শুধু নৃত্যেরই উল্লেখ আছে।[১]

শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—

নাট্য—রসাশ্রয়।

নৃত্য—ভাবাশ্রয়।

নৃত্ত—তাললয়াশ্রয়।

১। অভিনয় দর্পণ : শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী (পৃঃ ৬-৭)।

নৃত্ত—'ভাবাভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে।'

নৃত্য—'রসভাববা-ঞ্জনাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্ষ্যতে।'

প্রখ্যাত ইউরোপীয় কলাসমালোচক ও শিল্পী—E.B. Havell যথার্থই বলেছেন—"The Vedic period is all important for the historian, because, except for a very brief period of its history, the Vedic impulse is behind all Indian art."—(The Ideals of Indian Art (1920)P.14).

কথাটি প্রণিধান যোগ্য সমগ্র বৈদিক যুগ সম্পর্কেই।

সামবেদের ৩।১২।১ মন্ত্রে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গানের কথা আছে ঃ 'গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোহর্চন্ত্যকর্মর্কিন, ব্রহ্মনেস্তা শতক্রুত উদ্বংশমিব যেমিরে। 'সায়ণ এ সম্বন্ধে বলেছেন—'তত্র দৃষ্টাস্ত. বংশমিব যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পীনঃ পৌঢ়বংশম উন্নতং কুর্বন্তি।"[১] ইত্যাদি।

॥ যজুর্বেদে নৃত্য ॥

ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে যর্জুবেদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও ঋক্‌বেদের মৌল চিন্তাগুলিই ঘুরে ফিরে যর্জুবেদে প্রাধান্য লাভ করেছে, তবু দেখা যায় দেবদেবীদের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ যর্জুবেদেই ধরা পড়েছে। মন্দিরে যে সকল পৌরাণিক দেবতাদের দেখা যায়, তাঁরা যেন এই যর্জুবেদের সময় থেকেই সঠিক রূপ ধারণ করে।

বেদের আচার অনুষ্ঠানের (rituals) মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, সে যুগের মানুষ কি ভাবে আত্মনিবেদনের ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। বিশ্বপ্রকৃতিব বিচিত্র রহস্যের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টাকে উপলব্ধি করবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় মন্ত্র ও শ্লোকগুলির মধ্যে। মানুষ, তাঁর দেহ ও আত্মাকে ভগবানের কাছে নিবেদন করছে—এতে কিছু কিছু দেহভঙ্গী এই নিবেদনের অনুসঙ্গী হচ্ছে। (অনেক পরের যুগে 'দেবদাসী'-দের মধ্যে আত্মনিবেদনের এই ধারাটি দেখা যায়।)

এই সময়ে ইন্দ্র, উর্বশী ছাড়া রুদ্রদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদি (বাজসেনীয় সংহিতা) ইন্দ্রকে ঠিক নৃত্য শিল্পী হিসেবে দেখানো হয়নি—যেমন দেখানো হয়েছে ঋক্‌বেদ। তাছাড়া উঁচু স্তরের দেবতারা ছাড়া, সাধারণ

১। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—১ম খণ্ড, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। (পৃঃ ১২২ঃ পৃঃ ৯৭)।

অপ্সরাদেরও নৃত্যকুশলী হিসেবে দেখানো হয়নি। তবু তখনকার সমাজে নট ও নটীরা অপাংক্তেয় ছিল না।

পুরুষ মেধ যজ্ঞ (XXX. 6.)--এই যজ্ঞে পরাজিত সৈলুষ (Sailusa) প্রভৃতির সঙ্গে যে সকল নট-নটী-গন্ধর্ব অপ্সরা ছিল, যাঁদের সম্পর্কে দেখা যায় "For dance a stable Master (Sutam) and for song an actor, performer (nata)."

এখানে সূতম্-নট যে কে, তার সঠিক উল্লেখ না থাকলেও, ঐধরনের আরেকটি শ্লোকে (XXX. 20) পুরুষমেধ যজ্ঞে দেখা যাচ্ছে—"A tala man, a lutist these foı the dance."[১]

শুক্লযজুর অন্তর্গত বাজসেনীয় সংহিতায় 'নৃত্তয় সুতং গীতম্ সৈলুষম্' শব্দগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সুত' গায়ক ও 'সৈলুষ' অভিনেতা। সুত বা গায়ক নৃত্যের সঙ্গে ও সৈলুষ বা অভিনেতা গানের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সুতকে আবার গানের সঙ্গে ও সৈলুষ বা অভিনেতাকে নৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে 'গীতয় সুতং নৃত্তয় সৈলুষম্'।

যজুর্বেদে 'গন্ধর্ব' অর্থে দেবতাদের লক্ষ্য করা হয়েছে। যেমন—'সূর্যো গন্ধর্বঃ' 'চন্দ্রমা গন্ধর্ব' 'বাতো গন্ধর্বঃ' 'যজ্ঞো গন্ধর্ব' প্রভৃতি।

সাধারণতঃ 'গন্ধর্ব' ও 'অপ্সরা' শব্দ দুটির উল্লেখ থেকে আমরা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের ধারণাই পাই। কারণ বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগে তো বটেই—গন্ধব, কিন্নর ও অপ্সরাদের সঙ্গে সঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। গন্ধর্বেরা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ছিল একথা ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। শোনা যায় রাজপুতানার কোন একটি স্থানের অধিবাসীদের এখনো 'গন্ধর্ব' নামে অভিহিত করা হয় এবং সেই গন্ধর্ব জাতির স্ত্রী, পুরুষ, ও শিশু-কন্যারা সকলেই গান্ধর্ব বিদ্যায় বা সঙ্গীতবিদ্যার পারদর্শী। 'অপ্সরা' শব্দ সম্বন্ধে জানা যায়—সূর্যদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জলীয় বাষ্প যে মেঘের রূপ ধারণ করে তাকেই কাল্পনিক ভাবে 'অপ্সরা' বলা হতো।

(Personification of the vapour which were attracted by the sun and formed into mist or clouds."[২]

১। Dr. K. Vatsayana—Classical Indian Dance in Literature and the Art, Page—175. ২। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—১ম খণ্ড, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, (পৃঃ ৯৯-১০২)

উক্ত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ভাস্কর্যের মিল আছে। যেমন নৃত্যশিল্পীর একদিকে তালবাদক অন্যদিকে বংশীবাদক। এ থেকে বুঝা যায় নৃত্যের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের সম্বন্ধ ছিল ওতপ্রোত।

এছাড়া 'নৃতু' (nṛtu) এবং শৈলুষ (Śailuṣa) এই দুটি শব্দ থেকেই সেই যুগের সমাজে নট (actor) ও নৃত্যশিল্পীর পার্থক্য ধরা পড়ে।

বাজসেনীয় সংহিতায় দেখা যায়, নানা আচার-অনুষ্ঠানে (rituals) হাত ও দেহভঙ্গীর প্রয়োগ হতো। অঙ্গের বিভিন্ন অংশের ভঙ্গিমায় বিভিন্ন উপমা, রূপক মূর্ত হয়ে উঠতো। পরবর্তীকালে 'মুদ্রা' বলে আমরা যাকে শাস্ত্রের অন্তর্গত করেছি, তার সূত্রপাত বোধহয় এখান থেকেই। এবং এই সকল অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়েই 'অভিনয়' ফুটে উঠতো।

এই যজুর্বেদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে, একেকটি বিশেষ ছন্দে, এবং বিশেষ সুরে দেহভঙ্গির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হতো মন্ত্রের অর্থগুলি। (কথাকলি নাচের সূত্রপাতের ইঙ্গিত বোধহয় এইখানে। কথাকে কলি বা মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশ করাই তো—'কথাকলি') (বিভিন্ন ভঙ্গির পাদকর্ম, হস্তকর্ম, আঙ্গুলের কাজ প্রভৃতি মিলিয়ে যেন একটা আঙ্গিক পদ্ধতি তৈরী হয়েছিল। ভরত নাট্যমের গতিভঙ্গিতে যেটা লক্ষ্য করা যায়।)

অগ্নিহোত্রীরা যজ্ঞের বেদির পাশ দিয়ে যে ভাবে চলাফেরা করতো সেই বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রিফিথ (Griffiths) লিখেছেন[১]

"Let me not with my foot offend thee, Visnu" (11.8) and, saying this, he must step to the southern side of the altar with the left foot in advance of the right, and return with the right foot before the left."

কি ভাবে পা ফেলতে হবে তার একটা সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া গেল।

এরপর কোন অভিনেতা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আছে, ব্রাহ্মণ একটি জয়ঢাক বা দুন্দুভিতে আঘাত করছে অন্যান্য বাজনাগুলি বেজে উঠলে, বাজপেয়ী হাত তুলে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলছে—

"In us be your great might and many vigour...

১। Translation and commentary of Vajassneyi Samhita Book II. IX. —22. Ibid—Page 175-176.

Obeisance to our Mother Earth! Obeisance to our 'Mother Earth.

This is my sovereignity, Thou art the ruler thou art controller, thou art firm and steadfast.

Thee for land culture, thee for peace and quiet…" (IX.22)

এখানে Mother Earth এবং Land Culture (namo matri Prthivyai) এই শব্দ দুইটি কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে।

উক্ত শ্লোকে ১৬।১৭ বার মৃদঙ্গ বাদ্যের তাল দেওয়ার মতো পদ্ধতি প্রাচীন নাটকে নান্দী পাঠের আগে প্রযোজ্য হতো। বর্তমান কালেও কেরল অঞ্চলে গোঁড়া কথাকলি নাচের আগে ঐ ধরনের মৃদঙ্গের, চেণ্ডার বা জয়ঢাকের তাল দেওয়া হয় ডুম্ ডুম্ করে। নাগা নৃত্যেও এই পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

অশ্বমেধ যজ্ঞের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নাচের রূপটি আরও সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। অশ্ব ফিরে এলে তাকে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে যে অঙ্গভঙ্গির মাধুর্য রয়েছে, তা বর্তমান কালে বিবাহ উৎসবেও দেখা যায়। (বৈদিকমতের বিবাহে)। যাকে 'বরণ' বা বরণ নৃত্য বলা যায়।

॥ অথর্ববেদে নৃত্য ॥

অথর্ববেদে নাচের উপাদান খুবই কম পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ কপিলা বাৎসায়নের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন—

"By the time of the Atharvaveda we find that the attitudes have changed and much of the spontaneity and simplicity of the Ṛgveda has been lost. Fear and superstition have entered man's mind, instead of offering sacrifices as in the Yajurveda, he is concerned more with casting spells.

(এখানেও যাদুবিশ্বাসের ইঙ্গিত)

Indra himself has become a King (III.3), the Maruts and the Asvins are gods meant only to be worshipped and are no longer playful and joyous.

The concept of the apsaras, however, has developed ; they live in the waters (samudra) whence they came and whither they go, appear on earth and are lost again (11.2.iii). The goddesses accompany the gandharvas and are present in the clouds, lightning and stars (11.2.iV), they are the wives of gandharvas (Gandharva Patni). They dwell with rivers (IV.37.iii), with plants and trees in the water (IV.37,iv), with peacocks and the arjuna trees (IV.37.V). and where the great drums resound (IV.37.V), here these apsaras dance with the Gandharvas (IV.57.V11) ; the form anṛtyatah is used here, locks of hair are indicated by the adjective Sikhandin. Several references to Gandharvas and Apsaras throw interesting light on the modes of dress and coiffure attributed to them in different ages. For the first time we meet these celestial nymps in their modified character in that they have started dancing. It is not till the Satapatha Brahmana, however, that we find them actively engaged in dance, music, play and acting as instruments of seduction (11.6.1).

Men and women also sing and dance even amidst the disease and pestilence they fear. They gather in assembly halls (V11.12.ii) and the sabha is the recognized place of meeting where social entertainments including music and dance abound. The long cosmogonic hymn (Pṛithvisūtra) addressed to the earth, the finest in this Veda is indicative of a joyous life on various planes, where mortals sing and dance :

"The earth, on whom, with clamour loud, Men that are mortal sing and dance of whom they fight in battle fierce. This earth shall drive away from us our foemen."

(Translation by Macdonell—X11.1.41.)

There is another beautiful metaphor in the Atharvaveda where the heart of the worshipper is the sea, where Vasa imbibing the Samaveda dances with delight.

Atharvaveda abounds in references to Gandharva and apsaras dancing, and from all these references in the Vedic literature, we can easily re-create a picture of the society

where dancing and music is an integral part of man's day-to-day living, whether in joy or in sorrow, as a profession or as an important communal activity."[১]

এ ছাড়া শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'অথর্ববেদের নৃস্থক্তে বাণ বা 'বীণাসহ নৃত্যের উল্লেখ আছে,' কো বাণম্ কো নৃত্যো দধৌ (অথর্ব ১০।২।২৭)। তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন— 'অথর্ববেদের ১০ম কাণ্ড, ৭ম সূক্ত ৪র্থ অধ্যায়ে ৪২-৪৩ শ্লোক দুটিতে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়— 'তয়োরহং পরিনৃত্যন্ত্যোরিব ন জানামি যতরা পরস্তাৎ।[২]

এ যুগের মানুষের মতো বৈদিক যুগের মানুষও নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবাদিতে সেজেগুজে আনন্দে যোগদান করতেন, বেদে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'পোষাক ও অলংকারের দিকে আর্যদের বেশ দৃষ্টি ছিল দেখা যায়। পোশাকের তিনটি ভাগ ছিল। নীবি (অন্তর্বাস) বাস বা পরিধান ও অধিবাস বা দ্রাপী। বস্ত্র নানা রঙের ছিল—তূলা, হরিণের ছাল ও পশম দিয়ে তৈরী হতো। সোনার গহনা ও ফুলের সংযোগে অঙ্গসজ্জা করা হতো, বিশেষ করে উৎসবের সময়, পুরুষ ও মেয়েরা মাথায় একটি কাপড়ের পোশাক ব্যবহার করতেন এবং উভয়েই মাথার চুল দীর্ঘ রাখতেন।'[৩]

আমাদের ধারণা বৈদিক উৎসবাদিতে নৃত্যশিল্পীরাও উল্লিখিত সৌখিন পোষাক পরতেন। বেদের ব্রাহ্মণ অধ্যায় রচনা কালে দেখা যায়, ঐ সময় প্রজ্বলিত যজ্ঞবেদির কাছে নৃত্যানুষ্ঠান হতো। কুমারী মেয়েরা জলের কলসী নিয়ে ঐ অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বৃত্তাকারে নেচে প্রদক্ষিণ করছে, এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। এই নৃত্যের সঙ্গে তাঁরা আত্মনিবেদন মূলক বৈদিক স্তোত্রও সুর সহযোগে গাইতো। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা ছাড়াও পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডঃ কীথ (Keith), প্রোঃ ওল্ডেনবার্গ (Oldenburg), প্রোঃ হিলব্রাণ্ট (Hillebrandt), প্রভৃতিরাও একথা স্বীকার করেছেন। বৈদিক মহাব্রত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ঐ কুমারী মেয়েদের নৃত্যের উল্লেখ দেখা যায়।

পরবর্তীকালে ভারতীয় নৃত্যে যে দেবদাসী প্রথা দেখতে পাই, তার সূত্রপাত,

১। Dr. Kapila Vatsayana—I.C.D.L.A.—Page 177, 178.

২। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—১ম খণ্ড, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ৯৭, ১০২।

৩। ভারতজনের ইতিহাস—বিনয় ঘোষ (বাক্-সাহিত্য-দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৩, পৃঃ ৩০)।

এই মহাব্রত আচার-অনুষ্ঠান মূলক নৃত্যের মধ্যেই রয়েছে বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সঙ্গীততত্ত্ববিদ, আর, সত্যনারায়ণ (R. Satyanarayan) বলেছেন—

"The famous sacrifice, Soma Yaga has a variety called Mahabrata. Its central dias, called Mahavedi was devided into a number of auxiliary vedas each made of earth four inches high and a hasta—about eighteen inches—wide circular or aquare. They were collectively called a dhisnya. There were eight such dhisnya meant for the agnidhri, hotr, maitravaruna, prasastr, brahmanacchamsi, potr, nestr and acchavak respeetively, Besides these, another smaller curtain dias called marjaliya was constructed to the right of the mahavedi. This was used for cleaning the vessels and other accessaries of the Yajna."[১]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, বিখ্যাত সোমযজ্ঞ বা সোমযাগ এর একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মনিবেদনমূলক গান ও নাচের উৎস হল 'মহাব্রত' অনুষ্ঠান। নাচের ইতিহাসে এই মহাব্রত অনুষ্ঠানটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানের মধ্যেকার মঞ্চকে বলা হয় মহাবেদি। এই মহাবেদির আশে পাশে চার ইঞ্চি চওরা মাটির বেদি থাকতো কতগুলি। এদের আকার ছিল কোনটা গোল, কোনটা চৌকো। এসব বেদিগুলির সমষ্টিকে বলা হতো ধিষ্ণ (dhisnya)। এই ধরনের ৮টি ধিষ্ণ থাকতো, যথাক্রমে অগ্নিধ্রি (agnidhri), হোত্রি (hotr), মৈত্রাবরুণ (maitravaruna), পোশস্ত্রি (Prasastr), ব্রাহ্মণাচ্চংশি (brahmanacchasi), পোত্রি (Potr), নেস্ত্রি (nestr) এবং অচ্চাভাক (acchavak)। এ ছাড়া মহাবেদির ডান দিকে থাকতো 'মার্জালীয় (marjaliya) নামে মাটির ছোট বেদি। যজ্ঞের বাসন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ধোবার জন্য এটা তৈরী করা হতো।

এর পরেই সত্যনারায়ণ বলছেন—

"·· the interesting thing is that the dasis of one of the

১। Bharat Natya—a critical study—by R. Satyanarayan. (Varalalakshmi Academi of Fine Arts—Mysore—1969, 1st Edition, Page 278-282.)

yajawanas, or of their leader, the grhapati, were required to perform a ritual dance around the dhisnya and maryaliya."[১]

এখানে লক্ষ্য করতে হবে দুটি শব্দকে—গৃহপতি (grahapati) ও দাসী (dasi)। ঋক্ বেদের যুগে আর্যরা ছোট ছোট পিতৃপ্রধান পরিবারে বিভক্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে বাস করতেন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি 'বিশ' ও জনপদ গড়ে উঠতো। পরিবারের কর্তাকে বলা হতো গৃহপতি, গ্রামের মোড়লকে বলতো গ্রামণী। উক্ত মহাব্রত নৃত্যানুষ্ঠানে গৃহপতিদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকতো। তাঁদেরই নির্দেশে ঐ দাসীরা আচার-অনুষ্ঠানমূলক নৃত্য করতেন ধিষ্ণ ও মাজালীয়কে ঘিরে। আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কলিঙ্গের জৈনরাজা খারবেল নিজে রাজ-গৃহপতি রূপে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তাঁর উদয়গিরি-শিলালিপিতে তার উল্লেখ আছে। আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা করবো। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও দেখা যায়, সেরাইকেল্লা ও ময়ূরভঞ্জের ছৌ-নৃত্যে, ওখানকার স্থানীয় রাজ-গৃহপতিরা নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছেন। সে যাই হোক, এখানে 'দাসী' শব্দটি লক্ষণীয়। কারণ এই দাসীদের থেকেই সমগ্র ভারতে 'দাসী আট্টমের', সৃষ্টি হয়েছিল। এই দাসী আট্টমের অনেকগুলি ভাগ হয়েছিল পরবর্তীকালে। যেমন দেবদাসী' রাজদাসী, অলঙ্কার দাসী, শিবদাসী, সেবাদাসী ইত্যাদি ইত্যাদি। এদেরও আলোচনা করবো যথাস্থানে। দাসী আট্টমের সূত্রপাত যে বৈদিক যুগ থেকেই, এটা জানা গেল। দক্ষিণ ভারতে এখনো 'আট্টম্ বা অট্রিম্ শব্দ নৃত্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে এই নৃত্যশিল্পী দাসীরা, কারা? এই প্রসঙ্গে বলা যায় দাস ও দস্যুদের মহিলাদের কথাই বলা হয়েছে 'দাসী'। আর্য-অনার্য সংঘর্ষে, পরাজিত অনার্যগণ দাস বলে পরিগণিত হতেন। যদিও প্রথমাবস্থায় শ্বেতবর্ণের আর্যরা কৃষ্ণবর্ণের অনার্য দাসদস্যুদের সংস্পর্শ থেকে স্বভাবতঃই নিজেদের দূরে রেখেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেছে এদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে। অনেক আর্য ঋষি ঐসব দাসীদের বিবাহ করেছেন। জানা যায়, বিখ্যাত ঋষি কবশ ঐলূশা একজন দাসীপুত্র ছিলেন। (the aryan ṛsis even married the dasis. The famous ṛsi Kavesa Ailusa was a dasi puträ.)

১। Ibid—Page-278.

এ বিষয়ে সত্যনারায়ণের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।

"It meant originally a woman of the dasas or dasyas. These latter were the swarthy people of the south who had developed a remarkably high culture and civilization. They had their own towns and fortresses. Most of the ten kings of the dasarajna battle described in the Ṛgveda, including Sambara, were of this people. Their women were highly proficient in music and dance."[১]

এই বর্ণনা থেকে আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষে আর্যী-করণের পরবর্তী অধ্যায়ের কথাই বলেছেন। কারণ আর্যীকরণ প্রথম হয় উত্তর ভারতে। পরে দক্ষিণভারতে। উনি সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের দাস মহিলাদের উচ্চমানের সাংস্কৃতিক বোধ বিশেষ করে সঙ্গীত ও নৃত্যের পারদর্শিতার কথা বলতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্যে যে মন্দির কেন্দ্রিক ধর্মীয় নৃত্যপদ্ধতির উদ্ভব হয় তার মূল বোধহয় এখানেই অনুসন্ধান করে দেখাতে হবে। কারণ দেবদাসী নৃত্যপদ্ধতি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন যুগে এই দাসী নৃত্যধারার উৎকর্ষতা দেখা গেছে।

বৈদিক মহাব্রত অনুষ্ঠানে এইসব দাসীরাই জলপূর্ণ কলসী মাথায় নিয়ে ধিষ্ণ ও মার্জালীয় বেদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করতো বাম থেকে দক্ষিণে নৃত্যের মাধ্যমে। তাঁদের ঐ নৃত্য ছিল 'নৃত্ত' পর্যায়ের। অর্থাৎ ভাবাভিনয়যুক্ত 'নৃত্য' তখনও তৈরী হয়নি। তখন নৃত্য বলতে, তাল-লয়াশ্রিত নৃত্তকে (যাকে এযুগে Abstract Dance বলা হয়।) বোঝাতো। এই নৃত্তের সঙ্গে তাঁরা আত্মনিবেদনমূলক গাঁথা ও স্তব করে নিজেদের কণ্ঠে গাইতেন। এই প্রদক্ষিণের সময় কতগুলি বিশেষ অঙ্গভঙ্গি থাকতো। এই নৃত্তে বীণাও বাজতো। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এমন অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়—

১। 'উদকুম্ভান্ অধিনিধায় দাস্যো মার্জালীয়ং পরিনৃত্যন্তি পদো নিঘ্নন্তীঃ ইমং মধু গায়ন্তো মধু বৈ দেবানাং পরমমন্নাদ্যং পরমমেবান্নান্যমরুনুতে পদো নিঘ্নন্তি মহীয়ামেবৈষু দধাতি')

২। পরিকুম্ভি ল্যো মার্জালীয়ং যন্তীদং মধ্বিতি য ঘোষা এব তদ্ঘয়ো ভূষা সহ স্বর্গলোকং যান্তি।

১। Ibid—Page 278.

৩। প্রেষ্যাঃ সংশান্তি পূর্ণ উদকুম্ভাস্তি ব্রোহবসাঃ যঙ্ভুত্তমাঃ ইমং ধিষ্ণ্যং কুম্ভং চ ত্রিঃ প্রদক্ষিণং পরিব্রজায় দক্ষিনৈঃ পাণিমির্দক্ষিণাণু রুণাঘ্নানা এত্থেকা এত্থেকা এত্থেকাইন্দং মধু ইদং মধ্বিতি বদন্ত্যঃ।

৪। অথৈতা দাস্য উদকুম্ভান্ অধিনিধায় মার্জালীগং পরিনৃত্যন্তি উপস্থান্ন-পহস্ত দক্ষিণাৎ পদো নিঘ্নন্তীঃ ইদং মধুং গায়ন্ত্যঃ তাসাম্ যক্কৎ পরীতানাং প্রথমাং বাচয়তি গান এব স্বরভ্যো হে মহা ইদম্ মধ্বিতি।

৫। অগ্রেতা দাসকুমার্য্যঃ উদকুম্ভান্ অধিনিধীয় ত্রিঃ প্রদক্ষিণং মার্জালিয়ং পরিনৃত্যন্তি দক্ষিণাং পদ নিঘ্নন্তীঃ ইদং মধুং গায়তি। হিলকাং দ্বে গায়েতাং, হিংবিনং দ্বে হস্তবারাঃ হৈ সং কস্তর গাথাং দ্বে…হৈ মহা ইদংমধু হিণ্ডু হিলুতি পর্বাসাং শ্বপন্তেয়ু।

৬। অষ্টৌ দাশকুমার্য্যঃ উদকুম্ভং শীর্ষং নিধায়, ত্রিঃ প্রদক্ষিণং মার্জালীয়ং ধিষ্ণ্যং পরিনৃত্যন্তীঃ পরিষন্তি দক্ষিণাৎ পদো নিঘ্নন্তীরিদম্ মধুং গায়ন্ত্যঃ মিল্লকাং দ্বে গায়তঃ বাগ্বেদং হিম্মিণিতি দ্বে, বাগ্বেবহস্তবারাং দ্বে গায়েতাম্ং সংবস্তর গাথাং দ্বে, হৈ মহা ইদং মধুঃ হিল্লু হিল্লু বহমহর্মমীতি…সর্বাস্তন্থ।

৭। উদকুম্ভাং শিরন্নু কৃত্বামার্জালীয়ং দাস্যঃ পরিষন্তি। কাচরেত্যনাঃ পস্থাদিষু হৈ মহা, হৈ মহা ওঁ ইতি।

৮। গৃহপতের্দাস্যঃ নবান্নু দহরণাদ্ পূরাস্ত্বা প্রদক্ষিণম্ মার্জালীয়ম্ পরীয়ুঃ হৈ মহা হৈ মহা, হৈ মহা, ইদংমধু, ইদং ময়ু ইতি বদত্যঃ পশ্চাবরার্ধ্যাঃ পশ্চাশতম্ পরাধ্যাঃ পঞ্চবিংশতি সাম্প্রতাঃ।

৯। গৃহপতের্দাস্যঃ অভীষ্টাপস্ উদহরণান্ পুরায়িত্বা প্রদক্ষিণম মার্জালীয়ম্ পরীয়ু। হৈ মহা, হৈ মহা, হৈ মহা ইদং মধু ইদং মঞ্চিতি বদত্যঃ।… তাভ্যঃ বীণা বাদায়য়ুঃ।[১]

এ ছাড়াও জানা যায় বাদ্যের সঙ্গে তাল রক্ষা করে সামগেরা গান করতেন ও তাঁদের পুরনারীরা করতালি দিয়ে যজ্ঞবেদীর চার পাশে নৃত্য করতেন। ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলিতেও এ সকলের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক কিথ উল্লেখ করেছেন।

১। Ibid, Page 283.

"...the art of music had been fully developed by the Vedic age. Moreover the Ṛigveda (1.92.4.) already knows maidens who decked in splendid raiment, dance and attract lovers, and the Atharvaveda (X11.1.41) tells how men dance and sing to music."[১] ঋগ্বেদের (১।৯২।৪) মন্ত্রে আছে—'অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরি বা' অর্থাৎ উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করছে। 'নর্তকী'—শব্দ থাকায় নৃত্যকলা অনুশীলন যে বৈদিক যুগে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক কিথ বলেছেন মহাব্রত উৎসবে পুরনারীরা যজ্ঞাগ্নির চারিদিকে নৃত্য করতেন শস্যোৎপাদন ও বৃষ্টি আনয়নের জন্য। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে (১।১১।৫) আছে বিবাহ-উৎসবে পুরনারীরা নৃত্য করতেন, সেই নৃত্যের সঙ্গে থাকতো, নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র। অধ্যাপক কিথ লিখেছেন—

"Thus at the Mahavrata maidens dance round the fire as a spell to bring down rain for the crops, and to secure the prosperity of thc herds. Before the marriage ceremony is completed (Shankhyanagrihyasutra 1.11.5.), there is dance of matrons whose husband, are still alive and dancers are present who dance to the sound of the lute and flute, dance music and song fill the whole day moving."[২]

বৈদিক যুগে 'অবভৃথস্নান' নামে একটি অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়। সেই অনুষ্ঠান বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগেও প্রচলিত ছিল। ঐ অবভৃথস্নান' উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্য থাকতো। পুরুষ ও নারী উভয়ে বিভিন্ন বাদ্যের সঙ্গে নৃত্য-গীত করতো এবং তাঁরা রাজা ও রাণীর সঙ্গে স্নান করতে যেতো। তাতে তৈল-হরিদ্রাদি মেখে নৃত্য গীত ও বাদ্যের সঙ্গে স্নান সম্পন্ন হতো। এখনো খুঁজলে বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে এই অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়। আসল কথা বৈদিক যুগে স্তব, স্তোত্র, স্তুতি, গাথা ও গানের সঙ্গে নৃত্য অপরিহার্য ছিল।

১। Keith—The Sanskrit Drama (Oxford 1924)—Page-15-16.

২। Ibid—Page 26.

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরাণিক যুগের নৃত্যপ্রসঙ্গ

পৌরাণিক যুগ

(রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ ইত্যাদি)

।। পটভূমিকা ।।

বৈদিক যুগের প্রধান কীর্তি হলো হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সভ্যতার সংগঠন। আর্যদের বসতি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে, তার ভৌগোলিক সীমানা পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছে। কুরুপাঞ্চাল (দিল্লী-মিরাট অঞ্চল), কোশল (অযোধ্যা) কাশী (বারাণসী), বিদেহ (উত্তর বিহার) প্রভৃতি রাজ্য গড়ে উঠেছে।

ঋক্‌বেদের দশরাজার যুদ্ধের কাহিনীর মধ্যে আর্য-অনার্যের সংঘাত ও মিশ্রণের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আর্যরা যখন পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে মধ্যদেশে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আর্য ও অনার্য অনেক জাতির সম্মিলনে বড় বড় জাতি গড়ে উঠেছিল। যাই হোক, আর্য-অনার্য-এর সংঘর্ষের পর, আবার তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রিক মিলনও সূচিত হয়েছিল, এবং তারই ফলশ্রুতি হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও বিকাশ। এই সূত্রটি আমাদের মনে রাখা দরকার।

আর্যসভ্যতার প্রসার এবং আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে হিন্দুসভ্যতার পত্তন ও প্রতিষ্ঠার চিত্র ভারতের দুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে যেমন সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে তেমন আর কোথাও ফোটেনি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমালয়ের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র। ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।[১]

রামায়ণের কাহিনী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আর্যসভ্যতার কেন্দ্র তখন গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাইরে তার বিশেষ বিস্তার হয়নি। রামায়ণের কাহিনী মূলতঃ দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী; কারণ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —রবীন্দ্ররচনাবলী (১৩শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৬৬১(৩)-৬৬২(৭)।

এতে সর্বভারতীয় আর্যদের প্রসারের আভাস পাওয়া যায়। রাম তাঁর রাজ্য-সীমার বাইরে গেলেই কেবল অরণ্য এবং সেই অরণ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন আর্য-তপোবন দেখতে পান। কিষ্কিন্ধ্যায় (বর্তমান বেলারী অঞ্চল) পৌঁছুবার আগে কোন সুশৃঙ্খল সমাজবদ্ধ জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। গঙ্গার দক্ষিণ থেকে বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত কেবল বড় বড় অরণ্য দেখা যায়। এই চিত্র থেকে বুঝতে পারা যায়, মধ্যদেশ থেকে পূর্ব-ভারতে ও দক্ষিণভারতে আর্যসভ্যতার প্রসারের স্মৃতি 'রামায়ণ' বহন করছে।

মহাভারতের চিত্র একেবারে অন্যরকম। দক্ষিণভারত, পূর্বভারত, ও পশ্চিমভারতের বড় বড় রাজা ও রাজ্যের কথা মহাভারতে আছে এবং তাঁরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতের কেন্দ্রস্থ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ কাথিওয়ার উপকূলে দ্বারকার অধিবাসী। ভারতের সকল তীর্থস্থান, নদনদী, পাহাড়-পর্বত মহাভারতে সুপরিচিত, কিন্তু রামায়ণে নয়। রামায়ণ যে আর্যসভ্যতার আদি পর্বের এবং মহাভারত যে আর্য-অনার্য মিশ্রণে গঠিত পরবর্তী হিন্দু সভ্যতার পর্বের কাহিনী ও চিত্র অবলম্বনে রচিত তা এই ভৌগোলিক উপাদান থেকে বোঝা যায়।

॥ সময়কাল ॥

(খ্রীঃ পূঃ ৪০০-৪০০ খ্রীঃ) মতান্তরে-রামের সময়কাল-২১২৪ খ্রীঃ পূঃ—কৃষ্ণের সময়কাল ১৪৫৮ খ্রীঃ পূঃ।

পণ্ডিতদের মতে রামায়ণ ও মহাভারত রচনার সময়কাল ধরা হয় আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপরবর্তী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে। অর্থাৎ প্রায় আটশত বছর। যদিও প্রচলিত মতে কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণের এবং মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের রচয়িতা, তবু কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন ঐ দুইটি গ্রন্থের কোনটিই সমগ্রভাবে কোন এক ব্যক্তির দ্বারা বা কোন এক সময়ে রচিত হয়নি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লোকের রচনার সমাবেশে এই মহাকাব্যদ্বয়ের উদ্ভব। মহাকাব্য দুইটিই বৈদিকোত্তর যুগে রচিত।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মহাকাব্য হিসেবে আমরা বাল্মিকী-রচিত 'রামায়ণ' ও ব্যাস সংকলিত মহাভারত পাই। রামায়ণ ও মহাভারত সঙ্গীতশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, তাদের প্রতিটি কাণ্ডে, পর্বে, স্বর্গে বা অধ্যায়-এ নৃত্য গীত ও বাদ্যের

প্রভৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছুটি মহাগ্রন্থকে পুরাণ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রী: পূঃ ৪০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ৪০০ পর্যন্ত ভারতীয় জনজীবনের নানা তথ্য জানা যায়। আগের দিনে ক্রমিক দিন তারিখ দিয়ে ইতিহাস লেখবার প্রবণতা ছিল না। তাহলেও উক্ত মহাকাব্যগুলি উক্ত সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার পরিপূর্ণ ইতিকথার পরিচয় দেয়।

রামায়ণের যুগে তো বটেই, প্রাচীন ভারতে বংশানুক্রমিক ভাবে মুখে মুখে গান করার রীতি প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, গন্ধর্ব, ঋষি-মুনিরাও বিশেষভাবে সঙ্গীতের চর্চা করতেন। রাজদরবারে চারণদলের (Ballad Singer) পক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন অপরিহার্য ছিল। দেবদাসীরা ছাড়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীরাও নৃত্যগীতে স্বাধীনভাবে যোগ দিতেন। তখনকার নৃত্য শাস্ত্রীয় ধারার অনুবর্তী ছিল বলে অনেকে মনে করেন সুতরাং ভারতীয় 'ক্ল্যাসিকাল' নৃত্যের আভাস এই পর্বে সূচিত হয় বলা যেতে পারে।

॥ রামায়ণে নৃত্যের উপাদান ॥

ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল নৃত্যের সার্থক ইতিহাস সুরু হয় সম্ভবতঃ সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণগুলির মধ্য দিয়ে। এই মহাকাব্যের যুগ সুরু হতেই দেখা যাচ্ছে নৃত্যের মূলধারা ছুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছুইটি ধারা হল উচ্চাঙ্গ (classical) ও লোক নৃত্য (Folk or Popular) ধারা। এবং ও সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে নৃত্য এমন একটি শিল্পকলা যা রাজকুমার, কোন যুবতী বা কোন গণিকার কাছে আনন্দের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ধরা দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে রামায়ণ এবং মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়ের লেখকরা নৃত্যশিল্প বিষয়ে, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের নৃত্যপদ্ধতি ও নৃত্যকলাতত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

ভারতীয় শিল্পে পৌরাণিক যুগ একটি উল্লেখযোগ্য সময়কাল। পুরাণগুলিতে নৃত্যের যে মূল্যবান উপাদান পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় যে, শিল্প, পৌরাণিক কাহিনী ও বাস্তবতা মিলিয়ে এই তিনের স্বাঙ্গীকরণে শিব ও বিষ্ণুর নৃত্য বিকাশের ধারাটি কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও সংকেতাকারে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। নৃত্যের ঔপপত্তিক প্রকরণ বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও পদ্ধতিগত

আঙ্গিক প্রকরণের নাম পুরাণগুলিতে অজস্রবার দেখা যায়। যদিও পুরাণগুলির কিছু কিছু ভরতোত্তর যুগের (Post Bharat) রচনা বলে অনেকে মনে করেন।

রামায়ণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নৃত্যের প্রসঙ্গ এসেছে।

(ক) রামায়ণে এমন অনেক পৌরাণিক চরিত্র আছে যাঁরা নৃত্য করেছেন। যেমন অপ্সরাগণ। এদের নাচে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মুনি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করে, তাঁদের লাস্যময় জীবনের আস্বাদন দিয়ে প্রলোভিত করার জন্য এই অপ্সরাদের নিয়োগ করা হতো।

(খ) তদানীন্তন কালের রাজারা যে শিল্পচর্চা করতেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল নৃত্য চর্চা। রাম এবং রাবণ উভয়ই এই নৃত্যশিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা অনুমান করা যায়। অভিনেতা ও পেশাদার নৃত্যশিল্পীরা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এ সময়ে। তখনকার সমাজে গণিকাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই শিল্পে, তাঁরা সমাজে সম্মান পেতেন এবং কোন অনুষ্ঠানে এদের উপস্থিতি পবিত্র বলে গণ্য করা হতো। নাগরিকরা সুখে ও দুঃখে নৃত্যানুষ্ঠান করতো। (দুঃখে নৃত্য করতো, এ থেকে মনে হয় Death Dance বা Funeral Dance তখনো প্রচলিত ছিল, যা ছিল এক কালে Tribal Dance এর অঙ্গ)।

(গ) নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত ইমেজগুলি যেগুলিতে প্রাকৃতিক বিষয় রয়েছে তার সাথে নৃত্য ও নৃত্যশিল্পীর তুলনামূলক ধারণা উপলব্ধ হয়।

(ঘ) সুন্দরকাণ্ডে রাবণের গুণাগুণ বিচারের সময় বিশেষ ধরনের নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়। নৃত্যের পদ্ধতি বিষয়ে এখানেই প্রথম তথ্য পাওয়া যায়। নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গির প্রতি মহাকবির যে বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, নৃত্যের বর্ণনাই তার প্রমাণ।

সমগ্র রামায়ণ জুড়েই অপ্সরাদের কথা নানা প্রসঙ্গে এসেছে। ইন্দ্র রম্ভাকে পাঠাচ্ছেন বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করে তাঁকে বশ করার জন্য বা প্রলোভিত করার জন্য। তবে অপ্সরারা শুধু নাচে গান মুনিদেরই প্রলোভিত করেননি—বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানে, বিশেষ করে রামের রাজ্যাভিষেকে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। রাম নিজেও অন্যান্য বিদ্যাচর্চার সঙ্গে গন্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নৃত্য এবং সঙ্গীত এই গান্ধর্ব বিদ্যার অঙ্গ। (অযোধ্যাকাণ্ড ২.৩৫) এক

জায়গায় রামকে 'গন্ধর্বরাজ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। (অযোধ্যাকাণ্ড ৩।২৭) বনবাসের পর যখন রাম অযোধ্যায় ফিরে আসেন তখন অযোধ্যার রাস্তায়, অলিন্দে, গন্ধর্বদের সমাবেশ ঘটেছিল। রামের প্রতিপক্ষ রাবণও নৃত্যশিল্পী হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন অনেক জায়গায়।

রামের অযোধ্যা ও রাবণের শ্রীলঙ্কা—এই দু জায়গার অধিবাসীরাই নৃত্যপ্রিয় বলে পরিচিত। তখনকার সামাজিক জীবনে নৃত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অযোধ্যার ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে চিত্তবিনোদনের নানা উপকরণ ছিল। তার মধ্যে নৃত্য প্রধান। অযোধ্যার রাস্তাঘাট, বৃক্ষলতা সুশোভিত বাগানের সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যশিল্পীদেরও বর্ণনা আছে। নববিবাহিত বধূদের মনোরঞ্জনের জন্য 'নাটকশালা'-র বন্দোবস্ত রয়েছে, দেখা যায় (বালিকাণ্ড ৫।১২) অযোধ্যার রাজা মহারাজা, মুনি ঋষিদের সঙ্গে অভিনেতাদের সামাজিক সম্ভ্রম উপলব্ধি করা যায়। নট, নর্তক ও গণিকাদের অবর্তমানে কোন মাঙ্গলিক কাজ হতো না। ঋষ্যশৃঙ্গ ও গণিকার কাহিনীতেও দেখা যায় মিষ্ট কথায় ভুলানোর কাজ এই নৃত্যশিল্পের মাধ্যমে হয়েছে। রাজা দশরথ বিভিন্ন যজ্ঞে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের যেমন, কারিগর, মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি যাঁদের নিমন্ত্রণ করতেন তাঁদের নামের সঙ্গে পৃথক তালিকায় নট, নর্তক ও গণিকারও থাকতেন। এভাবে অন্যান্যদের সঙ্গে পৃথক করে দেখানোর মধ্যেই বোঝা যায় নট ও নর্তকদের, তথাকথিত গণিকাদের থেকে আলাদা করে দেখা হতো। রামের বিবাহের উৎসবেও এটা লক্ষ্য করা গেছে (বালকাণ্ড ১।৭৭)।

অযোধ্যা কাণ্ডে নট, নর্তক ও গায়িকাদের দেখা যায় রামচন্দ্রের যুবরাজ হিসেবে অভিসিক্ত হবার আগে আনন্দ উৎসব করতে। দশরথের মৃত্যু ও রামচন্দ্রের বনগমনের পর অযোধ্যার নৃত্য-গীত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, ভরত এসে সেইরূপই দেখেছেন। ভরত এসে কোন গান বা বাজনার শব্দ অযোধ্যায় শুনতে পান নি। অগুরু-চন্দনের গন্ধসহ গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ। বশিষ্ঠ মুনি যেন বলছেন—'In such a city neither the actor (nata) the dancer (nartaka) is happy and satisfied' (Ak. 67/15).[১] এবং এই অযোধ্যাতেই দেখা যাচ্ছে আবার আনন্দ গান-বাজনা-নাচ, যখন রাম

১। Dr. K. Vatsyayan—Classical Indian Dance in Literature and the Arts.—Page-183.

ফিরে এলেন। ভরত যখন রামকে আহ্বান করে আনতে গেছেন তখন সেই শোভাযাত্রায় রাণীরা, তাঁদের মায়েরা, নাগরিকরা, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সঙ্গে মার্জিত বারাঙ্গনারাও ছিলেন, এবং তাঁরা অঞ্জলি হস্তে রামকে বরণ করেছেন। রামকে আশীর্বাদ জানানো হয়েছিল—'May be awaken and sleep with the sound of high drums and tinkling bells (Nupura) and so bleesed may be rule this world, till the earth would be, and till the sun continues to shine in the heavens.' (UK 1, and 11.)[১]

ঐ পবিত্র সুন্দর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে অপ্সরারা যে নৃত্য করেছেন তাতে নৃত্য অর্থে 'লাস্য' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ভরতের বিষণ্ণ মনে উৎসাহ সঞ্চার করার জন্যও নৃত্য গীতের আয়োজন ছিল। তাঁর মন ভোলাবার জন্য 'লাস্য' নৃত্যও হয়েছিল।

ঋষি ভরদ্বাজ, ভরতকে আতিথ্য দেখিয়ে চিত্তবিনোদনের জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাতে নৃত্য ও গীতের প্রচুর জোগান ছিল। নারদ ভরতের জন্য গান গেয়েছেন। অপ্সরাদের মধ্যে মিশ্রকেশী, পুণ্ডরিকা, ভামনা প্রভৃতিরা নেচেছেন। পিপল গাছ সেই নৃত্যের ছন্দে আন্দোলিত হয়েছে। খর্বকায় বামন ও কুঁজোদের আনা হয়েছিল কৌতুক স্ফূর্তির জন্য। বর্ণনায় দেখা যায় ভবতের সৈন্যরা পর্যন্ত ঐ অনুষ্ঠানে এতটা আনন্দ পেয়েছিল যে তারা নিজেরাই নাচতে সুরু করেছিল। (অযোধ্যাকাণ্ড ৯১।১৫।৬২) এই সময়ে 'নৃত্ত' (nṛtta) ও 'নাচ' এই শব্দদুটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অযোধ্যার আনন্দ উৎসবেই যে নৃত্য গীত হয়েছে তা নয়, শোক যাত্রা বা ঐ ধরনের অনুষ্ঠানে নাচ হতো। দশরথের মৃত্যুর পর সমগ্র অযোধ্যায় যখন শোকের ছায়া নামে তখনকার আচার অনুষ্ঠানে বিশেষ ধবনের অঙ্গভঙ্গিকরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। দশরথের কৃতকর্মের বর্ণনার জন্য 'পাণিবাদক (Pani-vadaka) এসেছেন। বাজসেনীয় সংহিতায় 'পানিঘ্ন' (Panighna) সম্ভবতঃ পাণিবাদকের সমার্থক। এই পাণিঘ্নরা পেশাদার সঙ্গীত শিল্পী এবং এঁরা হাতে তালি দিয়ে তাল রাখতেন। মহাভারতে 'পানিতাল' নামে যে তালের উল্লেখ পাওয়া যায় তা সম্ভবতঃ এই পানিঘ্নদেরই অবদান হতে পারে।

১। Ibid Page 183.

এই সব শিল্পকলা সূর্যবংশীয় রাজত্বে যেমন সম্ভ্রম ও মর্যাদা পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে বানর ও রাক্ষস রাজত্বে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি—অরণ্যের বৃক্ষলতাদি সহ জীবজন্তু সবই যেন নৃত্যে আন্দোলিত হচ্ছে এমন প্রতীকী বর্ণনা পাওয়া যায়। বানর রাজত্বে বানররা নৃত্য গীত শুনে চিৎকার করে তা প্রতিধ্বনিত করেছে। সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের পর যখন ভাইয়েরা পাহাড়ে উঠেছে তখন দূর থেকে মৃদঙ্গ ধ্বনিসহ কিষ্কিন্ধ্যায় গান শুনেছে—এবং তাতে অবশ্যই বানরদের সোল্লাসিত চিৎকার শুনেছে। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৭।২৭)। ঐ বানর রাজত্বে অপ্সরাগণও থাকতেন। পরে লক্ষণ যখন সুগ্রীবের প্রাসাদে যান তখন বীণা শোনেন। মহিলারা সমতালযুক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। সুগ্রীব যখন নারী-পরিবৃত হয়ে রয়েছেন তখন সেখানে নৃত্য গীত-স্বর প্রভৃতিতে তিনি এমনই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে ঐ অবসাদগ্রস্ত অবস্থা থেকে লক্ষ্মণ এসে তাঁকে চাঙ্গা করে তোলেন। এতে বানর রাজ লজ্জা পেয়ে যান এবং লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরেন। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-৩০।১৪।২৭)।

সুন্দরাকাণ্ডের প্রথম সর্গের পরেও দেখা গেছে স্বর্ণলঙ্কার আনন্দ উচ্ছল রূপের সঙ্গে শিল্পকলা চর্চার বর্ণনা রয়েছে। কথিত আছে এই নগরী নির্মাণ করেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। প্রসাদের বাইরে থেকে নূপুর নিক্কণ শোনা যেত যেন সমুদ্রের তরঙ্গ সঙ্গীতের মতো। প্রাসাদের ভিতরে গানের স্বরের লহরী ওঠা-নামা করতো, মৃদঙ্গ ও শঙ্খের শব্দ শোনা যেত। হনুমান যখন আসেন তখন গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরেরা যে প্রার্থনানুষ্ঠান করেন তাতে হনুমান এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে তার মনে হয়েছিল যেন ইন্দ্রপুরী—গন্ধর্ব নগর (সুন্দরাকাণ্ড ৪।৬।১১)। তিনি সঙ্গীতের নিনাদ ও নূপুর ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন (সুন্দরাকাণ্ড—৪।৭) তিনি প্রাণীদের কাছে যখন গেছেন, এমন কি যখন রাণীবাসরে গেছেন তখনও ভেতরে সঙ্গীত শুনেছেন। প্রাসাদের প্রায় প্রতিকক্ষে মৃদঙ্গের শব্দ শোনা যেত—আর নূপুর ধ্বনি সর্বত্র (এই নূপুর ধ্বনি নাচের ব্যাপারও হতে পারে অথবা তখনকার মেয়েদের পায়ে অলঙ্কার মল-এর ধ্বনিও শোনা যেত এমনও হতে পারে)। নৃত্যের সঙ্গে সঠিক তাল মৃদঙ্গে শোনা যেত (সুন্দরাকাণ্ড ৫)। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রাসাদের নর্তকীরা নাচ গান করতেন (সুন্দরাকাণ্ড ১০।২৯।৫৬)। মাঝখানে রাবণ ঘুমিয়ে আছেন আর তার চারপাশে

সকল সঙ্গীত শিল্পীরা কোলে যন্ত্র নিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, নৃত্যশিল্পীরাও এখানে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন বর্ণনা পাওয়া যায়।

যন্ত্রগুলিও যেন নৃত্য করছে। তখনকার দিনে বিপঞ্চি (Vipanci) নামে বীণা বাজানো হতো এবং নৃত্যশালিনী (Nrityasalini) শব্দ এখানে বীণা অর্থেই প্রযোজ্য (সুন্দরাকাণ্ড ১০।৪১)। রাণীরা সকলেই প্রায় নৃত্য ও সঙ্গীতে পারদর্শিনী ছিলেন। 'নৃত্যবাদিত্রকুশলা' (সুন্দরাকাণ্ড, ১০।৩১) শব্দ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। নৃত্যে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তো। এমন কি ঘুমন্ত অবস্থাতেও নৃত্যের ভাব পরিলক্ষিত হতো (সুন্দরাকাণ্ড ১০।৩৬) 'অঙ্গহার' শব্দটি এই প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হয়েছে দেখা যায়। এমন কি রাবণ সীতার মন জয় করবার জন্য নৃত্যগীতের আয়োজন করেছিলেন 'গীত-বাদ্য-নৃত্য' এই শব্দগুলি তখন ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় রাবণ যে শুধুই একজন সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন তা নয়, তিনি একজন কুশলী নৃত্যশিল্পীও ছিলেন। কথিত আছে রাবণের নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে 'চন্দ্রহাস' উপহার দিয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক বইয়েই রাবণের এই নৃত্য প্রীতির কথা আছে। তাণ্ডব নৃত্যের অনেক কষ্টসাপেক্ষ পদক্ষেপ নাকি রাবণ দেখাতে পারতেন।

নিকুম্ভিলায় ভদ্রকালীর কাছে রাক্ষসীদের কালীনৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সীতাকে অত্যাচার করার সময় (সু. কা. ২৪।৪৪) এই দুর্ধর্ষ নৃত্যানুষ্ঠান আমাদের দেশের প্রাচীন নৃত্যকলার ইঙ্গিত বহন করে। এই সময় থেকেই কঠিন 'আরবতী' (arbhati) এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমাজে একদিকে যেমন নৃত্যে বীর রস ও মধুর রসের স্ফূরণ দেখা যায় তেমনি সমাজের একটু নীচু তলার লোকেদের মধ্যে আচার অনুষ্ঠান মূলক নাচ (Ritual) এবং Death Dance বা শবযাত্রার নৃত্য অজানা ছিলনা।

নৃত্যের এমন প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াও রামায়ণের নানা বর্ণনায় নৃত্যের একটা কাল্পনিক জগতের ছবি পাওয়া যায়। ভরত যখন রামচন্দ্রকে খুঁজতে চিত্রকূট পর্বতে গেলেন তখন ভরদ্বাজ মুনি যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাতে বৃন্দ-বাদকের চমৎকার নিদর্শন রয়েছে। মানুষ ছাড়া বৃক্ষও যে নৃত্য করছে সে কথা জানা যায়। এতে শম্পা তালের উল্লেখ রয়েছে। এই শম্পা-তাল সম্ভবতঃ প্রাচীন ঝম্পতাল বা বর্তমান ঝাঁপতালের মতো। মৃদঙ্গের এই শম্পা (Sampa) তালের সঙ্গে বাঁশীও বাজতো। (তত, আনদ্ধ ও শুষির এই তিনপ্রকার বাদ্যই

বাজতো।) (স্থ. কা. ১১।২১) পিপল গাছ নাচছে এমন বর্ণনা দেখা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে ছন্দ রয়েছে কবি কল্পনায় তাও ধরা পড়েছে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথম স্বর্গে দেখা যায়—'শম্পা তালের সঙ্গে রামচন্দ্রের নাম যুক্ত হয়েছে। এই বিষাদময় অধ্যায়ে দেখা যায় নৃত্যকে মিলনের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে। রামচন্দ্র প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যেন দেখতে পাচ্ছেন বৃক্ষলতা পাতা সবই যেন মৃদুমন্দ হাওয়ায় নৃত্যে আন্দোলিত হচ্ছে। নৃত্যপর ময়ূর ময়ূরী যেন তাঁকে উপহাস করছে। বায়ু যেন ফুলের সঙ্গে নৃত্য করছে। সবই রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন মহাকবি। ফুলের উপর মৌমাছির গুঞ্জনকে কবি বর্ণনা করছেন যেন—শতপদী গান গাইছে। বায়ু এসে গাছপালাকে নাচ শেখাচ্ছে। কোকিল এই প্রাকৃতিক নৃত্যে যেন মোহিত হয়ে গেছে। (কি. কা. ১৩।১৬) মৃদু-মন্দ বায়ুকে এখানে নৃত্যশিক্ষক বলা হয়েছে। অবসাদগ্রস্ত রাম সীতাকে হারিয়ে এই প্রাকৃতিক বস্তুগুলির আন্দোলন অবলোকন করে মনপ্রাণ অনেকটা শান্ত করেছেন। ময়ূর ও বৃক্ষশাখার আন্দোলিত নৃত্যের কথা বার বার এই সর্গে উল্লেখিত হয়েছে। ৩৬নং ও ৪০নং শ্লোকে দেখা যায় ময়ূরের নাচকে আনন্দ ও মিলনের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। (এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য এ যুগের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে') নৃত্যকে এখানে ভালবাসা ও মিলনের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। বর্ষার সমাগমে স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলনে ময়ূর নৃত্য করে—এ ভাবনা বহু স্তবকে দেখা যায়।

২৮শ সর্গে দেখা যাচ্ছে রামের মানসিক অবস্থা বোঝাতে প্রকৃতির উপর মনের প্রতীক ধর্মিতা আরোপ করা হয়েছে—বর্ষায় ধূসর মেঘ যেন রামের বিষণ্ণতা, বৃষ্টির ফোঁটাগুলি যেন রামচন্দ্রের চোখের জল, মৌমাছির গুঞ্জন যেন বীণা. ভেকের ডাক যেন তাল, বজ্রবিদ্যুৎ যেন মৃদঙ্গ, মৌমাছির গুঞ্জন বীণা এই উপমাগুলি প্রতীক রূপে বার বার এসেছে।

রামায়ণে রাজনর্তকীদের নাচের কথা আছে। এই নাচ তখন ক্ল্যাসিকাল পর্যায়ে উন্নত হয়েছিল—এটা অনুমান করা হয়।

যদিও এই সময়ের নৃত্যকলায় তেমন কোন পরিশীলিত উচ্চাঙ্গ পদ্ধতির নৃত্যের কথা জানা যায় না, তবু এই নৃত্যশিল্পের কিছু কিছু শৈলী যে গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখ দেখি। এই নৃত্যকলা যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, বৈচিত্র্যপূর্ণ

ছিল এবং বিভিন্ন শৈলীর মধ্যে পার্থক্যও ছিল তা একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে।

রামায়ণের যুগে 'নাটক' থেকে 'নৃত্ত' (nṛtta)-কে আলাদা করে দেখা হতো। নট এবং নর্তক এই দুটি শব্দ আলাদা দুটি অভিনেতা বা শিল্পী সম্প্রদায়কে বুঝাতো। নটরা সাধারণত নাটকের অভিনেতা বলে পরিগণিত হতো। আর নর্তকরা ঐ নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যেই এক আলাদা বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত হতো। 'নৃত্য' (Nṛtya) এবং 'লাস্য' এই শব্দ দুইটি ছিল প্রায় সমার্থক। এবং এই লাস্য নৃত্যে তদানীন্তন গণিকারাই ছিল পারদর্শিনী (অঃ কাঃ ৬১।৪) (অবশ্য সে যুগে গণিকাদের একটা বিশেষ সামাজিক মর্যাদাও ছিল)। অভিনয়ে হাস্য পরিহাসও স্থান পেত (অ. কা. ৯১)। নৃত্যে 'তাল' (Tala) শব্দটি অঙ্গাঙ্গিভাবে ব্যবহৃত হতো। নৃত্যে তালের অপরিহার্যতা প্রায় সর্বত্র প্রতিপন্ন হয়েছে (কি. কা. ২৮।৩৫।৩৬)। নৃত্যের তালে 'লয়' (Tempo) একটি প্রধান আঙ্গিক গুণ বলে বিবেচিত হতো (কি. কা. ৯১।২৭)। বাজনার মধ্যে বীণা ও মৃদঙ্গ থাকতোই। রাবণের রাণীরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম জানতো (সু. কা. ১০)। এই সকল উদাহরণ ছাড়াও, এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার ভেতরে একটা Technical—শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধীয় মানে আছে, যা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন 'অঞ্জলি' শব্দটি যুক্ত করে পুষ্পাদি সহ দেবসেবা বা বন্দনা বোঝায়। নাট্যশাস্ত্রের 'সংযুক্ত হস্ত অঞ্জলি' (Sanyutahasta anjali) সম্ভবতঃ ঐ 'অঞ্জলি' শব্দেরই ইঙ্গিত বহন করছে। নাট্যশাস্ত্রের 'অঙ্গহার' শব্দটি এখানে রাবণের রাণীদের ঘুমন্ত অবস্থায় দেহভঙ্গিকে বুঝাতেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। (মনে হয় নৃত্য পটীয়সী রাণীরা নৃত্য ক্লান্ত হয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখনও হয়তো শয়ান অবস্থায় ভঙ্গিটি নৃত্যেরই কোন এক ভঙ্গির মতো দেখাতো— এবং সেটাকেই বলা হতো 'অঙ্গহার'। 'অঙ্গ' এবং 'উপাঙ্গ' (বা. কা. ৫৫) শব্দ দুইটি ধনুক ও বাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নাট্য শাস্ত্রে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ এক বিশেষ অর্থে—দেহের বহিরঙ্গের Anatomy বোঝাতে চেয়েছে।

নট, নর্তক ও গণিকারা ছিলেন পেশাদার। সমাজে ছিল এদের বিশেষ সমাদর। সমাজের পবিত্র ও স্থানীয় অনুষ্ঠানে এদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যেত। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় 'শৈলূষ' (Sailuaa) শব্দটি 'পঞ্চগন্ধর্ব

গ্রহপতির' একজনকে বোঝাচ্ছে। তবে বেদের পুরুষমেধ যজ্ঞের 'শৈলুষ' আর এই 'শৈলুষ' এক কিনা তা বোঝা মুস্কিল (কি. কা. ৪১।৪৩)। এখানে আমরা 'কৌশিক' নামে একটি স্থানের নাম পাচ্ছি। পরবর্তীকালে ভরত তাঁর নাট্য শাস্ত্রে' কৈশিকী বৃত্তির' কথা বলেছেন। এই কৌশিক নামক জায়গাতে হয়তো লাস্য ধরনের নাচের প্রচলন ছিল, তাই হয়তো ভরত লাস্য-অঙ্গের কৈশিকী বৃত্তির কথা বলেছেন।

সেই যুগের শিক্ষাক্ষেত্রে নৃত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। রাজ পুত্রদের যুদ্ধ ও অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষায় সঙ্গে নৃত্যের চর্চাও করতে হতো। নৃত্য শিক্ষা রাজপুত্রদের অপরিহার্য ছিল। এই শিল্প তাদের মন দিয়ে শিখতে হতো।

বাড়ীতে নানা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানেও নানা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নৃত্য করা হতো।

পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে নৃত্যশিল্পীরা একেক জন বিশেষ চরিত্র হিসেবে অঙ্কিত হয়েছেন। বিশেষ করে রামায়ণের অপ্সরাগণ পৌরাণিক বিশিষ্ট চরিত্রের স্থান পেয়েছেন এবং এদের গতিবিধি ছিল স্বর্গ মর্ত্য। এই দুজায়গাতেই প্রায় নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন।

ডঃ কপিলা বাৎসায়ন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে[১] সঙ্গীত ও নৃত্যের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যতগুলি শব্দের তালিকা দিয়েছেন—এ থেকেই এক নজরে সে যুগে প্রচলিত নৃত্যগীতের রূপরেখাটি জানা যাবে।

The following words connected with music and dance frequently occur in the Ramayana :—

Sailusa : For a class of people, also for the dancing master of the maidens of the royal courts (A.K. 83, 15 and A. K. 30.8)

Nata : For the professional actor (UK.64.3. and AK. 67.15.)

Nartaka : For the professional dancer (UK. 64.3. and AK. 67.15.)

১। Classical Indian Dance in Literature and the Art—Dr. Kapila Vatsyayan, Page-189-91 (1968).

Ganikā : For the professional cortesan, whose main vocation was Dance and music (AK 15.8 and AK 3.16 etc.)

Pānivadak : The rhythm players or the drum-player, thereby showing us the very important role played by rhythm.

Gāyikā : Songstress (AK.6.14)

Tālavancāra : Akin to the pānivādakas—musicians who kept time.

Gandharva-Tatva : Used for the principles of music and dancing (BK. 4.10. and UK. 23-51.)

Nṛtya and Gita : Frequently mentioned together—whether in the court of Rama or in the court of Ravana or Sugriva (BK, 32.12, UK 2.11 ; UK. 42-20 ff ; Sk. 10-32 ff ; also KK, 27.26 and KK, 33.20)

Nṛtta : For dancing (AK.91.25 and KK, 20-10)

Lāsya : For dancing and nṛtta. (AK 69.4)

Angahāra : For Pose as a generic term (SK, 10.36).

Nātaka : For drama proper (AK, 69.4)

Nūpura and Kinkini : For the tinkling bells of the dancer as also for ornaments of the feet (KK. 33.25).

Tāla : For rhythm, both in general and technical sense.

Laya : For tempo, used several times in a technical sense in the context of music and dance. There types of tempo are Known to them (BK.4.8 ; AK, 91-27. and also KK.28.35ff)

Mārgi : Used in the context of singing. This is the same as the mārgi and deśi styles mentioned by the Sāmaveda (BK. 4-29)

Rasa : Six rasas are listed (BK. 4.8 ff)

The following instruments are mentioned as essential accompaniments to dance. There is always a lute, a vina and a Percussion instrument, besides the vocal gita. The percussion instrument mentioned specially in this context are :

Madduka : (SK,10.38)

Mṛdanga : (YK,50.16)

Muraja : (AK,39-41 and UK, 11.5)

Panava : (YK.59-8)

The instruments memtioned in connction with war are :—

Bheri : (YK.50.60.)

Dundubhi and Kana—YK. 31.28 and YK.32.45

The earthen musical instrument Kalsi (Sk.10.46) and the metallic ghaṇtā (YK.124. 120H) are also mentioned.

Various types of Turya, wind instruments, are frequently referred to in the Ramāyana in connetion with dance recitals. Vinā is by far the most favourite lute. The vipanci Vinā (YK.24.42 ff) and the tantri vinā (BK.4.5) find a mention in the Bālakānda.

In the Ramāyana we have the real beginnings of both the classical and the folk forms of dancing. We come to know from this work how dancing was used both for worship and entertainment how it was meant both for the professional dance and the layman. The social, ritualistic and classical

tendencies which we noticed in the Vedic literature have their first flowerings in this great epic of creative literature.

The ganikās of the Kābyas; the apsarās of Kalidāsas and the natas and nartakas of Sanskrit drama, take their cues from their Predecessors in the Rāmāyana. By the time of the Rāmāyana the character of the classical dance is almost set, and we are left with no doubt about the nature and character of the Indian dance on either the religious or the secular plane."

এ ছাড়া রামায়ণে সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন—'বাদিত্র বা 'আতোদ্য'কে সঙ্গীতশাস্ত্রে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : তত, আনদ্ধ, সুষির ও ঘন। এই চার রকম বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখই মোটামুটিভাবে রামায়ণে পাওয়া যায়। যেমন তন্ত্রী বা বীণার নিদর্শন তো দেওয়াই হয়েছে। সুষির হিসেবে বেণু বা বংশ (৪।৩০।৫১, ৫।.০।৪০), শঙ্খ (৬।৫০।৬), তূর্য (৪।১৩।২২), (৪।৩০।৫১)। আনদ্ধ হিসেবে ভেরী (৬।৫০।৬০), মৃদঙ্গ (৬।৫০।১৬), (৬।৫৭।২৮), মুরজ (২।৩৯।৪১), পর্ণব (৬।৫৯।৮), পটাহ (৩।৯৬।৩৫)। ঘনযন্ত্র হিসেবে স্বস্তিক (৬।১৩১।৩৯), ঘন্টি (৬।১২৪।১২৫) তাল (করতাল ? ৬।৫২।২৪)।

অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কায় রামায়ণের যুগে সকল ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল অপ্রতিহত। সে যুগে সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল অব্যাহত। নিদ্রা থেকে জাগ্রত করায়, আরাধনায়, যুদ্ধাভিযানে, অভিসারে, উৎসবে, শবানুগমনে, শিকার কার্যে, সকল আয়োজনেই নৃত্য গীত ও বাদ্যের সমাবেশ দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ, স্তাবক. বন্দী, যোদ্ধা সকলেই ছিল সঙ্গীতের অনুরাগী। তার কারণ মনে হয় তখনকার দেশনায়ক ও নৃপতিরা ছিলেন সঙ্গীতের একান্ত পৃষ্ঠপোষক। নর্তক, গায়ক, নট, শৈলুষ, দেবদাসী সকলেরই রাজ-দরবারে ও সমাজে ছিল সমাদব। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় পরিশ্রান্ত ভরত নৃত, গীত, বাদ্য ও নাটকে আনন্দ লাভ করছেন।······রাজা যে রাজ্যের নট, নায়ক, নর্তক ও উৎসবকারীদের রক্ষক ও উৎসাহদাতা, তাঁর অভাবে রাজ্য শ্রীহীন হয় একথা রামায়ণকার অযোধ্যা কাণ্ডের ৬৭ অধ্যায়ে ১৫

শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর একজন ন্যায়বান ও সর্বপ্রতিপালক নৃপতিকে নির্বাচন করার জন্য অমাত্যরা সমবেতভাবে ঋষি বশিষ্ঠ কে অনুরোধ জানালেন। একজন গুণবান ও গুণগ্রাহী নৃপতি নির্বাচনের পক্ষে তাঁরা যতগুলি কারণ দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি রাজাবিহীন রাজ্যে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্য, নাটক, উৎসব ও সমাজ কোনটাই পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে না।

'নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ।

মোটকথা তখনকার সময়ে নৃত্তগীত ও বাদ্যবিরহিত কোন রাজ্যের কল্পনাই করা যেত না।······নাটকে, নৃত্যে ও বিভিন্ন রকম বিদ্যার অনুশীলনে জাতি ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল মানুষ যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতো একথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।[১]

॥ মহাভারতে নৃত্য প্রসঙ্গ ॥

রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় গ্রন্থেই এমন একটি সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে সঙ্গীত ও নৃত্য আমোদ প্রমোদ ও চর্চার জন্য অপরিহার্য ছিল। মহাভারতের যুগে একক ও দলবদ্ধ নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্দ্রের অনুচরদের মধ্যে অপ্সরাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েছে এই মহাভারতের যুগে। এই সকল অপ্সরাদের মানুষের জগতেও দেখা গেছে। পুরুরবা ও বিশ্বামিত্রের জন্য স্বর্গ থেকে উর্বশী ও মেনকার মর্ত্যে আগমন, স্বর্গমর্ত্যের যোগসূত্র স্বরূপ। তবে তিলোত্তমার মর্ত্যে আগমন অন্য কারণে। সুন্দ-উপসুন্দকে নৃত্যের মায়াজাল বিস্তার করে ধ্বংস করার জন্য তিলোত্তমার উদ্ভব হয়েছে।

সারা মহাভারতেই অর্জুনের সঙ্গে এইসব স্বর্গীয় নৃত্যশিল্পী ও পরীদের দেখা যায়। উলুপী অর্জুনকে জলের গভীরে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। সেখান থেকে অপ্সরারা অর্জুনকে ধরে নিয়ে যায় স্বর্গে ইন্দ্রের সভায়। পৃথিবীতে থাকাকালীন কামরূপের নৃত্যশিল্পীদের তিনি ছিলেন প্রিয়, এবং দ্বারকায় যাদবদের ভূখণ্ডে সুভদ্রার নাচ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। (অভিনয় দর্পণে নাচের প্রবর্তন বিষয়ে দ্বারকা নামক স্থানটির উল্লেখ এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য।) মহাভারতের

১। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—(২য় খণ্ড) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ৮৮-৯০।

বাণ পর্বে দেখা যায় অর্জুন ইন্দ্রের রাজসভায় এসেছেন। এবং এখানে এসে তিনি সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা করেন। বিরাটপর্বে আবার এই অর্জুনকেই দেখি বৃহন্নলার ছদ্মবেশে তিনি রাজদরবারে নাচ শেখাচ্ছেন। ইন্দ্রের সভায় অপ্সরাগণ যখন অর্জুনকে নাচ শেখাচ্ছেন তখন কোন পদ্ধতি বা Technique-এ নাচ শেখানো হতো তার উল্লেখ নেই। গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ তাঁকে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে মনোরঞ্জন করেছেন। তম্বুরু নামক গন্ধর্ব সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। অর্জুনের জন্য যে সকল অপ্সরা নৃত্য প্রদর্শন করেন, তাঁরা হলেন, ঘৃতাচি (gritachi), মেনকা, রম্ভা, স্বয়ম্প্রভা (Svayamprobha) উর্বশী এবং মিশ্রকেশী। কি ধরনের নাচ তাঁরা নেচেছিলেন তা জানা যায় না। তবে নৃত্যে যে তাঁদের নিতম্ব ও বক্ষঃস্থল আন্দোলিত হচ্ছে তা বর্ণনায় পাওয়া যায়। (mahakati Kataksa Kampamananaih Payodharaih) (Mahabharata Section 43. Indralokagamana Parva, V.28-32)

এরপর দেখা যায় অর্জুনকে নাচ শেখাবার জন্য ইন্দ্র চিত্রসেনার নাম প্রস্তাব করছেন। অর্জুনকে নাচ-গানের সঙ্গে বাজনাও শিখতে বলা হয়েছে। কারণ তখনও নাকি মর্ত্যে বাজনার প্রচলন হয়নি। এবং সেভাবেই চিত্রসেনা অর্জুনকে গীত বাদ্য ও নৃত্যে শিক্ষা দিলেন। চিত্রসেনার সঙ্গে অর্জুনের অন্তরঙ্গতা একটু বাড়তেই গন্ধর্বদের গান-বাজনা ও নাচ তিনি (অর্জুন) আয়ত্ত করলেন। এ থেকেই বোঝা যায়' গীতং বাদ্যং নর্তনঞ্চ এয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে' কথার প্রাক্ স্বীকৃতি।

মহাভারতের যুগে রাজপুত্ররাও এই সঙ্গীত ও নৃত্যকলার চর্চা করেছেন। এবং এই চর্চা হতো ধারাবাহিক প্রথা বা প্রণালীবদ্ধ ভাবে।

মহাভারতের বিরাটপর্বে উর্বশী, অর্জুন, বৃহন্নলার কাহিনী থেকে বোঝা যায় সেই যুগে কুমারী মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে নাচের গুরুত্ব ছিল। এবং এই নৃত্যের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত' নর্তনশালা' ছিল যেখানে নৃত্যশিক্ষা ছিল আবশ্যিক এবং অপরিহার্য। অর্জুন যে গীত বাদ্য ও নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন, সে বিষয়ে তাকে পরীক্ষাও দিতে হয়েছে, তবেই তিনি নৃত্যশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

উক্ত 'নৃত্যশালা' বা 'নর্তনশালা'তেই বিরাট রাজের শ্যালক কীচক-বধ হয়েছিল। তবে ঐ নর্তনশালা নৃত্যানুষ্ঠানের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হতো না।

শুধুমাত্র নৃত্যশিক্ষার স্থান হিসাবেই পরিগণিত হতো। একমাত্র কীচক ছাড়া রাত্রিতে কেউ ঐ নর্তনশালায় যেতে পারতো না।

তখনকার সমাজে স্বর্গীয় নৃত্যশিল্পী, পেশাদার নৃত্যশিল্পী, অপেশাদার বা সখের নৃত্যশিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। নায়ক, নায়িকা, রাক্ষস জাতীয় সকলেই নৃত্যানুশীলন করতে পারতো। এ ছাড়া রাজসূয় যজ্ঞ পর্বে তখনকার দিনের মঞ্চ ও দর্শকদের বসবার জায়গা 'প্রেক্ষাগৃহ' নামেও পরিচিত হতো।

রামায়ণের পর মহাভারতের যুগে এসে দেখতে পাই, নৃত্যের বিকাশ ও রূপের যতটুকু স্পষ্ট পরিচয় আমরা রামায়ণে পাই—মহাভারত তা পাই না। অথচ এর পরেই হরিবংশ পরাণে নৃত্যের উপাদান অনেক পাওয়া যায় রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনায়। যথাস্থানে হরিবংশ পুরাণে নৃত্যের উপাদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাই হোক, রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের নৃত্যের উপাদান কম দেখে আমাদের অনুমান হয়—মহাভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে সংঘাত ও দুর্যোগপূর্ণ ছিল, ফলে শিল্পকলার রুচি ও চর্চা ব্যাহত হয়েছিল। রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের সমাজ ও চিন্তাধারা উন্নত ঠিকই, তবু অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক স্বীকার করেন রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের সমাজ বেশ বিস্তৃত ও জটিল ছিল—সুতরাং জটিল সমাজ ব্যবস্থায় উন্নত ধরনের শিল্পকলা গড়ে ওঠা হয়তো সহজ ছিল না এবং এজন্যেই বোধ হয় সঙ্গীত ও নৃত্যবিষয়ক উপাদান অপেক্ষাকৃত মহাভারতে কম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা এমন একটি সময় ও অবস্থার সন্ধান পাই যখন প্রাচীন যুগ শেষ হলো এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাত হলো অর্থাৎ কবি ভারতচন্দ্রের যুগের শেষ এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের যুগের সুরু এব মধ্যবর্তী সময়। এই সময় তুর্কী অভিযান দেশময় মারামারি কাটাকাটিতে দেশ বিধ্বস্ত সুতরাং তখন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। এবং সম্ভব ছিল না বলেই বাংলা সাহিত্য তখন আবর্তিত হয়েছে আর্যা, তর্জা, খেউড়, নেটো, পাঁচালী, আখড়াই, কবিগান প্রভৃতির মধ্যে। সুতরাং দেখা গেছে যে কোন দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে উন্নত ধরনের শিল্পকলার সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।

মহাভারতের যুগে সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন—

"মহাভারতের নৃত্য গীত ও বাদ্যের একত্র সমাবেশ যেমন—"ততো

বাদিত্রনৃত্তাভ্যাস্……গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ (আদি, ২০০।৯৯) বাদিত্রাণি চ… ননৃতুর্নর্তকাশ্চৈব জগুর্গীতানি গায়কা (আদি, ২০৬।৪) সনৃত্তগীতবাদিত্রৈঃ (আদি ২০৭।১১৪), নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ (সভা, ৫।২৪), 'বাদিত্রং নৃত্তগীতং' (সভা, ৮।৩৬), নৃত্তং গীতং চ বাদ্যং চ চিত্রসেনাদবাপ্নুহি (আরণ্য, ৪০।৬), 'নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়ামাহং (বিরাট, ৯।১৭), গীতবাদিত্র সংবাদৈঃ তালনর্তনলাসিতৈ (দ্রোণ, ৭৪।৩৮), নৃত্যবাদিত্র গীতানাম্ (শান্তি, ২৯৭।২৮), নৃত্তৈর্বাদৈশ্চ গান্ধর্বৈঃ (অনুশাসন, ১২৮।৩২৪), নৃত্যবাদিত্র গীতানি (অশ্বমেধিক ৪০।১৩) প্রভৃতি।……"

মহাভারতে গায়ক, নর্তক, বাদক, দেবদুন্দুভি, অপ্সরাদের নৃত্যগীত, গাথা গান, শঙ্খ, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, স্তোম, তাল, লয়, মূর্ছনা, প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গান্ধর্বগানের রূপ কি রকম ছিল, কোন কোন গ্রামে তা লীলায়িত ছিল, কোন রাগের সমাবেশ ছিল কিনা, কি রীতিতে বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা হতো ও তাদের বাজানো হতো, গানে কি তাল, কি মূর্ছনার বিকাশ থাকতো, এ সকলের সুনির্দিষ্ট কোন পরিচয় আমরা পাই না। (নৃত্যের বিকাশ ও পরিচয়ের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য, কারণ নাচের উল্লেখ থাকলেও কেমন করে নাচ হতো বা নাচের ব্যাকরণ কি ছিল, পদ্ধতি কি ছিল, তারও কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না।)

মহাভারতের যুগে গানের সঙ্গে বাদ্যের ও নৃত্যের সমাবেশ থাকতো। আবার গান ছাড়াও বাদ্য ও নৃত্যের অনুশীলন দেখা যায়।

নৃত্যের কথা মহাভারতে অনেকবারই উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু তার শ্রেণী, রূপ বা কোন পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়নি। সভাপর্বে 'নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি, রময়ন্তি মহাত্মনং' শ্লোকটিতে বিবিধ ভাব সহ নৃত্যের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আনন্দ দান কথাগুলি থেকে বিশেষভাবে বোঝা যায় নাট্যশাস্ত্রে যে বিবিধ রস ও ভাবের উল্লেখ আছে সে সকল রামায়ণ মহাভারতের সমাজে অব্যাহত ছিল। 'নৃত্তগীতং চ হাস্যং লাস্যং'—এই হাস্য, লাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গহার, মুদ্রার সমাবেশেই নৃত্যের রূপ ও মাধুর্যকে পরিস্ফুট করে। কাজেই মহাভারতকার নৃত্যের নির্দিষ্ট কোন রূপ, নাম বা ভঙ্গির উল্লেখ না করলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভরত যখন খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, ব্রহ্মা (ব্রহ্মাভরত আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূঃ) ও সদাশিব (সদাশিব ভরত) রচিত

নাট্যগ্রন্থের অনুসরণ করে তাঁর অভিনব নাট্যশাস্ত্রে গীত, বাদ্য, নৃত্য, অভিনয়ের প্রসঙ্গে বিভিন্ন নৃত্যের লক্ষণ, অঙ্গহার, রস-বিকল্প, ভাবব্যঞ্জনা, অভিনয়ের উপাঙ্গ বিধান, হস্তাভিনয়, সংযুক্ত ও অসংযুত হস্ত, নৃত্যসমাশ্রয় হস্ত, শরীরাভিনয়, চারীবিধান, মণ্ডল, গতিপ্রচার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন মনে করা যেতে পারে যে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে নৃত্যে ও অভিনয়ে এ সকল উপাদানের ব্যবহার ছিল এবং তখনকার নর্তক, নর্তকী ও অভিনেতাদের নৃত্য ও অভিনয় প্রচেষ্টায় সেগুলি প্রকাশ পেত।

এ সকল ছাড়া কাহিনীর প্রসঙ্গে নৃত্য গীত ও বাদ্যের কথা মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে ও অধ্যায়ে পাওয়া যায়। যেমন বৃহস্পতির পুত্র কচ নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর মন হরণ করেছিলেন। দেবযানীও নৃত্য-পরায়না ছিলেন। তিনি নির্জন স্থানে কচের কাছে নৃত্য শিক্ষা করতেন, গান করতেন ও তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। পাঞ্চাল রাজের সভায় নৃত্য ও গীতের বিশেষ সমাদর ছিল। খাণ্ডবদাহ পর্যায়ে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাদের বন্ধু-বান্ধব ও পুরনারীদের নিয়ে যমুনায় জলবিহারের সময় যমুনার তীরে খাণ্ডব-বনে পান ভোজন, নৃত্য গীত প্রভৃতি করেছিলেন। বনপর্বে অর্জুন অমরাবতীতে উপনীত হলে গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বরণীরা বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান করতে লাগলেন, আর ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরারা নৃত্য করলেন। অর্জুন পাঁচ বছর অমরাবতীতে অতিবাহিত করেছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেন তাঁকে নৃত্য গীত ও বাদ্যশিক্ষা দিয়েছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন বৃহন্নলা এই ছদ্মনাম নিয়ে নপুংসক সাজে বিরাটরাজের কন্যা উত্তরা ও রাজপুত্র, নারীদের নৃত্য গীত ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্রে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বৃহন্নলা বেশী অর্জুনের প্রসঙ্গে মহাভারতকার বিরাটপর্বে উল্লেখ করেছেন।—

স তত্র রাজানমমিত্রহাহ্ব্রবীদ্
বৃহন্নলাহহং নরদেব নর্তকী॥
(পাঠভেদ—'নর্তনং ভবামি তেহহং নরদেব নর্তনাম্ ?)

... ...

নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়াম্যহং
প্রবর্তনে কৌশলনৈপুণ্য মম।
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকী॥

বিরাট—

দদামি তে তং হি বরং বৃহন্নলে,
সুতাং হি মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশী ॥
... ...

স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয় প্রভুঃ
সখীশ্চ তস্য পরিচারিকা শুভাঃ
প্রেয়শ্চ তাসাং স বভুব পাণ্ডব ।

বৃহন্নলা—

নৃত্যং বা যদি বা গীতং বাদিত্রং বা
পৃথগ্বিধম্ ।
তৎ করিষ্যামি ভদ্রং তে সারথ্যং তু কৃতো মম ॥

এ থেকে বোঝা যায়, মহাভারতের যুগে পুরুষদের মতো নারীদের ও এমনকি অসূর্যম্পশ্যা, অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্য নিষিদ্ধ ছিল না। তাছাড়া সামন্ত রাজা ও সম্রাটদের দরবারে চারু শিল্প ও শিল্পীদের বিশেষ সম্মান ও সমাদর ছিল।"[১]

(এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পুরীর কোনারকের সূর্যমন্দিরে যে নৃত্য ভাস্কর্য দেখেছি তাতে একটি বিষয়ে আশ্চর্য লেগেছে যখন দেখলাম উপরের দিকে নারীশিল্পরা বড় বড় মৃদঙ্গ ও করতাল বাজাচ্ছেন এমন সব মূর্তির পাশেই নৃত্যশীলা নারীমূর্তিরা রয়েছেন। পুরুষ শিল্পী সেখানে অনুপস্থিত। অন্ততঃ ঐ জায়গাটুকুতে তো বটেই। এই থেকে মনে হয় মহাভারতের যুগেও যেমন নারীরা বাদ্যযন্ত্রের চর্চা করতেন—সেই ধারা যেন অব্যাহত ছিল কোনারকের যুগ পর্যন্ত)।

মহাভারতেব যুগের নৃত্যের উপাদান বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে যে 'ক্ল্যাসিক্যাল' যুগের সূত্রপাত ধরা হয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যেরও সূত্রপাত বুঝতে হবে। কারণ ভরত নাট্যশাস্ত্র প্রণয়নে যাঁকে অনুসরণ করেছেন, সেই ব্রহ্মা ভরতের কাল ধরা হয় আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে।

১। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—২য় খণ্ড, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১১৭-১১৯।

॥ হরিবংশ পুরাণে নৃত্য প্রসঙ্গ ॥

আমাদের ধারণা হরিবংশ পুরাণ ইত্যাদির লেখকরা নৃত্যশিল্প বিষয়ে, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পদ্ধতি (Dance Technique) এবং নৃত্য-কলাতত্ত্ব (Danciology) বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

ভারতীয় নৃত্য ও নাট্যকলার ইতিহাসে হরিবংশ পুরাণের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। যদিও হরিবংশ পুরাণকে মহাভারতেরই পরিপূরক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে, তাহলেও বলা যায়, নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতের উপাদান এখানে অনেক বেশী সুস্পষ্ট আকারে দেখা যায়। রামায়ণ-মহাভারতের নৃত্যের উল্লেখ মাত্র রয়েছে বিভিন্ন কাণ্ডে এবং পর্বে। কিন্তু সঠিক কোন নৃত্যের নামসহ বর্ণনা দুই গ্রন্থে নেই—যা আছে তা কোন নৃত্যের নামকরণের দিক থেকে স্পষ্ট নয়। সেদিক থেকে বলা যায় হরিবংশ পুরাণেই যেন কয়েকটি নৃত্যের নাম স্পষ্ট পাওয়া গেল—যে নামের নৃত্যগুলি পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত কোন কোন ক্ল্যাসিক্যাল নাচে, সেই নাচগুলির আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন হরিবংশে উল্লিখিত 'হল্লিসক' (Hallisaka) 'রাস' নৃত্য (Rāsa) এবং 'ছালিক্য' (Chālikya) গান ও নৃত্য, 'আসারিত' নৃত্য প্রভৃতির মধ্যে 'রাসনৃত্য' তো আমরা বর্তমান মণিপুরী ক্ল্যাসিক্যাল নাচে নানা নামে ও আঙ্গিকে এ যুগেও বিভিন্ন মঞ্চে ও অনুষ্ঠানে দেখে থাকি। যাই হোক, 'হরিবংশে সঙ্গীত' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যথার্থই উল্লেখ করেছেন[১]—'মহাভারতের পর খিল-হরিবংশে সঙ্গীতের উপাদান বড় কম নেই, বরং মহাভারতের চেয়ে অনেকাংশে বেশী ও সুস্পষ্ট। হরিবংশ অংশটি মহাভারত রচনার পরে তার অঙ্গীভূত করা হয়, তাই হরিবংশের নাম 'খিল—হরিবংশ'। 'খিল' অর্থে পরিশিষ্ট। মহাভারতের আঠারোটি অধ্যায় বা পর্ব ও হরিবংশের তিনটি পর্ব (হরিবংশ পর্ব, বিষ্ণু পর্ব ও ভবিষ্য পর্ব) মহাভারত ও হরিবংশ এই দুটি মিলেই আসলে মহাভারতের বিরাট কলেবরকে সম্পূর্ণ করেছে। হরিবংশকে অনেকে পুরাণের শ্রেণীভুক্ত বলেন। অন্ততঃ শ্রদ্ধেয় হপকিন্স ও ডঃ উইণ্টারনিজ তো বটেই—(১) 'Important is the fact for the

১। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—(দ্বিতীয় খণ্ড) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ—কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৬১ পৃঃ ১২০, ১৫৪, ১২৫, ১৩১, ১৩৫-১৪৪, ১৫৫-১৬১।

mythologis that the Harivansa is more closely in touch with puranic man with epic mythology. It is in fact a Purana, and epic mythology may properly exclude it, as it may exclude the Uttara in Ramayana, though both are valuable here and there to complement epic material"—Epic Mythology (Strassburg, 1915, P-2) (২) "… ..Harivansa a work which in reality a Purana and also occasionally called 'Harivansa-Purana' as part of the Mahāvārata."

হরিবংশ সংকলিত হয় প্রায় ২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। ৭০৫ শকে জিনসেন হরিবংশের অনুযায়ী একটি জৈন-হরিবংশ সংকলন করেন ও তাতে পুরাণের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশ তথা হরিবংশ পুরাণ সংকলন করেন ব্যাস-উপাধিধারী কোন মনীষী।'

হরিবংশে বিষ্ণু উপাসনার প্রাধান্য থাকলেও শৈবমতেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যেমন সামগ-ব্রাহ্মণেরা সামগানের মাধ্যমে হরি তথা বিষ্ণু—নারায়ণ বা কৃষ্ণ-বাসুদেবের স্তব-স্তুতি ও উপাসনা করলেও বিদ্যাধর, নৃত্যশীলা দেবদাসী ও অপ্সরাদের শঙ্করের স্তুতিগান করতে দেখা যায় ঃ—

(ক) উদ্গীয়মানং বিপ্রৈশ্চ সামভিঃ সামগৈর্হরিম (হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব ১১৫।৫)

(খ) নৃত্যন্তি নৃত্যকুশলা গায়ন্তি স্ম চ কন্যাকাঃ।
বিদ্যাধরাস্তথান্যত্র স্তবন্তঃ শংকরং শিবম্ ॥
(হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব, ৮৬।১৪)।

তাছাড়া, হরিবংশকার গান্ধর্ব অর্থে গানকে ও নৃত্যকে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলেছেন—'পূজার্থাং দেবদেবস্য গান্ধর্বং নৃত্যমেব চ' (বিষ্ণু পর্ব ৬৮।৫২) নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবেত রূপ যে সঙ্গীত, হরিবংশকার তারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন—

(১) নটানাং নৃত্যগেয়ানি বাদ্যানি চ সমস্ততঃ। (হরিবংশ পর্ব, ৫৫।১৯)
(২) মধুরৈর্বাদ্যগীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চাপিনদ্ গতৈঃ। (ভবিষ্যপর্ব, ২৭।১৩)
(৩) নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবসঙ্গীতযোনিনঃ। (বিষ্ণু পর্ব, ২৪।৭৫)

গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ নারদকে দেবতাদের আরাধ্য গান্ধর্বসঙ্গীতের কারণ বলা হয়েছে। মোটকথা 'সঙ্গীত' শব্দটির অনুপ্রবেশ রামায়ণ—মহাভারতের মতো হরিবংশ পুরাণেও (খ্রীঃ পূঃ ২০০) পাওয়া যায়।

হরিবংশে সঙ্গীতের উপকরণ হিসেবে হল্লীসক নৃত্য, ছালিক্য গান, উগ্রসেন ও যাদবদের জল ক্রীড়া, ভদ্রনটের সহায়তায় যাদবদের রামায়ণ-অভিনয়াদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত অসংখ্য রকমের ক্রীড়ার উল্লেখ আছে ও তাদের সংখ্যা প্রায় ছিয়াত্তরটি। বিভিন্ন বেদ থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, নিরুক্ত, নীতিমঞ্জরী, গর্গসংহিতা, পাণিনি সূত্র, পাতঞ্জলমহাভাষ্য, অর্থশাস্ত্র, কাশিকা, তত্ত্ববোধিনী, দশকুমার চরিত, বাসবদত্তা, মলিবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা নাটক, পঞ্চতন্ত্র, কুমারসম্ভব, অমরকোষ, নৈষধচরিত, শিশুপাল বধ, কিরাতার্জুনীয়, কাদম্বরী, পুরুষার্থচিন্তামণি, নির্ণয়সিন্ধু ভোজ প্রবন্ধ, চতুরঙ্গ-দীপিকা, মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। হরিবংশ পুরাণে এ ধরণের কয়েকটি কৌতুক-ক্রীড়ার ও উৎসবের সমাবেশ দেখা যায়। সঙ্গীত সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতের কয়েকটি ক্রীড়ার নাম যেমন—জলক্রীড়া, রাসক্রীড়া, ছালিক্য ক্রীড়া, নৃত্য ক্রীড়া, নাট্যক্রীড়া বংশনৃত্য, ইন্দ্রধ্বজ উৎসব, দেবযাত্রাদি মহোৎসব, হোলিকামহোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি।

(ক) হরিবংশ পুরাণের বিষ্ণু পর্বে (৮৮।২৫-২৭) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪অঃ ২৮।১৩৩-১৪২) জলক্রীড়ার বর্ণনা আছে। তাছাড়া কিরাতার্জুনীয়—(৯ম সর্গ), শিশুপালবধ (৮ম সর্গ) প্রভৃতি নাট্যসাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে।

(খ) রাসক্রীড়ায় নৃত্যগীতের সমারোহ ছিল। পণ্ডিতশাস্ত্রী ফার্কে[১] (Pharke) রাসক্রীড়া সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন ?"……বাদ্যাদিনা হস্তমিতকাষ্ঠ-দণ্ডদ্বয়েন বাঘাতপুরঃসরং মণ্ডলাকারং নৃত্যন্তো গায়ন্তি।' শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪৫) আছে : 'নদ্যা পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্ রেখে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবায়ুনা।"

(গ) ছালিক্য ক্রীড়ার উল্লেখ হরিবংশে (বিষ্ণু পর্ব ৮৯। ৬৬-৬৭) আছে।

১। **Pt. A. S. Pharke—Sports and games as referred to in Sanskrit Literature (Vide. The Journal of the Prince of Wales Saraswati Bhavana Studies, Vol—X, 1938, Pp.-64-98.)**

ছালিক্য নৃত্য বিশেষ। স্ত্রীগণ পরিবৃত হয়ে নৃত্যের সঙ্গে এই ক্রীড়া প্রচলিত ছিল।

(ঘ) নৃত্যক্রীড়ায়ও নৃত্য ও বাদ্যের সমাবেশ থাকতো। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে (১০।১৮।৯-১১)।

রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ।
কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদবন্॥
বেণু-পাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈ প্রশশংসুরথাপরে।
গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্নদেহা গোপালরূপিণঃ॥
ইত্তিরে কৃষ্ণরামৌ চ নটাইব নটম্ নৃপ।

নৃত্যক্রীড়ার প্রসঙ্গে গর্গসংহিতায় উল্লেখ আছে। (২খ ১২।৩৭-৩৮)

শ্রীরাগং চাপি হিন্দোলং রাগমেবং পৃথক্ পৃথক্।
অষ্টতালভিগ্রামৈঃ স্বরৈ সপ্তভিরগ্রত॥
নৃত্যৈর্ণানাবিধৈরম্যের্হাবভাবসমন্বিতৈঃ।
তোষয়ন্ত্যো হরিং রাধাং কটাক্ষৈব্রজগোপিকাঃ॥

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংহিতাকার শ্রীরাগ ও হিন্দোলে সাত স্বর ও তিন গ্রামের উল্লেখ করেছেন।

(ঙ) হল্লীসক ক্রীড়া। হরিবংশে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পূর্বোক্ত নাট্যক্রীড়া সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় (২।২৫।২২-২৩) আরও বর্ণিত হয়েছে: নৃত্যন্তঃ কৃষ্ণপুরতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব মৈথিল, রাধাবেষধরা গোপ্যঃ শতচন্দ্রাননপ্রভাঃ।" নৃত্যক্রীড়া সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে কৌমুদী-মহোৎসবে বর্ণিত হয়েছে: 'গায়ন্ত গায়কাশ্চৈব নৃত্যন্ত নটনর্তকাঃ।

(চ) বংশনৃত্য:—বংশনৃত্য নরমেধ যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হতো। শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় (৩০।২১) আছে: 'অগ্নয়ে পীবানং পৃথিব্যৈপীঠিমর্পিণং বায়বে (আদিবাসী নাগাদের মধ্যে এখনো 'বংশনৃত্য' প্রচলিত দেখা যায়।) চাণ্ডালমন্তরিক্ষায় বংশনর্তিতাম্। ভাষ্যকার মহীধর উল্লেখ করেছেন: 'অন্তরিক্ষায় বংশনর্তিতম্ বংশেব নর্তনশালম্। তথা ব্রাহ্মণাদীনাং পর্যগ্নিকবণানন্তরমিদং ব্রহ্মণে ইদং ক্ষত্রায়েত্যবং সর্বেযাং যথা স্বস্বদেবতোদ্দেশেন ত্যাগঃ। ততঃ সর্বাণ ব্রাহ্মণাদীন্ যূপেভ্যো বিমুচ্যোৎস্জতি।'

(ছ) ইন্দ্রধ্বজোৎসবের বিবরণ বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে আছে। এই উৎসব

ভিন্ন আকারে এখনো বর্তমান আছে। আধুনিক যুগে দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতিতে ঐ ধ্বজউৎসবের আঙ্গিক ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরকার উল্লেখ করেছেন :—'নটনর্তকসংকীর্ণং তথা পূজিত দৈবতম্।... ... ... উৎসবং চ তদা কার্যং জলতীর জগতৈর্মহৎ।' (পণ্ডিত অনন্তশাস্ত্রী এই ইন্দ্রধ্বজোৎসবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'ইন্দ্রকেতুসংজ্ঞকমিন্দ্রদেবতাকং মহান্তং ধ্বজমুত্থাপ্য তস্য পূজনং বিধায় নটনর্তকাদিভিরনেকখেলসং বিধায় পঞ্চমে দিবসে রাজা চতুরঙ্গবলযুতো হস্তিভির্ধ্বজং নদীতীরে নীত্বা তং তত্র প্রবাহয়েৎ। তদাজলে পৌরা জনপদা অনেকপ্রকারিকাং ক্রীড়াং কৃত্বা জল তীরে মহান্তমুৎসবং কুর্বন্তি।'—(Vide Saraswati Bhavana Studies—Vol-X ; 1938, P-93)

(জ) দেবযাত্রা মহোৎসব সম্বন্ধেও ব্রহ্ম পুরাণে বর্ণনা আছে। গর্গসংহিতায়ও (৪।১২।১৫-১৯) এর বিবরণ আছে। যেমন—রক্তহস্তাঃ পীতবস্ত্রাঃ কূজন-নূপুরমেখলাঃ, গায়ন্ত্যো হোলিকাগীতির্গালীভির্হাস্য-সন্ধিভিঃ' প্রভৃতি। বর্তমান হোলির মতো সেই যুগেও এটি একটি আবিরোৎসব—নৃত্যেও গীতে পরিপূর্ণ ছিল। এ ছাড়া হোলি এবং বসন্তোৎসবে নৃত্য গীত ও বাদ্যের সমারোহ থাকতো এবং এখনো তা আছে।'

একদা ভারতবর্ষীয় সমাজে ক্রীড়া-কৌতুকের মাধ্যমে সঙ্গীত তথা নৃত্য, বাদ্যের কি রকম অনুশীলন ছিল তা অনুধাবন করা যায় বিভিন্ন সাহিত্যে ক্রীড়া ও মহোৎসবের বর্ণনায়। বিশেষ করে হরিবংশ উল্লিখিত জলক্রীড়া, হল্লীসক নৃত্য, হালিক্য গান, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির অভিনয়ের কথা থেকে। যদিও 'গায়ন্তু গায়কাশ্চৈব নৃত্যন্তু নটনর্তকাঃ' প্রভৃতি ছোট ছোট উদ্ধৃতিতে সঙ্গীতের বা নৃত্যের সামগ্রিক নির্দিষ্ট বা বিস্তৃত রূপ ও বিকাশের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না, তবু এই শব্দগুলির মাধ্যমেই তদানীন্তনকালের সমাজের শিল্পদৃষ্টি ও অনুশীলন-এর একটা আভাস পাওয়া যায়। আপাত দৃষ্টিতে এগুলি নগণ্য মনে হলেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে এর গুরুত্ব বা মূল্য কম নয়। কারণ ঐ যুগকে এখন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং এই ছোট ছোট শব্দ বা উদ্ধৃতি ভবিষ্যতে নৃত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার তথ্য হিসেবে কাজে লাগবে। তাছাড়া সেই যুগের সামাজিক পটভূমিকায় নৃত্যের প্রচলন কেমন ছিল তা জানতেও এ তথ্যগুলি অপরিহার্য।

হরিবংশকার বলেছেন ছালিক্যগান ছিল যাদবদের অতীব প্রিয়। বিষ্ণুপর্বের

৮৮-৮৯ অধ্যায় দুটিতে উল্লেখ আছে : মহারাজ উগ্রসেন বসুদেবকে রাজ্যভার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেন। রেবতী, সত্যভামা প্রভৃতি ছাড়া যোলশো রমণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যান্য যাদবগণ তাঁদের পত্নীগণকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। অপ্সরা প্রভৃতি নর্তকীরাও সঙ্গে ছিল। তীর্থে জলক্রীড়ার অবসরে বিভিন্ন নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়েছিল। অপ্সরারা জল দর্দুরের তালে তালে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিল। তাঁদের মনোমুগ্ধকর বেশভূষায় সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন। বলদেব রেবতীর সঙ্গে আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিলেন। সত্যভামাও নৃত্য-গীতে যোগ দিয়েছিলেন। অর্জুন সমুদ্রযাত্রার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে সুভদ্রার সঙ্গে নৃত্য-গীতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নারদও সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ছিলেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলকে 'ছালিক্যগীত' গান করার জন্য আদেশ করেছিলেন। সঙ্গে ছিল মৃদঙ্গাদি বাদ্য। অপ্সরারা নৃতগীত বাদ্যে যোগদান করেছিল। 'আসারিত' নৃত্য হবার পর নর্তকী রম্ভা নৃত্যনৈপুণ্যে সমাগত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অভিনয়ের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে চারুদর্শনা ও বিশালনেত্রা উর্বশী, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি যোগদান করেছিল। নারদ বীণাযোগে ছটি গ্রামরাগ আলাপ করেছিলেন ও সেই গ্রামরাগদের মূর্ছনায়, মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ ও সকলে বিমোহিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে 'হল্লীসক নৃত্য' করেছিলেন।…

॥ হল্লীসক নৃত্য ॥

'হল্লীসক' একপ্রকার নৃত্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এই নৃত্যের রূপদান করতো। অভিনবগুপ্ত মণ্ডলীকৃত নৃত্যকে হল্লীসক বলেছেন—'মণ্ডলেন তু যৎ নৃত্যং হল্লীসকমিতি নৃতম্।' নীলকণ্ঠ বলেছেন—'হল্লীসকং বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ নৃত্যম্।' পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে প্রাচীন ভারতে ক্রীড়া হিসেবে একে হল্লীসক্রীড়া বলা হতো। হরিবংশে এই নৃত্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

তাস্ত পঙ্‌ক্তীকৃতাঃ সর্বাঃ রময়ন্তি মনোরমম্।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বয়োঃ গোপকণ্যকাঃ।
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্য কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ॥

(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ২০।২৫-২৬)

পণ্ডিত অনন্তশাস্ত্রী কাফে একে রাসক্রীড়া বিশেষ বলেছেন : 'রাসক্রীড়া

বিশেষ এব।' রাসক্রীড়া, বা রাসনৃত্যেও হল্লীসক ক্রীড়া বা হল্লীসক নৃত্যে পার্থক্য হল—রাসনৃত্যে এক একজন বালক বা পুরুষের এক একজন বালিকা বা প্রাপ্তবয়স্কা নারী থাকতো, কিন্তু হল্লীসক-এ একজন বালক বা পুরুষ মাঝখানে ও তাকে মণ্ডলাকারে ঘিরে নারীরা নৃত্যগীত ও বাদ্য করতেন। (রাসক্রীয়াং কণ্যকামন্তরা বালকস্তমন্তরা চ কণ্যকা। অত্র চ মধ্য এক এব বালকস্তিষ্ঠতি তমভিতো মণ্ডলাকারং বিধায় গায়ন্তো নৃত্যন্তো বালিকাঃ পরিক্রমান্ত।—(Vide Saraswati Bhvan Studies, Vol-X, p—80) ('হল্লীসক' ও ঋল্লীসক' দুটি শব্দের মধ্যে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানানন্দ নৃত্য হিসেবে 'হল্লীসক' পাঠ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করেছেন। কারণ হল্লাস বা হল্লীসক একটি প্রসিদ্ধ নৃত্য বিশেষ।)

॥ আসারিত নৃত্য ॥

'হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন, 'আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা।' টীকাকার নীলকণ্ঠ 'আসারিত' অর্থে অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে নৃত্যক্রিয়া বিধি বলেছেন। আসারিতক্রিয়ায় প্রথম নর্তকীপ্রবেশ, তারপর অভিনয়-প্রদর্শন, মূকাভিনয়, পরে তাল ও ছন্দের অনুসারী অঙ্গহার প্রয়োগ ও পরিশেষে দেবতা চিহ্নরূপে নৃত্য প্রদর্শন বোঝায়। ('আসারিতা ন্ ইতি ভরতো মুনিশ্চ তু বিধমাসারিতং নৃত্যবিধাবুপদিদেশেতি। প্রথমং নর্তকী প্রবেশঃ, ততশ্চাসারিতার্থাভিনয়ঃ নাট্যং ততস্তালানুগত্যাঙ্গহরণং ততো দেবতাচিহ্ন রূপেন নৃত্যম্। এবং চতুর্থপ্যাভিসারেযুক্তম্। এবমেয নর্তকী প্রায়শো ভরতস্যানুমতঃ।—নীলকণ্ঠ)

এ চারটি ক্রিয়া অভিসার—অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করা হতো। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আসারিত নৃত্যক্রিয়ার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। (আসারিত প্রয়োগস্ত ততঃ কার্য্যঃ প্রয়োক্তৃভি। তত্র চোপোহনং কৃত্বা তন্ত্রী ভাণ্ডাসমন্বিতম্। কার্যঃ প্রয়োগা নর্তক্যা ভাণ্ডবাদ্যসমন্বিতঃ। ইত্যাদি)

কুতপ বিন্যাসের পর নর্তকী বা নর্তক আসারিত নৃত্যের অনুষ্ঠান করত। 'কুতপ' অর্থে আসন বা আসর বিছানো বা চার রকম বাদ্যযন্ত্র বিশেষ বোঝায়। বিভিন্ন বাদযন্ত্রের সমাবেশ করে নাট্যোপযোগী বা নৃত্যোপযোগী অভিনয় মঞ্চে আসর তৈরী করা (আসর বিছানো বোঝায়)। আসর সজ্জার পর মৃদঙ্গ (ভাণ্ডবাদ্য), বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে উপোহন শেষ হলে একজন নর্তকী অভিনয়

মঞ্চে প্রবেশ করে ভাণ্ডবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করতো। সেই নৃত্যে বিশুদ্ধ করণের অনুসরণ ও বাদ্যযন্ত্রে জাতিরাগের বিকাশ থাকতো। তারপর সঙ্গীতের সঙ্গে চারীর সমাবেশ থাকতো। নর্তকী অঞ্জলীতে ফুল নিয়ে বৈশাখ ভঙ্গিতে মঞ্চে প্রবেশ ও পদ, হস্ত, কটিদেশ ও গ্রীবা এই চার রকম রেচক প্রদর্শন করতো। পরে হাতের ফুল ছড়াতে ছড়াতে অভিনয় মঞ্চ পরিভ্রমণ ও দেবতাদের নমস্কার করে অভিনয় আরম্ভ করতো। আকার-ভঙ্গির সঙ্গে যখন কোন গানের পরিবেশন করা হত তখন বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকতো না, কিন্তু অঙ্গহার প্রদর্শনের সময় মৃদঙ্গ বাজানো হতো। মৃদঙ্গের সুস্পষ্ট আঘাতে সম, বক্র, বিভক্ত প্রভৃতি যোজনার অভিব্যঞ্জনা হতো ও তখন নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতো। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে আসারিত নৃত্যের বিধি ও প্রয়োগ মনে হয় মহাভারত—হরিবংশের সময়ে (৩০০—২০০ খ্রীঃ পূঃ) এ ভাবেই প্রচলিত ছিল ও যদুবংশের অভিজ্ঞগণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরা (নর্তকীরা) নিশ্চয়ই এই প্রয়োগবিধি অনুসরণ করেই আসারিত নৃত্য করেছিলেন। উল্লিখিত হয়েছে—'আসারিতান্তে'—আসারিত নৃত্যের পর অভিনয় চতুরা রম্ভা নৃত্যের জন্য অভিনয় মঞ্চে প্রবেশ করলো। ...আসারিত নৃত্যকে "চিত্রতাণ্ডব"ও বলে, এর পরিচয় ভরত আগেই ৩১শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন—'নৃত্যমুৎপাদিতং পূর্বং চিত্রতাণ্ডবসংজ্ঞতম্' (৩১।২২৬)।

চিত্রতাণ্ডব বা আসারিত নৃত্যকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দায়িত করার জন্য বিশুদ্ধ-করণ ও বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকতো।" ...হরিবংশকার বলেছেন—"বাদ্যানুরূপং ননৃতুঃ সুগাত্র্যঃ" সুতরাং বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যছন্দের সম্পূর্ণ মিতালী ছিল ও তার পেছনে বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নৃত্যে ও অভিনয়ে হাব-ভাবাদির (Gesture and Posture) পূর্ণ বিকাশ ছিল। ভরত বলেছেন চিত্ত বা মন থেকে ভাবের সৃষ্টি হয়ঃ 'ভাবশ্চিত্তসমুত্থিত' (২৪।১০)। ভাব রসেতেই পরিণতি। ভরতের অভিমতে আদিরস শৃঙ্গারই সকল ভাবের মূল—'য এব ভাবাঃ সর্বেষাং শৃঙ্গাররসসংশ্রয়া' (২৪।১১) হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন আয়তনেত্রী নর্তকী ও ভৌমস্ত্রীরা গন্ধ, মাল্য, দিব্যযন্ত্র, হেলা, হাস্য, কটাক্ষ, ইঙ্গিত, বিভিন্ন খেলা, রোষ, মনের অনুকূল প্রসাদ বা প্রসন্নতা প্রভৃতি ভাব দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রীতি সম্পাদন করেছিলেন।

ভৌমরা নৃত্যগীত ও বাদ্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ভৌমরা রাজাজ্ঞায় গঙ্গাবতরণ নৃত্যনাট্য কুতিস্তের সঙ্গে অভিনয় করেন, নটদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন এবং সাম্বও ছিলেন। নৃত্যনাট্যের প্রস্তাবনায় বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের আলাপের সঙ্গে নান্দী বা আশীর্বচন সম্পন্ন করা হতো। পরে প্রদ্যুম্নও গঙ্গাবতরণের শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের বিধি বা নিয়ম-কানুন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ (গীতনৃত্য বিধিজ্ঞানম্) ভৌম ও ভৌমস্ত্রীদের নৃত্য ও অভিনয় দেখে অসুররাজ তাঁদের সকলকে নানা রত্ন অলংকারাদি উপহার দিয়েছিলেন। প্রেক্ষাগারে যে সকল দানব দর্শকেরা ছিল (প্রেক্ষাসু তাসু বহ্বীসু) তারাও অভিনেতা ও নর্তকীদের উপঢৌকন দিয়েছিল।

'নৃত্যানি বিবিধানি চ' (৯২।৫০)—নানাবিধ নৃত্যে ভৌমস্ত্রীগণ, যাদবেরা, গন্ধর্বেরা ও অপ্সরা নামধেয়া নর্তকীরা অভিজ্ঞ ছিলেন। এই বিবিধ নৃত্য কি কি শ্রেণীর ছিল তাদের পরিচয় আমরা নিশ্চয়ই নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত তাণ্ডবলক্ষণ (৪র্থ অধ্যায়) থেকে পেতে পারি। ভরত বত্রিশ রকম 'অঙ্গহার' ও একশো আট রকম 'করণ' বা নৃত্যের বা ভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন —'হস্তপাদসমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ' (৪।৩০),—অর্থাৎ নৃত্যের 'করণ' বলতে হস্ত ও পদের সহযোগ বা প্রয়োগ বোঝায়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন—'অষ্টোত্তরশতং হ্যেতৎ করণানাং ময়োদিতম্' (৪।১৬৯)। সেগুলির নাম যেমন, তলপুষ্পপুটয়বর্তিত, বলিতোর, শপবিধ, সমনখ, লীন, উন্মত্ত, অলাত, কটীসম, গঙ্গাবতরণ, প্রভৃতি। নাট্যশাস্ত্রের তাণ্ডব বা নৃত্যের তালিকায় 'গঙ্গাবতরণ' শেষ করণ বা নৃত্য। এই গঙ্গাবতরণ—নৃত্যের কথাই হরিবংশে তিনবার উল্লিখিত হয়েছে (গঙ্গাবতরণং তথা ৯৩।২৪)। গঙ্গাবতরণং শুভম্ ৯৩।২৫, গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্ (৯৩।২৭)।

গঙ্গাবতরণ অভিনয়াঙ্গ নৃত্য, সুতরাং হরিবংশে অভিনয়ের বিষয়বস্তু হিসাবে গঙ্গাবতরণকে 'নৃত্যনাট্য' বলা যেতে পারে। 'প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যনাট্যের প্রথম সূত্রপাত বলা যায়, এই গঙ্গাবতরণ নৃত্যাভিনয় থেকে। তবে প্রাচীন ভারতীয় লোকনাট্যের ধারাবাহিকতায় লোকায়ত নৃত্যনাট্যের রূপরেখা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে।

মহাভারত ও হরিবংশের যুগে অভিনেতা ও বিশেষ করে নর্তক ও নর্তকীরা

অবশ্যই এই শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা অনুসরণ করে তাঁদের অভিনয় ও নৃত্যাদি অনুষ্ঠান করতেন।

হল্লীসক, আসারিত প্রভৃতি নৃত্যের কথা, তাদের রূপ ও প্রকাশভঙ্গির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। হরিবংশের বিভিন্ন শ্লোকে নৃত্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—উপগায়ন্তি নৃত্যন্তি (২।৫০।৬৮), নটীনাং নৃত্যগেয়া নি বাদ্যানি (২।৫৫।১৯), নৃত্যন্তং রঘমার্গেষু (২।৫৯।৬৫), ঈপ্সিতং গীতনৃত্যঞ্চ (২।৬৭।৬০), ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ (২।৮৭।৩৬), পাদোদ্ধায়েণ নৃত্যেন (২।৯৩।৩২), নৃত্যন্তে চাপ্সরাস্তত্র (২।১১৮।৭), নৃত্যমানাঃ প্রগায়ন্তি (৩।১৯।১৭), নৃত্যৈশ্চাপি (৩।২৭।১৩) প্রভৃতি। অবশ্য 'নৃত্য' শব্দের উল্লেখ থাকলেই যে নৃত্যের রূপ বা তার উপস্থাপন—পদ্ধতি বোঝা যায় তা নয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে নৃত্য তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল ও তার সমাদর চারু শিল্পবিলাসী লোকদের ভেতরেও একান্তভাবে ছিল।

॥ **রাসনৃত্য** ॥

('রাসনৃত্য' হরিবংশ পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, প্রভৃতিতে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং এই 'রাসনৃত্য' এ সময় থেকেই ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের মর্যাদা পেয়েছে। এবং সত্যিকারের ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের যুগ এই সময় থেকেই শুরু হয়েছে বলা যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ কপিলা বাৎসায়ন লিখেছেন—"It appears that rāsa and the hallisaka were mixed entertainment, of both these singing and dancing were the main features and the Chālikya was a special kind of an operatic performance which consisted of song, instrumental music and dance."

(Dr. K. Vatsyayana, Classical Indian Dance in Literature and the Art. Page 194)

বর্তমানে আমরা মণিপুরী নাচে যে 'রাসনৃত্য' দেখি তার আদি রূপ বা অবস্থা এই সময়েই পাওয়া যায়। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে মণিপুরী 'রাসনৃত্য' প্রাচীন ধারারই নব সংস্করণ বলা যায়।

'Circular dance formation is by far the most common dance formation of all nations and the present Rāsa dance

in terms of dance choreography" does not come us as anything new, the circle however acquires a special symbolic significance in the Krishna Legend." Ibid Page 195.)

এই পৌরাণিক যুগ থেকেই ভারতের প্রায় সর্বত্র এই রাসনৃত্য বিভিন্ন আকারে প্রথাবদ্ধ ভাবে বা পরিবর্তিত আকারে চলে এসেছে। সুতরাং—"Rāsa dance took varying shapes and forms in the different provinces of India; they are prevalent to-day as dances of men only, of women only and of women dancing around one man or couples dancing in a circle. The circle as the basic choeographical motif is common to them all. Perhaps the most direct descendants of the rāsa dances described in the Purānas are the rāsa dances from Manipur."···Ibid page (97).

॥ **তাণ্ডব ও লাস্য** ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—পরিহাসকারী নটাচার্যগণ বিচিত্র রকম হাস্যরস ও নর্তকীরা তাণ্ডব দ্বারা বিভুর পরিচর্যা করতো। সাধারণভাবে তাণ্ডব (নৃত্য) পুরুষদের জন্য এবং লাস্য (নৃত্য) স্ত্রীলোকদের জন্য নির্বাচিত দেখা যায়। তাণ্ডবকে অভিজাত (ক্ল্যাসিক্যাল) শ্রেণীর নৃত্য বলা যেতে পারে, তাই গ্রাম্য বা দেশীয় নৃত্য থেকে এই নৃত্য সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু ভাস্কর্য্য শিল্পে নারীদের তাণ্ডবনৃত্যরতাও দেখা যায়। তাই মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নারীদের জন্যও তাণ্ডবের বিধান ছিল।.. অনেকে মনে করেন তাণ্ডবের গতি উদ্দাম, ভাব সৃষ্টিমুখী রাজসিক ও এর করণ প্রয়োগ দৃঢ় বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষেরাই সাধারণভাবে তাণ্ডবনৃত্য শিক্ষা ও প্রদর্শন করেন, আর লাস্যের প্রতিফলন কমনীয় ও সাবলীল, তাই নারীদের পক্ষে লাস্য বিধেয়। কিন্তু ভরত ও টীকাকার অভিনব গুপ্তের অভিপ্রায় তা নয়। তাঁরা তাণ্ডব ও লাস্যকে অভিন্ন রূপে গণ্য করেছেন। তাই পরবর্তী গুণীরা (খ্রীঃ ৮ম—১১শ শতাব্দী) যে স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাণ্ডবের অনুশীলনকে অশাস্ত্রীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা সমীচীন হয়নি বলে মনে হয়। (তবে এমনও হতে পারে যে, তাণ্ডবের দৃপ্তভঙ্গীর চর্চা করা মেয়েদের পক্ষে-

কষ্টকর বিবেচনা করেই হয়তো পরবর্তীকালের গুণীরা তাণ্ডব থেকে মেয়েদের বাদ দিতে চেয়েছেন। যেমন ছৌ-নাচ, কথাকলি প্রভৃতি মেয়েদের পক্ষে ঠিক প্রযোজ্য নয়।)

নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য ও নাট্যের প্রসঙ্গে (৪র্থ অধ্যায়) ভরত তাণ্ডবের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

সে গীতকাদৌ যুজ্যন্তে সম্যঙনৃত্তবিভাগকাঃ।
দেবেন চাপি সম্প্রোক্তস্তণ্ডু স্তাণ্ডবপূর্বকম্ ॥
গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্তমেতৎ প্রবর্ত্যতাম্।
প্রায়েণ তাণ্ডববিধিদেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ ॥
সুকুমার প্রয়োগশ্চ শৃঙ্গাররসসম্ভবঃ।
তস্য তণ্ডুপ্রযুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম্ ॥

নৃত্য, নাট্যের অঙ্গ। গীত বা গানের মতো নৃত্যেরও যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। শোনা যায় মুনি তণ্ডু তাণ্ডব নৃত্যের স্রষ্টা। ভরতের মতো কোহলাচার্যও একথা স্বীকার করেছেন।

'অভিনবভারতী' টীকায় অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন 'লাস্য'-শব্দে সকল রকম নৃত্যই বোঝাতে পারে। যাই হোক, ভগবান (সদাশিবভরত) নাকি মুনিতণ্ডুকে অঙ্গহারসমেত নৃত্যের (তাণ্ডব) প্রয়োগবিধি শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তারই জন্য তাণ্ডব রেচকাদি অঙ্গহারযুক্ত গীত ও অভিনয়ের উন্মুখ, বাদ্য ও তালের অনুসারি প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত নৃত্য। তাণ্ডববিধি সম্বন্ধে আচার্য অভিনব গুপ্ত বলেছেন—'তাণ্ডব বিধিরিতি সর্বং নৃত্যমুচ্যতেঃ লাস্যশব্দেন সন্নিধৌ—" ইত্যাদি। তাণ্ডব নৃত্য বিশেষভাবে বর্ধমান বা বর্ধমানক গানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

শৃঙ্গার আদিরস ও বিশ্বসৃষ্টির কারণ। সত্ত্বগুণ থেকে সৃষ্টি, রজোগুণে পালন ও তমোগুণে ধ্বংস। তাই শৃঙ্গার কল্যাণের প্রতীক ও সত্ত্বগুণের পরিণতি বলে তাণ্ডবে সৃষ্টির উন্মাদনা ও রজোগুণের প্রকাশাধিক্য দেখা গেলেও সত্ত্বেই তা পূর্ণ পরিণতি। ঈশ্বর এক থেকে বহু হয়ে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, মূলে রজঃ সত্ত্বগুণই তার কারণ। শৃঙ্গার রস থেকে উদ্ভূত বলে তাণ্ডব নৃত্য সত্ত্বের প্রসন্নতা ও সুকুমারতা নিহিত। এই প্রসন্নতার উদ্বোধক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই। পুনরায় তাণ্ডবে সৃষ্টি ও সংহার দু রকম বৃত্তিই থাকে। নটরাজ তাণ্ডবনৃত্যে নিখিল

বিশ্ব সৃষ্টি করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার মহিমা নিজেই উপভোগ করেন ও পরে আবার প্রলয়—মূর্তিতে তাণ্ডবের উদ্দাম নৃত্যে বিশ্বসংসার ধ্বংসও করেন। তাই তাণ্ডবে দুটি রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অনেকের মতে শান্ত রসের উদ্বোধক সৃষ্টিমুখী তাণ্ডব প্রসন্নতা ও কোমলতার প্রতিমূর্তি এবং 'প্রায়েন—দেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ'—দেবতাদের স্তুতির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় বলে কল্যাণময়, আর তারই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতকার ও হরিবংশ প্রণেতা কোমলস্বভাবা নারীদের পক্ষেও সেই নৃত্য (তাণ্ডব) বিহিত বলেছেন। (অতএব তাণ্ডব এবং লাস্য উভয় প্রকার নৃত্যই নারীদের পক্ষে হয়তো প্রযোজ্য ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের নৃত্য প্রসঙ্গে যদিও তাণ্ডব শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়নি তবু বর্ণনা পড়ে মনে হয় নারীরা বিশেষভাবে vigorous dance করতেন এবং এতে তাঁদের Stamina ছিল।) ডঃ কপিলা বাৎসায়ন লিখেছেন—

"The graphic description of the couples dancing in a circle tells us that the circle (mandala) foımation is the frist requisite, it is a vigorous dance demanding of the gopis practice and stamina ; their feet sometimes move fast, sometimes slow, their eyebrows are raised (bhruvitasa) to attract. To an appropriate song, the gopis gesticulate with their hands and arms to express various sentiments (Srimad Bhāgavata, X, 8). This is the only suggestion of abhinaya in the description of the rāsa dances. The various forms of Krisna are compared to the circle of clouds and the gopis to lightning. The Bhāgavata uses the words, Krḍa, nṛtya and nrtta frequently in this context. There is another masterly description of the mahārāsa, and the contemporary mahārāsa in Manipur till today is danced to these verses of the Bhāgavata." (Ibid—page 198)

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো—হরিবংশ পুরাণে যে ছালিক্য নৃত্য, আসারিত নৃত্য, বা গঙ্গাবতরণ নৃত্য-নাট্যের উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায় মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদ্যের সঙ্গে যে নট-নটীরা নৃত্য ও অভিনয়াদি

করেছিলেন তাঁরা ছিলেন অভিজাত যাদববংশীয় পুরুষ ও নারী। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও নটবেশে নৃত্যে রত ছিলেন। বারনারীদের পক্ষেও অভিজাত নৃত্যে অবাধ অধিকার ছিল। সুতরাং নট, নটী বা বারনারীরা সকল সময়েই ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা বর্ণসংকর হিসাবে ভারতীয় সমাজে পরিত্যক্ত, নিন্দনীয় বা অপাঙক্তেয় ছিল না।

অনেকের মতে 'নাটক' থেকে 'নট' শব্দটির উৎপত্তি। 'নট'—ধাতুর অর্থ নৃত্য করা। সেই হিসেবে অভিনয়ে নৃত্য গীত যারা করে তারাই নট বা নটী নামে অভিহিত। অমরকোষে নটপর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে—

'শৈলালিনস্তু শৈলূষা জায়াজীবা কৃশাশ্বিনঃ।
চারণস্তু কুশীলবাঃ ভরতেত্যাপি নটাকৃতাঃ॥

নটসম্প্রদায় শৈলালী, শৈলুষ, জায়াজীব, কৃশাশ্বি, চারণ, কুশীলব ও ভরত এই সাত ভাগে ও নামে বিভক্ত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে এই সাত শ্রেণীর নটকে এক জাতীয় বলে স্বীকার করেন নি। তবে নট হিসেবে সকলকেই গণ্য করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও দেখা যায়—খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৭শ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে কোন নাটক বা গীতিনাট্যের মূল গায়ককে 'নট' বলা হতো। আর সেই নটের সহকারী হিসেবে যে গীতি ও নৃত্য-কুশলা নারীরা থাকতো তাদের বলা হতো 'নটী'। মঙ্গলকাব্যে 'নাট' গান বা যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার পল্লীসমাজে এক সময় নাট গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। নাটগানের পুরুষশিল্পীদের নাম ছিল 'নট' ও নারী শিল্পীদের 'নটী'। নাটগানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিশেষ সমারোহ থাকতো।

এই পর্যন্ত পৌরাণিক যুগে, বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় নৃত্যের ক্ল্যাসিক্যাল রূপ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দেখা গেল, এই সময়ে নৃত্যকলার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল বলেই ভরতের পক্ষে নাটশাস্ত্র তথা নৃত্য ব্যাকরণ তৈরী করা বা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রের প্রণয়ন কাল খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যে ধরলে—এই পৌরাণিক যুগের (খ্রীঃ পূঃ ৪০০ থেকে) নৃত্যের ছাপ নাট্যশাস্ত্রে পড়েছে—একথা ভুললে চলবে না।

॥ মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে এবং অন্যান্য গ্রন্থে নৃত্য প্রসঙ্গ ॥

মৌর্য সাম্রাজ্য (খ্রীঃ পূঃ ৩২০—খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী)

বৈদিক যুগের শেষে আমরা দেখেছি আর্যদের একাধিক কৌম (clan) মিলে বড় বড় জাতি (tribe) এবং ছোট ছোট রাজ্য মিলে বড় বড় রাজ্য গড়ে উঠেছিল, রাজ্য সাম্রাজ্য হচ্ছিল, রাজাও সম্রাট' হচ্ছিলেন। পাঞ্জাব ও উত্তর-গাঙ্গেয় উপত্যকা হতে আর্য বা হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হচ্ছিল পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে। তবে তা একচ্ছত্র বিস্তাব ছিল না। পাশাপাশি ভারতজনের আরও অনেক শক্তিশালী রাজ্য ছিল—অনার্যদের, ব্রাত্যদের ও বিচ্ছিন্ন আর্যদের রাজ্য। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও বিস্তারের ইতিহাস হতে আমরা দেখেছি তাতে ক্রমে মধ্যদেশ বা মধ্যভারত অপেক্ষা পূর্ব ভারতের গুরুত্ব বাড়ছিল। ইতিহাসের ভারকেন্দ্র উত্তরভারত হতে ক্রমে পূর্বভারতে স্থানান্তরিত হচ্ছিল।

"ষোলটি মহাজনপদ"

বৈদিক সাহিত্যে ভারতজনের মধ্যে উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, ভোজ, পশ্চিম-ভারতের 'নীচা' ও 'অপাচ্য' এবং পূর্ব ভারতের 'প্রাচ্য'দের কথা জানা যায়। নীচ্য ও অপাচ্যরা পশ্চিম ভারতের কোন জনগোষ্ঠী বলে মনে হয়, প্রাচ্যরা মগধ ও তার প্রতিবেশী দেশগুলির অধিবাসী। মগধের বাইরে উত্তরবঙ্গ 'পুণ্ড্র'-জনেরা এবং মধ্য ও পূর্ববঙ্গে 'বঙ্গ' জনেরা বাস করত, তারা ঠিক 'আর্য গণ্ডীর' মধ্যে ছিল না। দক্ষিণে ভোজরা ছাড়া গোদাবরী উপত্যকায় 'অন্ধ্র' জনেরা ছিল এবং বিন্ধ্য-অরণ্যেও আদিবাসীদের বাস ছিল যথেষ্ট। পরবর্তীকালে আরও নূতন জনপদের নাম পাওয়া যায়—যেমন 'কলিঙ্গ' জনেরা বৈতরণী হতে গোদাবরীর কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পূর্ব-উপকূলে বাস করত, উত্তর গোদাবরীতে বাস করত 'অস্মন' ও 'মূলক' জনেরা। কাবুল উপত্যকা হতে গোদাবরীর তীর পর্যন্ত এরকম প্রায় ষোলটি জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের ঠিক আগে। বৌদ্ধসাহিত্যে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে—

(১) অঙ্গ (পূর্ব-বিহার), (২) মগধ (দক্ষিণ-বিহার)

(৩) কাশী (বারাণসী), (৪) কোশল (অযোধ্যা)

(৫) বৃজ্জি (উত্তর বিহার), (৬) মল্ল (গোরক্ষপুর জেলা)
(৭) চেদী (যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল)
(৮) বৎস (এলাহাবাদ অঞ্চল) (৯) কুরু (থানেশ্বর, দিল্লী, মীরাট)
(১০) পঞ্চাল (বেরিলি, বুদাউন, ফরাক্কাবাদ) (১১) মৎস (জয়পুর)
(১২) শূরসেন (মথুরা) (১৩) অশ্মক (গোদাবরী তীর)
(১৪) অবন্তী (মালব)। (১৫) গান্ধার (পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি)
(১৬) কম্বোজ (দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীর ও কাফিরস্তানের অংশ)।

লক্ষ্য করার বিষয় হল ভারতজনের এই ১৬টি মহাজনপদের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের কোন নাম জানা নেই।

॥ মৌর্যযুগের শিল্পকলা ॥

মৌর্য রাজাদের আমলে শিল্পকলা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্রে ও সমাজে। এই পরিবেশ সৃষ্টি না হলে, শিল্পকলার সাধনা বা বিকাশ সম্ভব হয় না। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে শৃঙ্খলা, শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধি এনে তাঁরা শিল্পসাধনার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। সম্রাট অশোক যা করেছিলেন তা শিল্পকলার বিকাশের দিক হতে আরও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সমাজে তাঁর ধর্ম ও নীতির ভিতর দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের সামনে যে মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা ছিল শিল্পকলার প্রাণ। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত বা পিতা বিন্দুসারের আমলে শিল্পকলার চর্চা বা বিকাশ যে একেবারে হয় নি তা নয়। চন্দ্রগুপ্তের কালে অন্তত স্থাপত্যের বা গৃহনির্মাণ শিল্পের যে বেশ উন্নতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। গ্রীক লেখকরা বলেন যে, পাটলিপুত্রে তিনি যে রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন তা তৎকালে পারস্য সম্রাটের আশ্চর্য প্রাসাদ মহিমাকেও ম্লান করে দিয়েছিল। মেগাস্থেনিস লিখেছেন যে, পাটলিপুত্র নগর সর্বশ্রেষ্ঠ, উহা প্রাচ্য রাজ্যে হিরণ্যবাহ নদ ও গঙ্গার সংগমস্থলে অবস্থিত। নগরের আকার সমান্তরাল ক্ষেত্রের মতো, চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত, পরিখার বিস্তার ৬০০ ফুট ও গভীরতা ৩০ হাত। নগরের চারিদিকে কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, তাতে ৫৭০টি বুরুজ ও ৬৪টি দরজা আছে। নির্মাণ প্রসঙ্গে গ্রীকদূত আরও বলেছেন যে ভারতবর্ষে এত নগর আছে যে তা গুণে শেষ করা যায় না, তবে সমস্ত নগর একরকম নয়। যে সব নগর নদী বা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত

সেগুলি কাঠের তৈরী, কারণ বর্ষাপ্রবল বলে ইট সেখানে স্থায়ী হয় না। কিন্তু যে-সব নগর উচ্চভূমি বা পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত সেগুলি ইট ও কাদা দিয়ে তৈরী। ইট-পাথরের কারুকর্মে ও চিত্রাঙ্কণে ভারত শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস মৌর্য যুগে অশোকের কাল হতে আরম্ভ হয়েছে বললেও ভুল হয় না।

সম্রাট অশোকের হৃদয়ের উদারতা, চিত্তের প্রসারতা এবং চরিত্রের গভীরতা ও কোমলতা মনে হয় যেন তাঁর যুগে শিল্পকলার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সারনাথ, সাঁচী প্রভৃতি ভারতের বহু স্থানে অশোক যে শত শত স্তূপ (বৌদ্ধ বিবরণ অনুসারী ৮৪ হাজার) স্থাপন করেছিলেন তাও আজ প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অশোক ভাস্কর্যের যে নিদর্শন আজও টিকে আছে তা তাঁর স্থাপিত পাথরের স্তম্ভগুলি। কিন্তু এই স্তম্ভগুলিই পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর কীর্তি বলে বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন। দীর্ঘাকার স্তম্ভগুলি (কোনটি ৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু) প্রত্যেকটি একখণ্ড পাথর কেটে তৈরী, চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা কঠিন। স্তম্ভগুলির গড়ন কোনাকৃতি, উপরের বেধ বা বেড় ক্রমশঃ ছোট হয়েছে। কারুকার্য নেই কিন্তু শান্ত ও সুকোমল। স্তম্ভশীর্ষে সিংহ প্রভৃতি পশুমূর্তির শিরোভূষণ, তার নীচে সিংহ, হাঁস, লতাপুষ্প ইত্যাদি উৎকীর্ণ। এই শিরোভূষণ—আলাদা তৈরী করে স্তম্ভের মাথায় বসান হত। কিন্তু তা স্তম্ভের সাথে এমন অঙ্গাঙ্গিলগ্ন যে দেখলে মনে হয় যেন একটা পাথর কেটে স্তম্ভ ও শিরোভূষণ তৈরী করা হয়েছে। শিরোভূষণের অধোদেশের (abacus) নিম্নভাগে অধোমুখী পদ্ম আছে। সমগ্র স্তম্ভটি একটা উঁচু পাথরের বেদীর উপর স্থাপন করা হত।

এই সময়ের (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) উল্লেখযোগ্য নৃত্য ভাস্কর্য পাওয়া গেছে সাঁচি স্তূপ ও ভারহুতে। বিখ্যাত ভারহুত স্তূপের অজাতশত্রু প্যানেলে যে স্তম্ভটি রয়েছে, তাতে সুন্দর ভঙ্গিমায় সারিবদ্ধ ভাবে সমবেত নৃত্যের কতগুলি মূর্তি পাওয়া যায়। চারটি মূর্তির মধ্যে দুটির নৃত্যভঙ্গিমাতে ভরতনাট্যম টাইপের নৃত্যের ছায়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া মূর্তিগুলির গঠন-কারুকার্যও চমৎকার শিল্পসমৃদ্ধ।

ঐ সমসাময়িক আরেকটি দলবদ্ধ নৃত্যের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, ভারহুত স্তূপের দক্ষিণ দিকের প্রসেনজিৎ স্তম্ভে। এখানে একদিকে যন্ত্রবাদকরা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র বাজাচ্ছেন, আরেকদিকে দলবদ্ধ নৃত্যের আসর বসেছে যেন।

মূর্তিগুলির হাতে পতাকা-মুদ্রা স্পষ্ট। আরেকটি মূর্তির—ডান হাতে 'চতুর' মুদ্রা দেখা যায়। ইতিহাসবিখ্যাত সাঁচি স্তূপের উত্তর দিকের গেটে যে স্তম্ভগুলি আছে, তার পশ্চিম দিকের স্তম্ভের উপর দিকে যে প্যানেল আছে, তাতে সমবেত বা দলবদ্ধ নৃত্যের ধারণা পাওয়া যায়। নীচের লাইনে একদল বাদক নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। মাঝের লাইনে সমবেত মূর্তিগুলি দেখা যায়।

খণ্ডগিরি—উদয়গিরির রাণীগুম্ফার, নীচের গ্যালারীর পূর্ব দিকে একটি নৃত্যরতা নারীমূর্তি দেখা যায়। মূর্তিটি ক্ষয়ে গেছে। তাই হাত পায়ের ভঙ্গি ছাড়া মুদ্রা বোঝার উপায় নেই। তবে নৃত্যের গতিভঙ্গিমা খুবই চমৎকার।

ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে খ্রীঃ পূর্ব ৪০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ৪০০ অর্থাৎ মোটামুটি ৮০০ বছর সময়কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের ভিত্তি মজবুত হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রচলিত ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলির (ভরত নাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী ও কুচিপুড়ি) form দু'শ বছরের বেশী প্রাচীন নয়। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আছে।) এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রামায়ণ, মহাভারত হরিবংশ পুরাণ, অন্যান্য পুরাণ সকলের, ধারা বেয়ে পাণিনি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বৌদ্ধ-জাতক, জৈন গ্রন্থ, বিভিন্ন কাব্য ও নাট্য সাহিত্য, সর্বোপরি ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং তাঁর অনুচিন্তা গোষ্ঠীর ('অভিনয় দর্পণ') ইত্যাদি লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় নৃত্যের বিপুলায়তন রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নৃত্যের রূপ ও পদ্ধতির সঙ্গে সার্থক নৃত্য-ব্যাকরণও এই সময়েই গড়ে উঠেছে—যা পরবর্তীকালের নাচগুলিও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সেই নৃত্য ব্যাকরণকেই অনুসরণ করে চলেছে নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলকলার সুপরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকেন্দ্রিক নৃত্য ক্রমশঃ মন্দিরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। দেবদাসী নৃত্যের পদ্ধতি যার ফলশ্রুতি। এ সময় থেকেই দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতি ও অন্যান্য পেশাদার নৃত্য শিল্পীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

।। নৃত্যের উপাদান ।।

পাণিনি

পাণিনির কাছ থেকে নৃত্যপ্রসঙ্গে খুবই কম আলোচনা পাওয়া যায়। তাঁর 'নটসূত্র' প্রসঙ্গে শিলালী ও কৃশাশ্ব এর উল্লেখ সহ নট ও নর্তকের পার্থক্য

বিচার ছাড়া তেমন কোন উপাদান নৃত্য বিষয়ে পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায়, তা হলো—

"The Nata Sūtra attributed to Silālin by Panini, clearly shows that a dance text on the subject was prevalent. Panini was familiar with the works of both Silalin and Kṛśāsva the two author of the Nata Sūtra (IV. 111. 110-11, 129 respectively). (Perhaps these names stood for two schools of dramaturgy). It has often been asserted that the Silalin of Panini was a close relation of the Sailusa of the Yajurveda, and the former's students formed the school of dancing known as Śailalinaḥ Naṭāh (IV, 3, 110) Bharata in the Natyasastra refers to the nātas—as Sailalkas, this is a corresponding term for Panini's Śailālinah naṭaḥ. It seems that Bharata's Natyasastra was the product of dramatic school of Silain which originted in the Rg-Veda caraṇa founded by a teacher who was also the author of a Barahamana work called Śailāli Brāhamana, cited in the Āpastamba Sranta Sutra (VI. 4.7)"···

Patanjali mentions the word śobhanika (actors) and does not make any distinction betwecn nata and nartaka (III. 1. 26. and VI. 3, 43)···

Panini himself quite clearly distinguishes between nartaka and nātya—even though he does not clearly make a distinction between a nata and nartaka. Dance was also considered as one of the "Śilpas" by Panini, the synonym for the 'Sippa' of the Jatakas. Sangita comprised of nṛitya, gita and vāditra and sometimes nātya. The Aṣṭādhyāyi refers to a dancer as nartaka (III. 1. 148), and to stage acting as nātya. (IV. 3. 129) Panini also knew of a festivity termed sammada and

pramada. Sammada, as interpreted by Dr. V. S. Agarwala, must hava been an opera like the Sāttaka which is seen in the sculpture of Bhārhut. The opera comprised music and dance and was performed on festive occasions. The musical instruments for this dance are the lute (Vina), the percussion instruments, madḍuka (a small tabor) (IV. 4. 56), Dardur Mṛidanga and the paṇava. The metal instruments Jharjhara (a pair of cymbals) is also mentioned."

(Dr. Kapila Vatsyayana = C.I.D.L.A.—Page 199-200)

॥ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নৃত্য ও নৃত্যশিল্পী প্রসঙ্গ ॥

কুটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চাণক্য রচিত অর্থশাস্ত্র বলে কিংবদন্তী আছে। কিন্তু এই অর্থশাস্ত্র কোন একজন ব্যক্তির রচনা বলে মনে হয় না। প্রাচীন হিন্দু যুগের ভারতের বহু মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তা ও রচনা থেকে এককালে সংকলিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। অর্থশাস্ত্রে অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। সেই যুগে নট-নটী বা অভিনেতা—নৃত্যশিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা ও কি কি সুযোগ সুবিধা তাঁরা পেতেন এবং তখনকার দিনের সরকার এ বিষয়ে কতটা অবহিত ছিলেন, এ বিষয়ে জানা যায়—"Kautilya states 'quite clearly that—'those who teach prostitutes, female slaves and actresses, arts, such as singing (Gita) playing on musical instruments (Vādya), reading (Pāthya) dancing (Nartana), acting (Nātyam), writing, Aakhara, painting (citra), playing on Vinā flute (Venu), drum (mridanga) shall be maintained by the state."[১]

চারুকলা শিল্পী ও শিল্প-শিক্ষকদের সকল ভরণপোষণের দায়িত্ব তদানীন্তন সরকারের ছিল, একথা জানা যায়। আরও জানা যায়—

Kautilya says, "The prostitute (Ganikā) must supply to

১। Kautilya's Arthasastra—Edited by R. Syamsastri, Book II. ch. 27. P. 175. Quotation from Sastris translation, P. 155-56.

the superintendent as to the amount of her daily fees (bhoga) and her future income (āyati), further the same rules shall apply to an actor (nata), to a dancer (nartaka), to a singer (Gāyaka), to a player of musical instruments (Vādaka), a buffoon (Vāgagivanā), to a music player (Kusilava), a rope-dancer (Plavaka), a juggler (saubhika) a wandering bard (cāran). The visiting professional dancer, singer would have to pay a fee of five paṇas as licence fee for his performance."[১]

মহিলা দাসী (female slaves) থেকে স্বরু করে পেশাদার নর্তকী, গণিকা, মার্জিত বা উঁচুদরের বারাঙ্গনা প্রভৃতিদের কঠিন নিয়ম মেনে নৃত্য-গীত-বাদ্য ও অন্যান্য শিল্পকলার চর্চা করার বিধান তখনকার সমাজে ছিল। দেহগত সৌন্দর্য, যৌবনের উচ্ছলতা তথা মার্জিত রুচি—এই গুণের অধিকারিণীরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো। এই সব দেখে মনে হয়, তখনকার সমাজে নৃত্যশিল্পীদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল—নৃত্যকলা শুধুমাত্র শখ (hobby) হিসেবে পরিগণিত হতো না। পেশাদার নট ও নর্তকদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। পাণিনি ও পতঞ্জলির মতো অর্থশাস্ত্রেও গীত, বাদ্য ও নৃত্যকেও নাট্যসঙ্গীতেরই একটি অঙ্গ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। শিল্পীদের তালিকায় নর্তকরা ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যশিল্পীরূপে এবং কুশীলবগণ সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হতেন। বর্ষাকালে কুশীলবদের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখবার নির্দেশ ছিল। তাঁরা ভ্রাম্যমান হতে পারতো না, এবং প্রায় একই জায়গায় অবস্থান করতে হতো।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের যুগে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, দেবদাসীদের মন্দির কেন্দ্রিক নৃত্যধারা তখন বেশ প্রচলিত ছিল এবং অন্যান্য পেশাদার নর্তকীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্যও ছিল। এই প্রসঙ্গে জানা যায়—

"Kautilya also mentions devadāsis in another chapter, they are connected with temples and are studiously taught the arts of music and dancing.

The demarcation between the classical dancer, who

১। Ibid—Page 155.

performs for the God, and the classical dancer, who performs on the stage is very definitely maintained. The tradition of the devotee dancing to the god and the tradition of the classical dancer of the stage were contemporaneous but distinct at a later stage in history they merged into one another. Whatever may have been the differences in approach to the art form between the secular nartaki and the religious devadāsi, we cannot doubt the rigorous training of either the gaṇikās and the devadāsis have been responsible for preserving the rich tradition of the classical Indian dance through many centuries."[১]

উক্ত উদ্ধৃতিতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো—একদিকে যেমন নৃত্যকে যাঁরা ভগবানের উপাসনার অঙ্গ হিসেবে দেখেছেন, তাঁদের সঙ্গে নৃত্যকে যাঁরা পেশা হিসেবে নিয়েছেন—এই দুই ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী সম্প্রদায়ের পার্থক্য যেমন সূচিত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি এই দুই ধারা পরবর্তীকালে এক হয়ে মিশে গেছে তার আভাস পাওয়া গেল।

নৃত্য ও সঙ্গীতের চর্চা বিষয়ে কৌটিল্য যতটা উদারতা দেখিয়েছেন মনু কিন্তু ততটা দেখাতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ এই শিল্পকলা তখন গণিকারাও চর্চা করতেন। মনুর রক্ষণশীল মন তাতে সায় দেয়নি। তাই তো দেখি—

"Since music and dancing were associated with prostitutes, these arts too started to be regarded with disfavour and thus Manu enjoins the prince to refrain from singing dancing and music (VII-46-47). He also asks the Brahmana to keep away from the courtesans (Manu, IV, 209). He does not look upon either the art or the profession with great favour (VII-65), he is indeed very sceptical of the statements of musicians and dancers." (Ibid page-202)

১। Ibid—Page 140.

॥ **বাৎসায়নের কামসূত্র ঃ** (নৃত্যের উপাদান) ॥

খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে মনীষী বাৎসায়ণের কামসূত্রও নিঃসন্দেহে তদানীন্তন সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অবাধ প্রচলন ও অনুশীলনের কথা প্রমাণ করে। বাৎসায়ন ১।৩।১৬ সূত্রে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাটকাখ্যায়িকা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়—তখনকার কুশীলবরা বিভিন্ন দেবমন্দির থেকে এসে সরস্বতী মন্দিরে নাটক অভিনয় করত। অভিনয়কে তিনি বলেছেন 'প্রেক্ষনক'। 'প্রেক্ষনক' শব্দ থেকেই পরবর্তী কালে অভিনয় গৃহের নাম হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ।

বাৎসায়ন-এর সময়ে পুরুষদের মতো কুমারী ও বিবাহিতা নারীরাও সঙ্গীত অনুশীলন করত। তিনি 'প্রাগ্‌যৌবনাৎস্ত্রী' সূত্রে (১।৩।২) বলেছেন, এমন কি পিতৃগৃহে থেকেই নারীরা কামসূত্র ও অঙ্গবিদ্যা অধ্যয়ন করতে পারত। টীকায় যশোধরেন্দ্র উল্লেখ করেছেন ঃ 'প্রাগ্‌যৌবনাৎ স্ত্রী কামসূত্রতেদঙ্গবিদ্যাশ্চাদীয়াত পিতুর্গৃহে এব তরুণ্যাঃ পরিণীতত্ত্বাদস্বতন্ত্রায়াঃ' ইত্যাদি। 'তদঙ্গবিদ্যা' বলতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়াদি ঃ 'তদঙ্গবিদ্যাশ্চ গীতাদিকাঃ' বাৎসায়ন আবার উল্লেখ করেছেন ঃ 'প্রত্তা পত্যুরভিপ্রায়াৎ' (১।৩।৪), অর্থাৎ প্রত্তা বা বিবাহিতা নারীরাও স্বামীর অনুমতি নিয়ে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করতে পারত। বাৎসায়নের সময়ে (প্রায় খ্রীঃ পূঃ ২০০) নৃত্য, গীত ও বাদ্যের রূপ ও পদ্ধতি সম্ভবতঃ মহাভারত হরিবংশে উল্লিখিত গীতি ও নৃত্যধারার মতোই ছিল। বাৎসায়ন চৌষট্টি কলার নামোল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল ঃ গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুল-কুসুমাবলিবিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশনবসনাঙ্গরাগ, মণিভূমিকাকর্ম, শয়নরচনা, উদকবাদ্য, উদবাঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্যগ্রথনবিকল্প, শেখরা পীড়যোজন, নেপথ্যপ্রয়োগ, কর্ণপত্রভাঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, ইন্দ্রজাল, কৌচুমার যোগ, হস্তলাঘব, চিত্রশোকযুষভক্ষবিকার ক্রিয়া, পানকর-মরুগাসবযোন, সুচিত্রাপকর্ম সূত্রক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্বচকযোগ, পতকবাচন, নাটকাখ্যায়িকা দর্শন, তর্ককর্ম, কাব্যসমস্যা, পট্টিকাবেত্রধনিবিকল্প, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকর জ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদ, মেষকু বকুটলাবকযুদ্ধবিধি, শুকশারিকা প্রলাপন, উদসাদনে সংবাহনেকেশমর্দনকৌশল, অক্ষর মুষ্টিকাকথন, পুষ্পশকটিকা, নিমিত্তজান, ম্লেচ্ছিতবিকল্প, দেশভাষাজ্ঞান, যন্ত্রমাত্রিকা, ধারণমাত্রিকা, সংপট্ট, মালসীকাব্যক্রিয়া, দলিকতাকযোগ, অভিধান-

কোষশব্দ জ্ঞান, বস্ত্রগোপন, দ্যূতবিশেষ, আকর্ষক্রীড়া, বালকক্রীড়া, বৈয়ানিকী-বিদ্যাজ্ঞান, বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান, ক্রিয়াকল্প, ছন্দোজ্ঞান, ব্যয়োমিকী বিদ্যাজ্ঞান। (সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—(২য়) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৬৪)।

এই চৌষট্টি কলাবিদ্যার মধ্যে অন্ততঃ আটটি সঙ্গীত তথা নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত। যেমন গীত, নৃত্য, বাদ্য, নাট্য, নেপথ্য প্রয়োগ, ছন্দোজ্ঞান, ব্যয়ামিকীবিদ্যাজ্ঞান ইত্যাদি। (The words that Vatsyana uses for dancing throughout are nrtya and nartana. The natas are the professional actors and dancers, and dancing plays an important part in society at all levels"—Dr. K. Vatsayana—C.I.D.L.A. Page 203)

।। নৃত্যের উপাদান ।।

শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিসার ঃ

শুক্রাচার্যের 'শুক্রনীতিসার' গ্রন্থে কামসূত্রের মতোই চৌষট্টি কলাবিদ্যার আরেকটি তালিকা দিয়েছেন তাতে গীতং বাদ্যং নৃতম্ শব্দগুলি আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়নি। হাব-ভাবাদি—সংযুক্তম্ নর্তনম্' কথাটিতে নৃত্যের সঙ্গে হাবভাব (emotion, grace) প্রভৃতির প্রকাশের কথা জানা যায়। আরও জানা যায়—

"The dancing that Sukranitisāra refers to as dancing proper which is accompanied by suitable expression of the face, movements of the arms, etc. and in short, all that we mean by āngikābhinaya...

On the whole Sukracharya given a very high place to the art of dancing. He often talks of the wealth of learning and at one place says, "The man who does not find pleasure in teaching, learning, perceptors, gods, arts, music, dancing and literature as either a man who has attained salvation or beast in the form of man."

(Dr. Kapila Vatsyana-- C. I. D. L. A., Page, 204)

।। প্রবন্ধকোষ ।।

প্রবন্ধকোষ-এ নৃত্য বিষয়ে খুবই কম উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে ৭২ রকমের শিল্পকলার কথা জানা যায়। এতগুলি শিল্পকলার মধ্যে নৃত্যও স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে জানা যায়—

"The Prabandha Kosa also mentions nrtyam as one of the arts in its list of the seventy-two arts ; the allied arts of singing (Gitam) and instrumental music (Vādyam) are also mentioned.

One of the chapters of Rājatarangini mentions thirty two modes of dancing and calls the whole Vādyam—nrtyam (dancing to the accompaniment of instrumental music).

(—Ibid Page 204)

।। অমর কোষ ।।

অমর কোষ গ্রন্থে নৃত্যের শ্রেণীবিভাগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে সেই যুগের পক্ষে। গীত বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বিত রূপ 'ত্রৌর্যত্রিক' বিষয়টির উল্লেখ আছে। তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের কথাও জানা যায়। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়—

"The Amarkosa, a later but an important lexicon, mentions several terms of music, dancing and rhythm. It devotes one complete varga (sub-chapter) to subjects of dramatics.

It lists five catagories of dancing—tāndava natānam, nātyam, lāsyam, nrtya and nartana. This is a comprehensive list including all the categories of dancing (1.7.10). It also mentions the combined art of singing, instrumental music and dancing (nrtyagitam—Vādyam) it is called Tauryatrika (তৌর্যত্রিক). The lady who performs the lāsya is called the lāsikā (1.7.8) and the courtesan who dances in the dramas is called ajjukkā. It also referes to men who dance in the

dress of women. (1.7.10.) : bhrūkunsa is the word used for them. The following terms of rhythm are included ; laya, tāla, vilambita, druta, and madhya-laya and ekatāla.……

In the sphere of abhinaya besides mentioning ten types of rasa (sānta and vātsalya included) and the bhāvas and anubhāva, it lists the following terms of āngikābhinaya (1) angahāra, (II) angavikshepa, (III) nivṛta bhru, (IV) āngikābhinaya, (V) sāttvikābhinaya.

(Ibid—Page-205)

।। বৌদ্ধজাতকে নৃত্য প্রসঙ্গ ।।

বৌদ্ধজাতকের সকল গুলিতেই সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আলোচনা নাই। জাতক গুলির মধ্যে নৃত্যজাতক (৩২নং), ভেরীবাদকজাতক (৫৯নং), শঙ্খজাতক (৬০নং) মৎস্যজাতক (৭৫নং), অসদৃশ্যজাতক (১৮১নং), সর্বদংষ্ট্রজাতক (২৪১নং), গুপ্তিলজাতক (২৪৩নং) ভদ্রঘটজাতক (২৯১নং) বীণাস্থূনোজাতক (২৩২নং), চুল্ল-প্রলোভন জাতক (২৬৩নং), ক্ষান্তিবাদীজাতক (৩১৩নং), কাকবতীজাতক (৩২৭নং), পাদকুশলমানবজাতক (৪৩২নং), শোনকজাতক (৫২৯নং), কুশজাতক (৫৩১), বিদুরপণ্ডিত জাতক (৫২৫নং) বিশ্বন্তর জাতক (৫৪৭নং) প্রভৃতি আরো কয়েকটিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের প্রসঙ্গ আছে।

নৃত্যজাতকে (৩২নং) মাত্র নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে এবং নৃত্য যে বিশুদ্ধ ও দোষবর্জিত হওয়া উচিত একথারই ইঙ্গিত আছে। এই জাতকটির আখ্যানাংশ হল : হংসরাজকন্যারত্নোজ্জ্বলগ্রীব বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূরকে পতিরূপে নির্বাচন করল। ময়ূর নৃত্যকলা জানত, কিন্তু নৃত্য তার অসম ও ছন্দোহীন হওয়ায় রাজকন্যার বরমাল্য থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল।

নৃত্যজাতকের এই উপাখ্যানটি বারহুত স্তূপে খোদিত করা হয়েছে। এর প্রসঙ্গে ডঃ উইণ্টারনিজ লিখেছেন :—

"The fable of the dancing peacock is an ancient one. As the fable was already represented, on a relief of the stupa

of Bhārahut in the 3rd century B. C., it must already at that time have been a jātaka.”

অনেকের অভিমত যে, নৃত্য জাতকের এই কাহিনীটি পারস্য থেকে গ্রীসে ও পরে ব্যাকট্রিয়া যখন গ্রীকদের শাসনাধীনে ছিল তখন গ্রীস থেকে তাকে ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়। কিন্তু মাননীয় টনী (**C. H. Tanney**) পণ্ডিত বেন্‌ফী (**Benfy**) ও ওয়ারেণ (**S. J. Warren**) প্রভৃতি মনীষীরা তা অস্বীকার করেছেন। আসলে ভারতবর্ষ থেকেই জাতক-কাহিনীটি পারস্যের ভিতর দিয়ে হেরোডটাসের সময় গ্রীসদেশে গিয়েছিল। ভদ্রঘটজাতকে (২৯১নং) বোধিসত্ত্বের পুত্রকে উপলক্ষ্য করে নৃত্য গীত ও বাদ্যের উল্লেখ আছে। চুল্লপ্রলোভন জাতকে (২৬৩নং) একটি নৃত্য-গীত বাদ্য কুশলা যুবতী নর্তকীর উল্লেখ আছে। নর্তকী বারাণসীরাজের কুমারকে প্রলোভিত করার জন্য বীণাসংযোগে গান আরম্ভ করেন। সে এমনি মধুরভাবে গান করে যে বীণার স্বরের সঙ্গে গানের ও গানের স্বরের সঙ্গে বীণান ধ্বনি মিলে এক হয়ে যায় প্রভৃতি। ঐ জাতকটিতে নৃত্য, বাদ্য ও গানের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষান্তিবাদিজাতকে (৩১৩নং) নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ আছে : একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত হয়ে নরগণের সঙ্গে সাড়ম্বরে প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করলেন। মঙ্গল-শিলাপটের উপর তার শয্যা রচিত হল। নৃত্য, গীত ও বাদ্যনিপুণা নর্তকীরা নিজেদের শিল্পচাতুর্য পরিবেশন করে রাজা কলাবুর মনোরঞ্জন করলেন।

পাদকুশলমানব-জাতকে (৪৩২নং) বারাণসীর কোন গ্রামে পাটল নামক নটের নৃত্যগীতের প্রশংসা আছে। গীত ও বাদ্যের আখ্যানটি এ জাতকে এভাবে গড়ে উঠেছে।—

নৃত্যগীত বিশারদ পাটল আমার
চলিল ভাসিয়া পড়ি গর্ভেতে গঙ্গার।
এমন একটি গীত শিখাও আমায়
গেয়ে যাহা জীবিকার হইবে উপায়।

এখানেও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্রসম্ভূত জাতকের (৪৯৮নং) নৃত্য গীতের এবং প্রতিগানের প্রসঙ্গ

আছে। বিদূর পণ্ডিত জাতকে (৫৪৫ নং) গন্ধর্বদের নৃত্যের উল্লেখ ও হরন্দতীর গানের প্রশংসা আছে। এছাড়া পূর্ণকের গাথায় বর্ণনা আছে,

স্থপকার-পাচক-নর্তক-নটগণ
গায়ক-গাইছে যারা করতালি দিয়া।
বাদক বাজাইতেছে যন্ত্র-কুম্ভস্থূণ,
পনবদিণ্ডিম শঙ্খভেরী, ও মৃদঙ্গ
কাংস্য করতাল বীণা। নৃত্য বাদ্যগীত
সুমধুর, লয়শুদ্ধ শ্রুতি সুখকর—
হের এ সকল এই মণিতে নির্মিত।

বিদুর পণ্ডিত জাতকে সঙ্গীতের পূর্ণপরিচয় পাওয়া যায়। নটগণের পরিচয় থাকায় খৃষ্টপূর্ব ৩০০-২০০ অব্দের সমাজে নাটক বা অভিনয়ের যে বিশেষ প্রচলন ছিল তা বোঝা যায়। হরিবংশ পুরাণে ভদ্রনটের সহায়তায় যাদবদের গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্যের বর্ণনায়ও তা সমর্থিত হয়। তথাগত বুদ্ধের পবিত্র জীবনালেখ্যকে রূপায়িত করাই বুদ্ধ নাটকের উদ্দেশ্য ছিল। সেই নাটকের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের পূর্ণ সহযোগ থাকত। বিদুর পণ্ডিতজাতকে উল্লিখিত নাট্যাভিনয়ের নৃত্যগীতাদির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতকে বৈতালিকদেরও উল্লেখ আছে। তারা রাজসভায় উচ্চৈঃস্বরে রাজাদের গুণাবলী গান করতেন। নৃত্যশীলা দেবদাসী ও অন্তঃপুরচারিণীদেরও নৃত্যগীতে যোগদান করতে দেখা যায়। যেমন,

নৃত্য করে গান করে মধুর বচন
অভাগতে সম্ভাষণ করে নারীগণ,

নৃত্যের সৌন্দর্যে আর মাধুর্যে গানের
একে করে অতিক্রম অন্যে পর পর।

নৃত্যের সৌন্দর্যে বিচিত্র ছন্দ, অঙ্গহার, ভাব, রস প্রভৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ নিয়েই সার্থক।

জাতককার উল্লেখ করেছেন নৃত্যের সৌন্দর্যে ও গানের মাধুর্যে নর্তক-নর্তকীদের সঙ্গে গায়ক গায়িকাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পিছনে তাঁদের শাস্ত্রীয় ও সৌন্দর্যে জ্ঞান ও দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বন্তর-জাতক (৫৪৭নং) কিন্নর গণের গান ও ময়ূর ময়ূরীদের উল্লেখ আছে।

গঙ্গামালজাতকে (৩।৪৫২) বারাণসীর রাজা উদয় তথা ব্রহ্মদত্ত কোশল-রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রচুর নাচগানের আয়োজন হয়েছিল। ষোল হাজার নর্তকী বিচিত্র ছন্দে নৃত্য করে বিবাহ-বাসরকে মুখরিত করেছিল।

সুমঙ্গল বিলাসিনী গ্রন্থে বারাণসীর আরো পুরাতন ইতিহাসের কথা বর্ণিত আছে। তখনও রাজঅন্তঃপুরে নৃত্যগীতের জন্য নর্তকীরা নিয়োজিত থাকত। জানা যায় কাশীরাজ রাম ধবল-কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলে অন্তঃপুরবাসিনী ও নর্তকীদের কাছে উপেক্ষিত হয়েছিলেন। সে সকল নর্তকী নৃত্য-গীতে সুশিক্ষিতা ছিলেন।

বারাণসী তখন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সওদাগরেরা সেখানে বাণিজ্য করতে আসত। মহাধনী-গোষ্ঠী নামে একজন ধনকুবের তার মাতার কাছে নৃত্য-গীত শিক্ষা করছিলেন। তার রূপলাবণবতী পত্নীও ছিলেন সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিনী।

ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহের কলন্দক-নিবাসে ছিলেন তখন ছজন ভিক্ষুণী 'গিরগ্‌গসমাজ্' নামে একটি উৎসবে যোগদান করে। জাতকে (১।৪৮৯) রাজগৃহে অনুষ্ঠিত এরকম একটি উৎসবের বর্ণনা আছে। উৎসবে যোগদানকারীরা যথেচ্ছভাবে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করত। 'বিশুদ্ধিমগ্‌গ' গ্রন্থে রাজগৃহে অনুষ্ঠিত এরকম একটি উৎসবের বর্ণনা আছে। তাতে পাঁচশত কুমারী নর্তকী মহাকশ্যপ-থেবকে এক প্রকারের পিষ্টক উপহার দেয়। মহাকশ্যপ তা গ্রহণ করেন। বিমানবথ্‌ভাষ্যেও (পৃঃ ৬২-৭৪) নবকত্তকীলম্ নামে একটি উৎসবের উল্লেখ আছে। মোট কথা উৎসবগুলির প্রধান অঙ্গই ছিল নৃত্য, গীত ও বাদ্য।

লিচ্ছবিরা বিচিত্র রকম উৎসবে যোগদান করতেন। উৎসবগুলির মধ্যে প্রধান ছিল 'সব্বরত্তিরবারো' বা 'সব্বরত্তিচারো' সেই উৎসবে নৃত্য গীতের সমারোহ থাকত। নানান শ্রেনীর গান গাওয়া হত ও গানের সঙ্গে থাকত বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র। বৈশালীতে যখন কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হত তখন সকল নরনারীই স্বাধীনভাবে নৃত্যগীত-এ যোগদান করত। সম্যুত্তনিকায় ও থের গাথাভাষ্যে এ ধরনের নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে ও বিশেষ করে বৌদ্ধযুগে

মালব, পাঞ্চাল, কুরু, গান্ধার, চেদী, মদ্র, শালব, আভীর, কেকয়, পুলিন্দ, কুলিন্দ, মদ্র, নিষাদ, লিচ্ছবি, শবর, চোল, বঙ্গ, গৌড়, পৌণ্ড্র, কিরাত, ভোজ, লাট, দশার্ণ-প্রভৃতি ৮৮টি জাতির মধ্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যথেষ্ট আদর ও অনুশীলন ছিল। (সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—(২য়)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৭২-১৯৯)

॥ ললিতবিস্তারে নৃত্য ॥

ললিতবিস্তারে বিভিন্ন গাথার উল্লেখ আছে। গাথাব মাধ্যমে সে যুগে উত্তর-প্রত্যুত্তর দেবার রীতি ছিল। গাথাগুলি বিভিন্ন স্বরযোগে বিভিন্ন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও নগরবাসীরা গান করত। রাজপ্রাসাদে গানের যথেষ্ট সমাদর ছিল। রাজদরবারে সঙ্গীত শিল্পীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হত। রাজা ও অমাত্যরা শিল্পীদের যথোচিত ভাবে সম্মান দিতেন। দেবদাসী বা নর্তকীরা তো থাকতই, তাছাড়া গায়ক, বাদক ও নর্তকরা রাজপ্রাসাদ, শোভাযাত্রা, বিচিত্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আনন্দোৎসব প্রভৃতির শোভাবৃদ্ধি করত। বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বাদ্যযন্ত্রনির্মাতারা (শিল্পীরা) কুশলী ছিল। যন্ত্রীরা নতুন নতুন পদ্ধতিতে বাজাবার শাস্ত্রীয় ধারা ও কৌশল সম্বন্ধে অবগত ছিল। অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও নৃত্য গীতের অনুশীলন নিষিদ্ধ ছিল না। নৃত্যছন্দ সুনিয়ন্ত্রিত ও মাধুর্যপূর্ণ ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের সময়ে (খ্রীঃ পূর্ব ৪০০-৩০০) নৃত্য প্রাচীন নাট্যবেদীয় ধারা অনুযায়ী ছিল: 'উপনৃত্যস্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ' (অযোধ্যাকাণ্ড) এই নাট্যাচার্য ভরত কিন্তু খ্রীঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীর মুনি ভরত নন। এই ভরত সম্ভবতঃ ব্রহ্মাভরত বা আদিভরত তথা সদাশিবভরত। রামায়ণ মহাভারতের যুগে এদের রচিত নাট্যবেদ তথা নাট্যশাস্ত্রেরই বিশেষ, প্রচলন ছিল। ভরত, মতঙ্গ, সঙ্গীত মকরন্দকার নারদ, শার্ঙ্গদেব ও কল্লিনাথাদি টীকাকার সকলেই এই প্রাচীন ও প্রামাণিক নাট্যাচার্যদের নাম ও তাদের মতের উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতশিল্পী ও শ্রোতারা বেশ মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ ছিলেন। দেশীয় (আঞ্চলিক) নৃত্যেরও তখন প্রচলন ছিল। নৃত্যশিল্পীরা মার্গ ও দেশী উভয় নৃত্যেই বিশেষ পারদর্শী ছিল।

(সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (২য়) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পৃঃ ১৮৮-১৮৯)

উক্ত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, তখনকার সমাজে মার্গ

(Classical) ও দেশী (আঞ্চলিক Folk Dance) উভয়প্রকার নৃত্যই পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রীয় বা মার্গ নৃত্য ইতিমধ্যেই যেন Classico-Folk পর্যায়ে অতিক্রম করে classical পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ দেখি—

"Courtesans, such as Ambāpāli and Sālavati, are well known in Buddhist legends, their fee for dancing was high—the tradition of dancing and music in a classical form was preserved by them. They are known to be experts in singing, dancing and lute playing."

... ...

"The Lalitavistāra lists many subjects to be studied ; out of the eighty—six arts mentioned, four deal with music and dance ; vinā vādyanṛtyam, lāsyam and nātyam are mentioned. We see that nṛtyam or dancing with interpretation and tāla is coupled with instrumental music vādya."

... ...

"The evidence provided by these texts leads us to the conclusion that acting existed as a flourishing profession ; dancing (nṛtya) was distinguished from the general and more popular art of dramatics and mime and practised by the natas. The dances described in the Lalitavistāra and the Mahāvastu are the only reference to the solo-classical dance we come across here."

(Dr. K. Vatsayana—C.I.D.L.A.) Page 207, 209.

জৈন ধর্মকে কেন্দ্র করে একদা যে জৈন-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তাতেও দেখছি নৃত্যের উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। জৈন সম্প্রদায় ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁদের কৃচ্ছ্রতায় জীবনাচরণের মধ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্যের আয়োজন যে ছিল তার প্রমাণ জৈন-সাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক নামে নৃত্যের উল্লেখ যেমন—'ক'-বর্গ, 'চ'-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ ইত্যাদি।

॥ জৈন সাহিত্যে নৃত্যের পরিচয় ॥

এই প্রসঙ্গে ডঃ কপিলা বাৎসায়ন উল্লেখ করেছেন—

Dancing is frequently mentioned in the Jaina, canons : the most important and significant for our purposes is the Rāyapasaniya. Thirty-two types of dances are mentioned. Their names indicate that they were dance dramas ; only a few seem to be the names of pure dance numbers :

(1) The first dance drama was presented to the accompaniment of orchestral music ; it represent the eight symbols, Sotthiya (Svastika), sirivaccha (Srivatsa), nandiyavatta (nandyāvarta) vaddhamanaga (vardhamānaka), bhaddāsana (bhadrāsana), Kalasa (pūrnakalasa), maccha and dappana (darpana), This was like an auspicious prelude, an invocation.

(2) In this dance-drama, other artistic motifs were represented through dance ; āvada (āvarta), paccāvada (pratya avarta), sedhi (sreni), pasedhi (prasreni), sotthiya (svastika), sovatthiya (sauvastika), pūsa, manavaka (pusyamānaka), vaddhamānaga (vardhamānaka), machhanda (matsyāndaka), magaranda (makarāndaka), phullāvali (puspāvali), paumapatta (padmapātra), sāgaratataranga, vasantalatā (vasantalatā) and paumalaya (padmalatā) ; this representation is called bhakaticitra.

(3) In this bhakticitra, the following were represented through abhinaya : ihamiga (ihamṛga), usabha (vasabha), turaga, nara, magara (makara), vihaga, vālaga (vyāla), kinnara, ruru, surabha, camara, kunjara, vanalayā (vanalatā), and paumalaya (padmalatā).

(4) In this variety, abhinaya is not predominant ;

instead, natya and nṛtya are important. The terms mentioned here indicate dance formations of circles and mandalas. Egao vanka, egao cakkavāla, duhao cakkavāla, cakkaddha-cakkavāla, all indicate circle formations—both single circle formations and concentric circle formations. Such circle formations and choreography are found in the Jaina sculptures of Gujrat.

(5) The fifth variety is called āvali and various types of āvalis are represented candāvali (candravali) surāvali (suryavali), hamsāvali. egavāli (ekavāli), taravāli, muttavāli (muktavali), kanagāvali (kannakāvali), rayanāvali (ratnāvali) etc.

The next three varieties represented the rising of the sun and the moon and other movements of these planets ; these were surely short dance-dramas.

(6) Here the rise of the sun and the moon were presented the numbers are termed suruggamana and canduggamana.

(7) The ascending movements of the sun and the moon are depicted in the dance-dramas known as suragamana and candagamana.

(8) The solar or the lunar eclipse was portrayed in numbers known as surāvarana and candāvarana.

(9) Finally, the dances of the setting of the sun and the moon were known as suratthamana (suryastamana) and candatthamana (candrastamana).

(10) The candamandala, suramandala, nāgamandala, jakkhamandala (yaksa), bhutamandala, rākkhasamandala, mahoragamandala and gandhavvamandala : all denote group formations of divine and evil beings.

(11) The next variety depicted different types of gaits : rsabhalalita, simhalalita, hayavilambiya, gajavilambiya, hayavilasiya, gayavilasiya, mattagajavilasya, mattahayavilasiya, mattagajavilambiya, mattahayavilamniya : the whole sequence was called the druta-vilambita dance.

(12) Another variety presented dances known as sāgarapavibhatti and nāgaiapavibhatti.

(13) A drama named after two creepers called Nandā and Campā is the thirteenth variety.

(14) In the next variety were the dances known as macchanda-pavibhotti, mayarandakapavibhatti, jārapavibhatti, and mārapavibhatti

(15) Letters from 'ka' to 'na', i.e, kavarga, were represented through movement. The dance sequence was termed as 'kavarga'.

(16) Another dance sequence was named after 'cavarga'.

(17) Similarly another represented 'tavarga'.

(18) And yet another took its name after the 'Pavarga'.

(19) another represented the 'tavarga'.

(20) A dance sequence represented the different types of leaves, namely, asoyapallava (asokapallava), ampapallava (āmra), jambupallava, Kosambapallava.

(21) Another variety showed the provibhaktis (movements) of the following creepers : paumalaya (padmalatā), nāgalatā, asogalatā, (Asokalatā), campakalatā, amba (amva latā), vanalatā, vāsanti, Kundalatā, atimuttaya, (atimuktalatā) and samalayā (Syāmalatā).

The next ten varieties were nṛtya performances ; the names suggest the types of dance, and their characteristics

are indicated by words such as druta, vilambita, mostly indicating tempo.

(22) Druta nṛtya.

(23) Vilombita nṛtya.

(24) Druta Vilambita nṛtya.

(25) Anciya (ancita) nṛtya.

(26) Ribhita nṛtya.

(27) Ancita-ribhita nṛtya.

(28) Arabhada (arbhata) nṛtya. (সম্ভবতঃ আরভটী বৃত্তিসমৃদ্ধ নৃত্য।)

(29) Bhasola nṛtya.

(30) Ārbhada bhasola nṛtya. Or ārbhada bhesda nṛtya.

(31) Uppayanivayapavatta (Utpāta and nitpāta), sankunciya (Sankucita), pasāriya (prasārita), rayāraiya (khecarita), bhānta (bhrānta) and sambhānta (sambrānta) nṛtya.১

(32) This drama depicted the story of Mahaviras early life, his conception, exchange of foetus, birth, boyhood, youth, renunciation, attainment of kevala hood (kavalayajñāna), the propogation of his message, and his nirvāṇa.১

উপরের বিস্তৃত বিষয়বস্তু থেকে জৈনসাহিত্যে তথা জৈনদের জীবনচর্যায় নৃত্যের যে কিরূপ প্রচলন ছিল তা জানা যায়। উক্ত ৩২ প্রকার বিভাগের মধ্যে অভিনয়, নৃত্য, নাট্য ও নৃত্ত বিষয় রয়েছে। এগুলি থেকে অবশ্য পূর্ণাঙ্গ কোন নৃত্য-নাট্যের নির্দেশ পাওয়া যায় না। মাঙ্গলিক প্রতীকের মাধ্যমে হস্তাভিনয় লক্ষণীয়। কতগুলি নৃত্যের নাম নাট্যশাস্ত্রের নামের সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের তালিকার সঙ্গে ঠিক মেলে না। তাইতো বলা হয়—এই জৈনসাহিত্যে উল্লেখিত নাচের নামের 'ট্রাডিশান' নাট্যশাস্ত্রের ট্রাডিশন থেকে আলাদা। ("If the terms contained here are technical, then they most certainly belong to a tradition of

১। Dr. K. Vatsayayna—C.I.D.L.A. Page 209-211.

the classical dance other than the Natyasastra tradition."— Ibid, Page 212)

যাই হোক, জৈন সাহিত্যে মার্জিত বা উঁচুদরের বারাঙ্গনারা যে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রভূত চর্চা করেছেন, তার উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে গণিকা নাম পাওয়া যায় 'ব্যায়াধম্মকহা' নামক গ্রন্থে। এ ছাড়া কোষ, উপকোষ, দেবদত্ত প্রভৃতির চর্চার কথাও জানা যায়। 'বৃহৎকল্প' ও 'ভাগবতা'তে এর উল্লেখ আছে। বৃহৎকল্প ভাষ্যে গণিকা ও নটা বা নৃত্যশিল্পীকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সেই বিপুলায়তন নৃত্যচর্চার সামান্য উপাদান এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হল।

এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভাল যে, যদিও রামায়ণ এবং মহাভারত ও হরিবংশ পুরাণের কাল পর্যন্ত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত এবং পরবর্তীকাল পুরাণের যুগ বলে ধরা হয়, তবু আমরা লক্ষ্য করি রামায়ণ-মহাভারত থেকেই পৌরাণিক যুগের ভূমিকা ধরে নিয়ে এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু পুরাণের যুগের নৃত্যের উপাদানের উপর ভিত্তি করেই নাট্যশাস্ত্রের নৃত্যব্যাকরণ গড়ে উঠেছে, সেইজন্য, এর অব্যবহিত পরেই ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যের উপাদান বিষয়ে আলোচনা রেখেছি। তাই এই যুগকে বলা যায় প্রাক্ ভরত যুগ। এর পর ভরত যুগ এবং তারপর উত্তর-ভরত যুগে আলোচনায় থাকছে ভরতের অনুচিন্তাগোষ্ঠীদের অবদানের কথা। এই অনুচিন্তাগোষ্ঠীদের পথ অতিক্রম করেই বর্তমান যুগের ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য ধারা চলে এসেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও কলিঙ্গরাজ খারবেলের বিখ্যাত শিলালিপিতে (Inscription) নৃত্যের উপাদান

।। ক্ল্যাসিক্যাল যুগ ।।

ভারতীয় সংস্কৃতি তথা নৃত্যের ক্রমবিকাশে 'ক্ল্যাসিক্যাল যুগ' নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সূত্রপাত ধরা হয় খ্রীঃ পূঃ ৬০০ শতাব্দী থেকে। বৈদিক যুগের সীমা অতিক্রম করে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে কালের স্রোতের প্রবাহ যখন খ্রীঃ পূঃ ৬০০—৫০০ শতকের কোঠায় উপস্থিত হল তখনই আরম্ভ হলো ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অগ্রগতি। ঐতিহাসিকরা তাই ভারতীয় সংস্কৃতির সুবিস্তৃত কালপরিধিকে 'বৈদিক' ও 'লৌকিক' মোট দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। লৌকিক বিভাগই হল 'ক্ল্যাসিক্যাল' নামে পরিচিত। ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের বিভাগকে উপলক্ষ্য করে সংস্কৃতি বিভাগ সম্বন্ধে বলেছেন—

"This history of the Sanskrit literature divides itself into two great ages, Vaidika and Laukika···Sacred and Profane—Scriptural and Classical."

এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ভরতোত্তর অভিজাত দেশী সঙ্গীতকে ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণী ভুক্ত বলেছেন। মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের উপাদান খ্রীঃ পূর্বাব্দের সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্রহ্মা ভরতের প্রতিপাদিত উপাদানেরই প্রতিধ্বনি এবং ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সকলে নিঃসন্দেহে নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত নাট্যসঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যধারাকে অনুসরণ করেছেন বলা যায়। ভরতের সময়ে নাট্য প্রয়োগে সঙ্গীত গন্ধর্ব শ্রেণীভুক্ত হলেও তা ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের ছিল।

বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগের ধারাবাহিকতায় রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, অন্যান্য পুরাণ, পাণিনি, পতঞ্জলি, শ্রীমদ্‌ভাগবত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎসায়নের কামশাস্ত্র, শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিসার, প্রবন্ধকোষ, অমর কোষ, বৌদ্ধজাতক, জৈন সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয় রয়েছে। নাট্য ও কাব্য সাহিত্যের মধ্য দিয়েই ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সাংস্কৃতিক তথা নৃত্য, সঙ্গীত নাটক প্রভৃতির উপাদান-গুলি সংকলিত হয়ে নতুন নৃত্য-ব্যাকরণের সৃষ্টি হলো—তারই ফলশ্রুতি ঐ বিখ্যাত 'নাট্যশাস্ত্র'। নাট্যশাস্ত্র নৃত্যের প্রামাণ্য দলিল। এমন একটি নৃত্য ব্যাকরণ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্ততঃ ক্ল্যাসিক্যাল যুগেতো বটেই। এই নৃত্য-ব্যাকরণকেই পরবর্তীকালের

ও তাত্ত্বিক ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুকরণ বা অনুসরণ করেছেন। নাট্যশাস্ত্র তাই নৃত্যের ইতিহাস-এ স্তম্ভস্বরূপ। সুতরাং নৃত্যের ইতিহাসে নাট্যশাস্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ইদানীংকালে বেশীর ভাগ পণ্ডিতই ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রণয়নের কাল ধরেছেন খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী নাগাদ কোন সময়। সময়কালের বিতর্ক নিয়ে একটু পরেই আমরা আলোচনা করবো। যাই হোক, এই খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেই নৃত্যের বিষয়ে একটি শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে—যা খারবেলের শিলালিপি নামে খ্যাত। খারবেলের শিলালিপির ১৭ স্তবকের মধ্যে পঞ্চম স্তবকটিকে নৃত্যের ইতিহাসের একটি প্রাচীন উপাদান হিসেবে ধরা যায়। এবং ধরা যায় বলেই ক্ল্যাসিক্যাল যুগের পরিধির মধ্যেই এই শিলালিপিকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হয়। তাই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আলোচনার সময় প্রাসঙ্গিক ভাবেই খারবেলের শিলালিপির কথা এসে পড়ে। তাছাড়া এ যুগের বিখ্যাত 'ওড়িশী' নৃত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন তথা উপাদান এই খারবেলের শিলালিপি থেকেই পাওয়া যায়। শুধু নৃত্যের ইতিহাস কেন, নাট্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই শিলালিপিটির গুরুত্ব কম নয়। সুতরাং ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষা ক্ষেত্রেও ভরতের নাট্যশাস্ত্র যেমন অপরিহার্য তেমনি খারবেলের শিলালিপিও উপেক্ষণীয় নয়।

এই ক্ল্যাসিক্যাল যুগেই দেখতে পাই ভারতীয় চিন্তা—চেতনা ও মননের ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির বিপুলায়তন প্রভাব পড়েছে, সাহিত্যে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে। এই যুগের শিল্পীরা যেন শিল্পের পঞ্চপ্রদীপ (সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য) জ্বেলে শিল্পদেবতার আরাধনা করেছেন। শিল্পের এই উৎসর্গিত রূপটি ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ (গুপ্ত যুগ) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ৪০০ পর্যন্ত, প্রায় এক হাজার বছর ধরে ক্ল্যাসিক্যাল যুগ বিধৃত হয়ে আছে। এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় লোক নৃত্য পর্যায়ক্রমে উন্নত পরিশীলিত, হয়ে শাস্ত্রীয় নৃত্যে তথা ক্ল্যাসিক্যাল বা উচ্চাঙ্গের নৃত্যে পরিগণিত হয়েছে। অবশ্য আজকের দিনের ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের সঙ্গে সেই যুগের ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের পার্থক্য অনেক। যাই হোক এই যুগের ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে **M. M. Marie Deneck** যথার্থই লিখেছেন—

"The civilization of India, one of the oldest and most continuous in the history of man, has been dominated by its three great faiths, Hindu, Budhist and Jain. Indian Art sustained by a consistent aesthetic theory, reflects the sublimity and variety "of Indian religious and philosophical thought."

(Epics Myths and legends of India, P. Thomas. ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

॥ খণ্ডগিরি-উদয়গিরি। রাজা খারবেল ॥

ভুবনেশ্বর থেকে মাইল তিন পশ্চিমে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে দুইটি বেলেপাথরের পাহাড় বা টিলা আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকীর্ণ কবিতার (চর্যাপদের আগে) জন্য শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিপি (Inscription) যেমন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তেমনি খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের উড়িষ্যার নৃত্যের ইতিহাসে উদয়-গিরির হাতিগুম্ফা গুহায় উৎকীর্ণ কলিঙ্গরাজ খারবেলের শিলালিপি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য উপাদান। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাবে যে উড়িষ্যায় খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে খুবই উন্নত ধরনের নৃত্যের প্রচলন ছিল। তার প্রমাণ খারবেলের শিলালিপি।

উক্ত পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি 'গুম্ফা' বা গুহাবাস আছে। এই গুহাবাসগুলির আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন—হাতিগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা, সর্পগুম্ফা, গণেশ গুম্ফা, রাণীগুম্ফা ইত্যাদি হাতিগুম্ফাতে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে যা উড়িষ্যার বা কলিঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান উৎস বলা চলে। এই হাতিগুম্ফা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কলিঙ্গের খারবেল বা ভিক্ষুরাজ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি 'চেত' (বা চেদী ?) বংশজাত এই চেতবংশের উদ্ভব হয় আনুমানিক ২২৫ খ্রীঃ পূঃ। চেত-রাজবংশের তৃতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন খারবেল। ২৪ বছর ধরলে আনুমানিক ১৮৫-৮৬ খ্রীঃ পূঃ খারবেল কলিঙ্গের রাজা হন। এই হিসেব মতে মনে হয় খারবেলের পিতামহের রাজত্বকালে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, হয়তো স্বাধীনচেতা রাজাকে মৌর্যরাজের অধীন করবার জন্য।

॥ রাজা খারবেল ॥

খারবেল অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, দিগ্বীজয়ী সম্রাট হবার বাসনা

তাঁর ছিল। হাতিগুম্ফা লিপি থেকে জানা যায়, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৬৫ শতকে তিনি তামিলদেশের একটি রাষ্ট্রজোট আক্রমণ করে ধ্বংস করেন। লিপিতে 'এশ্বিরদেশসংঘাতম্' বলে উল্লেখ আছে। পাণ্ড্য (Pandya কন্যাকুমারী অঞ্চল) দেশ থেকে তিনি কলিঙ্গে মণিমুক্তা, হাতিঘোড়া প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে এনেছিলেন। (নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী—A History of South-India—সপ্তম অধ্যায়)।

রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে খারবেল মগধে অভিযান করেন, দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান করেন। খারবেলের সময়ে পূর্বভারতে পাটলিপুত্রের পরই কলিঙ্গ ছিল অন্যতম রাজধানী।

খারবেল ছিলেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক। জৈন শ্রমণদের বসবাসের জন্য তিনি খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে কতকগুলি গুহাবাস নির্মাণ করিয়েছিলেন। গুহাগাত্রে যে খোদিত ভাস্কর্য আছে তাতে হিন্দু দেবদেবীর চিত্রই বেশী। খারবেলের পরে বিভিন্ন সময়ে এগুলি খোদাই করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন চিত্রও এর সঙ্গে মিশে আছে। গুহাস্থাপত্য প্রাচীন, খ্রীঃ পূঃ ২য়। ১ম শতকের, কিন্তু গুহাভাস্কর্য আরও পরবর্তীকালে প্রায় সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, খোদিত হয়েছে বলে মনে হয়। প্রায় ৬। ৭ শত বছর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি মিউজিয়াম বলা যায় খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিকে।

এরপর প্রায় ৬।৭ সাত বছরের ওড়িষ্যার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। (মাঝে কিছুকাল গৌড়বঙ্গের রাজা শশাঙ্কের অধীনে ছিল উড়িষ্যা।)

মূল শিলালিপির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

The Hatigumpha Inscription of Kharvela

(By K. P. Jayaswal, Esqr, M.A., Bar-at-Law, Patna and Prof. R. D. Banerjee, M. A., Banares Hindu University)

TEXT Page 79

1. (Two symbols) Namo Ar(i) hamtanam (*) Namo sava-Sidhanam (*) Airena Maharajena Mahameghavahanena Cheti. raja-vasa-vadhanena pasatha subhalakhamena Chaturamta-luthita-gun-opahitena Kalimgadhipatina Siri Kharavelena.

2. Pamdanasa-vasani Siri-kada-sariravata Kidita Kumara-Kidika(*) Tato lekha-rupaganana-vava-lara-Vidha-Visaradena sava-vigavalatena nava-vasani Yovaraja(m) Pasasitam(*) Sampuna-Chatu-Visati-vaso tadani vadhamana sesayo Ven-abhivijaya tatiya.

3. Kalingarajava(m) sepurisa-yuge Maharaj abhisechanam papunati(*) Abhisita matochapadhama vase(*) vata-viluta gopura pakiranivesanam patisamkharayati(*) Kalinga Magari Khibira isi-tala tadaga padiyo chabamdha Payati(*) sav-uyana-pa(ti) samthapanam cha.

4. Karayati panatisahi satasata-sahasihi Pakatiyo cha ramjayati(*) Dutiya cha-vase achitayita Satakamnim pachhima-disam haya gaja nara-radha bahulam damdam Pathapanuati(*) Kanha-bemna-jataya cha senaya Vitasitam M(u) sika-nagaram(*) Tatiya puna vase.

5. Gandhava veda budho dapa-nata-gita-vadeta samdam-sanahi usava samaya Karapanahi cha kidapayati nagarim(*) Tathi chavuthe vase Vijadharadhivasam ahata puvam Kalinga Puva-raga (nivesitam)···vitadhama(ku) ta-sabilama (dh) ite cha nikhita chhata.

6. Bhimgare hita-ratna sapateye sava-Rathika-Bhojake pade vamdapayati(*) Pamchami cha dani vasa Namda raja ti-vasa sata-oghatitam Tanasuliyavata Panadim Nagaram pavesa(ya) ti(*) So···bhusito cha Raha=s(u)ya(m) samda-sayamto sava kara-vanam.

7. anngaha-anekani sata-sahasani Visajati Poram Janapadam(*) Satamam cha vasam Pasasato Vajiraghara vati Ghusita-gharim sa matuka-pada-pumna···(ku) ma···(*) Athame cha vase mahata sen(a)···Goradhagirim.

8. Khatapagita Rajagaham upapidapsyati(*) Etin(a) cha

* **Darpa Nritya (Ugra Nritya or forceful)—Ragini Devi.**
Vaditra Nritya (Lasya or lyrical)

Kammapadana-sa(m) nadena samb(i)ta sena vahane vipamu(m) chitu Madhuram apayato Yavana-raj(a) D(i)mi(ta) ··Yachhati ···Palava···

9. Kapa rukhe haya gaja-radha saha yamte sava ghar-avasa parivasana aginathiya sava-gahanam cha Karayitum Bamhananam jatim Pariharam dadati(*) Araheto(Va ?)··· (gi)ya(to).

10. ···k.i. mana(ti)maja-samnivasam Mahavigayam pasadam karayati athatisaya sorta. sahasehi(*) Dasami cha vasa damda samdhi sa(ma)mayo Bharadhavasa-pathanam mah(t) jayanam···karapayati···P(a)yatanam chaman(i) ratuani upalabhati.* etc.

এই শিলালিপির পঞ্চম চরণের 'গন্ধব (গন্ধর্ব) বেদবুধো' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ সময় গন্ধর্ববিদ্যার চর্চা যে অব্যাহত ছিল এটা তার প্রমাণ। তাছাড়া 'দপ-নট-গীত—বাদিত বা বাদিত্র শব্দগুলিও বিশেষ অর্থবহ। দপ-দর্পনৃত্য (উগ্রনৃত্য বা তাণ্ডবাঙ্গের নৃত্যকেই বুঝায়। ওড়িশী নৃত্যে' দর্পনৃত্য, 'তাণ্ডব নৃত্যেরই রূপ বিশেষ ধরা হয়। তাছাড়া 'বাদিত নৃত্য' লাস্য নৃত্যের নামান্তর। (Darpa Nritya-Ugra Nritya or forceful, Vadita-Nritya, Lasya or lyrical—Ragini Devi) অবশ্য নট-নাট্য বা নৃত্য বা শিল্পী অর্থে, গীত-সঙ্গীতার্থে ও বাদিত—বাদ্য অর্থেও ধরা যায়।

॥ নাট্যশাস্ত্র প্রসঙ্গ ॥

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতার কাছে সমগ্র ভারতে প্রচলিত আঞ্চলিক নৃত্যগুলির পরিচয় যে জানা ছিল, তার প্রমাণ বিভিন্ন অঞ্চলের 'প্রবৃত্তি'-র উল্লেখ। এই 'প্রবৃত্তি'-র মধ্য দিয়ে সারা ভারতের তৎকালীন সাংস্কৃতিক ছবিটি যেন ভেসে ওঠে। ডঃ মহেশ্বর নিয়োগী যথার্থই বলেছেন—

"Bharata's Natyasastra (2nd century B. C.) makes a four-fold Classification of Pravrittis or local usages in dramatic

* Epigraphia Indica (Vol. XX), 1929-30) Page 79 (71-89) Edited by Hirananda Sastri, M. A. M. O. L., D. Litt. (Govt. Epigraphist for India) Delhi Manager of Publication 1933.

representation which are distinguished from each other on account of differences in costumes and languages, manners and professions in different regions of India."[১]

কবিরাজ রাজশেখর খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতাব্দীতে তাঁর বিখ্যাত 'কাব্য-মীমাংসা' গ্রন্থে রীতি, বৃত্তি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলির অতি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে বচন-বিন্যাস-ক্রম (অর্থাৎ পদ-সঙ্ঘটনা), রীতি (পদ্ধতি), বিলাস-বিন্যাস-ক্রমবৃত্তি (প্রয়োগ কুশলতা) এবং বেশ-বিন্যাস-ক্রমের নাম প্রবৃত্তি (সংবাদ) মহর্ষি ভরত বলেন যে, প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ 'নিবেদন' অর্থাৎ নিঃশেষ বেদন বা জ্ঞান। পৃথিবীর অন্তর্গত নানাদেশের বেশ, ভাষা, আচার, বার্তা, যা প্রখ্যাপিত করে সেটাই প্রবৃত্তি। বিভিন্ন দেশের নানরূপবেশ, বিবিধ ভাষা. বিচিত্র লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার (অর্থাৎ আচার) কৃষি ও পশুপালনাদির (বার্তা) বহু-বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই সকলের জ্ঞানই 'প্রবৃত্তি'। আচার্য অভিনব গুপ্তও বলেছেন (খ্রীঃ ১১ শতাব্দী)—'দেশ-বিদেশের বেশ, ভাষা, সমাচারের বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধিই প্রবৃত্তি।' প্রাচীন নাট্যপ্রয়োগ কর্তৃবর্গ সকলেই স্বীকার করেছেন যে প্রবৃত্তি চতুর্বিধ। (১) আবন্তী, (২) দাক্ষিণাত্যা, (৩) পাঞ্চালী (বা পাঞ্চালমধ্যমা) (৪) ঔড্রমাগধী (বা উড্রমাগধী)।

নাট্যশাস্ত্রকার মহর্ষি ভরত দৃশ্যকাব্যের রস ভাবাদির—বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বৃত্তিও চতুর্বিধ। (১) ভারতী (২) সাত্বতী, (৩) আরভটী, (৪) কৈশিকী। প্রবৃত্তির মূল আশ্রয় হলো বৃত্তি। অতএব বৃত্তির ন্যায় চতুর্বিধ। সাধারণতঃ, ভারত-ভূমিকে চারভাগে ভাগ করা হয়। (১) দক্ষিণাপথ (২) পূর্বদেশ (৩) পশ্চিমদেশ (৪) উত্তরভূমি। এই চার ভাগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গাররসের প্রাচুর্য সর্বজনবিদিত। অতএব দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীপ্রযোজ্য, বহু নৃত্যগীতযুক্ত, শৃঙ্গাররসবহুল কৈশিকী বৃত্তির প্রচলন অত্যধিক। আবন্তী প্রভৃতি পশ্চিমদেশে ধর্মভাবের কিছু প্রাধান্য বলিয়া কৈশিকীর সহিত সত্ত্ববহুল সাত্বতী বৃত্তির প্রাদুর্ভাব। প্রাচ্যদেশসমূহে কেবল বাগাড়ম্বর ও বিকট আস্ফালনের বাহুল্যহেতু রাগাশ্রিত ভারতী ও উদ্ধতভাববহুল আরভটীর সম্মেলন।

১। Dr. Maheswar Neogy—Sangeet Natak Academy—New Delhi, 1958 Seminar Paper—Page 1.

উত্তর ভূমিতে ধর্ম ও শৌর্যাদির প্রভাব বশতঃ সাত্বতী ও আরভটীর যোগ থাকা সত্ত্বেও তাতে কৌশিকীর অল্প সংমিশ্রণ দেখা যায়। এইরূপ দেশভেদের সঙ্গে বৃত্তি ও প্রবৃত্তি ভেদের সম্বন্ধ স্থাপনের বিশেষ প্রয়াস নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। এই সম্বন্ধস্থাপনের মূলে রয়েছে মানুষের চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা অর্থাৎ এইসব ভেদ মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভিন্ন লোক ও ভিন্ন রুচি, অতএব বেশ, ভাষা ও আচারে যে বহু বৈচিত্র থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

প্রথমেই ধরা যাক্ দাক্ষিণাত্য প্রবৃত্তিব কথা। এই প্রবৃত্তি দক্ষিণাপথে প্রচলিত ছিল। সে যুগে দক্ষিণাপথ বলতে বোঝাত মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, মেকল (মেলক বা মেখল) ও পালমঞ্জর (কালপিঞ্জর বা পলপিঞ্জর)।

তাছাড়া কোশল, তোসল, কলিঙ্গ, যবন, খম, মোসল, দ্রমিড় (দ্রাবিড়), অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, রৈন্না, বানবাসিক (বানবাসজ) প্রভৃতি দক্ষিণ সমুদ্র ও বিন্ধ-পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত সকল দেশই দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। এইসব দেশেই দাক্ষিণাত্যর নিয়ত প্রচলন। বৃত্তি—কৈশিকী।

তারপর আবন্তী প্রবৃত্তি। তৎকালে আবন্তী বা উজ্জয়িনী পশ্চিম ভূভাগের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল। এই পশ্চিমখণ্ড বলতে বোঝাত—আবন্তী (আবন্তিকা বা উজ্জয়িনী) স্বরাষ্ট্র, মানব, সিন্ধু, সৌবীর, আর্সত, দর্শান, ত্রিপুর ইত্যাদি। এই সব দেশে আবন্তী বা আবন্তিকী) প্রবৃত্তি প্রচলিত। বৃত্তি মূলতঃ সাত্বতী, অঙ্গরূপে কৌশিকী।

তারপর ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি। এটা প্রাচ্যভূখণ্ডে পরিচিত। প্রাচ্যখণ্ড বা পূর্ব দেশেব অন্তর্গত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বাস্থ, উড্রমাগধ, পুণ্ড্র, নেপালক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্লবঙ্গ, মহেন্দ্র মলদা, মল্যবর্তক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মাগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুলিন্দ, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক ইত্যাদি। এইসব দেশ ও পুরাণাদিতে বর্ণিত অপর যে সব দেশ—প্রাচ্যখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সেইসব দেশেই ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তির আবির্ভাব। বৃত্তি—ভারতী ও আরভটী।

তারপর পাঞ্চাল মধ্যমা প্রবৃত্তি। উত্তর ভূমিতেই এই প্রবৃত্তির প্রভাব দেখা যায়। উত্তরাখণ্ড বলতে বোঝায়—পাঞ্চাল (পঞ্চাল), শূরসেন, কশ্মীর (কাশ্মীর), হস্তিনাপুর, বাহ্লীক, মদ্রক, উশীনর ইত্যাদি। তাহার উত্তর ও হিমাচলপ্রান্তে যে সব দেশ অবস্থিত সেগুলিও উত্তরাপথের অন্তর্ভুক্ত। এইসব

অঞ্চলে পাঞ্চালী বা পাঞ্চালমধ্যমা প্রবৃত্তির প্রচলন। বৃত্তি মূলতঃ সাত্বতী ও আরভটী। অঙ্গরূপে কৈশিকী। এটাই হল দেশানুসারে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিভাগ। এই ভাগ করেছেন মহর্ষি ভরত। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে দেশানুসারে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিভাগ করলেও মহর্ষি ভরত প্রত্যেক প্রবৃত্তির পর্যাপ্ত বিবরণ কিছু দেন নি।

প্রবৃত্তির ভেদ বুঝতে হলে বৃত্তি ও রস সম্বন্ধে-জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। অতএব সংক্ষেপে কোন কোন প্রবৃত্তি কোন কোন বৃত্তি ও কোন কোন রসের অনুকূলতা দেখান হল —

(১) দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি—কৈশিকী বৃত্তি, শৃঙ্গার ও হাস্যরস। শ্যাম অথবা শ্বেতবর্ণের মৃদু-কোমল-সূক্ষ্ম-বিচিত্র মনোরম বেশ এতে ব্যবহার্য। স্ত্রীদেরই এতে প্রধান অধিকার। কান্ত কোমল পদাবলী ও নৃত্যগীতি বহুল সৌন্দর্যোপযোগী ব্যাপার এতে প্রচুর।

(২) আবন্তী প্রবৃত্তি—সাত্বতী ও কৈশিকীবৃত্তি, বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, হাস্য ও শৃঙ্গার রস। গৌর, হেম, রক্ত, পীত, শ্বেত, শ্যামবর্ণের ঈষৎ উজ্জ্বল ও অল্প মৃদু বেশ এতে পরিধেয়। সত্ত্বভাব অর্থাৎ শৌর্যবীর্যাদি মনো ব্যাপার প্রদর্শনেই এর প্রধান উপযোগিতা। অবান্তররূপে সৌন্দর্যের ব্যাপারও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

(৩) ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি: ভারতী ও আরভটী বৃত্তি, করুণ অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রস। কপোত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও নীলবর্ণের উজ্জ্বল ও উগ্রবেশ এতে ব্যবহার্য। নানাবিধ বাগ্‌ব্যাপার ও উদ্ধতকায় ব্যাপার যুগপৎ এর সাহায্যে প্রদর্শিত হতে পারে।

(৪) পাঞ্চালমধ্যমা প্রবৃত্তি—সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী বৃত্তি। বীর, রৌদ্র, ভয়ানক বীভৎস, হাস্য ও শৃঙ্গারের অল্পাধিক সংমিশ্রণ। এইজন্য বেশের বৈচিত্র্য। হেম, গৌর, রক্ত, কৃষ্ণ নীল, শ্বেত, শ্যামবর্ণের দীপ্ত, উজ্জ্বল, উগ্র, উৎকট, হাস্যজনক ও মৃদু মনোরম বিচিত্র বেশ এতে ব্যবহার্য। সত্ত্বভাব, কায় ব্যাপার ও মধ্যে মধ্যে সৌন্দর্যের ব্যাপার প্রদর্শনে ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।[১]

১। নাচের ইতিকথা—(১ম খণ্ড) শ্রীগোপীভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ বসু। (দি ঢাকা ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী ১৩৬২—পৃঃ ২৩—২৭, ২৯, ৩০)।

॥ নাট্যশাস্ত্র রচনা বা সংকলনের সময়কাল ও শ্লোক সংখ্যা এবং 'ভরত'-এর নাম নিয়ে বিতর্ক। নাট্যশাস্ত্রের গুরুত্ব ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন 'চণ্ডীদাস সমস্যা', 'কৃত্তিবাস সমস্যা' তেমনি নৃত্যের ইতিহাসে 'ভরত সমস্যা'। চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত বা নামাঙ্কিত ১২ শতের অধিক পদের মধ্যে বড়ু-চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। অতঃপর বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যটির আবিষ্কারের ফলে এই সমস্যার খানিকটা নিরসন হলেও সবটা মেটেনি। সমস্যা থেকেই গেছে। এরপর কৃত্তিবাস সমস্যাতে দেখা গেছে, কৃত্তিবাস নামাঙ্কিত বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত পুঁথিগুলি বিশ্লেষণ করে আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন প্রশ্ন তুলেছিলেন —খাঁটি কৃত্তিবাস রচিত 'রামায়ণ' কোনটি। কারণ বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে পার্থক্য অনেক। এগুলি অবশ্য বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাবেই হয়তো বিভিন্ন প্রক্ষিপ্ত ঘটনা অনুপ্রবেশ করেছে যা মূল বাল্মীকি রামায়ণেই নেই। যাই হোক্ সমস্যা খানিকটা থেকেই গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বুঝা যায় ভরতের, নামকরণ শ্লোক ও রচনাকাল নিয়েও এই সমস্যা বিতর্কের আকারে আছে।

এই ভরত বিতর্কে আমাদের দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা তাঁদের বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত প্রবর পিশেল, ম্যাকডোনাল, ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ, ধনঞ্জয়, ভোজরাজ, অভিনবগুপ্ত, ডঃ মনোমোহন ঘোষ, ডঃ সুশীলকুমার দে, প্রমুখদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ভরতের নাম নিয়ে যে বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে তাতে, আদিভরত (গ্রন্থ) ব্রহ্মা ভরত, সদাশিব ভরত, মুনি ভরত, নন্দী ভরত, বৃদ্ধ ভরত প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন—

"খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের অভ্যুদয় হয়। অবশ্য ভরতের অভ্যুদয়কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ বলেন ২য় খ্রীঃ পূঃ কাল পর্যন্ত ভরতের সময় নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার, অধ্যাপক ধ্রুব, ডঃ ভণ্ডারকর, মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ষ্টেন কেনো, শ্রদ্ধেয় র‍্যাপসন্, গণপতি শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে, ভরতের সময় বা নাট্যশাস্ত্র রচনার

কাল খ্রীঃ পূঃ ২য় থেকে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী থেকে ৫ম শতাব্দীর মধ্যে। কারো কারো মতে বিচিত্র বিবর্তনের ভিতর দিয়ে নাট্যশাস্ত্রের পূর্ণরূপের বিকাশ লাভ করে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে। অনেকে বলেন, নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের অধ্যায়গুলি (২৮শ-৩৩শ অধ্যায়) খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত। ডঃ কানে কলিঙ্গরাজ জৈন খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপিতে উৎকীর্ণ 'গন্ধর্ববেদবুধঃ শব্দটির নিদর্শন দেখিয়ে বলেছেন যে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকে (কারো মতে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতকে) ঐ প্রস্তর লিপিটি উৎকীর্ণ হয় ও তাতে গন্ধর্ববেদের কথা উল্লিখিত থাকায় গন্ধর্ববেদ তথা নাট্যশাস্ত্র যে ২০০ খ্রীঃ পূঃ আগেই রচিত হয়েছিল সে কথা বোঝা যায়। হাতিগুম্ফাগুহাটি উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরিতে অবস্থিত। জৈন রাজা খারবেল নৃত্য-গীত-বাদ্য ও নাটকের বিশেষ অনুরাগী ও পারদর্শী ছিলেন। তিন বছর রাজত্ব করার পর তিনি তাঁর রাজত্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয়, নৃত্য ও গীত ও বাদ্যের যাতে বিশেষ প্রচার হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লিপিতেও একথার উদ্ধৃতি দেখা যায়—"দপ-নট-গীত-বাদিত-সংদসনাহি। উসব-সমাজ-কারাপনাহি চ ক্রীড়া পয়তি নগরীম্।"

সুতরাং ডঃ কানে উল্লেখ করেছেন যে প্রথম অধ্যায় ও সম্ভবতঃ আর চারটি অধ্যায় (২য়-৫ম) খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্র-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ ধরনের অনেক মতবাদই নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল ও রচয়িতাকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নানান দিক থেকে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা, বিশেষ করে তার সঙ্গীতাংশের বিষয়বস্তু নিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে মুনি ভরত খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর আগে বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্রটি রচনা বা সংকলন করেন নি। ডঃ মনোমেহন ঘোষের অভিমত তাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ডঃ মনোমোহন ঘোষ তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন 'মনীষা' থেকে প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ডঃ সুনীল কুমার দে, নাট্যশাস্ত্রের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, যে ধরনের সংস্কৃত ভাষায় নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়েছে, তার সময়কাল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী। এদের মতামতই ডঃ ঘোষ পরে গ্রহণ করেছিলেন। আমরাও উক্ত মতই গ্রহণ করছি।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র আসলে—১২,০০০ হাজার শ্লোক নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল, পরে ৬,০০০ হাজার মাত্র শ্লোক-সংখ্যা নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী ও

পরবর্তীকে দুটি সংস্করণ—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মনে করা যেতে পারে। অনেকের মতে বৃহৎটির নাম 'নাট্যবেদাগম' ও ক্ষুদ্রটির নাম 'নাট্যশাস্ত্র' ছিল। সারদাতনয় (১১৭৫-১২৫০ খ্রীঃ) 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (১০।৫)

একং দ্বাদশমহস্রৈশ্লোকৈরেকং তদর্ধতঃ।
ষড়ভিশ্লোকসহস্রৈর্যে নাট্যবেদস্য সংগ্রহঃ॥

ধনঞ্জয়কৃত 'দশরূপ' গ্রন্থের ১।৬২ শ্লোকের টীকায় বহুরূপ-মিশ্র দ্বাদশসহস্রী সংস্করণটির প্রামাণ্য স্বীকার করে বলেছেন,

সভাষ্যমানমেকস্মিন্নকেহন্যার্থত্বসূচনম্।
সমাপ্যতি হি নাট্যজ্ঞৈয়তায় ইষ্যতে॥
ইতি দ্বাদশসহস্রীকার।

ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়া বলেন 'ভরত প্রকাশনম্'-নামে একখানি গ্রন্থ মাদ্রাজ থেকে তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ৯টি রস ও ভাবের পরিচয় আছে, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে ৮টি রস ও ভাবের বর্ণনা দেখা যায়। সম্ভবতঃ তেলেগু সংস্করণটি অধুনালুপ্ত—দ্বাদশসহস্রীরই অংশবিশেষ। ষট্‌সহস্রী-নাট্যশাস্ত্রের অস্তিত্বও প্রাচীন মনীষীরা স্বীকার করেছেন। (বহুরূপ মিশ্র ও অভিনব গুপ্তও একথা স্বীকার করেছেন)।

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি নাট্যশাস্ত্রের অন্তত পক্ষে চল্লিশখানি পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করে দ্বাদশসহস্রী সংস্কারণটিকেই প্রাচীম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি ৩৬,০০০ হাজার শ্লোকপূর্ণ একটি প্রামাণিক নাট্যবেদের নামও উল্লেখ করেছেন। সেই নাট্যবেদ রচয়িতা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা ভরত।

দ্বাদশসহস্রী ও ষটসহস্রী গ্রন্থ দুটির মধ্যে সারদাতনয়ের মতে, একই সঙ্গে লিখিত হয়েছিল—তবে দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক। কিন্তু অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে। শ্রদ্ধেয় পিশেল (**Pischel**) দ্বাদশ সহস্রীকেই প্রাচীনতার সম্মান দিয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডও তাই। ডঃ লক্ষণস্বরূপ-এর মতে ষটসহস্রী সংস্করণটিও প্রাচীন। ধনঞ্জয় দ্বাদশসহস্রীর পক্ষপাতী। ভোজরাজের মতে ষটসহস্রীই প্রামাণিক।

অভিনব গুপ্তের অভিমতও তাই। ডঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।[১] (সিদ্ধান্ত আগেই বলা হয়েছে)।

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি ব্রহ্মাকেই নাট্যবেদের রচয়িতা বলেছেন। অনেকের মতে নাট্যবেদের রচয়িতা 'আদি-ভরত'[২] (আদি ভরত, এখানে গ্রন্থ, গ্রন্থকার নয়)। ধনঞ্জয় তাঁর 'দশরূপ' গ্রন্থে ব্রহ্মাভরত, সদাশিবভরত ও মুনিভরত এই তিনজন প্রাচীন নাট্যাচার্যের নামোল্লেখ করেছেন। অভিনব গুপ্ত, অভিনয়ভারতীতে এই তিনজনের নাম উল্লেখ করে পূর্বপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন বর্তমান সমগ্র নাট্যশাস্ত্রটি মুনি ভরতের নিজের না তাঁর কয়েকজন শিষ্যের লেখা, তা বলা যায় না। পুনরায় কাব্যমালা সংস্করণে নাট্যশাস্ত্রের শেষে নন্দিভরতের নাম উল্লেখ দেখা যায়। (নন্দীভরত সংগীত পুস্তকম্)

অনেকের মতে ভরত সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রটি রচনা করেন নি। নন্দি তথা নন্দিকেশ্বর ও কোহল শেষাংশ রচনা করেছিলেন। কিন্তু নন্দিকেশ্বরের রচিত কোন সঙ্গীত গ্রন্থের সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুশীল কুমার দে বিশেষ ভাবে আলোচনা করে বলেছেন—সঙ্গীত সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র ২৮-৩৩ অধ্যায়গুলি মুনি ভরতের নিজস্ব অবদান হলেও পরবর্তীকালে নন্দিভরতের অভিমত অনুযায়ী তাকে নতুন করে আবার লেখা হয়েছিল।

নাট্যশাস্ত্রের বেশীর ভাগ আর্য্যাছন্দে (পদ্যে) লেখা ও সামান্য সামান্য তাতে গদ্য রচনাও আছে।

নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা মুনিভরত আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, এ নিয়ে মতদ্বৈততা কম নেই। তবে একথা ঠিক যে 'ভরত' একটি উপাধি বা পদবী বিশেষ। নাট্যশাস্ত্রে অভিনেতা বা নটমাত্রকেই 'ভরত' আখ্যা দেওয়া হত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় (৩।১৬২) 'ভরত' শব্দটি অভিনেতা বা নট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সারদাতনয় 'বৃদ্ধ ভরতের' নাম উল্লেখ করেছেন।

তামিল গ্রন্থ 'শিলপ্পদিকরমের' ভাষ্যে 'পঞ্চভারতীয়ম্' শব্দের উল্লেখ আছে। পঞ্চভারতীয়ম একটি গ্রন্থ, এটি পাঁচজন ভরতের বোধক নয়। সারদাতনয় 'ভাব প্রকাশমের দশম অধ্যায়ে 'পঞ্চভরতের' প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন দেখা

১। The Natyasastra—(Eng. ed.) Royal Asiatic Society of Bengal, 1951, P-LXXI-LXXII.

২। Vide : Preface to Natyasastra—Baroda, Vol.-1. P-6.

যায়। তিনি আচার্য পরম্পরায় পরিচয় দিতে গিয়ে মুনি ভরতের পঞ্চশিষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সারদাতনয়-এর পক্ষে ভরতোপাখ্যানের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের উল্লিখিত একশো শিষ্যের আখ্যানের কোন সামঞ্জস্য নেই। সারদাতনয়—পঞ্চভরতকে 'নট কুল' বা 'নট' আখ্যা দিয়েছেন।

এ থেকে বোঝা যায় একজন মুনিভরতের পাঁচজন শিষ্য ছিল ও তাদেরও 'ভরত' বলা হত। সুতরাং ৬ জন ভরত নাট্যশাস্ত্র প্রচার করে পৃথিবীতে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন নাট্যশাস্ত্রকার মুনিভরত ও অপর পাঁচজন নন্দিভরত, মতঙ্গভরত, কশ্যপ ভরত, কোহল ভরত, ও তণ্ডুভরত। অনেকে আবার তণ্ডুভরতের পরিবর্তে যাষ্টিক ভরতের নাম বলেন।

আসলে পঞ্চভরত উপাখ্যানটি পৌরাণিকী ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি, সারদা তনয়ের ভাবপ্রকাশন ও শিলপ্পদিকরম্' 'পঞ্চমরবু' এই দুইটি তামিল গ্রন্থের অনুসরণ করে যে পাঁচজন ভরতের কল্পনা করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া 'শিষ্যৈঃপঞ্চভিবন্বিতম্' শব্দগুলি থেকেও পঞ্চভরতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ হয় না। সুতরাং নাটাশাস্ত্রকার মুনি ভরতের প্রসঙ্গে বলা যায় যে 'ভরত' শব্দটি উপাধিবিশেষ হলেও নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা বা সংকলয়িতা ঐতিহাসিক ভরত একজন ছিলেন। নাট্যশাস্ত্রকার নিজে নাট্য-বেদজ্ঞানী ও নটরূপে (?) প্রসিদ্ধ থাকায় তাঁর পক্ষে নটের অভিন্ন উপাধি 'ভরত' নামধারী হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা বেশ প্রণালীবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত। নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তী গ্রন্থগুলি নাট্যশাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি ও একদিকে ভাষ্যই বলা যায়।[১]

॥ ভরত সমস্যা ॥

[বাংলা সাহিত্যে যেমন, চণ্ডীদাস সমস্যা (বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ইঃ) এবং কৃত্তিবাস সমস্যা রয়েছে, তেমনি ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে 'প্রামাণ্য-দলিল' 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থেরও ভরত-সমস্যা আছে। এখানে (১.সময়কাল, শ্লোকসংখ্যা ও কতজন ভরত, সেই প্রসঙ্গে একটি তালিকা' দেওয়া ম্যাকডে।এক নজরে সমস্যাটি বোঝার জন্য।

ধনঞ্জয় স্বাদ

১ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (২য় খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পৃঃ ২০৯-২১৬।

॥ ভরত সমস্যা ॥

রচনাকাল (সময়গত সমস্যা)

খ্রীঃ পূঃ ২য় থেকে খ্রীষ্টীয় ২য় শতক

- ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়া।
- অধ্যাপক ধ্রুব।
- ডঃ ভাণ্ডারকার।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ষ্টেন কেনো।
- র‍্যাপসন্।
- গণপতি শাস্ত্রী।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ থেকে পঞ্চম
„ ৮ম
„ ৪র্থ (২৮-৩৩ অধ্যায়) } অনেকের মতে।

খ্রীঃ ৫ম (১ ও ৪র্থ অধ্যায়)— ডঃ কানে।
খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর পূর্বে— ডঃ কানে।
খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী— ডঃ মনমোহন ঘোষ।
—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
* { ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। —ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ। —ডঃ সুশীলকুমার দে।

শ্লোকগত সমস্যা

১২ হাজার শ্লোক (নাট্যবেদাগম্)
- রামকৃষ্ণ কবি।
- পিশেল।
- ম্যাকডোনাল।
- ধনঞ্জয়।

৬ হাজার শ্লোক (নাট্যশাস্ত্র)
- লক্ষ্মণস্বরূপ।
- ভোজরাজা।
- অভিনব গুপ্ত।

[১২ হাজার ও ৬ হাজার শ্লোক একই সময়ে লেখা —শারদাতনয়ের মতে।

নামগত সমস্যা

নাট্যবেদ রচয়িতা – ব্রহ্মাভরত (রামকৃষ্ণ কবির মতে

আদিভরত—অনেকের মতে

ব্রহ্মা ভরত
সদাশিব ভরত
মুনি ভরত } ধনঞ্জয় ও অভিনব গুপ্ত

নন্দী ভরত—কাব্যমালা সংস্করণ।
কোহল ভরত—শেষাংশ রচনা অনেকের মতে
'পঞ্চভারতীযম্—"শিলপ্রধিকরম গ্রন্থে উল্লেখিত শব্দ
বৃদ্ধ ভরত—শারদাতনয
পঞ্চ ভরত— „

নন্দী | মতঙ্গ | কাশ্যপ | কোহল | তণ্ডু বা যাষ্টিক

* [ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ডঃ সুশীল কুমার দে প্রমুখ বিদ্বানেরা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, নাট্যশাস্ত্র যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা, সেই ধরনের সংস্কৃত ভাষা খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষারও একটি বিবর্তন আছে বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।]

॥ নাট্যশাস্ত্রের উপপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার ॥

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ নাট্যের উৎপত্তির প্রয়োজন, তার প্রয়োগ সম্বন্ধে ভরতমুনিকে প্রশ্ন করেছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের সূচনা প্রথম অধ্যায় এখান থেকে। ভরত উত্তরে বললেন, মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণের প্রার্থনায় চারবেদ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে ব্রহ্মা নাট্যকে তৈরী করেছিলেন। পিতামহের কথায় ইন্দ্র নাট্যবেদ অনুশীলনে দেবতার চেয়ে মুনির যোগ্যতা বর্ণনা করলেন। সেইজন্য পরে ভরত ব্রহ্মার আজ্ঞায় তাঁর শতপুত্রদের নাট্যশাস্ত্র অধ্যাপনায় নিযুক্ত হলেন। ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তিত্রয়ের কথা এবং নাটকে তার প্রয়োগ, কৈশিকী বৃত্তির সংযোজনা, এই বৃত্তিতে অপ্সরার পারদর্শিতা এবং অপ্সরাদের নামের কথা দেখা যায়। নারদ প্রভৃতি মুনিদের নাট্যযোগে নিয়োগ করে ব্রহ্মা আরম্ভ করলেন নাট্যপ্রয়োগ এবং ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা পরিতুষ্টি র জন্য বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করেন। বিরূপাক্ষাদি দৈত্যগণ ক্ষোভে নাট্য প্রয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। জর্জর[১]-এর উদ্ভব ও বিঘ্নবিনাশের জন্য ভরতের প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নাট্যমঞ্চ তৈরী করালেন। এই নাট্যমঞ্চ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেবতাদের নিয়োগ করা হল। বিঘ্নগণকে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড দ্বারা স্থাপন এবং নাট্যের স্বরূপ উল্লেখ ও রঙ্গদেবতার পূজার প্রয়োজন ব্যাখ্যার মধ্যে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ নাট্যগৃহের লক্ষণ ও পূজনের মধ্যে। 'প্রেক্ষাগৃহলক্ষণ' এ অধ্যায়ের নাম। নাট্য-গৃহ বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র রূপে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিষয়ক কথা—দেবতার জ্যেষ্ঠ, মানুষের মধ্যম ও অন্যান্য প্রকৃতির কনিষ্ঠ, ভূমিবিভাগ সূত্রস্বরূপ ও তার প্রসারণ, রঙ্গগৃহবিভাগ, মণ্ডপ নিবেশ, স্তম্ভস্থাপন, মত্তবারণী, রঙ্গশীর্ষ, দারু কর্ম, ভিত্তিকর্ম, চারপ্রকার গৃহের লক্ষণ এবং ত্র্যস্র গৃহ লক্ষণের মধ্যে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি।

১। জর্জর—শত্রুধ্বজ—জর্জতি শত্রূন্ তর্জয়তি।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

নাট্যগৃহের সূচিতা আনয়ন ও অধিবাসের কথা দিয়ে তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ। নাট্যাচার্যগণের যথাস্থানে স্থিতির জন্য দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা, জর্জর পূজা, রঙ্গপূজার শুদ্ধ সময় নির্ণয়, পূজার উপকরণ, দেবতাদের নিবেশ, পূজার প্রকার, হোমবিধি, নাট্যাচার্যের কুম্ভভেদ, রঙ্গক্ষেত্র প্রদীপ্ত করণ এবং রঙ্গপূজা করা ও না করার ফল কথনে একশো চারটি শ্লোকে এই অধ্যায়ের শেষ।

॥ **চতুর্থ** অধ্যায় (**নৃত্য বিষয়ক**) ॥

তিনশো একুশটি শ্লোক নিয়ে যে চতুর্থ অধ্যায়, তার প্রথমে তাণ্ডবলক্ষণ প্রকাশ উপলক্ষে 'অমৃতমন্থন' নাট্যে দশরূপের সমবকাররূপ প্রয়োগ কথা শোনানো হয়েছে। পরে 'ত্রিপুরদহ' নাট্যে দশরূপের আর একটি রূপ ডিম প্রয়োগ। দ্বিবিধ পূর্বরঙ্গ বত্রিশ রকম অঙ্গহার প্রসঙ্গে তণ্ডুর কথা, অঙ্গহারের প্রয়োগ, একশো আট প্রকার হস্তপদাদির প্রকরণ ও করণ প্রয়োগ অর্থাৎ নৃত্যের নিখুঁত আলোচনা এখানে রয়েছে। পরে বত্রিশ প্রকার অঙ্গহার, চাররকম, রেচক, পিণ্ডীবন্ধন, তাণ্ডবনৃত্য এবং নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঋষিদের প্রশ্ন, নৃত্য এবং গীতের প্রয়োগ বিধি উল্লেখ করে এই অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়েছে।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

পঞ্চম অধ্যায়-এ মুনিদের প্রশ্নের পর ভরত মোট দুশো পনেরটি শ্লোকে পূর্বরঙ্গ লক্ষণ-এর অঙ্গ ইত্যাদি, গীত সম্পর্কীয় সূচনা, গায়কের অনুপ্রবেশ। বাদ্যবৃত্তি, নান্দিপাঠ, রঙ্গদ্বারে বাগাঙ্গাভিনয়, বিদূষক, সূত্রধার, কলা, তাল, লয়, পূর্বরঙ্গ চিত্রের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। পাঁচ ধ্রুব যোজ্যা অর্থাৎ উত্থাপদনী—কালাকাল সমন্বিত অক্ষর, পরিবর্তা ত্রিলগ্না এবং ত্রিরতি, পঞ্চকলা-যুক্ত অপকৃষ্টা, তৃতীয় ষষ্ঠগুরু পাদত্রয়োদশ, চতুর্গণযুক্ত অড্ডিকা, তৃতীয় ষষ্ঠ নবম দশম গুরু অক্ষরযুক্ত বিক্ষিপ্তা এবং গীতিকার তাল-লয়-যতি পর্ব কিভাবে নাট্যের ক্ষেত্রে উপযোগীতা সুষ্ঠুভাবে দেখিয়েছেন, ভরত, এই অধ্যায়ে।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

তিরাশিটি শ্লোকে মুনিদের রস সম্পর্কীয় পাঁচটি প্রশ্ন দিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনা। রসভাব, ধর্মবৃত্তি প্রবৃত্তি, গানরঙ্গ, অভিনয়ের সূত্র কারিকার ব্যাখ্যা,

অষ্টরস, স্থায়ীভাব, সঞ্চারি ভাব, আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাব, চতুর্বিধ অভিনয়, লোকধর্ম-নাট-ধর্ম, চার প্রকার বৃত্তি, চার প্রবৃত্তি, দু রকম সিদ্ধি, দু রকম স্বর, চতুর্বিধ আতোদ্য[১], পাঁচ রকম গান, তিন রকম রঙ্গ, নাট্যরসের ব্যাখ্যা, রস এবং ভাবের সম্পর্ক, রসের বর্ণ, বিভিন্ন রসের দেবতা, শৃঙ্গার রস, হাস্য রস, করুণ রস, রৌদ্র রস, বীর রস, ভয়ানক রস, বীভৎস রস, অদ্ভুত রস, আবার শৃঙ্গার, করুণ, বীর ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভূত রসের তিন রকম প্রকাশ বলে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনেছেন।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

একশো চব্বিশটি শ্লোকে ভাব-ব্যঞ্জনার কথা দিয়ে সপ্তম অধ্যায়ের সূচনা। ভাব বিভাব-অনুভাব, বিভাব অনুভাবানুসারে লোকস্বভাব, ভাবভেদ, স্থায়ীভাব, রতি-হাস-শোক-ক্রোধ-উৎসাহ-ভয়-জুগুপ্সা-বিস্ময়ভাব, ব্যাভিচারী ভাব, নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ক্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মায় (মূর্চ্ছাযোগ) সুপ্ত, বিরোধ অমর্ষ, অবহিত্থ (আকার গুপ্তি), উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণত্রাস, বিতর্ক, সাত্ত্বিক ভেদে, স্বেদ-স্তম্ভ-কম্পন, অশ্রম, বিবর্ণ, রোমাঞ্চ, স্বরাপদ, প্রলয়, এই সবের কর্ম, ভাব রচনায় যোগ সম্বন্ধে ধারণার সুযোগ দিয়ে এই অধ্যায় শেষ হয়েছে।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

প্রত্যাভিনয় সম্পর্কে মুনিদের প্রশ্ন এবং ভরতের উত্তর নিয়ে অষ্টম অধ্যায় আরম্ভ। অভিনয় শব্দের চার প্রকার অভিনয়, ত্রিবিধ অঙ্গাভিনয়, অভিনয়ের বস্তু সম্পর্কে আলোচনার পর, মস্তকের কাজ অকল্পন, কম্পন, ধূত-বিধূত, পরিবাহিত—উদ্বাহিত, অবধূত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত, পরিলোলিত দৃষ্টির লক্ষণ, রসদৃষ্টি, স্থায়ীভাবের দৃষ্টি, বিভিন্ন দৃষ্টির নাম, শৃঙ্গার দৃষ্টি, ভয়ানক দৃষ্টি, হাস্যদৃষ্টি, করুণ দৃষ্টি, অদ্ভুত দৃষ্টি, রৌদ্র দৃষ্টি, বীরদৃষ্টি, বীভৎস দৃষ্টি, রতি দৃষ্টি, হাস দৃষ্টি, শোক দৃষ্টি, ক্রোধ দৃষ্টি, উৎসাহ দৃষ্টি, ভয় দৃষ্টি, জুগপ্সা দৃষ্টি, বিস্ময় দৃষ্টি, সঞ্চারি ভাবের দৃষ্টি, শূণ্য, মলিন, শ্রান্ত, লজ্জান্বিত, গ্লানি, শংকিতা,

১। বীণাদি বাদ্যকে **তত**, মুরজাদি বাদ্যকে **আনদ্ধ**, বাঁশী ইত্যাদি বাদ্যকে **শুষির**, কাংস্যতালাদি বাদ্যকে **ঘন** বলে। আতোদ্য অর্থে এই চার প্রকার বাদ্য।

বিপন্না, সুকুমার, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, জিহ্মা, ললিতা, বিতর্কিতা, অর্ধমুকুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্লুতা, বিকোশা, ত্রস্তা, মদিরা, দৃষ্টির রস প্রয়োগ দৃষ্টিকর্মের নাম, তার লক্ষণ, দৃষ্টি রসভাবের প্রয়োগ, দর্শন প্রকার, তারা পুষ্ট কর্মের নাম, যমের বিনিয়োগ, ঐ কর্মের নাম, রসভাবের প্রয়োজন, নাসিকার কর্ম, গণ্ডের কর্ম দু রকম ভেদ, গণ্ডের লক্ষণ, ওষ্ঠের লক্ষণ, ভাব ও তার প্রয়োগ, চিবুক কর্মের লক্ষণ ও প্রয়োগ, আস্যজানিয় কর্ম, মুখ রাগ, ও তার ভেদ, গ্রীবার কর্মোল্লেখ করে ভরত একশো বাহাত্তরটি শ্লোকে এই অধ্যায় শেষ করেছেন।

॥ **নবম অধ্যায়** ॥

দুশো সাতটি শ্লোকে অঙ্গাভিনয় প্রসঙ্গ দিয়ে নবম অধ্যায়ের যাত্রা। অসংযুক্ত হস্তের নাম, সংযুক্ত হস্ত, নৃত্য হস্ত, চব্বিশ রকম অসংযুক্ত, হস্ত, পতাকা হস্তের লক্ষণ ও কাজ, ত্রিপতাক, কর্তরী মুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর কপিথ, কটকা মুখ, সূচী মুখ, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষক, মৃগশীর্ষক, লাঙ্গুল, উৎপলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সংদংশ, মুকুল, উর্ণনাভ, তাম্রচূড়, তের রকম সংযুক্ত হস্ত—অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, কটকা, বর্ধমান, উৎসঙ্গ,নিষদ, দোল, পুষ্পপুট, মকর, গজদন্ত, অবহিত্থ, হস্তাভিনয় বিধি, হস্তের কর্ম, ত্রিবিধ হস্তপ্রচার, জ্যেষ্ঠ মধ্যমা অধম হস্তপ্রচার বিধি, পাঁচ প্রকার হস্ত প্রচার, নৃত্তরসাশ্রয়া হস্ত—চতুরস্র, উদ্‌বৃত্ত, তলমুখ, স্বস্তিক, বিপ্রকীর্ণ, অরাল কটক মুখ, আবিদ্ধ বক্র, সূচীমুখ, রেচিত, অর্ধরেচিত, উত্তানবাঞ্ছিত, পল্লব, নিতম্ব, কেশবন্ধ, লতাখ্য, করিহস্ত, পক্ষ প্রদ্যোতক, গরুরপক্ষ, হংসপক্ষ, উর্দ্ধমণ্ডলী, পার্শ্ব, উৎরা-মণ্ডলী, উরঃপার্শার্ধমণ্ডলী, মুষ্টিক, স্বস্তিক, নলিনী পদ্মকোশ, লালিত, বলিত, হস্তের চাররকম করণ, আবেষ্টিত, উত্তেজিত, ব্যবর্তিত, পরিবর্তিত এবং দশবিধ বাহু প্রকারের কথা বলে এ অধ্যায়ের শেষ।

॥ **দশম অধ্যায়** ॥

শরীর-অভিনয় নিয়ে দশম অধ্যায়ের পদ চারণা পঞ্চান্নটি শ্লোকে। পাঁচরকম উর-আভুগ্ন নিভুগ্ন, প্রকম্পিত, উদ্‌বাহিত, সম, পাঁচরকম পার্শ্ব—নত, উন্নত প্রসারিত, বিরাতত, অপসৃত, পার্শ্বের কাজ, ত্রিবিধ জঠর, জঠরের কর্ম, পাঁচ প্রকার কটি—ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, প্রকম্পিতা, উদ্বাহিতা, কটিকর্মের নিয়োগ, উরুর পাঁচ রকম কাজ—কম্পন, বলন, স্তম্ভন, উর্ধতন, নিবর্তন, উরু কর্মের

রসভাবারোপ, জঙ্ঘের পাঁচ রকম কাজ, আবর্তিত, নত, ক্ষিপ্ত, উদ্বাহিত, পরিবৃত্ত, জঙ্ঘাকর্মের রসভাবারোপ পায়ের পাঁচ প্রকার অবস্থা উদ্ঘাটিত, সম, অগ্রতাল সঞ্চার, কুঞ্চিত, উৎক্ষিপ্ত, পার্ষিলক্ষণ, সূচীপদের লক্ষণ, পদচারী কথা শেষে এ অধ্যায়ের অবসান।

॥ **একাদশ অধ্যায়** ॥

পাদ-জংঘা-উরু-কটি-সমান করণের চেষ্টার নাম 'চারীবিধান'। একশোটি শ্লোক নিয়ে একাদশ অধ্যায় এই বিষয় আলোচনা করেছে। চার লক্ষণ, ব্যায়াম, চার করণ, খণ্ড মণ্ডল এবং এর প্রয়োজনীয়তা, ভূমির চার নাম, আকাশের চার নাম, ষোড়শ ভূমিশ্চার্য—সমপাদাচার, বার্তা, শকটা, অধ্যধিকা, চাষগতি, বাচ্যবাচা, এড়কাক্রীড়িতা, বদ্ধ, উরুদ্বৃতা, উৎসন্দিতা, জনিতা, স্যন্দিতা, আস্যন্দিতা, মাসাৎসায়িতমণ্ডলা, মণ্ডলা, আকাশিকাশ্চর্য্য, অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, উর্ধ্বজানু, দোলাপাদা, উৎক্ষিপ্তা আবিদ্ধা উদ্বৃতা, বিদ্যুৎভ্রান্তা, অলাতা, ভুজঙ্গত্রাসিতা, হরিণপ্লুতা, দন্তপাদা, ভ্রমরী, চারীবিধি, ষট্স্থান, বৈষ্ণবস্থান, এর কর্মবিনিয়োগ—সম্পাদ, বৈশাখি, মণ্ডল, আলীর, স্থান, প্রত্যালীর, শাস্ত্রমোক্ষণে চার ন্যায়, ন্যায় শব্দের নিসক্তি (নিশ্চয় ভক্তি) ভারত, সাত্বত, গণ্য, কৌশিক, নাট্যে এই শাস্ত্রের প্রয়োগবিবিধ, সৌষ্ঠবাঙ্গ লক্ষণ, চতুরস্র অঙ্গ, ধনুপশ্চতু, বিধ করণ, ব্যায়াম বিধি, আলোচনায় এই অধ্যায়ের সমাপ্তি।

॥ **দ্বাদশ অধ্যায়** ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ে সাতান্নটি শ্লোকে মণ্ডল বিধান বলা হয়েছে। আকাশগামিনী মণ্ডল—অতিক্রান্ত, বিচিত্র, ললিতসঞ্চর, সূচীবিদ্ধ, দণ্ডপাদ, বিহৃত, আলাত, বামবন্ধ, লালিত, ক্রান্ত, ভূমিমণ্ডল, ভ্রমর, অস্ফন্দিত, আবর্ত, সমোৎসারিত, এওকাক্রাড়িত, সকটস্য অধম, পিষ্টকুট, চাষগত, যম, মণ্ডল প্রয়োগবিধিতে এ অধ্যায়ের শেষ।

॥ **ত্রয়োদশ অধ্যায়** ॥

দুশো ছাব্বিশটি শ্লোকে গতি প্রচারের আলোচনাই ত্রয়োদশ অধ্যায়। উপবহুনান্তর করণীয় প্রকার, পায়ের উৎক্ষেপে কলাতাল লয় বিধি, স্বচ্ছন্দ গমনে গতি প্রচারের প্রয়োগ, তিনপ্রকৃতি, অবস্থান্তরে উত্তম-অধম প্রকৃতির গতিপ্রকার, শৃঙ্গারে গতিপ্রকার, রৌদ্রে, বীভৎসে, বীরে হাস্যে কারুণ্যে,

শীতাভিনয়ে গতি, ভয়ানকে গতিপ্রকার, বনিজ সচিবানের গতি, উত্তম লিপির গতি, পাশুপত্যের গতি, স্যন্দন গতি, আকাশ গমনে গতি, আকাশদপ্রেশ্যতো গতি, আরোহণ—অবতরণের গতি, জাল অবতরণের গতি, নৌকায় গতি, অশ্বযানে গতি, বনগায় গতি, বিটর গতি, কাঞ্চু কী, অবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, কৃশ, ব্যাধি প্রস্তাদি, দূরাধরাণের গতি, স্থূল-মত্ত-উন্মত্ত-খঞ্জ-পঙ্গু-বামন-বিদূষক নীচ-ম্লেচ্ছ-বিহগ্রাদি সিংহর গতি, স্থানবিধি, যুবতী নারীর গতি, স্থবীয়সী-প্রেষ্যা-অর্ধনারীর গতি, স্ত্রীর কাপুরুষের ন্যায় গতি, সপুংসকের গতি, অভিনয়ে প্রকৃতি বিপর্যয়, স্ত্রীপুরুষের অভিনয় বিপর্যয়, স্ত্রীলোকের পুরুষের অভিনয়, পুরুষের স্ত্রী অভিনয়, বিজাতীয় নারীর গতি, অনিয়ে সমপাদ প্রয়োগ, এবং স্ত্রী পুরুষের আসন বিধির কথা অন্তে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।

॥ চতুর্দশ অধ্যায় ॥

চতুর্দশ অধ্যায়ে তিরাশীটি শ্লোকে প্রবৃত্তি ধর্মের কথা রয়েছে। ভারতবর্ষের বক্ষবিভাগ ভারতে চাররকম প্রবৃত্তি—দাক্ষিণাত্যের, অবস্তির, ঔড্রভাগের, পাঞ্চালির, প্রবৃত্তির বিবিধ প্রয়োগ, প্রয়োগ বিধি, আবিদ্ধ, দিশাদি বিভাগ, নাট্যে সেই অঙ্গের নামানুরূপ, দ্বিবিধধর্ম, লোকধর্ম, নাট্যধর্ম কথায়—এই অধ্যায় শেষ।

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাচিকাভিনয়ে ছন্দো বিভাগ প্রসঙ্গে একশো উনিশটি শ্লোক রয়েছে। কথার প্রাধান্য, বাচিকাভিনয়, দ্বিবিধ পাঠ, সংস্কৃত পাঠের অঙ্গ, নিবন্ধের দ্বিবিধ রূপ, চূর্ণ- নিবদ্ধ, ছন্দ, তার বিভাগ, নৃত্ত, ছন্দ ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ, অক্ষরক্রমে বৃত্তের বিভাগ, ছন্দের গতিবিধি, সম্পদের লক্ষণ, বিদ্যুৎ, স্বরাট, ছন্দের প্রস্তাব সংখ্যা, আটগণা, যতির লঘুগুরু বিভাগ, বৃত্তের তিন গণ, গায়ত্রাদি বৃত্তের অক্ষর নিয়ম, প্রস্তাব বিধি, নষ্ট উদ্দিষ্ট ও ছন্দোবিচিত্রই—এই অধ্যায়ের শেষ কথা।

॥ ষোড়শ অধ্যায় ॥

ষোড়শ অধ্যায়—বৃত্তানি খোদা হযনানি। প্রধানত তনু মধ্যা, মকরক শীর্ষা, মালিনী, উদ্ধতা, ভ্রমর মালিকা, সিংহলীলা, মত্তচেষ্টিত, বিদ্যুল্লিখা,

মধুকরা, উৎপল মালিনী, শিখিসায়িনী, দোধক, ঘোটক, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্র বজ্রা, রথোদ্ধতা, স্বাগতা, শালিনী, তোটক, কুমুদনিভা, চন্দ্রলেখা, প্রমিতাক্ষর বংশস্থ, হরিণপ্লুতা কাসমত্তা, অপ্রেমেয়া, পদ্মিনী, পুষ্টবৃত্ত, প্রভাবতী, প্রহর্ষিণী, মত্তময়ূরক বসন্ত তিলকা, অশংবাধা, শয়ভা, নান্দীমুখী, গজবিলসিত, প্রবর ললিত, শিখরিণী, বৃষভচেষ্টিত, মেঘমালা, ক্রৌঞ্চপদী, ভুজঙ্গ বিজৃম্ভিত, দণ্ডক, বিষমাধনমানিবৃত্ত, পথ্যাবৃত্ত, বিপরীতা, বিপুলা, বক্তত্র, পথ্যা, উদগতা, সর্ববিষমা, সেতুমতী, অপর যক্ত্র, পুষ্পিতাগ্রা, বাসবালিকা, পঞ্চবিধ আর্য্যা, যতিমাত্রা বিকল্পন, পথ্যা, বিপুলা, মুখচপলা, সর্বচপলা, প্রস্তরাদি-বিধি, নিয়ে একশো উন্‌সত্তরটি শ্লোকে ভরত এই অধ্যায়ের পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন।

॥ **সপ্তদশ অধ্যায়** ॥

একশো তেইশটি শ্লোকে বাগাভিনয় নিয়ে আলোচনাই সপ্তদশ অধ্যায়ের বিষয়। ছত্রিশটি লক্ষণ—ভূষণ, অক্ষর সংঘাত, শোভা, উদাহরণ, হেতু সংশয়, দৃষ্টান্ত, প্রাপ্তি, অভিপ্রায়, নিদর্শন, নিরুক্ত, সিদ্ধি, বিশেষণ, গুণাতিপাত, অতিশয়, তুল্যতর্ক, পদোচ্চয়, দ্বিষ্টম্, উপদিষ্ট, বিচার, বিপর্যয়, ধ্বংস, অনুনয়, মালা দাক্ষিণ্য, গাইন, অর্থাপত্তি, প্রসিদ্ধি, পৃচ্ছা, সরূপ্য, মনোরথ, ক্ষোভ, গুণকীর্তন, সিদ্ধি, প্রিয়োক্তি, চার অলংকার—উপমা, পঞ্চবিধ উপমা, প্রশংসা নিন্দা, কল্পিতা, সদৃশী, কিঞ্চিৎ সদৃশী, রূপক, দীপক, যমক, যমকের ভেদ, পাদান্ত যমক, কাঞ্চী, সমুদ্‌গত। বিক্রান্তা, চক্রবাক, সন্দষ্ট, পাদাদি, আম্রেড়িত যথন, চতুর্থ্যবসিত, মালা যমক, কাব্যদোষ, তার দশভেদ,—গূঢ়ার্থ, অর্থান্তর, অর্থহীন, ভিন্নার্থ, একার্থ, অভিল্লুতার্থ. অভিপ্লুতার্থ, ন্যায়াদাপত, বিষম, বিসন্ধি, শব্দচ্যুত, গুণের ভেদ, শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, ওজঃ, সৌকুমার্য্য, অর্থব্যক্তি, উদাত্ত, কান্তি. অলংকারাদির রসের বিনিয়োগ, হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত রসের প্রয়োগ, নাট্যে সমুচিত শব্দ, প্রয়োগ আলোচনায়, এই অধ্যায়ের সমাপ্তি।

॥ **অষ্টাদশ অধ্যায়** ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় উনপঞ্চাশটি শ্লোকে ভাষাবিধানের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। প্রথমে প্রাকৃত পাঠের লক্ষণ, প্রাকৃত পাঠ্যের তিনবিধি, সমান শব্দ, বিভ্রষ্ট, সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃতে রূপান্তর নিয়মের উদাহরণ, চতুর্বিধ দেশভাষা, অতি ভাষা, আর্যভাষা, দুই রকম জাতি ভাষা, আভ্যন্তরী ভাষা, জাতিভাষা

শ্রয়ের দুই রকম পাঠ, নায়কের সংস্কৃত পাঠ, কারণব্যপদেশে প্রাকৃত, উত্তমের কখনো প্রাকৃত পাঠ, শ্রত্মনাদির প্রাকৃত পাঠ, নারীর প্রাকৃত পাঠ, শ্রোত্রিয়ের সংস্কৃত পাঠ, রাজার সংস্কৃত পাঠ, কার্যের শুভাশুভ লক্ষণ, নৃপপত্নীর সংস্কৃত পাঠ, বৈশ্যের সংস্কৃত পাঠ, অপ্‌সরার পাঠ, বর্বর কিরাতদের পাঠে ভাষার নিয়ম, সপ্তবিধ ভাষা শবরাদির পাঠ্য বিভাষাবিধি, নাট্যে মাগধী প্রয়োগ, অর্ধমাগধী, প্রাচ্যো, শৌরসেনী, দাক্ষিণ্যাত্যা, বাহ্লীক ভাষা প্রয়োগ, শকার ভাষা, শবর ভাষা, বিভিন্ন দেশবাসীর পাঠ্যে ভাষা বিধান এবং নিয়ম আলোচনায় এই অধ্যায়ে শেষ।

॥ **ঊনবিংশ অধ্যায়** ॥

কাকু স্বরব্যঞ্জনা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে মোট আটাত্তরটি শ্লোকের মধ্যে। নাট্যে পাত্রের সম্ভাষণবিধি, পাত্রের নামবিধান বিধি, পাঠ্যগুণ, সপ্তস্বরে রসের নিয়োগ, তিন স্থান, তার পাঠ্যে সম্প্রয়োগ, চারবর্ণ, দ্বিবিধ কাকু, ষড় অলঙ্কারে রসের বিনিয়োগ, ষড় অঙ্গের রসগত প্রয়োগ, বিরামভেদে অভিনয়ে সমুপ্যযোগ এবং স্বর অলঙ্কারাশ্রিত পাঠের নিখুঁত আলোচনা রয়েছে ঊনবিংশ অধ্যায়ে।

॥ **বিংশ অধ্যায়** ॥

বিংশ অধ্যায়ে দশরূপবিধানের আলোচনা করা হয়েছে একশো চুয়াল্লটি শ্লোকে। রূপকের নাম, কাব্যের মাতৃকাবৃত্তি, নাটক, অঙ্কের কার্য, প্রবেশক, বিষ্কম্ভক, অন্য অবধানযোগ্য কার্য, প্রকরণ. নাটিকা, সমবকার, তিন বিদ্রব, তিন কপট, ত্রিবিধ শৃঙ্গার—ধর্ম শৃঙ্গার, অর্থ-শৃঙ্গার, কাম-শৃঙ্গার, সমবকারের বৃত্ত, ইহা মৃগা, ডিম, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, এবং উহার দ্বিবিধ রূপ, শুদ্ধ, মিশ্র, ভাণ, বীথী, তার লক্ষণ, তার ত্রয়োদশ অঙ্গ—উদ্ঘাত্যক, অবলগিত, আস্যন্দিত, সথ্যপ্রলাপ, প্রপঞ্চ, মালিকা, অতিবল, ছল, দৃষ্টবৎ, ব্যাহার, মৃদয়, ত্রিগত, গণ্ড, নাস্যের অঙ্গ, তার প্রয়োগ, লাস্যের অঙ্গের নাম, গেয়পদ, স্থিতিপাঠ্য, আসীন, পুষ্পপঞ্জিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিমূঢ়ক, সৈন্ধব, দ্বিমূঢ়ক, উত্তমোত্ত, বিচিত্রপদ, উক্তপ্রত্যুক্ত এবং ভাবিত আলোচনায় এই অধ্যায়ের সমাপ্তি।

॥ **একবিংশ অধ্যায়** ॥

একবিংশ অধ্যায়ে একশো তেত্রিশটি শ্লোকে সন্ধির অঙ্গবিকল্প বিষয়ের আলোচনা। পঞ্চসন্ধি ভাগের ইতিবৃত্ত। দ্বিবিধ ইতিবৃত্ত, আধিকারিক,

প্রাসঙ্গিক, পঞ্চাবস্থা, আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তিসম্ভব, ফলপ্রাপ্তি, কলযোগ, পঞ্চসন্ধি ব্যবস্থা, অর্থপ্রকৃতি, বীজ, বিনয়, বিন্দু পতাকা প্রকরী-কার্য এর ব্যবস্থা, পতাকাস্থান, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চসন্ধি,—মুখ, প্রতিমুখ গর্ভ, বিমর্শ, নির্বহন, দশরূপকের সন্ধি ব্যবস্থা, সন্ধির অন্তর, সন্ধির অঙ্গের প্রয়োজন, মুখের অঙ্গ, প্রতিমুখের অঙ্গ, গর্ভের অঙ্গ, বিমর্শর অঙ্গ, নির্বহনের অঙ্গ, তার লক্ষণ, মুখ উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাবর্তন, বিধান, পরিভাবনা, উদ্‌ভেদ, করণ, ভেদ, প্রতিমুখ—সমীহা, পরিসর্প, বিধৃত, তাপস, নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রশমন, বিরোধ, উপসম, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস, বর্ণসংহার, গর্ভ—অভূতাহরণ, মার্গ, বিতর্ক, উদাহরণ ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, প্রার্থনা, আক্ষিপ্ত, তোটক, অধিবল, উদ্বেগ, বিদ্রব, অবমর্শ, অপবাদ, সংকট, বিদ্রব শক্তি, ব্যবসায় প্রসঙ্গ, দ্যুতি, খেদ, নিষেধ, বিরোধন, আদান, ছাদম প্ররোচনা, সংহার-সন্ধি, বিরোধ, প্রথম, নির্ণয়, পরিভাষণ, দ্যুতি, প্রসাদ, আনন্দ, শখ, উপগুহন, ভাষণ, পূর্ববাক্য, কাব্য সংহার, প্রশস্তি, অঙ্গে প্রয়োগ প্রকার,—পাঁচ অর্থোপক্ষেপ—বিষ্কম্ভক, চূলিক, প্রবেশক, অঙ্কাবতার, অঙ্কমুখ, এবং নাটকের তদপেক্ষিত গুণ আলোচনায় এর সমাপ্তি।

॥ দ্বাবিংশ অধ্যায় ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বৃত্তিবিকল্প। উনসত্তরটি শ্লোকে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। বৃত্তির সমুত্থান, ভারতীয় নির্মিতি, সত্বনির্মিতি, কৈশিক—নির্মাণ, আরভট নির্মাণ, ন্যায়, বিভিন্ন বেদ থেকে বৃত্তির উদ্ভব, ভারতী, চারপ্রকার ভারতী. প্ররোচন, আমুখ, পাঁচ আমুখ অঙ্গ, কাথাদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবৃত্তক, আমুখ বিধান, সাত্বতী, চার প্রকার সাত্বতী, উত্থাপক, পরিবর্ত, সংলাপক, সংঘাতক, কৈশিকী, চার প্রকার কৈশিকী, নর্ম, নর্মস্ফূর্জ, নর্মস্ফাট, নর্মগর্ভ, আরভটী, চার প্রকার আরভটী,—সংক্ষিপ্তক, অবঘাত, বস্তুথাপন, সংকেট, বৃত্তির রসের নিয়োগ এবং স্থায়ী রসের কথায় এর সমাপ্তি।

॥ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে দুশো পনেরোটি শ্লোকে আহার্য্যাভিনয় নিয়ে আলোচনা। আহার্য্যাভিনয়ের লক্ষণ, নেপথ্য, চার প্রকার নেপথ্য, তিন রকম

পুস্ত, সন্ধি, ব্যজিম্ চেষ্টিম্ পুস্ত, অলঙ্কার, পঙ্কবিধ, মাল্য, চাররকম আভরণ—আবেদ্ধ্য বন্ধনীয়, প্রক্ষেপ্য, আরোপ্য, পুরুষের ভূষণ বিকল্প, যোষির্তের ভূষণ বিকল্প, নাট্যে যথাভাব-রস-ভূষণের প্রয়োগ, নাট্যে বহুভূষণ নিষেধ, দিব্যাঙ্গনার ভূষণাবিধি, মানুষের ভূষণ প্রকার, ভূষণের দেশাবস্থানুরূপ্য, বর্ণবিধি, যর্তনা, যেষ, সমাশ্রয়ো প্রভাব, দেবতা এবং প্রণীর উল্লেখ, দেবাদির অঙ্গরচনা, মনুষ্যের বর্ণবিধি, মনুষ্যের শ্মশ্রুকর্ম, বেষবিধি, পঞ্চবিধমাল্য, তিনপ্রকার আচ্ছাদন, ত্রিবিধ বেষ, শুদ্ধ, চিত্র, শুদ্ধোবস্ত্রবিধি, মলিন, পুরুষ-স্ত্রীর বেষবিধি, মানুষের মুকুটারণবিধি, শিবের প্রসাধন প্রকার, সঞ্জীব, নাট্যে প্রহরণের বিধি। নাট্যে প্রহরণের নাম ও তার লক্ষণ, জর্জরের লক্ষণ ও তার স্থাপন বিধি, দণ্ডকাষ্ঠের লক্ষণ, নাট্যে পটী প্রয়োগ, পটিচ্ছেদ্যবিধি, মুকুট প্রয়োগ, উপকরণ, লোকধর্মী, নাট্যধর্মী, লোহাদীনাথ, উপকরণ নিষেধ, নাট্যোপকরণের নাম, উপকরণের যন্ত্রবিধি, প্রহরণবিধি, মৃণ্ময় উপকরণ, লাক্ষোপ-করণ, অন্যান্য প্রকরণ, উপকরণের মুকুটবিধি, আভরণবিধি, নাট্যে মন্ত্রবিধি।

॥ চতুর্বিংশ অধ্যায় ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় তিনশো কুড়িটি শ্লোকে আলোচনা দেখা যায়। সামান্যাভিনয়ের সত্যের প্রাধান্য, নাট্যাশ্রয়ী অলঙ্কার, সত্ত্বের ভেদ, তার উৎপত্তি, ভাব, হেলা, স্ত্রীস্বভাবের অলঙ্কার-লীলা, বিলাপ, বিচ্ছিতি, বিভ্রম, কিল-কিঞ্চিত, মোটায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, লালিত, বিকৃত. অয়ত্নজা অলঙ্কার-শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, ধৈর্য্য, প্রাগল্ভ্য, ঔদার্য, পৌরুষের সত্ত্বভেদ-শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য, লালিত, ঔদার্য, তেজ, শরীর অভিনয়-বাক্য, সূচ, অঙ্কুর, শাখা, নাট্যায়িত, নিবৃত্ত্যঙ্কুর, অভিনয়াত্মক অলঙ্কার-আলাপ, প্রলাপ, বিলাপ অনুলাপ, সংলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, নির্দেশ, ব্যপদেশ, উপদেশ এদের সপ্তপ্রকার সামান্যাভিনয়—আভ্যন্তর নাট্য, বাহ্য অভ্যন্তর শব্দের অর্থ, তার প্রয়োগ, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চপ্রকার, অভিনয়, শব্দের, স্পর্শের, রূপের রসে, গন্ধের, মনে প্রাধান্য, মনের ত্রিবিধভাব, ইষ্টাভিনয়, অনিষ্টাভিনয়, মধ্যমাভিনয়, আত্মস্থ, পরস্থ, কাম, কামভেদ, শৃঙ্গার, স্ত্রীর সুখ মূলত্ব, নারীর শীল, দেবের শীল, অসুরশীল, গন্ধর্ব্য, রাক্ষস, নাগ, যক্ষ, ব্যাস, মানুষ, বানর, হস্তী, মৃগ, মীন, উষ্ট্র, মকর, খর, শূকর, হয়, মহিষ, অদ্ধ, অশ্বত্থ গো প্রভৃতির শীল, উপচার, প্রকার,

দ্বিবিধ কামোপকার, রসোপভোগ, উপচারবিধি, কামসমুৎপত্তি, কাম ভাবের অঙ্গ, কামের দশাবস্থা,—অভিলাষ, চিন্তা অনুস্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, প্রসাদ, ব্যাধি জড়তা, মরণ, প্রচ্ছন্নকামীর বিপ্রলম্ভ সমুদ্ভয় ভাব, রাজোপচারের বিধি, অষ্টনায়িকা, বাসক সজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা স্বাধীনভর্তৃকা, কলহন্তরিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকা, অভিসারিকা, এদের কামতন্ত্র, অন্তঃপুর সম্বন্ধে-শৃঙ্গারস সংযুক্ত বিধি, নারীর প্রিয়বাচ্য বচন, দ্বিব্যাঙ্গনার বিধিতে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি।

।। পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—বাহ্যো-পচার—ঊনাশীটি শ্লোক। কৈশিক, কৈশিকের গুণ, দূতী, দূতীভেদ, দূতীগুণ, দূতীকর্ম, মদনাতুরা, নারী, অনুরক্তা, বিরক্তা, হৃদয় গ্রহণোপায়, স্ত্রী-পুরুষের বিরক্তির কারণ, নারীর ভাব গ্রাহিণী কর্ম, নারীর তিন প্রকৃতি,—উত্তম, মধ্যম, অধম। চার প্রকার যৌবন লম্ভা, প্রথম যৌবন, দ্বিতীয় যৌবন, তৃতীয় যৌবন, চতুর্থ যৌবন, প্রথম যৌবন লম্ভ, দ্বিতীয় যৌবন লম্ভ, তৃতীয় যৌবন লম্ভ, চতুর্থ যৌবন লম্ভ, পুরুষের পঞ্চবিধি প্রয়োগ—চতুর, জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, অধম এবং সংপ্রবৃদ্ধ, কামতন্ত্রানুকূল্য, নারীপুরুষের প্রবৃত্তি, স্ত্রীলোকের কর্তব্যের নাম—সাম দণ্ড, ভেদ প্রদান, নারীর সামাদির নাম উপযোগ, নারীর মুখরাগাবির প্রকৃতি পরিচয়, অর্থের জন্য বারবণিতার পুরুষের প্রতি ব্যবহার উল্লেখে এ অধ্যায় শেষ।

।। ষড়বিংশ অধ্যায় ।।

ষড়বিংশ অধ্যায়ে চিত্রাভিনয়ের আলোচনায় একশো বাইশটি শ্লোক। চিত্রাভিনয়, প্রভাতাদিসাম অভিনয়, ভূমিস্থ অভিনয়, চন্দ্রজ্যোৎস্নাদি, সূর্য্যাদি, মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন সূর্য্য, সৌম্য, তীক্ষ্ণ রন্ধ্রদামনা, সর্বার্থগ্রহণাভিনয়, বিদ্যুৎ উৎকাদি অভিনয় অনিষ্টে অভিনয়, উষ্ণবায়ু ইত্যাদি, সিংহাদি. প্রতোদগ্রহণ অভিনয়, ধ্বজ, স্মৃতি, উচ্ছ্রেয়, শ্রুতবাক্যাদি, শারদ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, প্রাবৃষ, বর্ষারাত্রি ঋতু, যথারস ঋতুর নাট্যে প্রয়োগ, ভাবাভিনয়—ভাব, বিভাব, অনুভাব, স্ত্রী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় প্রকার হর্ষাভিনয়, ক্রোধাভিনয়, ঈর্ষ্যাভিনয়, দুঃখের, স্ত্রীর দুঃখের, পুরুষের ভয়ের, স্ত্রীর ভয়ের, স্ত্রীর মদ, ভয়ে প্রয়োগ, শুকাদি অভিনয় খয়োষ্ট্রাদি, ভূতাদি, দেবাদি, নম্রাভিবাদন, দেবতা—দিনামাভিবাদন,

মহাজনাদি, পর্বতাদি, সাগরাদি, শৌর্যাদি, দোলা, আকাশ রচনাদি নাম, আকাশ বচন, আত্মগত, অপবায়িতক, জনান্তিক, কার্যনিবেদ্য, পুনরুক্ত, অপবায়িত, অভিনয়বিধি, নাট্যে পুনরুক্ত প্রয়োগ, প্রকৃত্য অনুরূপ ভাবাভিনয়, স্বপ্নায়িতে ভাবাভিনয়, স্বপ্নায়িতে পাঠ্য, মরণাভিনয়, বিষবেগের প্রকার, তার অভিনয়বিধি, অভিনয়ে পাত্রের ভাবের অনুকূলত্ব, নাট্যের ত্রিবিধ প্রমাণ, প্রমানানুরূপ নাট্যের অনুকূলত্ব, নাট্যের ত্রিবিধ প্রমাণ, প্রমানানুরূপ নাট্যের ব্যাস্থিতির আলোচনায় এর সমাপ্তি।

।। সপ্তবিংশ অধ্যায় ।।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—সিদ্ধিব্যঞ্জন প্রসঙ্গে একশো দুইটি শ্লোক। সিদ্ধির লক্ষণ, দুই রকম সিদ্ধি, বাঙময়ী, শরীরী-মানুষী-দৈবিকি সিদ্ধি, চাররকম মাত-দৈবিক-আত্ম-সম্ভূত-পর প্রযুক্ত-ঔৎপত্তিক, অন্যমতি, কাব্যের সাতস্থান, ঘাতজা, অনিষ্ঠা, মাতো স্থান বিশেষ, ঘাতের অন্যপ্রকার, নাটকে গম্ভীরর্থে শব্দের যোজনা, প্রেক্ষা, কেরগুণ, প্রাশ্নিকার ভেদ, প্রাশ্নিকার প্রয়োজন, সংঘর্ষ, প্রেক্ষকের আসনবিধি, পতাকাদান, সম, অঙ্গমাধুর্য, নাট্যের সময়. পূর্বাহ্নে প্রয়োজনীয় নাট্য, অপরাহ্নে প্রদোষে—প্রভাতে নাট্যপ্রয়োগে নিষিদ্ধকাল, তিনত্রুণ, পাত্রগত নাট্যবিধি, প্রয়োগ সমৃদ্ধি অলঙ্কার কথায় এই অধ্যায়ের সমাপ্তি।

।। অষ্টবিংশ অধ্যায় ।।

একশো একত্রিশটি শ্লোকে আতোদ্যবিধির আলোচনা হয়েছে অষ্টবিংশ অধ্যায়ে। আতোদ্যের চার বিধি, লক্ষণ, তার ত্রিবিধ প্রয়োগ, তার বিন্যাস, নাট্যযোগে, সঙ্গীতের লতাচক্র, প্রতি সত্ব, গান্ধর্ব, গান্ধর্বের যোনী, গান্ধর্বের তিনবিধি, শ্রুতির গ্রাম মূর্ছনা এবং এর জাতির আলোচনায় এর শেষ।

।। ঊনত্রিংশ অধ্যায় ।।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে আতোদ্যবিধানের আলোচনা রয়েছে মোট ঊনপঞ্চাশটি শ্লোকে। রস সংশ্রয়ের জাতি, বাদ্যপ্রয়োগ বিহিত স্বর, বর্ণলঙ্কার, গীতালঙ্কার-এর বিধি, বর্ণবিহীন অলঙ্কার, চারধাতু, তিনবৃত্ত, বেণুবাদ্যের বিধি, তত্ত্ব-অনুগত-তথ-এর প্রয়োগ, বিপঞ্চীবাদ্যের ভেদরূপ, প্রতিকৃতি, প্রতিভেদ, রূপশেষ, গুথ,

প্রতিশুষ্কা—তার প্রয়োগ, বহির্গীতির প্রকার, আশ্রাবণা, আরম্ভ, বক্ত্রপাণি, সংঘোটনা, পরিঘটনা, মার্গাসারিত ও লীলাকৃতের আলোচনাভুক্ত এই অধ্যায়।

॥ ত্রিংশ অধ্যায় ॥

ত্রিংশ অধ্যায় সুষিরাতোদ্যবিধান কথা মোট বারটি শ্লোক। সুষির বেণুর বিধি ও বংশগত স্বরের আলোচনায় এর সমাপ্তি।

॥ একত্রিংশ অধ্যায় ॥

একত্রিংশ অধ্যায়—তালব্যঞ্জন প্রসঙ্গ এবং শ্লোক সংখ্যা মোট পাঁচশো পয়তাল্লিশ। কলা, লয়ের ভেদ, ছন্দলয়ের তিন রকম কলা, তাললয়ের প্রকৃতি, তালের ভেদ, চঞ্চুৎপুট, চাপপুট, মিশ্রতাল, তার দুইরূপ, সমাসযোগে তার ত্রিবিধ রূপ, পঞ্চপাণি, ষট্‌ পাতা, প্লুতের অন্ত, উদ্ঘট, তালের প্রকার, হস্তাঙ্গুলি-বিকল্প, তালপ্রকার, কামযন্ত্রাভিনয়, তালভেদপ্রপঞ্চ, আসারতবিধি, বর্ধমানকবিধি, গীতের লক্ষণঅঙ্গ, গীতের বস্তুকল্পন, ধ্রুবের (১) তাল বিধান, লাস্যের লক্ষণাঙ্গ, তাল অবধারণের প্রয়োজন এবং তিনপ্রকার লয়ের আলোচনায় এর সমাপ্তি।

॥ দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে চারশো চুরাশিটি শ্লোকে ধ্রুববিধানের আলোচনা। ধ্রুব, ধ্রুবের পাঁচ প্রকার—এর ছন্দবৃত্ত, নিদর্শন হ্রী, তটি, ধৃতি, রজনী, পুষ্প, ভ্রমরী, জয়া, বিদ্যুৎভ্রান্তা, দ্রুতলতন্বী, কমলমুখী, বাগুরা, শিখা, ঘনপংক্তি, তনুমধ্যম, মালিনী, মকরশীর্ষা, বিমলা, বার্য্য, গিরা. জলা, রম্যা, কান্তা, পংক্তি, নলিনী, নীল তোয়া, দ্রুতগতি, বিমলা, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগাতী, মধুকরিকা, সমুদ্রা, কুসুমবতী, মুদিতা, প্রকাশিতা, দীপ্তা, বিলম্বিতী, পঞ্চমগতি, বিমলজলা, ললিতগতি, ললিতা, মহী, মধুকর সদৃশী, নদী, রুচিরা, প্রমিতা, গতবিশোকা, ললিতা, বিলম্বিনী, অপকৃষ্টবৃত্তির জাতি, দ্রুতের বিভিন্ন বৃত্ত, উদ্ধতজাতির বিকল্পন, পংক্তি জাতির বিকল্প, যমবৃত্ত, গমমাত্রা বিকল্পন, শীর্ষকের লক্ষণ, নৎকটুকের লক্ষণ, ধ্রুবের বিকল্পপ্রকার, পঞ্চবিধ পান, পঞ্চধ্রুব, ভাণ্ডসমাশ্রয়গ্রহ, গাতৃবাদকের গুণালোচনায় এর সমাপ্তি।

নাট্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কিত একপ্রকার গানকে 'ধ্রুব' বলে

॥ ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায় ॥

ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়-এর নাম বাদ্যাধ্যায়। শ্লোক দুশো সত্তর। অবনদ্ধবাদ্যের উৎপত্তি, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অবনদ্ধ, তার ভেদ, ত্রিপুষ্করাদির বাদ্যবিধি, তিন প্রকার মার্জন, গুরু সঞ্চয়, লঘুসঞ্চয়, অষ্টাদশজাতি, বাদ্যসংশ্রয় প্রকার, এদের প্রয়োগ, আতোদ্যের লক্ষণ, বাদ্যের লক্ষণেই এর সমাপ্তি।

॥ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে উনাশিটি শ্লোকে প্রকৃতি বিচারের আলোচনা। প্রকৃতির তিনবিধি উত্তম, মধ্যমা, অধমা, স্ত্রীজাতির প্রকৃতির রূপ, উত্তমা, মধ্যমা, অধমা, সংকীর্ণ, প্রকৃতি, নায়ক চতুর্বিধ, নায়ক প্রকৃতির বিভিন্ন উপাচার, অন্তঃপুরাশ্রয়ের তিন বিভাগ, মহাদেবী, দেবী, স্বামিনী, শিল্পকায়িকা, নর্তকী, পরিচারিকা, সঞ্চারিকা সহচরী, বৃদ্ধা, আয়ুক্তিকা, স্ত্রীর বিশেষণ, অন্য অন্তঃপুরের লোক, বাহ্য পুরুষ সঞ্চয় বিষয় আলোচনায় এর শেষ।

॥ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়-এ ভূমিকা পাত্র বিকল্প আলোচনা সাতাশিটি শ্লোকে। ভূমিকায় ভূভাগ, প্রকৃতির তিনপ্রকারত্ব, ভূমিকা বিকল্পের প্রয়োগ, আহার্যগুণ, সূত্রধারের গুণ, পরিপার্শ্বকের গুণ, বিটের-শকারের, বিদূষকের, নায়িকার, গণিকার গুণ, ভরত এর বিকল্প করেছেন যেমন—বিদূষক, তোয়িক, নট, সূত্রধার, নাট্যকার, মুকুটকার, আভরণকৃৎ, মালাকার, চিত্রকর, রজক, কারুক এবং কুশীলব।

॥ ষট্ত্রিংশ ও সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ॥

ষট্‌ত্রিংশ এবং সপ্তত্রিংশ এই দুই অধ্যায়ে নটশাপ—ও গুহ্য, বিকল্প বিষয় কথন। উনাশিটি শ্লোক। এখানে প্রশ্নকারী ঋষিগণের নাম, তাঁদের প্রশ্ন, পূজা বিধির জন্য পূর্বরঙ্গ—বিধান, উর্বীতাল নাট্যসঞ্চারী নটবংশের উৎপত্তি কথা, নাট্যশাস্ত্র মাহাত্ম্য কীর্তনে ভারতী রসতত্ত্বের আদি গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।[১]

নাট্যশাস্ত্রের উপপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার থেকে সেই যুগের নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত, মঞ্চকলা, অন্যান্য নানাবিধ উপকরণের মধ্য দিয়ে যে বিপুলায়তন

১। (ক) নাট্যশাস্ত্রম্ (বাণী সংস্কৃত সিরিজ পুস্তকমাল)—পণ্ডিত বটুকনাথ শর্মা ও বলদেব উপাধ্যায়। গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে।

সংস্কৃতি চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় তা মাত্র ৬০০০ হাজার শ্লোকের ফলশ্রুতি অর্থাৎ কালের গ্রাস থেকে যেটুকু উদ্ধার পেয়েছে তাই। সুতরাং ভাবতেই অবাক লাগছে ৬০০০ হাজার শ্লোকে যা পেয়েছি ১২০০০ যদি পেতাম তাহলে ক্ল্যাসিক্যাল যুগের শিল্পচর্চার আরও কত দিগন্ত উন্মোচিত হতো সন্দেহ নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে কোন কারণেই হোক বাকি ৬০০০ হাজার শ্লোক বর্তমান নাট্যশাস্ত্র আকারের মধ্যে পাইনি। এটাকে 'মহতী বিনষ্টি' বলতে হয়। নাট্যশাস্ত্র এত বৃহৎ ব্যাপার যে এই বিষয়ের স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে।

॥ **নৃত্যে মুদ্রা প্রসঙ্গ** ॥

মুদ্রা ঃ—নৃত্যের ভাব প্রকাশের ও অর্থপ্রকাশের জন্য মুদ্রার সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করে কথাকলি নৃত্যের ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ, কারণ কথিত ভাষার প্রতীক হল মুদ্রা। পর্দার পিছনে গায়ক অভিনীত চরিত্রের বক্তব্য গেয়ে চলেছেন আর শিল্পী মঞ্চের উপরে মুখভঙ্গি দেহভঙ্গি ও মুদ্রার মাধ্যমে তার যথাযথ রূপ দিচ্ছেন। সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে শিল্পী নৃত্য করছেন, অভিনয় করছেন আবার সেই সঙ্গে গীত বিষয়ের ভাবও ফুটিয়ে তুলছেন। এই জন্যই মুদ্রা নৃত্য ও অভিনয়ের অপরিহার্য অঙ্গ।

মানব সভ্যতার মতই সুপ্রাচীন এই মুদ্রা। ভারতবর্ষে বৈদিকযুগ হতে এই মুদ্রা শুধু যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গহিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা নয়, নৃত্য ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় কলাবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কিত মুদ্রাগুলি আরও উন্নত ও পরিমার্জিত হয়ে রীতিমত বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে। পুরোহিতরা যখন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে মুদ্রা প্রদর্শনের সাহায্যে দেবারাধনা করছেন তখন থেকেই মুদ্রার ব্যবহারিক তত্ত্বের প্রতি শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। 'হস্ত-লক্ষণ-দীপিকা', 'অভিনয়-দর্পণ' ও মূল নাট্যশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে মুদ্রার প্রয়োগ কুশলতা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। 'হস্ত-লক্ষণ-দীপিকা' গ্রন্থে মাত্র ২৪টি মুদ্রার বিষয় উল্লেখ করা আছে। নাট্যশাস্ত্রে মোটামুটি পাওয়া যায় ২৪ প্রকার এক হস্তের মুদ্রা, ১৩ প্রকার যুক্ত হস্তের মুদ্রা, ও ২৭ প্রকার অতিরিক্ত মুদ্রার বিবরণের কথা। তাহলে মোট শাস্ত্রীয় মুদ্রার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪ প্রকার। 'অভিনয়-দর্পণে' ২৮ প্রকার এক হস্তের মুদ্রা ও ২৩ যুক্ত হস্তের মুদ্রা এবং ১৩ প্রকার নৃত্ত-হস্ত-এর অতিরিক্ত মুদ্রার উল্লেখ আছে। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বর্তমান কথাকলি নৃত্যে অন্যূন সাতশতাধিক মুদ্রার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ যুগে যুগে প্রয়োজন বোধে যে সব মুদ্রা কলাবিদ্‌গণ আবিষ্কার করেছেন তা সাধারণের ভিতর প্রচার করার জন্যে কোন গ্রন্থের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।*

মুদ্রা প্রসঙ্গে ডঃ মহেশ্বর নিয়োগী লিখেছেন—

"Some scholars seek to distinguish between three broad divisions of hand gestures, Vedic, Tantric and Histrionic. I have seen with late Dr. P. C. Bagchi of Visvabharati the manuscript copy of an 18th century Buddhist ritualistic text in corrupt Sanskrit, discovered from Nepal, wherein mundras of Vajrayana worship are depicted in colour. These mundras are associated with mystic formula such as om vajrapuspe svaha, Om vajrapuspa svaha, Om vajrankusaja, "Om vajranaivedya svaha, Om vajradhupe svaha" etc. and they might be taken to symbolise object like pasa (noose) puspa (flower), ankusa (elephant's goods) naivedya (offering to a deity), dhupa (incense stick) etc. Tyra de kleen's beautiful work in Dutch, Mundras of Bali : Handhoudingen Der Priesters, likewise describes with telling illustrations, such mundras in use by Balinese priests as netra, musti, puspa, ghanta, vajra, naracha, tritattva, svikarana, aghora etc. The vyah-gowa ojas of Assam, to whom we are presently coming, take a

* জীবিতগণের মধ্যে মুদ্রা ও অভিনয় কলার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হলেন নাট্যাচার্য পি. কে. কুঞ্জু-কুরুপ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে গোপীনাথ, মাধবন্‌, আনন্দ, শিবরাম ও কৃষ্ণ নায়ার দেশবিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে দিল্লীর ভারতীর কলাকেন্দ্র অথবা সঙ্গীত ও নাটক একাডেমি যদি কথাকলি মুদ্রার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনা করেন, তবে নৃত্যকলার উন্নয়নে সেটি বিশেষ সহায়ক হবে। পৃথিবীতে কোথাও এইরূপ সুবিস্তৃত প্রতীকা কলার অস্তিত্ব নেই।

metal Yantra, called mudra in songs associated threrithin when they dance in course of the jagara ceremony of Siva and Durga worship. It is quite likely that the mudras of of Assam ojapatis may have been derived from some tantric text like the Kalika Purana."

Dr. Maheswara Neogy—Seminar Paper, Page 4-7.

বর্তমান কালে ভারতীয় নৃত্যকলার ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ব্যবহার অপরিহার্য। অথচ ভাবতেই অবাক লাগে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেও মুদ্রার ব্যবহার হতো ধর্মীয় পূজা অর্চনা ও সামগানের প্রয়োজনে।

শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন—সঙ্গীতে, নৃত্যে ও নাট্যে বা অভিনয়ে মুদ্রার ব্যবহার হয়। 'মুদ্রা' শব্দের অর্থ যা আনন্দ দান করে (মুদম্ আনন্দং রাতি দাতি) মুদ্রারস ও ভাবের প্রকাশক। তবে নৃত্যে বা নর্তনে অঙ্গাভিনয়ের ভিতর দিয়ে ভাব ও রসের পরিবেশন করা হয়। নাট্যে বাচিক অভিনয়ই প্রধান, আঙ্গিক তার সহকারী। হস্তাঙ্গুলির বিভিন্ন সন্নিবেশ মুদ্রার বাহ্যিক রূপ দেবদেবীর পূজায়ও ভাবের প্রকাশ হিসাবে মুদ্রার প্রচলন আছে। নৃত্যে, নাট্যে, সঙ্গীতে ও দেবার্চনায় মুদ্রা ভাবের উদ্বোধক। ভাবের উৎস রস নাট্যে, ও নৃত্যে গ্রীবা, চক্ষু, ভ্রূ, পদ, বক্ষ, বাহু, কটি, জঙ্ঘা, প্রভৃতির বিচিত্র গতি রস ও ভাবের প্রকাশক। নন্দিকেশ্বর নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে ভাব প্রকাশের আঙ্গিকের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন,

> আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
> চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
> যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
> যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥[১]

মুখের দ্বারা গান, হাতের দ্বারা গানের অর্থ, চক্ষুর দ্বারা ভাব, পদদ্বারা তালের প্রকাশ করা উচিত। যেখানে হস্ত সেখানে চক্ষু বা দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানে মন বা মনের গতি, যেখানে মন সেখানে ভাব এবং যেখানেই ভাব সেখানেই রসের অভিব্যক্তি এখানেই মুদ্রার সার্থকতা বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। হস্তচালন

১। অভিনয় দর্পণ (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত, ১৩৪৪) পৃঃ ১৯-২০।

বা হস্তমুদ্রার সঙ্গে পরম্পরা সম্বন্ধে সম্পর্কিত চক্ষু বা দৃষ্টি, মন, ভাব ও রস। অর্থাৎ ভাব থেকে রসের অভিব্যক্তি, ভাব অভিব্যক্ত হয় মন থেকে, মনের গতি থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় চক্ষু বা দৃষ্টি এবং চক্ষুর সঙ্গে হস্তের নিবিড় সম্বন্ধ। হস্তের সঙ্গে পরম্পরা সম্বন্ধে রস ও ভাবের যে সম্পর্ক তা নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে। মোট কথা রসকে পরিবেশন করার জন্য ভাবের, ভাবকে রূপায়িত করার জন্য মনের, মনকে ক্রিয়াশীল করার জন্য চক্ষু বা দৃষ্টির এবং দৃষ্টিকে প্রাণবান করার জন্য হস্তের তথা হস্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন।

'মুদ্রা' প্রতীক হিসাবে মানুষের আন্তরভাব ও রসকে বাস্তব জগতে প্রকাশ করে। মুদ্রার উদ্ভাবন হয় সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে। সামগ-ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যুগে বিভিন্ন স্বর-সন্নিবেশ করে যজ্ঞবেদীর সম্মুখে সামগান করতেন তখন মুদ্রার প্রয়োগ হত গানে ছন্দ বা তাল এবং ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করার জন্য।

মুদ্রার নূতন আবিষ্কার নন্দিকেশ্বর, কোহল, যাষ্টিক বা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত কেউ করেন নি, বৈদিক যুগে ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরাই মুদ্রার উদ্ভাবন করেছিলেন সামগান সম্পর্কে। নন্দিকেশ্বর কেবল 'অভিনয়দর্পণ' গ্রন্থেই নয়, তাঁর সুবৃহৎ নন্দিকেশ্বর সংহিতা এবং ভরতার্ণব গ্রন্থদুটিতে নাকি মুদ্রার আলোচনা করেছেন। শিল্পাচার্য, আনন্দকুমার স্বামী "The Mirror of Gesture." গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের পর ইন্দ্রনন্দিকেশ্বর-সংবাদে ভরতার্ণবের উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই :—

'দৈত্য নর্তক নটশেখরের সঙ্গে নৃত্যের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্য ইন্দ্র নন্দিকেশ্বরের কাছে নৃত্যকলা শিখতে ইচ্ছা করেছিলেন। নন্দিকেশ্বর চার হাজার শ্লোকবিশিষ্ট—'ভরতার্ণব' গ্রন্থ রচনা করে দেবরাজ ইন্দ্রকে শিক্ষা দেন। কিন্তু ইন্দ্র ঐ বিস্তৃত গ্রন্থ যথাযথ আয়ত্ব করতে অক্ষম হলে নন্দিকেশ্বর 'ভরতার্ণব' গ্রন্থ সংকলন করে 'অভিনয়দর্পণ' রচনা করেন। ডঃ কৃষ্ণমাচারি, ডঃ রাঘবন প্রভৃতি এই কাহিনী অনেকটা স্বীকার করেন। ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এ 'ভরতার্ণব' নামে হস্তলিখিত একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন মনীষীর অভিমত সেটি নাকি 'অভিনয়দর্পণ' প্রণেতা নন্দিকেশ্বর-এর রচিত নয়। যাই হোক একথা কিন্তু সত্য যে কোহল, নন্দিকেশ্বর, ভরত প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যেরা বৈদিক সামগদের হস্ত বা অঙ্গুলী

সন্নিবেশের তথা মুদ্রার নিদর্শন অনুসরণ করেন তাদের গ্রন্থে নৃত্য ও নাট্যের বিচিত্র আঙ্গিক বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন।

মুদ্রার পরিচয় দিতে দিয়ে নন্দিকেশ্বর অভিনয়দর্পণের 'হস্তভেদাঃ' পর্যায়ে অসংযুক্ত ও সংযুক্ত হস্তলক্ষণ বা মুদ্রার পরিচয় দিয়েছেন : 'অসংযুতাঃ সংযুতাশ্চ হস্তদ্বেধা নিরূপিতা'। 'অসংযুত' হস্তলক্ষণের ভেদসম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

পতাকস্ত্রিপতাকোহর্ধপতাকঃ কর্তরীমুখঃ।
ময়ূরাখ্যোহর্ধচন্দ্রশ্চ অরাল শুকতুণ্ডকঃ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ কটকামুখঃ।
সূচী চন্দ্রকলা পদ্মকোশঃ সর্পশিরস্তথা॥
মৃগশীর্ষঃ সিংহমুখঃ কাঙ্গুলশ্চালপদ্মকঃ॥
চতুরো ভ্রমরশ্চৈব হংসাস্যো হংসপক্ষকঃ॥
সন্দংশো মুকুলশ্চৈব তাম্রচূড়াস্ত্রিশূলকঃ।
ইত্যসংযুতহস্তানামষ্টাবিংশতিরীরিতা॥[১]

পতাক, ত্রিপতাক, অর্ধপতাক, ময়ূর, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতণ্ডুক, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থঃ কটকামুখ, সূচীকলা, পদ্মকোশ, সর্পশির, মৃগশীর্ষ, সিংহমুখ, কাঙ্গুল, অলপদ্মক, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, তাম্রচূড় ও ত্রিশূল এই ২৮ প্রকার অসংযুত হস্তলক্ষণভেদ। নাট্যশাস্ত্রে ২৪ রকম লক্ষণভেদের উল্লেখ আছে এবং সেগুলি পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, বা খটকামুখ, সূচী, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষ, লাঙ্গু (কালাঙ্গুল ?) উৎপলপদ্ম বা অলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, ঊর্ণনাভ, তাম্রচূড়। যেমন—

পতাকস্ত্রিপতাকশ্চ তথা বৈ কর্তরীমুখঃ।
অর্ধচন্দ্রো অরালশ্চ শুকতুণ্ডস্তথৈব চ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ কটকামুখঃ।
সূচ্যাস্যঃ পদ্মকোশচ তথা বৈ সর্পশীর্ষকঃ॥
মৃগশীর্ষ পরো জ্ঞেয়ো হস্তাভিনয়যোক্তৃভিঃ
কাঙ্‌গুলোহলপদ্মশ্চ চতুরো ভ্রমরস্তথাঃ॥

১। অভিনয়দর্পণ, (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত), ৮৯-৯২।

হংস্যাস্য হংসপক্ষশ্চ সন্দংশো মুকুলস্তথা।
ঊর্ণনাভস্তাম্রচূড়শ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ ॥[১]

সংযুতহস্তের লক্ষণভেদ সম্বন্ধে অনিয়দর্পণকার বলেছেন,

অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিকতথাঃ ॥
ডোলাহস্তঃ পুষ্পপুট-উৎসঙ্গঃ শিবলিঙ্গকঃ।
কটকাবর্ধনশ্চৈব কর্তরীস্বস্তিকস্তথা ॥
শকটঃ শঙ্খচক্রে চ সম্পুটঃ পাশ-কীলকৌ।
মৎস্যঃ কুর্মো বরাহশ্চ গরুড়ো নাগবন্ধকঃ ॥
খট্বা ভেরুণ্ড ইত্যেতে সঙ্খ্যাতাঃ সংযুতাঃ করাঃ।
ত্রয়োবিংশতিরিত্যুক্তাঃ পূর্বগৈর্ভরতাগিভিঃ ॥[২]

অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, ডোলা (হস্ত), পুষ্পপুট, উৎসঙ্গ, শিবলিঙ্গ, কটকাবর্ধন. কর্তরী, স্বস্তিক শকট, শঙ্খচক্র, সম্পুট, পাশ, কীলক, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, গরুড়, নাগবন্ধ, খট্বা ও ভেরুণ্ড। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে ২৩ প্রকার হস্তলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। ডঃ আনন্দকুমার স্বামী "The Mirror of Gesture"-এ এদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। অনেকের মতে সংযুক্ত হস্তলক্ষণ ২৭, আবার কারো মতে ৩০ প্রকার। ভট্ট অভিনবগুপ্ত অসংযুত ও সংযুত লক্ষণগুলির মিলিত সংখ্যা ৬৭ প্রকার বলেছেন। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের মতে সর্বসমেত ৬৪ রকম হস্তলক্ষণ। মুদ্রার সংখ্যা, লক্ষণ ও প্রয়োগ ব্যাপারেও মতভেদের অন্ত নেই এবং বিভিন্ন রুচি থাকার জন্য মুদ্রা লক্ষণভেদ হওয়াও স্বাভাবিক।

ভারতীয় নৃত্যে হস্তমুদ্রা সম্বন্ধে শুভঙ্কর সুচিন্তিতভাবে যা লিখেছেন তার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল (বিশ্ববাণী কার্তিক ১৩৬৭, ৯ম, সংখ্যা থেকে) তিনি বলেছেন : 'সাহিত্যের তুলনায় নৃত্যকলার প্রকাশ ক্ষমতা বেশ খানিকটা সীমায়িত। ছন্দায়িত দেহভঙ্গিমায় শিল্পীকে তার উপজীব্য বিষয়টি রূপায়িত করে তুলতে হয়। তা সংলাপনিষিদ্ধ। আবহসঙ্গীত যদিও কিছুটা সাহায্য করে কিন্তু সেটাও গৌণ। ভারতীয় নৃত্যকলার বিবিধ শিরকর্ম, দৃষ্টি কর্ম, গ্রীবাকর্ম ইত্যাদির বিধান আছে। লোকচরিত্রের বিশ্লেষণে মনের বিবিধ ভাবের সঙ্গে ভ্রূ-অক্ষিপুটাদির সঞ্চালন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে ভারতীয় নৃত্যে ঐ

১। নাট্যশাস্ত্র (কাশী ১৯২৯), ১।৪-৭।
২। অভিনয়দর্পণ—পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১৭২-২৭৫।

সবের সৃষ্টি। তা সত্বেও ভাব যেখানে গভীর, শুধু অঙ্গ-উপাঙ্গকর্মে বা কেবলমাত্র দেহভঙ্গিমায় তা প্রকাশ করা যায় না। তাই বিভিন্ন নৃত্যকর্মকে তাদের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থ ছাড়াও আরোপিত অর্থে অর্থবান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য প্রকাশের সৌকর্য্য ও সম্পূর্ণতাসাধন।'

এই মুদ্রাকে ভিত্তি করে আবার 'দেবহস্ত' 'দশাবতারহস্ত' ও 'গন্ধর্বহস্ত'। তা ছাড়াও আছে নৃত্ত হস্ত ও 'নবগ্রহহস্ত'। সম্প্রদায় ভেদে এসব হস্তকর্মে সংখ্যা ও প্রয়োগে পার্থক্য দেখা যায়। নৃত্তহস্তের বিধান নাট্যশাস্ত্রে ত্রিশ প্রকার, মতান্তরে সাতাশ। অভিনয় দর্পণে এই হস্ত সংখ্যা মাত্র তেরো। নাট্যশাস্ত্রের নৃত্তহস্ত সংযুত ও অসংযুত হস্ত থেকে পৃথক কিন্তু অভিনয় দর্পণে ত্রয়োদশ নৃত্ত হস্ত সংযুত ও অসংযুক্ত হস্ত থেকেই গৃহীত হয়েছে। অসংযুতহস্ত থেকে ছয় (মতান্তরে পাঁচ) এবং সংযুত হস্ত থেকে (মতান্তরে আট) তা ছাড়াও অভিনয়দর্পণে ষোলটি দেবহস্ত—যথা ব্রহ্মা, শিব (ঈশ্বর), বিষ্ণু, সরস্বতী, পার্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ (বিনায়ক), কার্তিকেয় (যন্মথ), মন্মথ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু ও কুবের। দশাবতার হস্ত—মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, কৃষ্ণ ও কল্কি। তাছাড়া—বান্ধবহস্ত-দম্পতি, মাতা, পিতা, শ্বশ্রূ ও শ্বশুর ইত্যাদি। জাতিহস্ত—রাক্ষস, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি নবগ্রহ হস্তেরও বিধান আছে। শাস্ত্রকারদের মধ্যে কেউ আবার উপরিউক্ত সংযুত ও অসংযুত হস্তমুদ্রাগুলির পৃথক পৃথক ঋষি, বর্ণ ও বংশের কথা বলেছেন।

মুদ্রার সৃষ্টি ও রূপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। জিন্ প্রজিলাস্কি (Jean Przyluski) বলেছেন, মুদ্রা শব্দের উল্লেখ বৈদিকোত্তর সাহিত্যে পাওয়া যায়। এর সাধারণ অর্থ শীলমোহর। হিন্দী ভাষায় মুদ্রক ও মুদ্রা দুই রকম শব্দই দেখা যায়। খস্ ভাষায় শীলমোহর-এর নাম মুনরো (Munro) সিন্ধি ভাষায় বলে মুন্দ্রী (Mundri) তিনি বলেছেন মুদ্রার উৎপত্তি কখন থেকে এবং কেমন করে হল তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। মনে হয় সামগানের হস্ত ও অঙ্গুলি সঙ্কেত থেকে বৈদিকযুগে মুদ্রার সৃষ্টি একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এফ. হোমেলের (F. Hommel) অভিমত যে অসিরীয় ভাষা মুসরু (Musaru) থেকে মুদ্রা শব্দের সৃষ্টি হয়ে থাকবে কেননা মুসরূপ

অর্থ লেখা বা শীলমোহর। 'মুসরু' শব্দ থেকে মুদ্রা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এভাবে—মুসরু>মুজরা>মুদ্রা। পালি ভাষায় মুদ্রাকে বলে 'মুদ্দা' কিন্তু জাঙ্কার (Junker), ল্যুডার্স (Luders) প্রভৃতি মনীষীরা হোমেলের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নি। বর্তমান হিন্দী, মারাঠী, বাঙ্গলা, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষায় মুদ্রা শব্দের অর্থ টাকা বা শীলমোহর। হিন্দুস্থানীতে মুদ্রাক 'মোহরও' বলে। অধ্যাপক ল্যুডার্স বলেছেন খোটানে মুদ্রা তথা টাকার নাম 'মুর' এবং তা থেকেই মুদ্রা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য মনীষীরা বৈদিক সামগানের প্রয়োগ ও প্রকাশভঙ্গী সম্ভবতঃ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন নি। জিন পৃজিলস্কির মতে মাঙ্গলিক ধর্মানুষ্ঠানে বা আভিচারিক কোন কর্মে মুদ্রা শব্দে হস্ত ভঙ্গী বোঝায় একথা অনেকটা সঙ্গত। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, নর্তনকলায় যে সব হস্তভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়া থাকে সাধারণতঃ সেগুলিকে মুদ্রা বলে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কেবল্ নর্তন ও নাট্যাভিনয় কেন—পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনায়ও এই প্রকার দেবপ্রীতি কর নানারূপ হস্তভঙ্গি (মুদ্রা) ও দেহভঙ্গী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নর্তন মুদ্রা ও উপাসনা মুদ্রার মধ্যে ব্যবহারিক রূপভেদ থাকিলেও উভয়ের মূলস্বরূপে কোন পার্থক্য নাই। মূলতঃ এই উভয় শ্রেণীর মুদ্রাই সাঙ্কেতিক মূকভাষা মাত্র।[১]

জিন পৃজিলস্কি কেবল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মুদ্রার উপযোগিতার কথা বলেছেন। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে যে মুদ্রার প্রচলন দেখা যায় সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। অধ্যাপক ফিনোট (L. Finot) বলেছেন মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ আছে। এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে মণ্ডল, মন্ত্র, পূজা ও মুদ্রা এই চারটির অপরিহার্যভাবে প্রয়োগ আছে। পূজার অপরিহার্য অঙ্গরূপে—মুদ্রার ব্যবহার সকলে স্বীকার করেন। শৈব ও বৈষ্ণবদের অনুষ্ঠানেও মুদ্রার ব্যবহার হয়। অধ্যাপক পৃজিলস্কি বলেছেন, 'রাম নৃজাসরণি' গ্রন্থে ও বিশেষভাবে 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ে ২৪ রকম মুদ্রার উল্লেখ আছে। সন্ধ্যানুষ্ঠানে সর্বদা মুদ্রার ব্যবহার ছিল। কেননা বৈদিক সাহিত্যগুলি তার প্রমাণ।

বাজসেনীয়-প্রাতিশাখ্য (১।১।২১) ও পাণিনীয় শিক্ষার উল্লেখ করে পৃজিলস্কি

১। অভিনয়দর্পণ (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মন্তব্য করেছেন : Going beck to the Vedictimes, however, one finds the word and the gesture on one plane and being giving the same magical or religious importance."

বাজসেনয়ী-প্রাতিশাখ্যে ও পাণিনীশিক্ষায় 'হস্তেন' শব্দের উল্লেখ হস্তভঙ্গীর প্রকাশক। যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে মুদ্রার তথা হস্তভঙ্গির উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়।

'মুদ্রা' অর্থে তন্ত্রে দেবতা পত্নী তথা দেবীকেও বোঝায়। মাননীয় ফিনোট-এ সম্বন্ধে বলেছেন : "Mundra or more usually maha-mudra has in the Tantras, besides the ordinary sense, that of woman, when a woman is associated to the rites. For instance in the abhiseka, the master and desciple, both have their mudra and however discreet the expression may voluntarily be, the context does not leave any doubt upon the part which these feminine assistants play Vajravarahi is given the name of maha-mudra, in quality of Haruka's First wife (agramahisi)"

সুতরাং মুদ্রা শব্দের দ্বারা টাকা মোহর, বা শীলমোহর ও হস্তভঙ্গীর মতো দেবী তথা দেবতাপত্নীও বোঝায়। তাছাড়া তন্ত্রে পঞ্চমুদ্রার মধ্যে চাল-কড়াই ভাজাকেও মুদ্রা বলে। পরিশেষে পণ্ডিত পৃজিলস্কি বলেছেন : "The study of the word mudra, fact, show the permanence of the tendencies which have ruled the first manifestation of Buddhist art, and through it very different of the political and economical and religious life of India may be linked together."

তবে মুদ্রা কোন্ সময় প্রচলিত হল জিন পৃজিলস্কি তার সঠিক বিবরণ দেন নি। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রার সৃষ্টি হয়েছিল বৈদিক যুগেই। বিচিত্র যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সামগানে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক বা দ্যোতক হিসাবে সামগান-

কারীরা যে সকল হস্তভঙ্গী ব্যবহার করতেন আসলে তাদের থেকেই মুদ্রার সৃষ্টি।"[১]

ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে বা ক্রমবিকাশে প্রতীকী ভাষা হিসেবে মুদ্রার গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি ১০৮ করণও খুবই উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে ঐ করণের বিনিয়োগ যেখানে আধুনিক ক্যাসিক্যাল নাচেও নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, নানা আকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে তা প্রাচীন ধারার সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে খুবই ক্ষীণ।

১। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস-(১ম খণ্ড) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পৃঃ ৩২০-৩৩৪।

নৃত্য ও অভিনয়ের সম্বন্ধ বিচার ॥
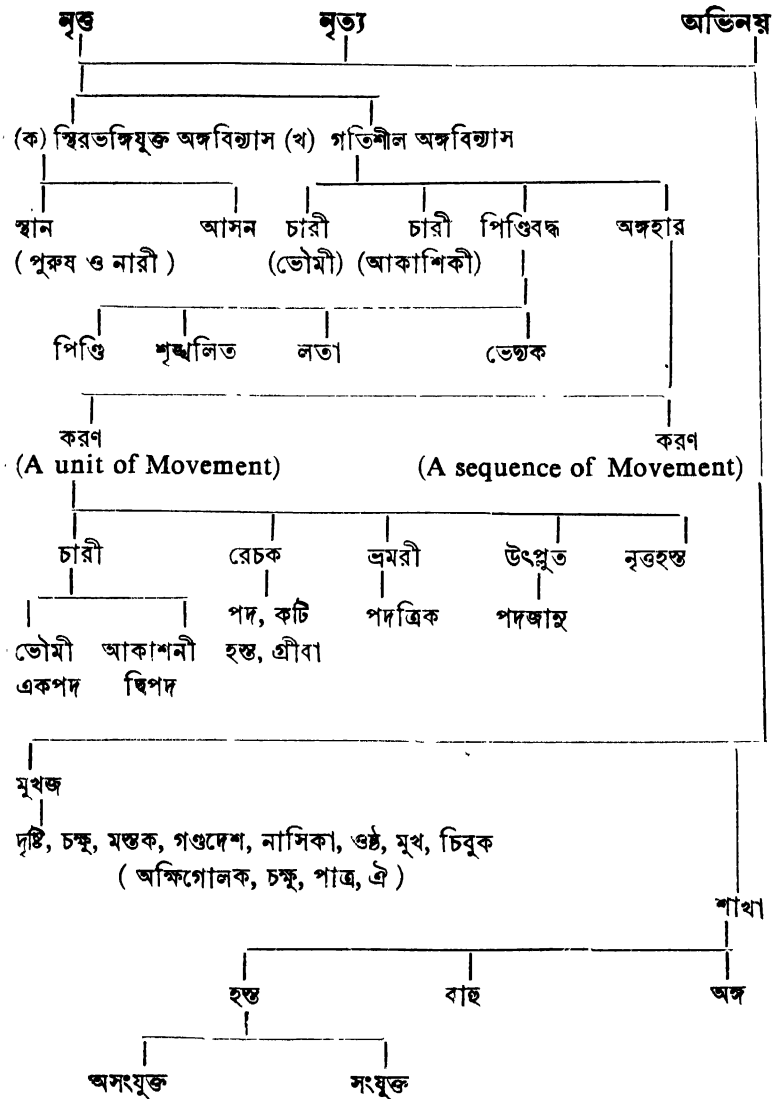
ষষ্ঠ অধ্যায়

ভরতের অনুচিন্তাগোষ্ঠী ও নটরাজ পরিকল্পনা

॥ ভরতের অনুচিন্তাগোষ্ঠী ॥

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ভারতীয় সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য প্রভৃতি শিল্পকলার এক প্রামান্য দলিল। এ জন্যেই বোধহয় বলা হয় "Bharata's Natyasastra occupies an archetypal position."

যেহেতু নাট্যশাস্ত্র উক্ত শিল্পকলাগুলির মূল ভিত্তি স্বরূপ, সুতরাং পরবর্তীকালে সঙ্গীত-নাটক নৃত্যকলা নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভরতের সূত্রগুলিকেই বিশ্লেষণ করে অনুকরণ বা অনুসরণ করেছেন। এ জন্যে এঁদের বলা যায় অনুচিন্তাগোষ্ঠী। বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ থেকে সুরু করে, অভিনয়দর্পণ, অগ্নিপুরাণ, সঙ্গীত মকরন্দ, দশরূপক, নাটক লক্ষণ রত্নকোষ, নাট্যদর্পণ, অভিলসিত চিন্তামণি, ভাবপ্রকাশ, সঙ্গীত রত্নাকর, সাহিত্য দর্পণ, সঙ্গীত সময়সার ইত্যাদি। সঙ্গীতোপনিষৎ সারোদ্ধার, সঙ্গীত দামোদর, নর্তন নির্ণয়, সঙ্গীত দর্পণ, নাট্যশাস্ত্র সংগ্রহ, হস্তরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা, কোহল মতঙ্গ সম্প্রদায় এবং আধুনিক যুগের ওড়িশী নৃত্যের যে পাণ্ডুলিপিগুলি পাওয়া গেছে তার লেখকবৃন্দ ও অল্পবিস্তর নাট্যশাস্ত্রকেই অনুসরণ করেছেন নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে। এরা সকলেই প্রায় ভরতের অনুসারী গোষ্ঠী। দীর্ঘ দুই হাজার বছর ধরে মনে হয় এক নাট্যশাস্ত্রই যেন নানা শাখা-প্রশাখায়; নানা পত্র পল্লবে বিরাট মহীরূহ রূপী ভারতবর্ষের উক্ত শাস্ত্রগুলিকে বিধৃত করে আছে।

ভরতের সময়কার নাচের যে টেকনিক বা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে বা আছে—তার সঙ্গে আজকের দিনে ব্যবহৃত টেকনিকগুলির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। যদিও বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর নাম করা ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ভাবধারায় পুষ্ট বলা যেতে পারে নাট্যশাস্ত্রের করণ-প্রকরণ অঙ্গহার-চারী-ভ্রমরী-মুদ্রা দ্বারা সমৃদ্ধ। তথাপি একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার রয়েছে—প্রথমতঃ বর্তমানে প্রচলিত নাচগুলির নাম বিশেষভাবে ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, কুচিপুড়ি ওড়িশী প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং অবলীলাক্রমে বলা যায় যে, এই সকল নাচের নামকরণ অনেক পড়ে হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ—নাট্যশাস্ত্রের অনুসারী প্রথম দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের বর্ণিত টেকনিকগুলির সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের টেকনিকের তেমন মিল নেই। এই দুটি হল 'নর্তন নির্ণয়' ও 'সঙ্গীত দর্পণ'। এ বিষয়ে ডঃ মন্দাক্রান্তা বসুর অভিমত হল—

NARTANA-NIRNAYA and SANGITA-DARPANA.—These mention terms that have nothig at all to do with those found in the texts of the Bharata tradition. These are not even etymologically similar to the terms of that tradition, which may call the classical tradition. It is possible that the tradition represented by these terms arose in different localities or in differant times.[১]

লেখিকা উক্ত বই দুটির পরিচয় দিতে গিয়ে পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন—

(A) Nartana Nirnaya is a text on dancing by Puṇdarika Viṭṭhala written to please the Emperor Akbar. From this it appears that this book was written sometimes in the sixteenth century A.D. Nothing is said about its actual date in the text. It is as yet unpublished but the following manuscripts are extant.

(1) An ms at the Asiatic Society Library in Calcutta, this Ms. consists of 86 folios, well-preserved and legible though there are some scribal errors and omịssions. The colophon has the spelling Nartakanirnaya and this has caused the title to be misspelt in the Society's catalogue.

(2) An ms. in the India Office Library, London. This ms. Consists of 107 leaves. It is full of scribal errors but it

১। Classical Indian Dancing···(A Glossary)
···Mandakranta Bose (General Printers and Publishers. Calcutta. 1970, Introduction, Page 1).

is kept in a good condition. The script is in Devanāgari. The text has a few slokas which can be found in the NS.

In the first thirty-three folios NN gives the same views on dancing in the NS with a few variations while the last twenty-one., folios report a different tradition though in describing the basic movements, it follows the NS. The tradition can also be found in S Dar, in the last half of S Sam and in the description of the Desi style in S. R.

(3) A fragment, which has besn edited by Dr. Priyabala Shah for the Rajasthan Oriental Research Institute. As the fragment bears no title and as the editor has not discovered its relationship with the NN, she calls it Nṛttasangraha. The fragment, in fact consists of 13 folios which correspond with the last 13 folios of the NN.

(B) Sangita Darpana, by Dāmodara, is a work of the sevtnteenth century A.D. (1704 Samvat). I have examined a ms. of this work at the Bibliotheque Nationale in Paris and an incomplete ms. at the Bodleian Library, Oxford. The Paris ms. Contains 225 leaves and the script is in Devanāgari. The Natyādhyāya is a part of the Bodleian ms. which like the Paris ms., is in Devanāgari script and is in very good condition. Nṛtya is discussed in the last chapter of this work which quotes slokas from S Sam (Sangita Samayasara) SR (Sangita Ratnākar) and Adar (Abhinaya Darpana). (Ibid—Page 5)

যাই হোক নাট্যশাস্ত্রের পর অনুচিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে অভিনয় দর্পণকেই নৃত্যধারায় বিশ্লেষণ-এ প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ভরতোত্তর যুগে নৃত্যধারাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে' অভিনয় দর্পণ।' এবং এই অভিনয় দর্পণে উল্লেখিত নৃত্য-ব্যাকরণ বর্তমান যুগের ক্ল্যাসিক্যাল

নাচগুলিতে বেশী অনুসৃত হচ্ছে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষায় অভিনয়দর্পণ-প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এই বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের অভিমত প্রণিধানযোগ্য মনে করি। তিনি লিখেছেন—

'মানুষ কথা বলেছে তার জীবনাবেগকে প্রকাশ করতে, মনোভাবকে সঞ্চার করতে যেমন করে সহজ জীবনাবেগে প্রাণীরা অস্ফুট শব্দ করেছে, কিন্তু মনোধর্মিতা নেই বলে প্রাণীরা যা করতে পারেনি মানুষ তা পেরেছে, মানুষ কথা থেকে ব্যাকরণ তৈরী করেছে, অভিজ্ঞতা থেকে শাস্ত্র গড়েছে, জীবন থেকে জীবনদর্শন সৃষ্টি করেছে, কল্পনাকে নানাভাবে প্রকাশ করে শিল্প তৈরী করেছে—শিল্পের ও শাস্ত্রের এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য যেদিন সে প্রথম কথা বলেছে, সেই দিনেই সে ব্যাকরণ সৃষ্টি করেছে তা নয়, কথার কথা চিন্তা না করেই সে বহুকাল কথা বলেছে, কথা নিয়ে চিন্তা করবার ক্ষমতা এসেছে কথা বলার অনেক পরে—মননশক্তি একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছানোর পরে।

শুধু ব্যাকরণই যে কথার পরে এসেছে তা নয়, সব শাস্ত্রই তৈরী হয়েছে আলোচ্য বিষয়ের অনেক পরে। জীবনের হাজার হাজার বছর পরে এসেছে জীবনদর্শন, পদার্থের হাজার হাজার বছর পরে এসেছে, পদার্থবিদ্যা। তেমনি নাট্যশাস্ত্রের অনেক আগেই জন্মেছে নাটক, অভিনয়শাস্ত্রের অনেক আগে থেকেই চলে এসেছে অভিনয়।

এই সূত্র সামনে রেখেই আমরা বলতে পারি, ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রের শিলালিন—কৃশাশ্বরচিত নট সূত্রের (৫০০ খ্রীঃ পূঃ) বহু আগেই ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয় প্রবর্তিত হয়েছিল এবং সূচনা থেকে সমৃদ্ধির একটি বিশেষ স্তরে পৌছানোর পরে নাট্যশাস্ত্র বা নটসূত্রাদি রচিত হয়েছিল। শিলালিন কৃশাশ্বের নটসূত্রে শুধু পাণিনির উল্লেখেই রয়েছে ; সুতরাং তা থেকে সমস্ত প্রমাণ কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রাচীনতম নাট্যশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে গেলে, দেখা যাবে, ভরত যখন নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন, তখন দশ প্রকার রূপক বা নাট্যের অভিনয়

১। অভিনয় দর্পণ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত (সংস্কৃত বুকডিপো—১৩৭১) ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (ভূমিকা লিখেছেন ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য)

প্রচলিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, দশ প্রকার নাট্য একদিনে রচিত হয়নি, বহু বৎসরের বিবর্তনের ইতিহাস তার পিছনে আছে।

নাট্যশাস্ত্রের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, ঐ বর্ণনায় বৈদিক এবং পৌরাণিক দুইটি স্তরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্তাকারে নিহিত রয়েছে। ইন্দ্রোৎসবে অভিনীত দেবাসুর যুদ্ধে প্রথম স্তর এবং শিবের সম্মুখে প্রযোজিত ত্রিপুরদাহতে দ্বিতীয় স্তর প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে দেবাসুর যুদ্ধ অবলম্বনে প্রথম নাট্য রচিত এবং ইন্দ্রোৎসবে প্রযোজিত হলেও, নাট্যাভিনয়ের বহু পূর্বেই অভিনয়ের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। অভিনয়ের ইতিহাস নাটকের ইতিহাসের চেয়ে অনেক পুরাতন। 'যেখানেই অবস্থানুকার' সেখানেই অভিনয় (ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ) এ কথা সত্য হলে, অভিনয়ের জন্ম হয়েছে সেই দিনেই যেদিন মানুষ শব্দের, ভাবের বা কার্যের এক কথায় অবস্থার অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছে, ইঙ্গিতে বা অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অর্থাৎ দেহের ভাষায় মনোভাব বা অভিজ্ঞতাকে অপরের কাছে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছে। প্রথম অনুকরণের—মূকাভিনয়ের—দিনেই অভিনয়ের জন্ম হয়েছিল এবং সেইদিন খুব সম্ভব মানুষের গোষ্ঠী জীবনের প্রথম দিন। আদিম অবস্থায়, যখন মানুষ তার পরিবেশের জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াকে শব্দ সঙ্কেত চিহ্নিত করতে পারে নি, সেদিন ইঙ্গিত ভাষা বা মূকাভিনয়েই ছিল পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের প্রধান উপায়। পরবর্তীকালেও, বাগ্‌ভাষার শক্তি বাড়ালেও, শব্দ সঙ্কেতের প্রাচুর্য ঘটলেও, মানুষ বাগ্‌ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত ভাষাও কম ব্যবহার করেনি। আজও, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক বা আবেগিক আচরণ আমাদের ভাবপ্রকাশ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আজও আমরা ভাষায় যা ব্যক্ত করতে পারিনে, নানা প্রকার ইঙ্গিতে তা ব্যক্ত করে থাকি। আজও দুই ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর লোক যখন ভাবের আদান-প্রদানে বাধ্য হয়, তখন বোবার মতো ইঙ্গিত ভাষাই ব্যবহার করে থাকে। আদিম সমাজের মানুষ শুধু যে ভাবের আদান-প্রদান করবার তাগিদেই ইঙ্গিত ভাষার বা দেহের ভাষায় ব্যবহার করেছে তা নয়, তাদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রায় সবটাই ছিল অভিনয়াত্মক। কারণ তাদের মন ছিল প্রাক্-নৈয়ায়িক (প্রি-লজিকাল) স্তরে, তাদের ছিল নৈর্ব্যক্তিক যাদু শক্তিতে বিশ্বাস (**belief in impersonal magical powers**), ধর্ম চেতনা ছিল 'প্রি-এনিমিষ্টিক' বা 'মনইজিমের' স্তরে

অথবা এনিমিজ্মের স্তরে। যাদুক্রিয়া আচার-অনুষ্ঠানের অনেকখানি জুড়ে থাকায় এবং যাদু ক্রিয়া অভিনয়াত্মক ব্যাপার হওয়ায়, তাদের যুদ্ধোৎসব, শিকার-উৎসব, পরবর্তীকালের হলকর্ষণ-উৎসব, জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব—এমন কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও অভিনয়াত্মক যাদুক্রিয়ার প্রভাব ছিল বিলক্ষণ। উৎসবানুষ্ঠানে যে নাচে গানে তারা সামষ্টিক আবেগের উচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করেছে, তাতেও ঐ যাদু বিস্তার করবার, অতিপ্রাকৃত অদৃশ্য শক্তিকে তোষণ করবার চেষ্টাই ব্যক্ত হয়েছে। এই সকল নাচে গানে তারা মূল ঘটনাটির, কোন একটি কল্পিত অবস্থার অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছে এবং তদনুযায়ী আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি দেখিয়েছে।

তবে আদিম সমাজের বা প্রাচীন সমাজের মানুষ অনুকরণাত্মক যে সব আচরণ করেছে, তা অভিনয়সদৃশ বটে, কিন্তু যথার্থ অভিনয় নয়। অভিনয় অনুকরণাত্মক বটে, কিন্তু অনুকরণমাত্রই অভিনয় নয়। সাধারণ অনুকরণাত্মক আচরণের বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে অভিনয়ের পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য এই যে—অভিনয় হচ্ছে উৎসবে সমবেত দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই প্রদর্শিত ভাবব্যঞ্জক বা অনুকরণাত্মক ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান। 'অভিনয়' শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলেই আমার কথাটি আরো স্পষ্ট হবে। 'অভি'পূর্বক নীঞ্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করে অভিনয় শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। 'অভি' উপসর্গের অর্থ—দিকে বা অভিমুখে, নীঞ্ ধাতুর অর্থ 'নয়ন' অর্থাৎ পৌঁছে দেওয়া, সুতরাং অভিনয়ন হচ্ছে ভাবের বা কার্যের রূপটিকে দর্শকদেব কাছে পৌঁছে দেওয়া।

নাট্যশাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায়ে এই ভাবেই অভিনয় শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখানো হয়েছে—'অভিনয় ইতি কস্মাদুচ্যতে। অভীত্যুপসর্গঃ। নীঞ্ প্রাপণার্থো ধাতুঃ। অস্যাচ্ প্রত্যয়ান্তস্য অভিনয় ইতি রূপং সিদ্ধম্।' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে, এই কথাই বলতে হবে যে, অভিনয়ে দুটি পক্ষ অপরিহার্য, এক পক্ষ যে বা যারা অভিনয় করবে, অন্য পক্ষ, যাদের সামনে অভিনয় করা হবে। এক পক্ষ অভিনেতা, অপর পক্ষ দর্শক। যে অনুষ্ঠানে এই দুই শর্ত পূরণ করা হয় না, তাকে আর যাই বলা হোক, অভিনয় বলা চলবে না। কারণ, অভিনয় হচ্ছে সামাজিকদের সামনে ভাবকার্য বা অবস্থার অনুকরণ প্রদর্শন, অভিনয় প্রদর্শনাত্মক ব্যাপার। প্রদর্শনের উদ্দেশ্য যেখানে মুখ্য সেখানেই অবস্থানুকার অভিনয়।

এই সূত্রানুসারে, ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ অনুসারে যে অনুকরণাত্মক অনুষ্ঠান করা হয়েছে তাকে আমরা যথার্থ অভিনয় বলছিনে, অভিনয় হিসাবে গণ্য করতে পারি সেই গীতাভিনয়কে বা নৃত্যকে বা নাট্যকে যা উৎসবে আনন্দানুষ্ঠান হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই হিসেবে ধর্মোৎসবে এবং সামাজিক উৎসবের অঙ্গস্বরূপ বাদ্যগীতিসহ নৃত্যের মধ্যে অভিনয়ের প্রথম রূপটির নিদর্শন পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে নৃত্যে অভিনয়ের আরম্ভ, নাট্যে অভিনয়ের পূর্ণতা।

অভিনয়—যার অপর নাম 'নটন'—যখন আঙ্গিক-আহার্য সাত্ত্বিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে কোন ভাবকে ব্যক্ত করে, তখন তার নাম হয় নৃত্য, যখন আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য সাত্ত্বিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে কথা বা লোকবৃত্তকে ব্যক্ত করে, তখন তাকে বলা হয় নাট্য। এই কারণে নৃত্যাভিনয়ের চেয়ে নাট্যাভিনয়ের অনেক জটিলতর ব্যাপার, উন্নততর শিল্প এবং নৃত্যনাট্যের চেয়ে প্রাচীনতর। আদিম সমাজের শিল্প নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তারা একবাক্যে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আদিম জাতিদের মধ্যে এমন কোন ভাষাশিল্প নেই যার সঙ্গে বাদ্য, নৃত্য ও সুর ওতপ্রোতভাবে মিশে না আছে, এমন গান নেই যার সঙ্গে নৃত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নয়। সুতরাং নৃত্যাভিনয়েই যে অভিনয়ের সূচনা এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। নাট্যের বহু আগেই নৃত্যগীতের উদ্ভব ঘটেছিল। রামায়ণ-মহাভারতের নট-নর্তকরা রীতিমতো যে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য নৃত্যের ইতিহাসের মতো নাট্যের ইতিহাস অতো পুরাতন না হলেও একেবারে কম পুরাতন নয়। সংস্কৃত নাটকের বর্তমান ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে যে কথাই মনে আসুক না কেন, এ কথা অতি সত্য যে, প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয়ের চর্চা কম উৎসাহ পায়নি এবং পায়নি যে তার বড় প্রমাণ ভরত-বর্ণিত ১০ প্রকার রূপক, শারদাতনয় বর্ণিত ৩০ প্রকাব দৃশ্যকাব্য, বিশ্বনাথ বর্ণিত ১০ প্রকার রূপক এবং ১৮ প্রকার উপরূপক।

প্রাচীন ভারতে নাট্যবিদ্যা চর্চা

প্রাচীন ভারতে শুধু নাট্য রচনা ও নাট্য প্রযোজনাতেই নাট্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, নাট্যবিদ্যার চর্চাও যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। আমরা জানি,

নাট্যবিদ্যা বেদের মর্যাদা পেয়েছিল। এই চর্চার সব নিদর্শন আজ আমাদের হাতে নেই, তার অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। পাণিনি (৫০০ খ্রীঃ পূঃ) শিলালিন ও কৃশাশ্বের লেখা যে নটসূত্রের উল্লেখ করেছেন, উল্লেখ ছাড়া তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। ভরতের নাট্যশাস্ত্র সম্প্রতি পাওয়া গেলেও, ভরতের শতপুত্রের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্তি এবং পরবর্তীকালের লেখকদের লেখায় উদ্ধৃত—কোহল দত্তিল (ধূর্তিল), শালিকার্ণ (শাতবর্ণ), বাদরায়ণ (বাদরি), নখকুট্ট, অশ্মকুট্ট, বাৎস, শাণ্ডিল্য প্রভৃতির নাম স্মৃতি থেকে প্রায় মুছেই গেছে। অথচ এ কথা তো মিথ্যে নয় যে, এঁরা একদিন নাট্যবিদ্ বলে পণ্ডিতসমাজে বহু সম্মানিত ছিলেন।

আমরা দেখি, কোহলের সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ অধ্যায়ে এরূপ একটি ভবিষ্যদবাণী রয়েছে যে, ভরত যা আলোচনা করেন নি, কোহল তা আলোচনা করবেন। নাট্যশাস্ত্রের বিখ্যাত টীকাকার পণ্ডিতপ্রবর অভিনবগুপ্তও কোহলের নাম উল্লেখ এবং মত উদ্ধৃত করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে যে দত্তিলের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অভিনব গুপ্ত যে দত্তিলাচার্যের মত উল্লেখ করেছেন, তিনি ভরতশিষ্য দত্তিল ছাড়া আর কেউ নন। শাণ্ডিল্য এবং বাৎসের নামও নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। অশ্মকুট্টের উল্লেখ করেছেন সাগরনন্দিন এবং বিশ্বনাথ এবং নখকুট্টের ও বাদরায়ণের উল্লেখ করেছেন সাগরনন্দিন।

এই সকল প্রাচীন লেখকের পরেই নাট্যবিদ বলে যারা পরিচিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—নন্দী (নন্দিকেশ্বর), তুম্বুরু, বিশ্বাখিল, চারায়ণ, সদাশিব, পদ্মভূ, দ্রৌহিণি, ব্যাস, আঞ্জনেয়, কাত্যায়ন রাহুল, গর্গ, শকলিগর্ভ, ঘণ্টক, বার্ত্তিককার হর্ষ, মাতৃগুপ্ত, সুবন্ধু, অগ্নিপুরাণের এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা প্রভৃতি। পণ্ডিতরা অনুমান করেন—২০০ খ্রীঃ থেকে ৮০০ খ্রীঃ এই সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নাট্যশাস্ত্রীরা তাঁদের গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন।

আরো পরবর্তীকালে আমরা অনেককে পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

১। ধনঞ্জয় (১০ম শতাব্দী)—দশরূপক

২। সাগরনন্দিন (১০ম শতাব্দী)—নাটকলক্ষণ রত্নকোশ

৩। রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র (১২শ শতাব্দী)—নাটকদর্পণ

৪। রুয্যক (১২শ শতাব্দী)—নাটকমীমাংসা

৫। শারদাতনয় (১২শ শতাব্দী)—ভাবপ্রকাশন
৬। বিশ্বনাথ কবিরাজ (১৩শ শতাব্দী)—সাহিত্যদর্পণ
৭। সিংহভূপাল নাটকপরিভাষা রসার্ণবসুধাকর।

দেখা যাচ্ছে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে নাট্যশাস্ত্রের রচনা ও চর্চা শুরু হয়েছিল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার ধারা অব্যাহত গতিতে নেমে এসেছিল। বলা বাহুল্য, এ খুবই গৌরবের কথা এবং এ ধরনের সোনার ফসল খুব কম দেশেই ফলেছিল। এই পর্বের ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সমসাময়িক ইয়োরোপীয় ইতিহাসের তুলনা করলে দেখা যাবে—ইয়োরোপে যেখানে একমাত্র এরিষ্টটলের পোয়েটিকস্ নিয়ে গর্ব করতে পারে, আমরা সেখানে ভরতের নাট্যশাস্ত্র ছাড়াও এক ডজন গ্রন্থ দেখাতে পারি। প্রচলিত নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল খ্রীষ্ট জন্মের দুশো বছর আগেই হোক বা দুশো বছর পরেই হোক, এই জাতীয় গ্রন্থ ঐ সময়ের ইয়োরোপে একখানিও রচিত হয়নি। ইয়োরোপে যখন নাট্যের অন্ধকার যুগ চলেছিল, তখন যে ভারতে নাট্যশাস্ত্রের প্রচুর ফসল ফলেছিল, এ কম গৌরবের কথা নয়। বাস্তবিক রস, ভাব, অভিনয়, ধর্মীবৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, আতোদ্য, গান, রঙ্গ প্রভৃতি নাট্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে, নাট্যশাস্ত্র যেভাবে আলোচনা করেছিল, ইয়োবোপের কোনও গ্রন্থেই সেভাবে আলোচনা দেখা যায় নি। এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, নাট্যের রচনা, প্রযোজনা এবং আলোচনায় ভারতবর্ষ একটি স্মরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল এবং রাজনৈতিক দুর্বিপাকে সেই ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে না গেলে, ভারতকে ইয়োরোপীয় জাতির কাছ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন করে নাট্যবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করতে হত না—নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হত না। নতুন করে আবিষ্কারের কথা যে কত সত্য, তা তিনিই ভালভাবে বুঝতে পারবেন, উনবিংশ শতাব্দীতে কিভাবে ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রের পুঁথি আবিষ্কৃত, বহু চেষ্টায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে তা তিনি জানেন। তার আগে ভরত শুধু নামেই ছিলেন এবং নন্দিকেশ্বরের অবস্থাও তথৈবচ। নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ প্রভৃতি লুপ্ত রত্নকে উনবিংশ শতাব্দীতেই নতুন করে উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিনয়দর্পণের পুঁথি ও প্রকাশের এবং অনুবাদের ইতিহাসের দিকে যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই, যতগুলি পুঁথি আমাদের হস্তগত

হয়েছে, তাদের অধিকাংশই তেলেগু অক্ষরে লিখিত। এতে আর কিছু প্রমাণিত হোক বা না হোক এটি বোধ হয় যে, অভিনয়দর্পণের গ্রন্থকার দক্ষিণাবর্তের লোক ছিলেন এবং তেলেগু ভাষাভাষীদের কাছে অভিনয়দর্পণ একখানি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। সে যাই হোক, নাদমঙ্গলমের তিরুবেঙ্কটচারীর সম্পাদনায় তেলেগু অক্ষরে অভিনয়দর্পণের যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, তারই উপর নির্ভর করে এ. কে. কুমারস্বামী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দি মিরর অফ জেশ্চার' নামে অভিনয়-দর্পণের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং অভিনয়দর্পণের দিকে দেশ-বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর, কুমারস্বামীর গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষ মহাশয় অভিনয়দর্পণ গ্রন্থের এক সম্পাদিত সংস্করণ এবং অনুবাদ প্রকাশ করেন।

অভিনয়দর্পণের পুঁথি ও অনুবাদ

যে পুঁথিগুলির উপর নির্ভর করে তিনি সম্পাদনা করেছিলেন, তাদের উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যাবে—শ্রদ্ধেয় ডঃ ঘোষ মহাশয় কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি করেছিলেন এবং অভিনয়দর্পণের কতগুলি পুঁথি আমরা পেয়েছি।

(ক) তেলেগু-হরফে লেখা সম্পূর্ণ একখানি পুঁথি—দেবনাগরী হরফে পরিবর্তিত। ১৮৯৪ খ্রীঃ সংগৃহীত এবং মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল পুঁথিশালায় রক্ষিত।

(খ) প্রায়-সম্পূর্ণ একখানি পুঁথি—তালপাতায় এবং তেলেগু হরফে লেখা—বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত।

(গ) তালপাতার লেখা—অসম্পূর্ণ—তেলেগু-হরফে লেখা—তেলেগু টীকা সহিত—আদিয়ার গ্রন্থাগারে রক্ষিত।

(ঘ) তালপাতার পুঁথি—অসম্পূর্ণ—তেলেগু-হরফে লেখা—আদিয়ার লাইব্রেরীতে রক্ষিত।

(ঙ) কাগজে লেখা পুঁথি—অসম্পূর্ণ তেলেগু-হরফে লেখা—আদিয়ার গ্রন্থাগারে রক্ষিত।

উল্লিখিত পুঁথিগুলি ছাড়াও ডঃ ঘোষ কুমারস্বামীর 'দি মিরর অফ জেশ্চার' গ্রন্থের এবং আরো কয়েকখানা পুঁথির সাহায্য নিয়েছেন।

(চ) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে দুখানি পুঁথি, একখান তেলেগু-

হরফে একখানি দেবনাগরী-হরফে লেখা একই পুঁথি। (পুঁথিখানি আঞ্জনেয় সম্প্রদায়ের কোন লোকের রচনা এবং অভিনয় ও তাল সম্বন্ধে লেখা।)

(ছ) পুণার ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউ-এ রক্ষিত গভর্ণমেণ্ট মেনাসক্রিফট লাইব্রেরীতে ৪২ সংখ্যক পুঁথি। পুঁথিখানি 'ভরতার্ণব' নামে পরিচিত।

(কারো কারো মতে অভিনয়দর্পণ ভরতার্ণবেরই একটি অংশ। কিন্তু এ মত ডঃ ঘোষ মানেন না।)

(জ) ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এ রক্ষিত সরকারের পুঁথি সংগ্রহশালার পরিশিষ্ট ১০নং পুঁথি।

অভিনয়দর্পণ রচয়িতা ও রচনাকাল

সকলেই জানেন প্রাচীন গ্রন্থের রচয়িতার এবং রচনাকালের প্রশ্ন উঠলে, অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের কথায় আমাদের বলতে হয়—'হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ।" তবে এ কথাও ঠিক, কবি যত সহজে 'গেছে যদি আপদ গেছে মিথ্যা কোলাহল' বলে উদাসীন থাকতে পারেন, ঐতিহাসিক বা গবেষক তত সহজে নিষ্কৃতি পান না। তাকে তন্ন তন্ন করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, নেতি নেতি করে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় এবং উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু অভিনয়দর্পণের রচয়িতার এবং রচনাকালের প্রশ্নেও আমাদের কবির কথার বাইরে বেশী কিছু বলার কি আছে? রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চিত যেটুকু জানা যায় তা এই যে, রচয়িতার নাম নন্দিকেশ্বর, তার বেশী যা সবই অনুমান। সমস্যা আরো জটিল হয়েছে একাধিক নন্দিকেশ্বরের, উপস্থিতিতে। বহু এবং বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থকার রূপে নন্দিকেশ্বরকে পাওয়া যায়। অভিনয় ছাড়াও তাল, রস, যোগ, তন্ত্র, কামশাস্ত্র, পূর্বমীমাংসা, শৈবতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের লেখক হিসাবে নন্দিকেশ্বরের নাম পাওয়া যায়। তাললক্ষণ, তালাদিলক্ষণ, তালাভিনয়লক্ষণ— এই তিনখানি তালবিষয়ক গ্রন্থের লেখক নন্দিকেশ্বর।

এমন পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন অনিবার্য—এক নন্দিকেশ্বরই কি এত বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থকার? অথবা নন্দিকেশ্বর একাধিক? কমপক্ষে দুজন? এবং

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের উত্তর সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যাঁরা দুই নন্দিকেশ্বরের পক্ষপাতী তাঁদের ধারণা—এক নন্দিকেশ্বর অভিনয়, তাল, রস প্রভৃতি বিষয়ের লেখক, অন্য নন্দিকেশ্বর কামশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, পূর্বমীমাংসা এবং লিঙ্গায়েত শৈবতন্ত্রের লেখক। কেউ কেউ কামশাস্ত্রের রচয়িতা ও অভিনয়দর্পণের রচয়িতাকে অভিন্ন মনে করার উদারতা দেখাতে প্রস্তুত বটে, কিন্তু অভিনয়-দর্পণের রচয়িতাকে যোগ, মীমাংসা এবং শৈবতন্ত্র প্রভৃতি গুরুগম্ভীর দার্শনিক বিষয়ের লেখকের মর্যাদা দিতে অসম্মত। অভিনয়শাস্ত্র নিয়ে যিনি চর্চা করবেন, নায়ক নায়িকার হাবভাব নিয়ে বা কামের বিচিত্ররূপ সম্বন্ধে তাঁকে চর্চা করতেই হবে, সুতরাং অভিনয়দর্পণ লেখকের পক্ষে কামশাস্ত্র আলোচনা একেবারে অসম্ভব বা অসঙ্গত ব্যাপার নয়। কিন্তু যোগ, মীমাংসা, শৈবদর্শন প্রভৃতি জটিল তত্ত্ব নিয়েও তিনি আলোচনা করছেন—এ কথা ভাবতে কেমন লাগে? নন্দিকেশ্বরকে সার্বভৌম পণ্ডিত মনে করতে এঁরা কুণ্ঠিত।

কিন্তু নন্দিকেশ্বর এক বা দুই যাই হোন না কেন, তাতে তার ব্যক্তি-পরিচয়ের পরিধি একটুও বৃদ্ধি পায় না। তবে লিঙ্গপুরাণের বিবরণে যে নন্দিকেশ্বরকে পাওয়া যায় তাকে এবং অভিনয়দর্পণের লেখককে অভিন্ন মনে করলে পরিধিটি সামান্য একটু বাড়তে পারে। লিঙ্গপুরাণের বিবরণে পাওয়া যায়—শিবের অনুচর নন্দিন বা নন্দিকেশ্বর পূর্বে মর্তলোকেরই লোক ছিলেন, এবং শিলাদনাম্নী এক অন্ধ রমণীর পুত্র ছিলেন। শিলাদ অমর পুত্রের জন্য শিবের কাছে প্রার্থনা করায় শিব নন্দী নামে এক পুত্র দান করেছিলেন এবং সেই নন্দীই পরে নন্দিকেশ্বর নামে খ্যাত ও শিবগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অমরত্বলাভ করেছিলেন। শিবানুচর নন্দিকেশ্বর—এই সংস্কারবশেই বোধহয় অভিনবগুপ্ত লিখেছিলেন—'তুণ্ডুমুনিশব্দৌ নন্দিভরতয়োর্ন্যামন" এবং অভিনব গুপ্তের উক্তির উপরে নির্ভর করে মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি মহাশয় নন্দিকেশ্বর ও তণ্ডুকে অভিন্ন মনে করে নন্দিকেশ্বরকেই 'নন্দী সংহিতার' রচয়িতার মর্যাদা দিয়েছেন। তার ধারণা—অভিনয়দর্পণ ঐ পূর্ণাঙ্গ নন্দীশ্বর সংহিতারই বিশেষ একটি অধ্যায়। সে যাই হোক, তণ্ডু ও নন্দীকেশ্বর অভিন্ন হলেও আমাদের অবস্থার ইতরবিশেষ কিছু হয় না। শুধু এইটুকুই বেশী জানা যায় যে, নন্দিকেশ্বরের অপর নাম তণ্ডু আর নন্দিকেশ্বর যে শিবভক্ত ছিলেন এই অনুমানের পক্ষে আরো একটি প্রবল সমর্থন পাওয়া যায়। নন্দিকেশ্বর

শিবভক্ত ছিলেন, এ সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রবল যুক্তি অভিনয়দর্পণের প্রথম শ্লোকটি—

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্‌ময়ম্।
আহার্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥

কিন্তু যারা অল্পে তুষ্ট নন এবং শিবভক্ত-এর সংখ্যা বাড়াতে কুণ্ঠিত তারা বলতে পারেন—

শিবকে নমস্কার করা হয়েছে বলেই নন্দিকেশ্বর শিবভক্ত ছিলেন, এ সিদ্ধান্ত করা সমীচিন হবে না এই কারণে যে, অভিনয়দর্পণ গ্রন্থে নন্দিকেশ্বর যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা হচ্ছে আঙ্গিক অভিনয় বিশেষ করে সেই সব আঙ্গিক অভিনয় যা নৃত্যের বা নৃত্তের উপযোগী, সুতরাং নৃত্যের বা নৃত্তের আদিগুরু শিবকে গ্রন্থারম্ভে নমস্কার করা নিছক প্রথানুসরণ হতে পারে।

কোন্ ধারণা কার মস্তিষ্কে প্রথম জন্মেছে তা না জানলে যেমন চিন্তার ধারাবাহিক ইতিহাসের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে তেমনি কার চিন্তার দ্বারা কে প্রভাবিত, কার কাছে কে ঋণী তাও ঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যেরই কথা, নন্দিকেশ্বরকে ব্যক্তিগত পরিচয়ের মতো, তাঁর কাল এবং তাঁর গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে আমরা খুবই অল্প জানি এবং সময়ের ঊর্ধ্ব এবং নিম্নসীমা নিয়ে অনুমান বা জল্পনা-কল্পনা করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমরা করতে পারি না।

প্রথমতঃ নিম্নসীমা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা যাক। তা করতে গেলে দেখা যাবে নন্দিকেশ্বরের তথা অভিনয়দর্পণের রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে নয়। ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, সংগীতরত্নাকরের গ্রন্থকার শারঙ্গদেব তাঁর গ্রন্থে নন্দিকেশ্বরের নাম উল্লেখ করে এবং সঙ্গীত বিশারদদের অন্যতম বলে নন্দিকেশ্বরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নন্দিকেশ্বরের জীবৎকালের নিম্নসীমা বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু নিম্নসীমা বড় কথা নয় আসল সমস্যা ঊর্ধ্বসীমা নিধারণ করা। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্ন সামনে রেখে অগ্রসর হতে পারি।

(ক) নন্দিকেশ্বর কি ভরতের সমসাময়িক?

(খ) নন্দিকেশ্বর কি ভরতের পূর্ববর্তী?

(গ) নন্দিকেশ্বর কি ভরতের পরবর্তী এবং পরবর্তী হলে কত পরবর্তী?

সমসাময়িক বাদীদের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা যেতে পারে যে, যেহেতু

নন্দিকেশ্বর এবং তণ্ডু অভিন্ন ব্যক্তি এবং তণ্ডুই ভরতকে তাণ্ডবনৃত্য শিখিয়েছিলেন, সেইহেতু নন্দিকেশ্বর এবং ভরত সমসাময়িক। তাঁদের সমসাময়িক আর একটি প্রমাণ—নাট্যশাস্ত্রের (কাব্যমালা সংস্করণের) একটি সমাপ্তি বচন—'সমাপ্তশ্চায়ং নন্দিভরত সংগীত পুস্তকম্'। এই রচনাটির উপর ভিত্তি করে কোন কোন গবেষক বলতে চেয়েছেন যে, নন্দিকেশ্বরের এবং ভরতের আদি গ্রন্থের সংযোগে প্রচলিত নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়েছে। সে যাই হোক, 'নন্দিভরত সংগীত পুস্তক' কথাটি এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, উভয়ে সমসাময়িক। নাট্যশাস্ত্রর বর্ণিত অঙ্গাভিনয়ের সঙ্গে (৮ম-২১শ অধ্যায়) অভিনয়দর্পণের আলোচ্য বিষয়ের অনেকাংশে সাদৃশ্য রয়েছে বলে এসব প্রশ্নও অনেকে তুলেছেন। তবে কি উভয়েই অপর কোন নাট্যাবিদের কাছে ঋণী? ভরত নন্দিকেশ্বরের কাছে ঋণী? অথবা নন্দিকেশ্বর ভরতের কাছে ঋণী। সমসাময়িকবাদীরা নিশ্চয়ই বলবেন—উভয়েই অপর কোন প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রবিদের কাছে ঋণী। যাঁরা নন্দিকেশ্বরকে প্রাচীনতর বলতে চাইবেন তাদের বক্তব্য বোধ হয় এই হবে যে, ভরত তণ্ডুর কাছে নৃত্য ও নৃত্ত শিখেছিলেন, সুতরাং তণ্ডু বা নন্দিকেশ্বর ভরতের গুরুস্থানীয় আর সমসাময়িক হলেও বৃদ্ধ সমসাময়িক। তণ্ডুর পূর্ববর্তিতার আর একটি প্রমাণ এই যে, নন্দিকেশ্বরে যা সংক্ষিপ্তাকারে, ভরতে তাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেহেতু বিস্তারিত-এর চেয়ে সংক্ষিপ্তেরই পূর্ববর্তী হওয়া স্বাভাবিক, নন্দিকেশ্বর ভরতের পূর্ববর্তী। এই দুই পক্ষের বিপরীত কোনটিতে আছেন তাঁরা, যাঁরা নন্দিকেশ্বরকে ভরতের পরবর্তী বলেই মনে করেন। আমার ধারণা—সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সামনে রেখে বিচার করলে, নন্দিকেশ্বরকে ভরতের পরবর্তী বলে গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। সমসাময়িকবাদীরা বা পূর্ববর্তিবাদীরা বড় একটি প্রমাণকে উপেক্ষা করেছেন বলেই আমি মনে করি। সেই বড় প্রমাণটি এই যে, স্বয়ং নন্দিকেশ্বর বহু স্থলে ভরতের পূর্ববর্তিতা স্বীকার করেছেন। প্রথমতঃ তিনি স্বীকার করেছেন—'নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায়চতুর্মুখঃ এবং 'প্রয়োগমুদ্ধতং স্মৃত্বা স্বপ্রযুক্তং ততো হরঃ। তণ্ডুনা স্বগণাগ্রণ্যা ভরতায় ন্যদীদিশৎ॥' অর্থাৎ—নাট্যবেদ ব্রহ্মা প্রথম ভরতকে দান করেছিলেন এবং হরের নির্দেশে তণ্ডু ভরতকে প্রথম তাণ্ডবাদি নৃত্ত শিখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, (গ্রন্থের বহু স্থলে তিনি ভরতকে স্মরণ তথা পূর্বাচার্য বলে স্বীকার করেছেন। যথা—

মুনিভির্ভরতাদিতিঃ (১০), নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ (৪৪, ৫৯), প্রয়োগো ভরতাদিভিঃ (৫১), পূর্বসূরিভিঃ (৫৬), নাট্যকোবিদৈঃ (৬৮), ভরতোত্তমৈঃ (৮৬), যুজ্যতে ভরতাদিভিঃ (১০৪), ভরতাগমকোবিদৈঃ (১১১, ১৪৮, ২১৭, ২৩০), কীর্তিতো ভরতাগমে (১৪৪), ভরতবেদিভিঃ (১৪৬), পূর্বৈর্ভরতাদিভিঃ (১৫৬), ভরতাগমবেদিভিঃ (১৬৪, ২২৭, ২২৯), ইত্যাহুর্ভরতাদয়ঃ (১৭০), নাটশাস্ত্রার্থ-কোবিদৈঃ (১৮৮), মুনিভির্ভরতাদিভিঃ (২০৪, ২০৫), ভরতকোবিদৈঃ (২০৭), ভরতাগমদির্শিভিঃ (২২৫, ২৩২), বিখ্যাতং ভরতাদিভিঃ (২৩৮), নাট্যশাস্ত্র-বিশারদৈঃ (২৬০, ২৭৬), ভরতোদিতা (২৬৬), প্রসিদ্ধা ভরতাগমে (২৮৪) প্রভৃতি উক্তি থেকে এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, নন্দিকেশ্বর সংজ্ঞা-নির্ণয়ে এবং বিনিয়োগ নির্ধারণে ভরতের নাট্যশাস্ত্রকেই (ভরত ও ভরতাগম নামেও যা প্রসিদ্ধ ছিল) বার বার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর জ্ঞান যে নাট্যশাস্ত্র-বিশারদদের, বা ভরতাগমকোবিদদের কাছ থেকে পাওয়া, এ কথা তিনি বার বার স্বীকার করেছেন ! এতো স্পষ্ট প্রমাণ থাকতেও নন্দিকেশ্বরের কাছে ভরতকে ঋণী প্রমাণ করতে অথবা উভয়কে সমসাময়িক মনে করে উভয়কেই তৃতীয় কোন নাট্যকোবিদের কাছে ঋণী বলে ঘোষণা করতে যাওয়া নিরর্থক গবেষণা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অভিনয়দর্পণ ভরতার্ণবেরই সংক্ষিপ্ত একটি অংশ হোক আর ভরতার্ণব নন্দিকেশ্বরেরই রচনা হোক, নন্দিকেশ্বর যে ভরতের কাছে ঋণী এবং ভরতের পরবর্তী লোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অভিনয়দর্পণের বর্তমান রূপ অন্ততঃ এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থক।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তই করছি যে, ভরতের পরবর্তী কালেই নন্দিকেশ্বর এসেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একাধিক শতাব্দীর ব্যবধান থাকাও অসম্ভব নয়।

রামায়ণই বাল্মীকিকে এবং মহাভারতই বেদব্যাসকে মহাকবির প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাল্মীকির রচনা বলেই রামায়ণ বা বেদব্যাসের রচনা বলেই মহাভারত মহাকাব্য হয়নি, রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য হয়েছে বলেই বাল্মীকি—বেদব্যাস মহাকবি।

আমরা, অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলতে পারি—'আলোচ্য অভিনয়দর্পন গ্রন্থখানিতে নন্দিকেশ্বর-সম্প্রদায়ের প্রচলিত অঙ্গাভিনয়-পদ্ধতির কিয়দংশ মাত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে" (অভিনয়দর্পণের ভূমিকা)।

নন্দিকেশ্বর শুধু 'নৃত্যমাত্রোপযোগিনি' যেগুলি, সেইগুলিরই আলোচনা করেছেন।

আঙ্গিক অভিনয়ের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ বলা হবে সেখানেই, যেখানে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে, আর অসম্পূর্ণ আলোচনা বলা হবে তাকেই, যে আলোচনায় অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বর্ণনা থাকবে না। এই সূত্র প্রয়োগ করেই আমরা নাট্যশাস্ত্রের এবং অভিনয় দর্পণের সম্পূর্ণতার বিচার করব।

প্রথমতঃ দেখা যাক্ ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে আঙ্গিক অভিনয় বর্ণনায় কোন্ কোন্ অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর নন্দিকেশ্বরই বা তাঁর অভিনয়দর্পণে কোন্ কোন্ অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গকে স্থান দিয়েছেন? ভরত লিখেছেন—

ত্রিবিধস্ত্বাঙ্গিকো জ্ঞেয়ঃ শারীরো মুখজস্তথা।
তথা চেষ্টাকৃতশ্চৈব শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ॥
শিরোহস্তকটিবক্ষঃ পার্শ্বপাদসমন্বিতঃ।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গসংযুক্তঃ ষড়ঙ্গো নাট্যসংগ্রহঃ॥

তস্য শিরোহস্তোরঃ পার্শ্বকটীপাদত অঙ্গানি, নেত্রভ্রূনাসাধরকপোলঃ চিবুকান্যুপাঙ্গানি।

ভরতমতে—১। শিরঃকর্ম—সংখ্যা ১৩

(উত্তমাঙ্গের ২। দৃষ্টি—(ক) রসদৃষ্টি—৮
অভিনয়) (খ) স্থায়িভাব দৃষ্টি—৮ } ৩৬
(গ) সঞ্চারী দৃষ্টি—২০

৩। তারাকর্ম—৯
৪। দর্শনবিধি—৮
৫। পুটকর্ম—৯
৬। ভ্রূকর্ম—৭
৭। নাসাকর্ম—৬
৮। গণ্ডকর্ম—৬
৯। অধরকর্ম—৬
১০। চিবুককর্ম—৬

১১। মুখরাগ—৪

১২। মুখকর্ম—৬

১৩। গ্রীবাকর্ম—৯

(উপাঙ্গ অভিনয়) ১৪। হস্তকর্ম—অসংযুত—২৪ }
হস্তকর্ম—সংযুত—১৩ } ৬৭
নৃত্তহস্ত—*৩০ }

১৫। হস্তের করণ—৪

১৬। বাহুকর্ম—১০

১৭। উরঃকর্ম—৫

১৮। পার্শ্বকর্ম—৫

১৯। উদরকর্ম—৩।৪

২০। কটীকর্ম—৫

২১। উরুকর্ম—৫

২২। জঙ্ঘাকর্ম—৫

২৩। পাদকর্ম—৫

২৪। চারী (ভৌমী)—১৬
চারী (আকাশিকা)—১৬

২৫। স্থান—৬

২৬। ন্যায় (শস্ত্র মোক্ষণে)—৪

২৭। মণ্ডল (আকাশগ)—১০
মণ্ডল (ভূমিগ)—১০

২৮। গতি—

নন্দিকেশ্বরের মতে—আঙ্গিক অভিনয় হচ্ছে—'অঙ্গোপাঙ্গপ্রত্যঙ্গৈস্ত্রেধা প্রকাশতঃ।'

অঙ্গ=শির, হস্ত বক্ষ, পার্শ্ব, কটীতট, পাদ—মোট ছয়টি (কারো কারো মতে 'গ্রীবা' ও একটি অঙ্গ)

প্রত্যঙ্গ=স্কন্ধ, বাহু, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা—মোট ছয়টি (কারো কারো মতে=মণিবন্ধ, জানু, কূর্পর)।

* অধ্যাপক শাস্ত্রী এবং ডাঃ ঘোষ-২৭ প্রকার নৃত্তহস্ত কোথায় পেলেন ?

উপাঙ্গ=দৃষ্টি, ভ্রূ, পুট, তারা, কপোল, নাসিকা, হনু, অধর, দশন, জিহ্বা, চিবুক বদন (শিবের) পার্ষ্ণি, গুলফ্, অঙ্গুলি (করে ও পদে)—মোট পনেরটি।

উল্লিখিত অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গের মধ্যে নন্দিকেশ্বর নিম্নলিখিত কর্মের বর্ণনা করেছেন—

১। শিরোভেদ—৯ (নাট্যশাস্ত্রে—১৩)

২। দৃষ্টিভেদ—৮

(নাট্যশাস্ত্রে দৃষ্টিকর্ম ৩৬ এবং দৃষ্টিবিধি ৮। এখানে ভরতোক্ত দৃষ্টিবিধিকেই শুধু গ্রহণ করা হয়েছে।)

৩। গ্রীবাভেদ—৪ (নাঃ শাঃ—৯)

৪। হস্তভেদ—(ক) অসংযুক্ত হস্ত—২৮ (নাঃ শাঃ—২৪)

(খ) *সংযুক্ত হস্ত—২৩ (নাঃ শাঃ—১৩)

(গ) দশাবতারহস্ত—১০

(ঘ) জাতিহস্ত—৪

(ঙ) বান্ধবহস্ত—১১

(চ) নৃত্তহস্তের গতি—৫

(ছ) নৃত্তহস্ত—১৩

(জ) নবগ্রহহস্ত—৯

৫। পাদভেদ—৪ (নাঃ শাঃ—৫)

৬। মণ্ডলভেদ—১০ (নাঃ শাঃ ১৮)

৮। স্থানকভেদ—৬ (ঐ)

৮। উৎপ্লবন ভেদ—৫ (ঐ ×)

৯। ভ্রমরী ভেদ—৭ (ঐ ×)

১০। চারিভেদ—৮ („ „ ১৬)

১১। গতিভেদ—১০ („ „ ×)

সাধারণ তুলনামূলক আলোচনায় প্রথমেই দেখা যাচ্ছে—ভরত যেখানে—শির, দৃষ্টি, তারা, পুট, ভ্রূ,-নাসিকা, গণ্ড, অধর, চিবুক, মুখ, গ্রীবা, হস্ত, বাহু,

* ত্রয়োবিংশতিরিত্যুক্তাঃ পূর্বৈর্ভরতাদিভিঃ?

উরঃ, পার্শ্ব, উদর, কটী, উরু, জঙ্ঘা, পাদ—এই ২০টি অঙ্গোপাঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্ম বিনির্ণয় করেছেন, নন্দিকেশ্বর সেখানে শুধু শির, দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত, পাদ—এই ৫টি অঙ্গের ভেদ নির্ণয় করেছেন। দ্বিতীয়তঃ,—নৃত্যে উপযোগিতা আছে কি নেই, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে, অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্বাচন করলেও, নন্দিকেশ্বর ভরতোক্ত ৩৬ প্রকার ভাবদৃষ্টি (রসদৃষ্টি + স্থায়িভাবদৃষ্টি + সঞ্চারিভাবদৃষ্টি) বাদ দিয়ে অভিনয়দর্পণের অঙ্গহানি ঘটিয়েছেন বলেই আমার ধারণা। তৃতীয়তঃ, 'পূর্ব গৈর্ভরতাদিভিঃ' বলে দোহাই দিলেও, হস্ত-ভেদ-পরিকল্পনায় নন্দিকেশ্বর অনেক নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে মোট হস্তকর্ম—৬৭, অভিনয়দর্পণে হস্তভেদ মোট—১০৩। তারপর, উৎপ্লবন, ভ্রমরী, গতি প্রভৃতি যে সব বিষয়ের ভেদ বর্ণনা করেছেন, নাট্যশাস্ত্রে সেইসব বিষয়কে পৃথকভাবে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি।

ভরত এবং নন্দিকেশ্বরকে পাশাপাশি রেখে দেখলে তাঁদের ঐক্যের ও পার্থক্যের ছবিটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

	ভরত (*কর্ম)	নন্দিকেশ্বর (*ভেদ)
১।	শিরঃকর্ম—১৩	শিরোভেদ—৯
২।	দৃষ্টিকর্ম—৩৬	
	*দৃষ্টিবিধি—৮	দৃষ্টিভেদ—৮০
৩।	তারাকর্ম—৯	×
৪।	পুটকর্ম—৯	×
৫।	ভ্রুকর্ম—৭	×
৬।	নাসাকর্ম—৬	×
৭।	গণ্ডকর্ম—৬	×
৮।	অধরকর্ম—৬	×
৯।	চিবুককর্ম—৬	×
১০।	মুখকর্ম—৬	×
১১।	মুখরাগ—৪	×
১২।	গ্রীবাকর্ম—৯	গ্রীবাভেদ—৪

	ভরত (*কর্ম)			নন্দিকেশ্বর (*ভেদ)
১৩।	হস্তকর্ম	(ক)	অসংযুক্ত—২৪	(ক) ২৮
		(খ)	সংযুক্ত—১৩	(খ) ২৩
		(গ)	নৃত্তহস্ত—৩০	(গ) ১৩
		(ঘ)	×	(ঘ) দশাবতার হস্ত—১
		(ঙ)	×	(ঙ) জাতিহস্ত—৪
		(চ)	×	(চ) বান্ধব হস্ত—১১
		(ছ)	×	(ছ) নৃত্তহস্তের গতি—৫
		(জ)	×	(জ) নবগ্রহ হস্ত—৯
		(ঝ)	হস্তের করণ	(ঝ) ×
১৪।	বাহুকর্ম—৪			×
১৫।	উরঃকর্ম—৫			×
১৬।	পার্শ্বকর্ম—৫			×
১৭।	উদরকর্ম—৩ বা ৪			×
১৮।	কটিকর্ম—৫			×
১৯।	উরুকর্ম—৫			×
২০।	জঙ্ঘাকর্ম—৫			×
২১।	পাদকর্ম—৫			পাদভেদ—৪
২২।	চারী—৩২			চারী—৮
২৩।	স্থান—৬			স্থানভেদ—৬
২৪।	ন্যায়—৪			×
২৫।	মণ্ডলভেদ—১০			মণ্ডলভেদ—১০
২৬।	গতি—(*বহু প্রকার)			গতিভেদ—১০
২৭।	আসন—(পাত্রোচিত)			×
২৮।	×			ভ্রমরী ভেদ—৭
২৯।	×			উৎপ্লবন ভেদ—৫

'নৃত্যমাত্রোপযোগিনি কথ্যন্তে লক্ষণৈঃ ক্রমাৎ।
অঙ্গানাং চলনাদেব প্রত্যঙ্গোপাঙ্গয়োরপি।
চলনং প্রভবেত্তস্মাৎ সর্বেষাং নাত্র লক্ষণম ॥

একথা নন্দিকেশ্বর ঘোষণা করলেও, আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, গ্রন্থকার অভিনয়দর্পন নাম না রেখে নৃত্যদর্পণ রাখলেও, অসম্পূর্ণতার অভিযোগ এড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না এবং কেন হত না তা আশা করি, এই আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই সাধারণ তুলনামূলক আলোচনার স্তর অতিক্রম করে বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করলে, উভয়ের ঐক্য ও পার্থক্যের রূপটি আরো ফুটে উঠবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে বিশেষ আলোচনা করতে হলে নামকরণ, লক্ষণ এবং বিনিয়োগ সম্বন্ধে যতখানি বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার, এখানে সে অবকাশ নেই। তাই আমি নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দর্পণ উভয়েই যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, তাদের শ্রেণীবিভাগকে পাশাপাশি রেখে ঐক্য ও পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করব এবং লক্ষণ ও বিনিয়োগের ঐক্য ও পার্থক্য দেখাতে বিরত থাকব।

(ক) শিরকর্ম

ভরত	নন্দিকেশ্বর
১। আকম্পিত	*১। সম
২। কম্পিত	*২। উদ্বাহিত (৬)
৩। ধুত	*৩। অধোমুখ (১২)
৪। বিধুত	*৪। আলোলিত (১৩)
৫। পরিবাহিত	*৫। ধুত (৩)
৬। উদ্বাহিত	*৬। কম্পিত (২)
৭। অবধুত	*৭। পরাবৃত্ত (১০)
৮। অঞ্চিত	*৮। উৎক্ষিপ্ত (১১)
৯। নিহঞ্চিত	*৯। পরিবাহিত (৫)
১০। পরাবৃত্ত	×
১১। উৎক্ষিপ্ত	×
১২। অধোগত	×
১৩। লোলিত	×

(খ) দৃষ্টিবিধি

ভরত	নান্দকেশ্বর
১। সম	১। সম
২। সাচী	২। আলোকিত (৪)
৩। অনুবৃত্ত	৩। সাচী (২)
৪। আলোকিত	৪। প্রলোকিত (৬)
৫। বিলোকিত	৫। নির্মীলিত
৬। প্রলোকিত	৬। উল্লোকিত (৭)
৭। উল্লোকিত	৭। অনুবৃত (৩)
৮। অবলোকিত	৮। অবলোকিত (৮)

(গ) গ্রীবা

ভরত	নন্দিকেশ্বর
১। সমা	১। সুন্দরী
২। নতা	২। তিরশ্চীনা
৩। উন্নতা	৩। পরিবর্তিতা
৪। ত্র্যস্রা	৪। প্রকম্পিতা
৫। রেচিতা	*(কোনও মিল·নেই
৬। কুঞ্চিতা	×
৭। অঞ্চিতা	×
৮। বলিতা	×
৯। বিবৃত্তা	×

(ঘ) অসংযুতহস্ত

ভরত	[illegible]
১। পতাক	১। পতাক (১)
২। ত্রিপতাক	২। ত্রিপতাক (২)
৩। কর্তরীমুখ	৩। অর্ধপতাক
৪। অর্ধচন্দ্র	৪। কর্তরীমুখ (৩)
৫। অরাল	৫। ময়ূরাক্ষ

ভরত	নন্দিকেশ্বর
৬। শুকতুণ্ড	৬। অর্ধচন্দ্র (৪)
৭। মুষ্টি	৭। অরাল (৫)
৮। শিখর	৮। শুকতুণ্ডক (৬)
৯। কপিত্থ	৯। মুষ্টি (৭)
১০। কটকামুখ	১০। শিখর (৮)
১১। সূচ্যাস্ত (সূচীমুখ)	১১। কপিত্থ (৯)
১২। পদ্মকোশ	১২। কটকামুখ (১০)
১৩। সর্পশীর্ষ	১৩। সূচী (১১)
১৪। মৃগশীর্ষ	১৪। চন্দ্রকলা
১৫। কাঙ্গুল	১৫। পদ্মকোশ (১২)
১৬। অলপদ্ম (অলপল্লব)	১৬। সর্পশির (১৩)
১৭। চতুর	১৭। মৃগশীর্ষ (১৪)
১৮। ভ্রমর	১৮। সিংহমুখ
১৯। হংসাস্য	১৯। কাঙ্গুল (১৫)
২০। হংসপক্ষ	২০। অলপদ্মক (১৭)
২১। সন্দংশ	২১। চতুর (১৮)
২২। উর্ণনাভ	২২। ভ্রমর (১৯)
২৩। তাম্রচূড়	২৩। হংসাস্য (২০)
×	২৪। হংসপক্ষক (২১)
×	২৫। সন্দংশ (২১)
×	২৬। মুকুল
×	২৭। তাম্রচূড় (২৩)
	২৮। ত্রিশূলক

(খ) সংযুক্তহস্ত

ভরত	নন্দিকেশ্বর
১। অঞ্জলি	১। অঞ্জলি (১)
২। কপোত	২। কপোত (২)
৩। কর্কট	৩। কর্কট (৩)

ভরত	নন্দিকেশ্বর
৪। স্বস্তিক	৪। স্বস্তিক (৪)
৫। কটকাবর্ধমানক	৫। ডোল (দোল) (৮)
৬। উৎসঙ্গ	৬। পুষ্টপুট (৯)
৭। নিষধ	৭। উৎসঙ্গ (৬)
৮। দোল	৮। শিবলিঙ্গ
৯। পুষ্পপট	৯। কটকাবর্ধন (৫)
১০। মকর	১০। কর্তরী স্বস্তিক
১১। গজদন্ত	১১। শকট
১২। অবহিত্থ	১২। শঙ্খ
১৩। বর্ধমান	১৩। চক্র
×	১৪। সম্পুট
×	১৫। পাশ
×	১৬। কীলক
×	১৭। মৎস্য
×	১৮। কূর্ম
×	১৯। বরাহ
×	২০। গরুড়
	২১। নাগবন্ধ
	২২। খট্বা
	২৩। ভেরুণ্ড

(চ) নৃত্তহস্ত

ভরত	নন্দিকেশ্বর
১। চতুরস্র	১। পতাক
২। উদ্‌বৃত্ত (তালবৃন্তক)	২। স্বস্তিক্ (৪)
৩। তলমুখ	৩। ডোলাহস্ত
৪। স্বস্তিক	৪। অঞ্জলি
৫। অরালখটকামুখ	৫। কটকাবর্ধন
৬। আবিদ্ধবক্ত্রক	৬। শকট

ভরত	নন্দিকেশ্বর
৭। সূচীমুখ	৭। পাশ
৮। রেচিত	৮। কীলক
৯। অর্ধরেচিত	৯। কপিত্থ
১০। উত্তানবঞ্চিত	১০। শিখর
১১। পল্লব	১১। কূর্ম
১২। নিতম্ব	১২। হংসাস্য
১৩। কেশবন্ধ	১৩। অলপদ্ম
১৪। লতা	* * *
১৫। করিহস্ত	
১৬। পক্ষবঞ্চিতক	
১৭। পক্ষপ্রদ্যোতক	
১৮। দণ্ডপক্ষ	
১৯। ঊর্ধ্বমণ্ডলী	
২০। পার্শ্বমণ্ডলী	
২১। উরোমণ্ডলী	
২২। উরঃপার্শ্বার্ধমণ্ডল	
২৩। মুষ্টিকস্বস্তিক	
২৪। নলিনীপদ্মকোশ	
২৫। অলপল্লব	
২৬। উল্বন	
২৭। বলিত	
২৮। বিপ্রবীর্ণ	
২৯। গরুড়পক্ষ	
৩০। ললিত	

(ছ) পাদকর্ম ও পাদভেদ

ভরত	নন্দিকেশ্বর
১। উদ্‌ঘট্টিত	১। মণ্ডল
২। সম	২। উৎপ্লবন

ভরত	নন্দিকেশ্বর
৩। অগ্রতল সঞ্চর	৩। ভ্রমরী
৪। অঞ্চিত	৪। পাদচারিকা
৫। কুঞ্চিত	

(জ) চারী

ভরত	নন্দিকেশ্বর
(ক) ভৌমচারী (১৬)	
১। সমপাদ	১। চলন
২। স্থিতাবর্ত	২। চংক্রমণ
৩। শকটাস্য	৩। সরণ
৪। অধ্যর্ধিকা	৪। বেগিনী
৫। চাষগতি	৫। কুট্টন
৬। বিচ্যবা	৬। লুণ্ঠিত
৭। এলকাক্রীড়িতা	৭। লোলিত
৮। বদ্ধা	৮। বিষমসঞ্চর
৯। উরুদ্বৃত্তা	*(কোন মিল নেই
(ক) ভৌমচারী	
১০। অড্ডিতা	
১১। উৎস্পন্দিতা	
১২। জনিতা	
১৩। স্যন্দিতা	
১৪। অপস্যন্দিতা	
১৫। সমোৎসরিতমণ্ডলী	
১৬। মণ্ডলী	
(খ) আকাশচারী (১৬)	
১। অতিক্রান্তা	
২। অপক্রান্তা	
৩। পার্শ্বক্রান্তা	
৪। ঊর্ধ্বজানু	

ভরত	নন্দিকেশ্বর
৫। সূচী	
৬। নূপুরপাদিকা	
৭। দোলপাদা	
৮। আক্ষিপ্তা	
৯। আবিদ্ধা	
১০। উদ্বৃত্তা	
১১। বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তা	
১২। অলাতা	
১৩। ভূজঙ্গত্রাসিতা	
১৪। হরিণপ্লুতা	
১৫। দণ্ডপাদা	
১৬। ভ্রমরী	

(ঝ) স্থান

ভরত	নন্দিকেশ্বর
১। বৈষ্ণব	১। সমপাদ
২। সম্পাদ	২। একপাদ
৩। বৈশাখ	৩। নাগবন্ধ
৪। মণ্ডল	৪। ঐন্দ্র
৫। আলীঢ়	৫। গারুড়
৬। প্রত্যালীঢ়	৬। ব্রহ্ম

(ঞ) মণ্ডলভেদ

ভরত	নন্দিকেশ্বর
(ক) আকাশ(গ)	
১। অতিক্রান্ত	১। স্থানক
২। বিচিত্র	২। আয়ত
৩। ললিত সঞ্চর	৩। আলীঢ়
৪। সূচীবিদ্ধ	৪। প্রত্যালীঢ়
৫। দণ্ডপাদ	৫। প্রেঙ্খণ

ভরত

৬। বিহৃত
৭। অলাতক
৮। বামাবিদ্ধ
৯। ললিত
১০। ক্রান্ত
(ভৌম—)
১১। ভ্রমর
১২। অস্কন্দিত
১৩। আবর্ত
১৪। সমোৎসরিত
১৫। এলকাক্রীড়িত
১৬। অড্ডিত
১৭। শকটাস্য
১৮। অধ্যর্ধক
১৯। পিষ্টকুট্ট
২০। সম

নন্দিকেশ্বর

৬। প্রেরিত
৭। স্বস্তিক
৮। মোটিত
৯। সমস্থচী
১০। পার্শ্বস্থচী

(ট) গতি

ভরত

১। (গতির শ্রেণীবিভাগ না করলেও ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের সমগ্র দ্বাদশ অধ্যায়ে 'গতি'-প্রচার নিয়ে আলোচনা করেছেন।)

নন্দিকেশ্বর

১। হংসী গতি
২। ময়ূরী গতি
৩। মৃগী গতি
৪। গজলীলা গতি
৫। তুরঙ্গিণী গতি
৬। সিংহী গতি
৭। ভুজঙ্গী গতি
৮। মণ্ডূকী গতি
৯। বীরা গতি
০। মানবী গতি

নাট্যশাস্ত্রের এবং অভিনয়দর্পণের তুলনামূলক আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক্।

অভিনয়দর্পণ, যা যা নৃত্যোপযোগী শুধু সেই সেই বিষয় আলোচনা করতে চেষ্টা করেছে এবং নাট্যশাস্ত্র নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—এই ত্রিবিধের নটনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সব কিছু আলোচনা করেছে।

অভিনয়দর্পণে 'নটন'কে নাট্য, নৃত্ত এবং নৃত্য—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু এই তিন প্রকার নটনের লক্ষণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত।

প্রথমতঃ নাট্য ও নাটককে সমার্থক করে নন্দিকেশ্বর ভরত-নির্ধারিত শ্রেণীভেদ থেকে দূরে সরে এসেছেন, কারণ, নাটক দশরূপকের অন্যতম খ্যাতবৃত্ত অবলম্বনে রচিত দৃশ্য কাব্য, নাট্যমাত্রেই নাটক নয়। দ্বিতীয়তঃ, নাট্যের শ্রেণী-বিভাগ বিষয়ে সচেতন থাকেননি। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অধিক আলোচনা দাবী করতে পারে নৃত্ত এবং নৃত্য এই দুটি শব্দ। প্রথমে প্রশ্ন জাগে—নৃত্ত ও নৃত্যের এই পার্থক্য নন্দিকেশ্বর নিজেই করেছেন, অথবা পূর্বাচার্য ভরতের কাছ থেকে পেয়েছেন? এই প্রশ্নটির আলোচনা দুই কারণে আবশ্যক। প্রথম কারণ—নন্দিকেশ্বর এবং পরবর্তী গ্রন্থকারগণ নৃত্য ও নৃত্তকে পৃথক্ বলেই মনে করেছেন, দ্বিতীয় কারণ—ভরত যদি নৃত্ত ও নৃত্যের মধ্যে ভেদ কল্পনা না করে থাকেন, অন্ততঃ এমন কিছু না বলে থাকেন যা এই ভেদ কল্পনাকে প্ররোচিত করতে পারে তা হলে নন্দিকেশ্বরই—অবশ্য অন্য ঈশ্বরের অভাবে—ভেদ কল্পনার কৃতিত্ব দাবী করতে পারবেন। ভেদ কল্পনার উৎস সন্ধানে বের হওয়ার আগে দেখা যাক্ অভিনয়দর্পণে নৃত্ত এবং নৃত্যের কি লক্ষণ নিরূপণ করা হয়েছে, পরে দেখা যাবে সেই লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় কিনা।

নন্দিকেশ্বরের মতে—'ভাবাভিনয়হীনংতু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে।' অর্থাৎ—যে নটন ভাবাভিনয়হীন তার নাম নৃত্ত। আর নৃত্য হচ্ছে—'রসভাবব্যঞ্জনাদিযুক্তম্।' এই সংজ্ঞা ছাড়াও নৃত্য সম্বন্ধে আরো বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় 'নাট্যক্রম' আলোচনা প্রসঙ্গে। সেখানে গ্রন্থকার লিখছেন—

'নৃত্যং গীতাভিনয়ং ভাবতালযুতং ভবেৎ।
আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ ভাবং তালমাচরৎ॥

অর্থাৎ নৃত্য হচ্ছে ভাবতালযুক্ত গীতাভিনয়। নৃত্যের সময় মুখে থাকবে গান, হস্তে থাকবে অঙ্গব্যঞ্জক নানা মুদ্রা বা হস্তকর্ম, চোখে থাকবে ভাবের অভিব্যক্তি এবং পায়ে রাখতে হবে তাল। তা হলে এখানেও দুয়ের পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে এই যে—নৃত্য হচ্ছে ভাবতালযুক্ত গীতাভিনয়ন, আর নৃত্ত হচ্ছে—ভাবাভিনয়হীন গীতাভিনয়হীন শুধু তালযুক্ত নটন। নৃত্যে—আঙ্গিক-আহার্য সাত্ত্বিক—এই তিন অভিনয়-এরই প্রাধান্য, নৃত্তে শুধু আঙ্গিক অভিনয়েরই—তালযুক্ত অঙ্গচালনারই প্রাধান্য। বলাবাহুল্য, পরবর্তীকালে দশরূপককার ধনঞ্জয় নৃত্যকে ভাবাশ্রয় এবং নৃত্তকে তাললয়াশ্রয় বলে নন্দিকেশ্বর-এর ভেদ কল্পনাকেই অনুসরণ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে, কৈশিকী যোজনা প্রসঙ্গে প্রথম নৃত্য শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়—পাওয়া যায়' নৃত্তাঙ্গহারসম্পন্না রসভাবক্রিয়াত্মিকা।' নৃত্ত শব্দটির টীকা করতে অভিনবগুপ্ত লিখেছেন, 'নর্তনং নৃত্তম্। গাত্রাণামঙ্গোপাঙ্গানাং বিলাসেন ক্ষেপঃ। ন তু কেনচিৎ কর্তব্যাংশেন। লোকোহপ্যেবংবিধবিষয়ে এবমেব আহ—নৃত্যতীব গচ্ছতি। 'টীকাকারের 'ন তু কেনচিৎ কর্তব্যাংশেন' কথাটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে– নৃত্ত, অঙ্গোপাঙ্গাদির সবিলাস এবং কর্তব্যনিরপেক্ষ ক্ষেপ বা সঞ্চালন। এখানেই বলা হয়েছে—নীলকণ্ঠের নৃত্যে 'কৈশিকী প্রথম দেখা দিয়েছিল। তারপর নৃত্য কথাটি পাওয়া যাচ্ছে 'তাণ্ডবলক্ষণ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে মহাদেবের··· 'ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং···' উক্তিটিতে। এই নৃত্য নানা করণসংযুক্ত অঙ্গহারে অলংকৃত। টীকাকার অভিনব গুপ্তই এই 'নৃত্য'কে যে নৃত্ত বলেই মনে করেছেন এর প্রমাণ' 'নৃত্তকর্মণি' 'নৃত্তেন মিশ্রিত' 'নৃত্তবিরহিতম্'···প্রভৃতি প্রয়োগ। তারপর অঙ্গহার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'নৃত্ত' কথাটি বহুবার প্রযুক্ত হয়েছে। 'হস্তপাদ-সমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ'।···'দ্বেনৃত্তকরণেচৈব ভবতো নৃত্তমাতৃকা' শেষোক্ত পংক্তির টীকায় অভিনব গুপ্ত লিখেছেন—'নৃত্তস্যাঙ্গহারাত্মনো মাতৃকা উৎপত্তিকারণম্।' এ থেকে জানা যাচ্ছে—নৃত্তের আত্মা হচ্ছে 'অঙ্গহার' (অঙ্গানাং দেশান্তরে প্রাপণপ্রকারোহঙ্গহারঃ)।

অষ্টোত্তরশত করণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত যা লিখেছেন, তা নৃত্ত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে খুবই সহায়ক। তিনি লিখেছেন—'অভিনয়ে বস্তুত্বেন যন্নৃত্তং বক্ষ্যতে অভিনয়ান্তরালবর্তিচ্ছিদ্র-প্রচ্ছাদনাদেতৎ প্রযুজ্যতে। শস্ত্রাদিযুদ্ধে,

বহু যুদ্ধে, চারুপ্রয়োগ-সৌষ্ঠবার্থমপি প্রযুজ্যতে। চতুর্থধ্যায়ের শেষে 'নৃত্ত' সম্বন্ধে ভরত বিশেষ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'রেচকা অঙ্গহারাশ্চ পিণ্ডীবন্ধস্তথৈব চ।
সৃষ্ট্বা ভগবতা দত্তাস্তণ্ডবে মুনয়ে তদা॥
তেনাপি হি ততঃ সম্যগ্‌গানভাণ্ডসমন্বিতঃ।
নৃত্তপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতি স্মৃতঃ॥'

এর পরেই ভরত ঋষিদের মুখে প্রশ্ন তুলেছেন—সাধারণ অঙ্গাভিনয়ের সঙ্গে নৃত্তের পার্থক্য কোথায়?

'যদা প্রাপ্ত্যার্থমর্থানাং তজ্‌জ্ঞৈরভিনয়ঃ কৃতঃ।
কস্মান্নৃত্তং কৃতং হ্যেতৎ কং স্বভাবমপেক্ষত॥
ন গীতকার্থসম্বন্ধং ন চাপ্যর্থস্য ভাবকম্।
কস্মান্নৃত্তং কৃতং হ্যেতদ্‌গীতেষ্বাসারিতেষু চ॥'

নৃত্তের যখন গীতকার্থের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, নৃত্ত যখন অর্থভাবক নয়, তখন নৃত্তের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নটি সামনে রেখে টীকাকার অভিনবগুপ্ত পূর্বপক্ষের যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন এবং নাট্যের সঙ্গে নৃত্তের পার্থক্য কোথায় তা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। কৌতূহলী পাঠক নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ২৬১—২৬৩ শ্লোকের টীকা পাঠ করলেই সব কিছু জানতে পারবেন।

তবে প্রশ্নের উত্তরে ভরত যা বলেছেন, তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য—

'অত্রোচ্যতে ন খল্বর্থং কঞ্চিন্নৃত্তমপেক্ষতে।
কিং তু শোভাং প্রজনয়েদিতি নৃত্তং প্রবর্তিতম্॥
প্রায়েণ সর্বলোকস্য নৃত্তমিষ্টং স্বভাবতঃ।
মঙ্গল্যমিতি কৃত্বা চ নৃত্তমেতৎ প্রকীর্তিতম্॥
বিবাহপ্রসবাবাহপ্রমোদাভ্যুদয়াদিষু।
বিনোদকারণং চেতি নৃত্তমেতৎ প্রবর্তিতম্॥

** ** **

গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্যমেতৎ প্রবর্ত্যতাম্।
প্রায়েণ তাণ্ডববিধির্দৈবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ॥

নৃত্ত প্রয়োগের অবস্থাগুলি সম্বন্ধে ভরতের নির্দেশ এই—

অঙ্গবস্তুনিবৃত্তৌ তু বর্ণনিবৃত্তিষু
তথা চ অভ্যুদয়স্থানে নৃত্তং তজ্‌জ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ।
যত্তু সংদৃশ্যতে কিঞ্চিদ্দম্পত্যোর্মদনাশ্রয়ম্‌।
নৃত্তং তত্র প্রযোক্তব্যং প্রহর্ষার্থগুণোদ্ভবম্‌॥
যত্র সন্নিহিতে কান্তে ঋতুকালাদিদর্শনম্‌।
গীতকার্থাভিসম্বন্ধং নৃত্তং তত্রাপি চেষ্টতে॥
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা বা কলহান্তরিতাপি বা।
যস্মিন্নঙ্গে তু যুবতির্ন নৃত্তং তত্র যোজয়েৎ॥
সখীপ্রবৃত্তে সংলাপে তথা সন্নিহিতে প্রিয়ে।
নহি নৃত্তং প্রযোক্তব্যং যস্যা বা প্রোষিতঃ প্রিয়া॥
যস্মিন্নঙ্গে প্রসাদং তুগৃহ্ণীয়ান্নায়িকাক্রমাৎ।
ততঃ প্রভৃতি নৃত্তং তু শেষেষঙ্গেষু যোজয়েৎ॥
দেবস্তুত্যাশ্রয়কৃতং যদঙ্গং তু ভবেদথ।
মাহেশ্বরৈরঙ্গহারৈরুদ্ধতৈস্তৎ প্রযোজয়েৎ॥
যত্তু শৃঙ্গারসংবদ্ধং গানং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ম্‌।
দেবীকৃতৈরঙ্গহারৈর্ললিতৈস্তৎ প্রযোজয়েৎ॥'

চতুর্থ অধ্যায়ের পরে অষ্টম অধ্যায়ে নৃত্তের উল্লেখ পাওয়া যায় আঙ্গিক অভিনয়ের প্রসঙ্গে।

বলা হয়েছে—"অস্য শাখা চ নৃত্তং তথৈবাঙ্কুর এব চ।" নৃত্ত আঙ্গিক অভিনয়ের শাখা; অঙ্কুরও বটে, 'অঙ্গহারবিনিষ্পন্নং নৃত্তং তু করণাশ্রয়ম্‌।'

নবম অধ্যায়ে হস্তকর্ম-বর্ণনা প্রসঙ্গ ভরত ৩০ প্রকার নৃত্তহস্তের উল্লেখ ও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—এবং এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, বহু প্রকার হস্তকর্মের মধ্যে ৩০ প্রকার হস্তকর্ম নৃত্তের উপযোগী। এ পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্রে নৃত্তের যে বিবরণ পাওয়া যায়, আমরা তার দিকেই দৃষ্টি রেখে এসেছি এবং দেখেছি ভরত পূর্বপক্ষের সঙ্গে এক মত হয়ে স্বীকার করেছেন—নৃত্য 'ন গীতকার্থসম্বন্ধং ন চাপ্যর্থস্য ভাবকম্‌', ভরতের নিজের কথায়,—'ন খল্বর্থং কঞ্চিন্নৃত্তমপেক্ষতে' (অবশ্য গীতকার্থসংবদ্ধং নৃত্তও যে সম্ভব, সে কথাও নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। নৃত্তপ্রয়োগের অবস্থা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।) 'নৃত্তপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতি

স্মৃতঃ' এবং নৃত্ত আঙ্গিক অভিনয়েরই শাখা। কিন্তু লক্ষণীয় নাট্যশাস্ত্রে 'নৃত্য' সম্বন্ধে কোন বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায় না। এমন কথা কোথাও বলা হয়নি যে, নৃত্য হচ্ছে গীতার্থসংবদ্ধ অর্থভাবক এবং তাললয়াশ্রিত। তা স্পষ্ট করে না বলা হলেও নৃত্তের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার ভিতর দিয়ে, পরোক্ষভাবে যে বলা হয়েছে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে। নন্দিকেশ্বর নাট্যশাস্ত্রের নৃত্ত লক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই যে নৃত্ত ও নৃত্যের ভেদ কল্পনা করেছেন, এ কথা বললে অন্যায় সিদ্ধান্ত করা হবে বলে আমি মনি করি না।

নৃত্তের গীতার্থ নিরপেক্ষত্ব তথা ভাবাভিনয়হীনত্বের লক্ষণটি নাট্যশাস্ত্র থেকেই নন্দিকেশ্বর গ্রহণ করেছেন এবং তাহার বিপরীত লক্ষণকেই অর্থাৎ—গীতার্থ-সংবদ্ধতাকে তথা ভাবাভিব্যঞ্জকতাকে নৃত্যের লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন।

নৃত্য ও নৃত্তের মধ্যে নর্তন শিল্পীর বা নর্তকের দুটি প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। একটি প্রবণতা—অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তথা শরীরের ভাষায় ভাবকে ব্যক্ত করার চেষ্টা। অন্যটি শরীরের ভাষার স্বাধীন অনুশীলন করা অর্থাৎ তাললয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গিমার তথা সুন্দর অঙ্গ-বিক্ষেপের চাতুর্য দেখানো, -নর্তনপটুতার কসরৎ দেখানো। প্রত্যেক শিল্পেই এই দুই প্রবণতার দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় এবং এই দ্বন্দ্বে শিল্পতত্ত্বের দ্বন্দ্বই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে, একদল ভাবাবেগকে শিল্পের অণুকার্য বা প্রকাশ্য বিষয় বলে গণ্য করে থাকেন এবং তাঁদের মতানুসারে নৃত্যের উদ্দেশ্য হবে অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে ভাবাবেগকে ব্যক্ত করা। অন্য দল বলেন, শিল্প হচ্ছে উপাদানকে বিচিত্র ভঙ্গিমার আকারে সাজানো বা বিন্যাস করার কৌশল এবং তাঁদের মতে নৃত্যের উদ্দেশ্য ভাবকে ব্যক্ত করা নয়। অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমাযোগে বিচিত্র দেহভঙ্গিমা সৃষ্টি করা, তাললয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিচিত্র ভঙ্গিতে অঙ্গবিক্ষেপ করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা—এক কথায় অঙ্গহার রচনা করা। প্রথম শ্রেণীর ঝোঁক ভাবাভিব্যক্তির উপরে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝোঁক অঙ্গবিক্ষেপের কলা কৌশলের উপরে—দেহের বিচিত্র ভঙ্গি সৃষ্টির উপরে। শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে—শিল্পীদের মধ্যে এই দুটি প্রবণতা বহুকাল থেকেই চলে আসছে এবং আধুনিক যুগে এসে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাধান্য বেড়েছে। ভাস্কর্যে, চিত্রে, সাহিত্যে, সংগীতে, বিশেষতঃ ভাস্কর্যে ও চিত্রে নির্বিষয় রূপের বা

রূপকৈবল্যের অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংগীতের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে দল'-'রেফারেনশিয়ালিষ্ট' তাঁরা সংগীতে বিশেষ একটি ভাবকে (মুড) ব্যক্ত বা উদ্রিক্ত করার চেষ্টা করে থাকেন এবং যাঁরা 'এ্যাবসোলিউটিষ্ট' তাঁরা স্বরধ্বনির (মিউজিক্যাল সাউণ্ড্স্) সাহায্যে সুখশ্রাব্য স্বরমণ্ডল গঠন করতে চেষ্টা করেন। প্রথম দলের কাছে স্বরধ্বনি ভাবের বাহক বা উদ্দীপক, অতএব, সাপেক্ষ দ্বিতীয় দলের কাছে স্বরধ্বনি স্বরমণ্ডল সৃষ্টির উপাদান বিশেষ, অতএব নিরপেক্ষ। শিল্পের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে Art is Configuration। এই সংজ্ঞাটি আজ অগ্রগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংজ্ঞানুসারে নৃত্তকে বলা যেতে পারে—অঙ্গোপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমাযোগে 'কনফিগারেশন' (Configuration) বা রূপ—বিকল্পনা মাত্র। আমার ধারণা, উল্লিখিত দুটি প্রবণতা, ভারতীয় নৃত্যে দুটি পৃথক্ ধারায় চলে আসছে। একটি ধারার নিদর্শন মেলে কথাকলি প্রভৃতি ভাবাভিনয় প্রধান নৃত্যের মধ্যে, অন্যটির নিদর্শন পাওয়া যায় তাললয়প্রধান 'কত্থক নৃত্যে'র মধ্যে। আমি মনে করি, 'কথাকলি' নৃত্যগোষ্ঠির এবং 'কত্থক' নৃত্তগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কথাকলির প্রধান ঝোঁক ভাবাভিনয়ের দিকে এবং কত্থকের প্রধান ঝোঁক তাললয়াশ্রয়ে অঙ্গহার রচনার দিকে। কথাকলিশিল্পী ভাবসচেতন, কত্থকশিল্পী আঙ্গিক-সচেতন।"

॥ ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল নাচের বিভিন্ন পর্যায় ॥

ক্ল্যাসিক্যাল নাচের প্রথম পর্যায় গেছে প্রাক্ ভরত যুগ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায় ভরত ও তার অনুচিন্তাগোষ্ঠী পর্ব পর্যন্ত। গুপ্তযুগের কাব্যসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্যের অন্তর্গত নৃত্য-পরিচয়ে আমরা তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষণগুলি দেখি। চতুর্থ পর্যায়ের সন্ধান মেলে মন্দির কেন্দ্রিক দাসী আট্যম বা দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতির মধ্যে। পঞ্চম পর্যায়—উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় আধুনিক যুগের পরিশীলিত ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলির পুনর্নবীকরণের (Revivalist Movement) মধ্যে এই পর্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিচয় আগের অধ্যায়ে আলোচিত হয়ে এসেছে। এবার তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত রূপটি এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। শেষ অধ্যায়ে ক্ল্যাসিক্যাল নাচের নব রূপায়ণ, যাকে আমরা 'Neo-classical' আখ্যা দিয়েছি, তার মূল্যায়ণ থাকবে।

॥ প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ ॥

পটভূমিকা—

মৌর্যদের পতনের পর সুঙ্গরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর কাণ্ব রাজবংশ। ৪০-৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে সুঙ্গ ও কাণ্ব উভয় রাজবংশই দক্ষিণভারতের সাতবাহনদের অগ্রগতির সামনে ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। সুঙ্গ ও কাণ্বদের প্রতিপত্তি খর্ব করে যারা নতুন রাজশক্তির অধিকারী হল তাঁরা পুরাণে 'আন্ধ্র' বলে পরিচিত। গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল তেলেগু ভাষী আন্ধ্রদের বাসস্থান। কিন্তু শিলালিপি ইত্যাদিতে এদের সাতবাহন বলা হয়েছে। ভারতীয় লোককথায় যে শালিবাহন রাজার কাহিনী শোনা যায়, তা এই সাতবাহনদের স্মৃতি বহন করে। ভারতের ইতিহাসে সাতবাহনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উত্তর ভারতের আর্যসংস্কৃতি ও দক্ষিণভারতের দ্রাবিড় সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য বন্ধনের জন্য তাঁরা যেন একটি সেতু রচনা করেছিলেন। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর যে সেতু এক রকম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা আবার মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে গাত্রো'খান করে কিছুকালের জন্য তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এরপর বাইরে থেকে আসেন বক্ত্রিয়ার গ্রীকরা। এই গ্রীক রাজাদের মধ্যে যাঁরা ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশের রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন মিনাণ্ডার। ইনি প্রায় ১৬০-১৪০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পোষক ছিলেন। নাগসেন কৃত 'মিলিন্দ-পনহো' নামে বৌদ্ধ গ্রন্থে মিলিন্দের (মিনাণ্ডার) প্রশ্ন ও উত্তর সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সময় গ্রীক-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংঘাতের কালে গান্ধার-শিল্পের, বিশেষ করে ভাস্কর্যের আশ্চর্য বিকাশ হয়। পেশোয়ার কাবুল উপত্যকা এবং সিন্ধু ও ঝিলমের মধ্যবর্তী পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ থেকে এই সকল ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাই বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ছাড়া জৈন বা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোন নিদর্শন নেই।

॥ জৈন ও বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প ॥

বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত শিল্পকলা প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের— অর্থাৎ মুসলমান আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের নানা স্থানে গড়ে উঠেছিল।

এই যুগের স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাঁচী, ভারহুত, বোধগয়া, অমরাবতী এবং অন্যান্য বহু স্থানে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ স্থাপত্যের স্তূপ, মঠ, স্তূপের রেলিং বা আবেষ্টনী, তোরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাথরের পাহাড় কেটে গুহামন্দির ও মঠ বা বিহার নির্মাণ জৈন ও বৌদ্ধ স্থাপত্য রীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নাগার্জুন পর্বতের বৌদ্ধ গুহাগুলি এবং উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ের জৈন গুহাগুলি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্যক্ষেত্রেও বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত শিল্পকার্যাদির সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। স্তূপ, চৈত্য, গুহা, তোরণ প্রভৃতির গায়ে খোদাই করা মূর্তি ও আলংকারিক ভাস্কর্য শিল্পকৌশলের চমৎকার নিদর্শন।

বৌদ্ধ শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য চিত্রশিল্পেও প্রকাশ পেয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম-সাহিত্য বিনয়পিটকে রাজা প্রসেনজিতের প্রমোদকক্ষে নানা প্রকার চিত্র অঙ্কিত ছিল সেই কথায় উল্লেখ ছিল। সেই যুগে 'লেপ্যচিত্র' অর্থাৎ কাপড়ের উপর পটের ন্যায় অঙ্কিত চিত্র, 'লেখ্যচিত্র' অর্থাৎ আল্পনা জাতীয় চিত্র, এবং ধূলিচিত্র' অর্থাৎ নানা রঙের গুড়া ব্যবহার করে অঙ্কিত চিত্র—এই তিন প্রকার চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এরপর কনিষ্ক যুগের সংস্কৃতিতে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় সেই যুগের অমরাবতী ও মথুরার শিল্পরীতিতে।

।। গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ।।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত-ইতিহাসে গুপ্ত যুগ 'স্বর্ণ যুগ' (Golden Age) নামে প্রসিদ্ধ। বস্তুত, এই যুগে যে ব্যাপক উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে গুপ্ত যুগকে স্বর্ণ যুগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই উৎকর্ষ শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা ও শিল্পকলা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশলাভ করেছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতি অমর কাব্য ও নাট্যগ্রন্থ রচয়িতা কালিদাস, বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু

এবং শূদ্রক্, বিশাখদত্ত, হরিষেণ প্রভৃতি বিদ্বান, মনীষীবৃন্দ এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই যুগকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগ এবং গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। (The Gupta period is in the annals of classical India almost what the Periclean age is in the history of Greece.)

গুপ্ত যুগের সঙ্গীতশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্ত নিজেও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বীণাবাদনরত মুদ্রার প্রতিকৃতি থেকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিতে গুপ্ত যুগ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের পরধর্মসহিষ্ণুতা গুপ্ত-শাসন ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করেছে। গুপ্ত-রাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে গুপ্তযুগের শিল্প নিদর্শনের প্রায় অনেক কিছুই মুসলমান আক্রমণ কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে গেছে। স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা যায় সে-যুগে নির্মিত অজন্তা ও ইলোরার গুহাগুলিতে। এই সকল গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রশিল্প উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন। গুপ্ত যুগের দেবদেবীর মূর্তি, পশু-মূর্তি, বৃক্ষ-লতাদি সে-যুগের ভাস্কর্য ও আলংকারিক শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করে। ভারহুত, সাঁচী, মথুরা ও সারনাথের ভাস্কর্য শিল্পের সুষমা অতুলনীয়।

ভারতের বাইরে ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তারের দিক দিয়েও গুপ্ত যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বাণিজ্যিক যোগাযোগের সূত্রে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, কম্বোজ, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল।

যাই হোক দেবালয়, স্তূপ, চৈত্য নির্মাণে, বুদ্ধমূর্তি ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির ভাস্কর্যে, গুহা গাত্রের চিত্রকলায় ভারতীয় শিল্পের যে সরল সাবলীল প্রকাশ দেখা যায়, তা গুপ্ত যুগের সামাজিক নবজাগরণের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য ও আদর্শ শিল্পীরা পুনরাবিষ্কার করে তার উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

॥ **গুপ্তযুগে নৃত্য প্রসঙ্গ** ॥

ক্ল্যাসিক্যাল যুগে হল্লিসক নৃত্য, আসারিত নৃত্য প্রভৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু নতুন ধরনের নৃত্যের নাম পাওয়া যায় কালিদাস, শূদ্রক, বিষ্ণুশর্মা প্রভৃতির গ্রন্থে। (মহাকবি কালিদাসের সময়কাল ধরা হয় খ্রীঃ পূঃ ১০০-থেকে ৪০০।৪৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত।) কালিদাস বিভিন্ন ধরনের নৃত্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন, নন্দাবর্ত, চতুরস্র, অর্ধ-চতুরস্র প্রভৃতি। বিক্রমোর্বশী নাটকে বিভিন্ন ধরণ ও পদ্ধতির সঙ্গীত ও নৃত্যের কথা জানা যায়। বিশেষ করে উর্বশীর বন্ধু চিত্রলেখার আখ্যানে তা দেখা যায়। চিত্রলেখা তাঁর নৃত্যগুরুর কাছ থেকে যে যে নৃত্য অধ্যয়ন করেছিলেন তা হলো—দ্বিপাদিকা, জম্ভালিকা, খণ্ডধারা, চরচরি, ভিন্নকালাবস্তিকা প্রভৃতি। এই খণ্ডধারা নৃত্য হলো দ্বিপাদিক বা দ্বিপদী নৃত্যেরই একটি অংশ বিশেষ। এবং জম্ভালিকাও দ্বিপাদিকা নৃত্যেরই অঙ্গীভূত একটি বিশেষ ধরনের নৃত্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঐ দ্বিপাদিকা বা দ্বিপদী নৃত্যই মূলগত নৃত (basic dance) আর খণ্ডধারা, জম্ভালিকা প্রভৃতি নৃত্য ঐ মূলগত নৃত্য থেকেই উদ্ভুত। এবং এও দেখা যায় যে, ঐ খণ্ডধারা বা খণ্ডিকা নৃত্য গুপ্তযুগেও প্রচলিত ছিল। যদিও তা কালিদাসের সময়কার খণ্ডধারা থেকে একটু স্বতন্ত্রধর্মী ছিল বলে অনুমান করা হয়।

কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্গত হিসেবেই নাটককে দৃশ্যকাব্য বলেছে। নাটকে বাচিকাভিনয়ের সঙ্গে আঙ্গিকাভিনয় তথা নৃত্যও এসেছে। (In drama (drisya-Kābya), thus, We find a body of stage technique which is none other than the angika-bhinaya of the classical Indian dance.)

কাব্য-সাহিত্যের যুগে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই যুগে নৃত্য ছিল নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। ("Dance or Abhinaya enters into the body of this drama, not as an intruder or an interloper, not to amuse the audience while the main actor of the plot of the drama is held up ; it is on the contrary an integral part of the drama") (K. Vatsayana—C.I.D.L.A. Page-214)

কাব্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়েই নাচের non-technical এবং technical ব্যাপারগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এ থেকেই নৃত্য এবং তার ষ্টাইলের উদ্ভব

হয়েছে। এভাবেই নাটকের মূলগত বক্তব্য 'নাট্যধর্মী' (Idealistic) ও লোকধর্মী (Realistic) ব্যাপারটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অশ্বঘোষের' বুদ্ধচরিত' গ্রন্থে নাচের টেকনিক্যাল ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—বিভিন্ন হস্ত (মুদ্রা) ললিত ভাব, কুঞ্চিত ও রেচিত ভঙ্গি, কটাক্ষ চক্ষুর বিবর্তন, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচন, পদ্মকোষ হস্ত, প্রেক্ষিত, ভ্রুকুটি অঞ্জলি (সংযুক্ত হস্ত) প্রভৃতি।

এভাবে কলিদাসের রঘুবংশ, কুমার সম্ভবম্, মেঘদূত, ঋতুসংহার, প্রভৃতি গ্রন্থে নাচের কিছু কিছু টেকনিক্যাল শব্দ পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারবী, দণ্ডিন, বাণের রচনাতেও নৃত্যবিষয়ক উপাদান পাওয়া যায়।

।। বাণভট্টের হর্ষচরিত-এ নৃত্যের উপাদান ।।

হর্ষচরিতে বিভিন্নগোষ্ঠীতে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠীগুলি হলো—কাব্যগোষ্ঠী, গল্পগোষ্ঠী, গীতগোষ্ঠী, নৃত্যগোষ্ঠী ও বাদ্যগোষ্ঠী। তাছাড়া 'তাণ্ডবনৃত্য' ও 'আরভটী' নৃত্যের উল্লেখ দেখা যায়।

"There is mention of the Tāndava nṛtya, telling us of the prevalence of the concept of Siva dancing (1, 15). In a beautiful smile describing the dust storms in summer, We are told that the rising dust seemed as if dancers were performing the Ārabhati nṛtya (II, 48). There are two other references to the Ārabhati style of dancing : from the first, we know that this style was danced in the form of a rāsa dance in which the rechakas were predominant. We are told further that there was five characteristics of this dance :—(i) mandali nṛtya, (ii) rechaka, (iii) rāsa rasa, (iv) rabhasārabdha nartana and (v) catulasikhā nartana.

According to the Nātyasastra the ārabhati is a style (vṛtti) and not aspecific dance ; when the Harsacarita refers to the ārabhati the reference must be to the character of the dance and the general impression of the dance and not to a particular form of dance.

The mandali nṛtya which is mentioned is interpreted by Sankara as the hallisaka, where a man stands surrounded by women in a circle; We have a representation of it in the Bāgh caves, where a man stands in the middle surrounded by women playing with little wooden sticks. The mandali nṛtya, therefore, represents a social type of dancing and is obviously related to the hallisaka nṛtya"

(Ibid—Page 226)

এ ছাড়া তিন ধরনের রেচকের কথা জানা যায়। যেমন কটিরেচক (কোমড়ের ভঙ্গি), হস্তরেচক (হাতের ভঙ্গি) ও গ্রীবারেচক (গলার ভঙ্গি) এই 'রেচক' ও 'রেচিত' শব্দ নাট্যশাস্ত্রেও পাওয়া গেছে। 'রাসরস'—ধরনের নৃত্য এখনো ভারতের অনেক অঞ্চলে দেখা যায়—যেমন, মণিপুরের রাস ও মহারাস, গুজরাটের রাস, বিভিন্ন ধরনের গরবা নাচ, কাথিয়াবাড়ের দণ্ডিয়া রাস—প্রভৃতি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের মণ্ডল (group of dances পিণ্ডিবন্ধ (group of circle formation) লতাবন্ধ (variously—star like pattern) এই সবকিছু উপাদান নিয়েই আরভটি ষ্টাইল তৈরী হয়েছিল। এই আরভটি নাচ সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে :

"This ārabhati dance to which Bāna refers consists of the formation of circles. Distinctly group and folk in character, it utilises the rechakas in its nṛtya portions and expresses vigorous emotion, enthusiasm or dynamism, The dance must have been characterised by a quick spring tempo, fast movements and a choreography of cicle and group formation.

(Ibid—Page-227.)

হর্ষচরিতে ভাই-বোনের দ্বৈতনৃত্যের কথা জানা যায়। এই "couple dancing" এর কথা প্রত্যক্ষভাবে লেখা না থাকলেও একে অপরের হাত ধরাধরি করে নাচার বর্ণনা থেকে অনুমিত হয়। এ ছাড়া নাচের ব্যাপারে যে কোন জাতি ধর্মের বালাই ছিল না তার প্রমাণ হর্ষের জন্মের সময়ে অনুষ্ঠিত

নৃত্যগুলোর বর্ণনা পড়লেই জানা যায়। (হর্ষ চরিত—চতুর্থ অধ্যায়) এই সকল নৃত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও তাল ব্যবহৃত হতো তার বর্ণনাও আছে। চতুর্থ অধ্যায় প্রসঙ্গে জানা যায় যে—'

In Chapter IV. we have a vivid description of the birth of Harsa (125 ff). The old maid servants of the palace dance, the noble ladies come out and perform different types of dance ; the young and the old alike dance with mirth and pleasure. Those long out of practice also start dancing but above all the Sudra maid servants take hold of the favourites of the kings and start dancing with them (IV. 130 ff). The pratihāris of the queens chambers join the maid servants in a dance." (Ibid—Page 227)

'রাসরস' নৃত্য ছাড়া অনেক ধরনের নাচের সন্ধান পাওয়া যায়, যে নাচ প্রধানতঃ তালের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। নাচের বক্তব্য পাদকর্মের দ্বারাই প্রকাশ করার রীতি এ নাচে ছিল। এ নাচ অনেকটা এ যুগের কথক নাচের মতো হয়তো অনুষ্ঠিত হতো। নাচটির নাম—'রাসকমণ্ডল' নৃত্য (৪।১৩০)। 'তালাভচরচরণ—চরণক্শোভম্' এই শব্দটি থেকেই তা অনুমিত হয়। এই নৃত্যে আলিংগ বা মুরজ, মঞ্জু বা বাঁশী, তন্ত্রী, কাহল বা বড় জয়ঢাক, পাতক (ঘনবাদ্য) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে করতালি দিয়ে তাল রাখবার বা নৃত্যকরার রীতি ছিল। বাদ্যের মধ্যে তত, ভিতরত, শুষির, ঘন প্রভৃতি দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ে বাজানো হতো। এ যুগের রমণীরা পায়ে ঘুংঘুর বেধে নাচতেন। এই ঘুংঘুরকে বলা হতো—'পাদহংসক'।

হর্ষচরিতে বিভিন্ন ধরনের নৃত্যশিল্পীদের নাম পাওয়া যায়। যেমন—তাণ্ডবিক, (লাসক, ইত্যাদি লাস্য থেকে যদি লাসক শব্দ ধরা যায় তাহলে তাণ্ডব ও লাস্য উভয় অঙ্গের নাচই এঁরা নাচতেন।)

হরিণীকা নামে যে নর্তকী ছিলেন, তিনি নাচতেন—শিখণ্ডক নাচ, এই নাচ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুযায়ী ছিল বলেই বোধ হয় নাম 'শৈলালী'। এই তাণ্ডবিক, লাসক, শিখণ্ডক প্রভৃতি নাচের মধ্য দিয়ে আগের যুগের ক্ল্যাসিক্যাল নাচের ট্রাডিশন চলে এসেছে।

ভাসের 'বালচরিত' নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু-বন্ধুনীদের দিয়ে যে নৃত্যে মেতে উঠেছিলেন সেই নৃত্যের নাম আমরা হরিবংশ পুরাণেও পেয়েছি, অর্থাৎ 'হল্লিসক নৃত্য'। এ ছাড়া অভিষেক নাটকে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের গানের মাধ্যমে বিষ্ণু বন্দনা করতে দেখা যায়।

॥ মৃচ্ছকটিকে নৃত্য ॥

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' গ্রন্থে নটী বসন্তসেনা যে নৃত্যে পারঙ্গমা ছিলেন, তার প্রমাণ তার 'নৃত্যপ্রয়োগে'। বিদূষক 'কাংসতাল' বা ধাতুনির্মিত করতাল বাজাতে বাজাতে ঢুকছেন এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে দেখা যায় নৃত্য এবং নাট্যকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে—'নর্তন্তে নাট্যম্ পঠন্তে 'সশৃঙ্গারম্'। আঙ্গিকাভিনয়ের কথাও জানা যায়। এই প্রসঙ্গে দেখা যায়—

"The Āngikābhinaya for this would be as follows—The night would be indicated by suchimukha hands facing each other and held on the right side, the removal of armlets by ardhacandra hastas the anklets by the same hastas, the door would be indicated by tripatākā hastas and entry into the house with a patākā hasta. The entire scene of Vasantasenā being pursued, her groping along the wall her finding and entering the door would be a piece of āngikabhinaya. The lamp she puts out may actually have been on the stage ; if not, then it would have been indicated by hamsasya hands. The lamp may also have been indicated by the suchimukha hasta. (NS.IX.67)." (Ibid, page-235)

আঙ্গিকাভিনয়ের সঙ্গে মুদ্রা প্রয়োগের প্রবণতার কথা উক্ত বিষয় থেকে বুঝা যায়। হস্তমুদ্রার ব্যবহার ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই সময় থেকেই।

এর আগে আমরা কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের ভাবপ্রকাশক কিছু কিছু নাচের কথা উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে জম্ভালিকা মূলতঃ গান হলেও (যে কোন কোরাস্ গানের মাঝে গাওয়া হতো।) অঙ্গভঙ্গি সহযোগে গাওয়া হতো বলে ক্রমশঃ নৃত্য পর্যায়ে তা উত্তীর্ণ হয়। খণ্ডধারা অবশ্য গান ও নাচ

উভয় প্রকার মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হতো। চরচরিতে গান ও নাচ উভয়ই অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু কুটিলিকা ও মল্লগতি শব্দ উভয়ই নাচ হিসাবে পরিচিত হয়েছে। নৃত্তের বিভিন্ন ভ্যারাইটির মধ্যে তাণ্ডবাঙ্গের নাচ ছিল অর্ধমণ্ডলী। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অর্ধমণ্ডলী একটি করণ। মল্লগতি নাচে সব রকম লয়ই ব্যবহৃত হতো। গলিতিকা নামক নাচে অভিনয় ও নৃত্য দুইই থাকতো। সুতরাং একে নৃত্যাভিনয় বলা যায়।

এই সকল নাচের মধ্যে যে গুলি মূলতঃ গানের আশ্রয়ী সেগুলিকে বর্তমান যুগের 'যক্ষগণ' গান তথা নৃত্যনাট্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

॥ শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলীতে' নৃত্য ॥

উক্ত গ্রন্থে যে দ্বিপাদিকা নৃত্যের কথা আছে, তা হলো নৃত্য, নৃত্ত ও অভিনয়ের সমাহার। অনেকটা ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারার 'পদম্' পর্যায়ের মতো। এই পদগুলি মোট ২৬ মাত্রা, ১৩+১৩ সমানভাগে ভাগ করে হতো। রত্নাবলীর ভাষ্যকার বলেছেন, চাররকমের দ্বিপাদিকা নৃত্য ছিল। তার মধ্যে একটি হল খণ্ডকা নৃত্য। চরচরি নৃত্যও দ্বিপাদিকা নৃত্যেরই একটি অঙ্গ ছিল। এই চরচরি নৃত্য চার চরণ যুক্ত গীতি কবিতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো বলেই নাম হয়েছিল 'চরচরি'। মেয়েরা এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করতেন সুতরাং এই নৃত্য ছিল লাস্য অঙ্গের। ভীম ভূপালের মতে এই চরচরি নাচ ছিল শৃঙ্গাররস প্রধান। কিন্তু রানাকুম্ভের মত আলাদা। তার মতে চরচরি নাচ যে কোন রস ও যে কোন তালে অনুষ্ঠিত হতো।

কালিদাস যে সকল নাচের উল্লেখ করেছেন—নন্দাবর্ত, চতুরস্র, খুরক, কুটিলা, গলিতক প্রভৃতি, পরবর্তীকালে শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের উক্ত নাচগুলির মধ্যে কথা উল্লেখ করেছেন, এই থেকে অনুমান করা হয়—কালিদাসের সময় থেকে শার্ঙ্গদেবের সময় পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্যধারায় উক্ত নাচগুলির ধারাও প্রবাহিত ছিল।

উক্ত নাচগুলি এক পার্শ্বগত নৃত্যশ্রেণীর অন্তর্গত। নন্দ্যাবর্তের উল্লেখ করে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

অশ্চৈব চেচ্চরণয়োরন্তরং স্যাৎষড়ঙ্গুলম্
বিতস্তি মাত্রমথবা নন্দ্যাবর্ত্যং তদোদিতম্।

নন্দাবর্ত-নৃত্যে উভয় চরণের স্থিতি ছ আঙ্গুলের ব্যবধানে থাকে। নন্দ্যাবর্ত্যের চতুরস্র—নৃত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। শার্ঙ্গদেব চতুরস্রের পরিচয় দিয়েছেন—

নন্দ্যাবর্তস্য চেদঙ্ঘ্র্যোর্ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলম্।
অন্তরং চতুরৈঃ স্থানং চতুরস্রং তদোদিতম্॥

কালিদাস যে 'অস্থানন্তরে অর্দ্ধদ্বিচতুরস্রকং' অর্ধদ্বিচতুরস্র-নৃত্যের উল্লেখ করেছেন তার অপর নাম নন্দ্যাবর্তাপর, কেননা নন্দ্যাবর্ত্য-নৃত্যে শিল্পীর ছ-অঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে দুটি চরণের স্থিতি থাকে, আর চতুরস্রে তার তিনগুণ বা আঠার আঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে থাকে। সুতরাং যে নৃত্যে দুটি চরণের স্থিতি বারো আঙ্গুলি পরিমিত স্থানের দূরত্বে হয় তাকে অর্ধদ্বিচতুরস্র (১৮—৯ = ৯ + ৩ = ১২) বা নন্দ্যাবর্ত্যাপর (৬ × ২ = ১২) নৃত্য বলে। কালিদাস নৃত্য, গীত, বাদ্য, ও নাট্য কলায় পারদর্শী না হলেও চাক্ষুস ভাবে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের তত্ত্ব জানতেন। তাছাড়া নাটকে তিনি শাস্ত্রীয় নৃত্য গীতের উল্লেখ করেছেন।

গুপ্তযুগের রাজারা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এক নবজাগরণ এনেছিলেন। মহারাজা সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যই অবশ্য ভারতীয় সমাজে এই নবজাগরণ এনেছিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য প্রায় তেত্রিশ বছরেরও বেশী সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর কুমার গুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি চল্লিশ বছরেরও বেশী রাজত্ব করেন। সঙ্গীতাদি ললিতকলার—তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সঙ্গীতমালা ও নাট্যগৃহে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ানুষ্ঠানে পুরুষ ও নারী সকলেই যোগদান করে শিল্পকলার অনুশীলন ও আনন্দ উপভোগ করতে সুযোগ পেত।

শোনা যায়, মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (5th Cent. A. D) নৃত্যের একজন বলিষ্ঠ পৃষ্ঠশোষক ছিলেন এবং তাঁর রাজপ্রাসাদের নিকটেই সঙ্গীত এবং নৃত্যের জন্য বড় বড় হলঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন। নৃত্য ও সঙ্গীতের যে প্রভূত চর্চা ছিল এটাই তার বড় প্রমাণ। তাঁর পুত্র মহারাজ কুমারগুপ্ত ও পিতার **tradition** বজায় রেখেছিলেন। থানেশ্বরের মৌখরীরাজ প্রভাকরবর্ধনও এই সকল নৃত্যের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিও তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন ভূমিতে

বড় বড় হলঘর তৈরী করান যাতে পুরুষ এবং মহিলা শিল্পীরা নৃত্য ও সঙ্গীতের চর্চা করতে পারেন অবাধে।

এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে, খ্রীষ্টজন্মের আগে তৈরী উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের উদয়গিরির গুহাগুলিতে যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, মুক্তাঙ্গনে কিছু নটীর নৃত্যসহ একটি চমৎকার নৃত্যদৃশ্য। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে পরবর্তীকালে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুগামী বা অনুসারী যে নৃত্যধারা ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের মর্য্যাদা পেয়েছে তার প্রচলন উড়িষ্যাতে অনেক আগে থেকেই দেখা যায়। উদয়গিরির গুহা প্রসঙ্গে জনৈক শিল্প সমালোচক বলেন :—

Caves of Udaygiri are to be seen in a fairly well. preserved shape exquisite works of art depicting different facets of life. The precision and accuracy with which the artist used his chisel inspire the awe and admiration of anyone who visits the caves."

ভরতের সময় থেকেই ভারতীয় নৃত্যে একটি নতুন ভাবধারার অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান যুগের নৃত্যধারার সূত্রপাত ওখান থেকেই। এই নতুন বৈচিত্র্যপূর্ণ—Dance motifs বিশ্লেষণ করলেই বর্তমানে প্রচলিত নৃত্যধারা থেকে সেই যুগের নৃত্যধারার মূলগত পার্থক্য ধরা পড়বে। ঐ সময় নৃত্যে চারী (cāris) এবং অঙ্গহারের চলন দেখা যায়। এই চারী ও অঙ্গহারের রেওয়াজ পৌরাণিক যুগ থেকেই চলে এসেছে। ভরত যে মার্গনৃত্যের কথা বলেছেন তাতে পুষ্করবাদ্য যে ব্যবহৃত হতো তার উল্লেখ আছে। প্রায় ২।৩ রকমের পুষ্করবাদ্য ব্যবহৃত হতো। নৃত্যশিল্পীর ভাবপ্রকাশের আঙ্গিক মাধ্যম ছিল মুদ্রাপ্রধান। এবং এই মুদ্রার ব্যবহার খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী (classical period) থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের নবম অধ্যায়-এ ২৪ প্রকার অসংযুক্ত হস্ত ও ১৩ প্রকার যুক্ত হস্তের কথা বলেছেন। এই মুদ্রাগুলি ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যে ব্যবহৃত হতো। ভরত নাট্যশাস্ত্রের একাদশ অধ্যায়ে চারী, মহাচারী, (আকাশ, ভৌম) মণ্ডল প্রভৃতি নৃত্যের প্রধান কতগুলি আঙ্গিকের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নৃত্যে গতিপ্রচার, রস ও ভাব প্রকরণ নিয়েও আলোচনা

করেছেন। নৃত্যের আঙ্গিকে চারী, করণ, খণ্ড, মণ্ডল, প্রভৃতি বিষয় একটির সঙ্গে আরেকটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

চারী কি? চারী হলো পা, হাঁটু, উরু এবং কোমর পর্যন্ত যে ভঙ্গিমা প্রথা-বদ্ধ ভাবে চলে এসেছে তাই চারী। এক পায়ের ভঙ্গী 'চারী'। দুই পায়ের ভঙ্গি 'করণ'। একাধিক করণ হলে তাকে বলে 'খণ্ড'। আবার ৩।৪টি খণ্ড একযোগে একটি 'মণ্ডল'-এর সৃষ্টি করে। এই চারী এবং মণ্ডল একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভরত উৎক্রান্ত, বিচিত্র, সূচীবিদ্ধ প্রভৃতি মণ্ডলের, কথা বলেছেন। এই মণ্ডল আবার কুতপ (Kutapa) সঙ্গীত ও অঙ্গ-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চারপ্রকার (Kutapa বা orchestra-র কথা উল্লেখ করেছেন। (তত, ঘন, শুষির ও আনদ্ধ বা অবনদ্ধ) প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে তাণ্ডব, উর্দ্ধতাণ্ডব প্রভৃতি নৃত্যের আঙ্গিক ভরতের যুগের অনেক আগে থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। তক্ষঃশীলায় প্রাপ্ত উর্দ্ধতাণ্ডব মূর্তি প্রমাণ করে যে ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের আঙ্গিক যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আগেই হয়তো ভারতে প্রচলিত ছিল। মৌর্য্য এবং গুপ্ত যুগের আগেই এই ধারার অব্যাহত ছিল। ঐ মূর্তিটি এখনো তক্ষশীলার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে এবং ঐটি আবিষ্কার করেন স্যার জন মার্শাল ১৯১৩ খ্রীঃ। মার্শাল মূর্তিটি পরীক্ষা করে ঐটি মৌর্য্য যুগের আগে বলে অভিহিত করেছেন। (5th-4th Century B. C.)

ঐ মূর্তিটিতে ললাটতিলক ভঙ্গিমায় বৃশ্চিক ভঙ্গিতে দেখা যায় একটি পা মাথার উপরে তুলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কপালে যেন তিলক আঁকছে।

এই ভঙ্গিটির উল্লেখ নন্দিকেশ্বর কৃত "ভরতার্ণব" গ্রন্থের ৪১৬ পাতায় দেখা যায়।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতে উচ্চাঙ্গ ও লোকনৃত্যের ধারা পরম্পরাগত ভাবে চলে এসেছে। তক্ষশীলার যক্ষিণী, ভারহুত, অমরাবতী, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, কোনারক প্রভৃতির নৃত্যভাস্কর্য, নাগার্জুনকোণ্ডা অজন্তা প্রভৃতির চিত্রাবলী প্রমাণ করে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নৃত্যকলার প্রভূত চর্চা ছিল।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে. প্রতিভাশালী শিল্পীদের প্রচেষ্টায়, সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন যুগে এই প্রবাহিত শিল্পধারায় নানা পরিবর্তন, নানা পরিবর্ধন, নানা সংযোজন ঘটেছে এবং নতুন নতুন নৃত্যভঙ্গিরও

সৃষ্টি হয়েছে। এ ভাবেই প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের পার্থক্য ও সাদৃশ্য নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে আমাদের হাতে এসে পড়েছে মণ্ডনকলার সুপরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধরনের ও পদ্ধতির নৃত্যকলা সার্বিকভাবে ভারতীয় নৃত্যকলাকে প্রকাশ করেছে। এই দেখা যায়—

"In connection with his valuable article, A new documents of Indian Dancing, Prof O. C. Ganguly has said that ; the tradition of Indian dance art had disappeared from the North, surviving in the practices of the guilds of dances under the active patronage of South Indian Temple-Foundations. But the Bhir Mound slap of Taxila has proved that the dance art used to be cultured in ancient time in its true perspetive throughout India, irrespective of boundaries of North and South. In North India, the classico-religious dance of Manipuri school evolved with new and novel technique in Manipur Assam. Besides many socio-religeo-folk type of dances evolved in different rural areas of India."[১]

বিশেষ করে বাংলাদেশে গানের সঙ্গে সহজ সরল ভঙ্গিতে বাউল, গম্ভীরা, কীতন প্রভৃতি নৃত্য গড়ে উঠেছে। এই নৃত্যগুলির সঙ্গে নানা ব্রত ও আচার অনুষ্ঠানের (rituals) নৃত্যও গড়ে উঠেছে। Classico-folk ধরনের নৃত্য, বিশেষ করে সেরাইকেলার ছৌ-নাচ, পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ প্রভৃতি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার আঞ্চলিক নৃত্য হয়ে গেছে। Classical Kathak নৃত্য লক্ষ্ণৌ এবং জয়পুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরীপ্রসাদ এই কথক নৃত্যের নবজন্মদাতা। এরপর এই নাচকে নবতর রূপে তুলে ধরেন ঠাকুরপ্রসাদ, (কলিকাপ্রসাদ) মহারাজ বৃন্দাদিন, আচ্ছান মহারাজ, শম্ভু মহারাজ, লাচ্চু মহারাজ, আজমত আলী, রহমত আলী প্রভৃতি গুণীরা। বারাণসী, এলাহাবাদ, জয়পুর, প্রভৃতি স্থানে কথক নৃত্যের প্রভুত চর্চা হয়ে থাকে। নায়ক নায়িকা

১। A New document of Indian Dancing—Prof. O. C. Ganguly (U. S. I. S. Centre News Almora, Vol. 5. No. 50. April. 1943.)

ভেদে বিভিন্ন ভাব ও রসকে মূর্তকরে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তোলাই কথক নৃত্যের প্রধান কাজ।

পূর্ব ভারতেই আরেকটি মূল্যবান নৃত্য ধারা যাকে Tagore School of Dance বলা হয়েছে, তার সৃষ্টি করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য-এর মাধ্যমে। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নৃত্যে ভরত নাট্যম, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, রাইবেশে, সিংহলী কাণ্ডিনৃত্য, জাভা ও বলি দ্বীপের নৃত্যের প্রভাব পড়ে। পরবর্তীকালে অবশ্য কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যই প্রাধান্য পায়। এই দেশী-বিদেশী নৃত্যের আঙ্গিক মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্যধারার প্রচলন করলেন তা একান্তই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক এক নতুন নৃত্য ভাবনা। অনেকে একে শান্তিনিকেতনী নাচ বলেন। (যথাস্থানে পরবর্তী অধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)।

।। ভারতীয় নৃত্যে দেবদাসী ।।

যে মন্দিরকেন্দ্রিক নৃত্য-ধারা অর্থাৎ 'দাসী আট্যম্' বা দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতি একদা সমগ্র ভারতেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচলিত ছিল, অন্ততঃ উত্তর ভারতে প্রাক-মুসলমান যুগ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ ভারতে তারও পরবর্তীকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তার পটভূমিকাটি আলোচনা করে, দেবদাসীদের আরাধ্য দেবতা নটরাজ শিবের পরিকল্পনার রূপরেখাটিও এখানে আলোচনা করে নেওয়া ভাল। কারণ পরবর্তী যুগে এই দুইটি বিষয়ের প্রভাব নৃত্যশিল্প ও শিল্পীদের মননে ও চর্চায় অপরিসীম।

দক্ষিণভারতীয় সংস্কৃতির মূল পীঠস্থান মন্দিরগুলি। দক্ষিণভারতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মন্দিরকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য-শৈলী গড়ে উঠেছে। উত্তর ভারতে যখন বারবার 'শক-হূণদল-পাঠান-মোঘল' এর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে শিল্পসংস্কৃতি ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে, তখনো দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা মন্দির গড়ে উঠেছে এবং এই মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতি বা 'দাসী আট্যম' গড়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে আসামের 'নটীনৃত্য' দেবদাসী নৃত্যেরই নামান্তর মাত্র। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা আছে।

॥ দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি ॥

পল্লব যুগে দক্ষিণ ভারতের আর্যীকরণও সম্পূর্ণ হয় এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চা দক্ষিণে সর্বত্র বিপুল উৎসাহে আরম্ভ হয়। সংস্কৃত উত্তর ভারতের মত দক্ষিণভারতেও রাজভাষা ও পণ্ডিতের ভাষা হয়ে ওঠে। পল্লবরাজধানী কাঞ্চিপুরম দক্ষিণভারতের এবং সেখান হতে সমুদ্র পথে দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় উপনিবেশে, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ ভারতের দেবালয়-স্থাপনের একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। একে দ্রাবিড়রীতি বলে। উত্তর ভারতের দেবালয়ের সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য দেখা-মাত্রই নজরে পড়ে। দক্ষিণের দেবালয়ের 'শিখর' পিরামিডের আকৃতি ও স্তরবিন্যস্ত, তার ওপর অর্ধগোলাকার আবরণ বা গম্বুজ। দেবালয়ের প্রথম যুগে হয়ত শুধু দেবালয় ছাড়া সংলগ্ন আর কিছু থাকত না। পরে প্রাচীর বেষ্টিত চতুষ্কোণাকার বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে আরও বহু মন্দির, জলাশয়, হলঘর ও আরাধনা কক্ষসহ প্রধান দেবালয় তৈরী করা হয়েছে। এই শিল্পরীতির বিকাশ হয় সপ্তম শতকে পল্লব যুগ থেকে। মাদ্রাজের ৩৫ মাইল দক্ষিণে মামল্লপুরম বা মহাবলীপুরম-এর ধর্মরাজ রথ, গণেশ রথ, প্রভৃতি সাতটি পাহাড় খোদিত দেবালয় পল্লব রাজাদের মৃত্যুঞ্জয়ী স্থাপত্যকীর্তি। এই শিল্পরীতির বিকাশের পরবর্তী স্তর পল্লবরাজধানীর কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠ-পেরুমল, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি বিখ্যাত দেবালয়ের গড়নে লক্ষ্য করা যায়। এরপর চোল রাজাদের পোষকতায় এই স্থাপত্যরীতির চরম বিকাশ হয়—দেবালয় নির্মাণে।

রাষ্ট্রকূট শিল্প ঃ দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার উৎকর্ষ-সাধনে রাষ্ট্রকূটদের দান উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রকূটদের রাজগণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় ইলোরার পর্বতগাত্রে খোদিত কৈলাস-নাথের-মন্দিরটি স্থাপত্য ও আলঙ্কারিক ভাস্কর্য কৌশলের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে আজও বর্তমান।

চালুক্য শিল্পরীতি ঃ চালুক্য রাজগণও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চালুক্য রাজাদের আমলে অজন্তা ও এলিফ্যাণ্টার গুহাচিত্রগুলিরও কয়েকটি চিত্রিত হয়েছিল। চালুক্যদের রাজত্বকালে আইহোল, বাদামি, পট্টকল প্রভৃতি স্থানে বড় বড় শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির নির্মিত হয়েছিল। আইহোলে প্রায় ৭০টি দেবালয় আছে। এজন্য একে বলা হয় City of

Temple বা দেবালয় নগর। সোমেশ্বরের মন্দির, বিরূপাক্ষ মন্দির চালুক্য স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

পল্লব-শিল্পরীতি ঃ সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষের জন্য পল্লবযুগ বিখ্যাত। বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকৌশল পল্লবদের শিল্পকার্য্যে লক্ষ্য করা যায়। কুষাণ আমলে অমরাবতী ও কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে এক অতি উন্নত ধরনের শিল্প ও স্থাপত্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই শিল্পরীতিকে ক্রমে উন্নত করে পল্লবগণ পল্লব শিল্পরীতি গড়ে তুলেছিলেন। কাঞ্চী ও মহাবলীপুরমে পল্লব-শিল্পের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। পল্লব শিল্পীগণ বড় বড় পাথরের পাহাড় কেটে মণিকারের সূক্ষ্মতা সহকারে বহু মন্দিরের কারুকার্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের শিল্পকৌশল, সূক্ষ্ম কার্যদক্ষতা, অনুপাত জ্ঞান প্রভৃতি আজও দর্শককে বিস্ময়াভিভূত করে।

পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে কাঞ্চির ত্রিপুরান্তশ্বরের মন্দির, ঐরাবতেশ্বরের মন্দির ও মহাবলীপুরমের মুক্তেশ্বর ও কৈলাস মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে দ্রৌপদী রথ, ভীম রথ, অর্জুন রথ প্রভৃতি রথের আকৃতি বিশিষ্ট বহু মন্দির পল্লব শিল্পীগণ নির্মাণ করেছিলেন। পল্লব শিল্প ভারতীয় শিল্পরীতির উৎকর্ষের এক অতি সুন্দর নিদর্শন স্বরূপ। পল্লব শিল্পরীতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে বিস্তার লাভ করেছিল।

চোল শিল্পরীতি ঃ দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পোৎকর্ষে চোলদের দান উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে চোল শিল্পীগণ চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন। চোল শিল্পরীতিতে পল্লব শিল্পরীতির কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঞ্জোরের রাজ-রাজেশ্বরের মন্দির (শিবমন্দির) চোল স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি স্তর আছে এবং সর্বোপরি একটি বিরাট পাথর বৃত্তের আকারে কেটে বসানো হয়েছে। রাজেন্দ্র চোলদের স্থাপিত 'গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম' নামক নগরে বহু মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। এগুলির দেওয়ালে নানা প্রকার মূর্তি খোদাই করা আছে। বড় বড় পাথর কেটে মণিকার সুলভ সূক্ষ্মতা সহকারে সেগুলি হতে নানা প্রকার কারুকার্য খচিত মন্দির তৈরী করে চোল শিল্পীগণ তাঁদের শিল্প কৌশলের প্রমাণ রেখে গেছেন। চোল

শিল্পীগণ ধাতু দ্বারা মূর্তি নির্মাণেও পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। ব্রোঞ্জ নির্মিত নটরাজের মূর্তি চোল শিল্পীদের শিল্পোৎকর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

॥ দাসী আট্যম্ (আট্টম্) ॥

বৈদিক মহাব্রত অনুষ্ঠান থেকেই 'দাসী আটামের' সূত্রপাত ধরতে হয়। বৈদিক যুগে দাসীরা যে নাচতেন, সেই নাচকে বলা যায় "Dedication of Dance to God." অর্থাৎ নৃত্যকে ভগবানের নামে উৎসর্গ করা। যেমন যজ্ঞে আহুতি দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীকালে যে দাসী আট্যমের সৃষ্টি হলো তাকে বলা যায় "Dedication of Dancers to God," অর্থাৎ নৃত্যশিল্পী নিজেকেই উৎসর্গ করছেন বা আত্মনিবেদন করছেন ভগবানের কাছে। এ ক্ষেত্রেও মাধ্যম কিন্তু নৃত্য। প্রথম যুগে নৃত্যশিল্পকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। পরের যুগে নৃত্যশিল্পী নিজেই উৎসর্গীকৃত হয়েছেন। অর্থাৎ নৃত্যকে উৎসর্গ করার নামে নিজেকেই উৎসর্গ করে ফেলেছেন বা বাধ্য হয়েছেন। (Dedication of the dancer herself to God instead of the dance.)

বৈদিক যুগে দক্ষিণ ভারতীয়দের দাস এবং তাঁদের স্ত্রীলোকদের যে অর্থে দাসী বলা হতো, দেবদাসীরা সে পর্যায়ে ঠিক পড়েন না। কারণ তাঁদের নৃত্যশিল্প চর্চার জন্যই, মানুষের দাসী না ভেবে ভগবানের দাসী ভাবা হতো। এবং তাঁরাও শিল্পের মাধ্যমে ভগবানের সেবা করতেন। সুতরাং দাসী শব্দ, যে মহিলা দাসী হতেন এবং তার সেবা এই দুটি মিলে উৎসর্গের জন্য উচ্চমার্গের পবিত্র সাংস্কৃতিক ব্যঞ্জনা বহন করতো। (Both the word dāsi, the person of the dāsi and her Seva were sublimated in to the highest reaches of cultural aspirations by such dedication.)

॥ দাক্ষিণাত্যের দেবদাসী বলার তাৎপর্য ॥

'দাসী আট্যম্' শব্দটা এখন পুরোপুরি দাক্ষিণাত্যের দেবদাসীদের পক্ষেই প্রযোজ্য। দক্ষিণ ভারতীয়রা সাধারণ নাটক অর্থে 'নাট্যম' এবং নৃত্য অর্থে 'আট্যম' শব্দটি দীর্ঘকাল ব্যবহার করে এসেছেন। আমাদের ধারণা দীর্ঘদিন ধরেই এই 'দাসী আট্যম্' শব্দটি চলে এসেছে। পক্ষান্তরে দেখি 'কৃষ্ণনাট্যম্' শব্দটি নাচ হলেও নাট্যার্থেই চলে আসছে। অথচ মোহিনী নাচ 'আটাম্' অর্থে ঠিকই আছে। যাই হোক দাসী আট্যম্ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা

অনুশীলিত নৃত্যকলা পদ্ধতি। এই সম্প্রদায় যাঁদের নিয়ে গঠিত, একদা তাঁরা সারা ভারতেই ছড়িয়েছিলেন। পরে অবশ্য উত্তর ভারতে নানা ঐতিহাসিক আলোড়নের ফলে যে উত্থান পতন হয় তাতে উত্তর ভারত থেকে সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এরা উৎখাত হল—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানা কারণে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বাইরের অনুপ্রবেশ কম হওয়ায় ভক্ত সম্প্রদায় দীর্ঘদিন তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে। তাঁদের জীবনের করুণ রসঘন অধ্যায় এখনো ইতিহাসের পাতায় নানা উপাদানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে—যা গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

দাসী আট্যম মূলতঃ একটি সম্প্রদায়—যাঁরা নানা ভাবে দাসী থেকে কখনো দেবতার কখনো মানুষের সেবা করেছে। কখনো এই সেবা বিকল্পার্থে হয়েছে বলেই আমাদের সমাজের রক্ষণশীল দল এদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছে। তা হোক। কোন যুগে নারী পুরুষের লালসার শিকার না হয়েছে বা হচ্ছে? তবু বলা যায় ওদের অন্ধকারময় জীবনকেই শুধু—না দেখে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যেও যে তাঁরা একটি উচ্চাঙ্গের নৃত্যশিল্প-ধারাব চর্চা করে এসেছেন এবং আমাদের হাতে তা তুলে দিয়েছেন—একথা যখন ভাবি তখন স্বভাবতই ওদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে মনটা ভরে ওঠে। উপন্যাসে এদের বিকৃত জীবনকাহিনী পড়ে যেন ওদের আমরা ভুল না বুঝি।

মূল দাসী-আট্যম্ থেকেই বিভিন্ন যুগে দেবদাসী, শিবদাসী, অলংকার দাসী, সেবাদাসী, কম্বলা দাসী, রাজদাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব হয়েছে।—

দাসী আট্যম্

দেবদাসী, রাজদাসী শিবদাসী অলংকারদাসী সেবাদাসী কম্বলা দাসী ইত্যাদি।

দেবদাসীদের মধ্যে শ্রেণী ভেদের নানা কারণ আছে। দেবদাসীরা ৭ থেকে ১২ বছরের মধ্যে নত্তুভানদের কাছে নৃত্যশিক্ষা করতেন। শিক্ষা শেষ হলে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশের আগেই 'আরেংদেআট্যম্' সেরে, আরংগ্রেত্রাল বা আরংগেত্রাম্ নামক অনুষ্ঠান হতো। নত্তুভানরা ছিল খুব রক্ষণশীল, পরম্পরাগত

শিক্ষায় বিশ্বাসী ও আগ্রহী। নতুন কিছুতে তাঁরা সাধারণতঃ অনাগ্রহী ছিল। সমাজপতিদের চক্রান্তে নব্ত্ভানদের লালসায় দেবদাসীদের পবিত্রজীবনে ক্রমশঃ নেমে এসেছে ব্যভিচার ও কলুষতা। এই প্রথার অপব্যবহারের জন্য সমগ্রদেশে গণিকাদের মধ্যে এক বিরাট অংশ দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সংগৃহীত হতে থাকে। পিতামাতার দারিদ্র ও ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে পুরোহিত ও নব্ত্ভানদের চক্রান্তে মাতৃক্রোড় থেকে গণিকালয়ে বা রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য দেবদাসী সংগৃহীত হতে থাকে। পরবর্তীকালে অর্থ-লালসার ও শোষণের মাধ্যম রূপে বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান এই প্রথার সঙ্গে যুক্ত হয়। এবং সেইসব ক্ষেত্রে মন্দিরে নামমাত্র দক্ষিণা দিয়ে পিতৃগৃহেই দেবদাসীদের 'রক্ষিতা' জীবন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। এই প্রথায় যাঁরা শিকার হয়েছেন, এমন অসংখ্য দেবদাসীরা ভারতের বিভিন্ন গণিকালয়ের অন্যতম অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা শ্রেণী-ভেদ দেখা দিয়েছে। পরবর্তীকালে এঁরা রাজদাসী, শিবদাসী, অলংকার দাসী—এই নানা নামে অভিহিত হয়েছেন।

দেবদাসী—মন্দিরের অভ্যন্তরে শুধুমাত্র দেবতার সামনে নৃত্য প্রদর্শন করতো। রাজদাসী—মন্দিরের ধ্বজস্তম্ভের সম্মুখে রাজা বা অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে নৃত্য করতো। স্বদাসী বা শিবদাসী—এরা মূল দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা নিম্নস্তরের। তাদের বিখ্যাত 'কুম্ভাভিষেক' ছাড়া দেবতার সামনে এরা নৃত্য প্রদর্শন করতে পারতেন না। দেবতা ছাড়া সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করতো বলে যে পাপ হতো, তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য এঁরা মূল মন্দিরের বিগ্রহের মাথায় বছরে একবার মাত্র জল ঢালতে পারতেন। মন্দির থেকে ভ্রষ্ট হয়েই এঁদের 'স্বদাসী' জীবন যাপন করতে হতো। অলঙ্কার দাসী—এঁরা পেশাদারী নৃত্যশিল্পী হিসেবে, বিবাহ বা কোন সামাজিক উৎসবে কারো বাড়ীতে গিয়ে নেচে উৎসবের শোভা বর্ধন করতেন।

॥ দাক্ষিণাত্যের দেবদাসী ॥

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরাশ্রিত দেবদাসী সম্প্রদায়ের কথাই এখানে সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি। এই সম্প্রদায়ের জীবনধারা, রীতিনীতি বিষয়ক তথ্যগুলি

নানা সরকারী রেকর্ড ও পুরোনো ঐতিহাসিক দলিল ও পুঁথিপত্র থেকে যথা-সম্ভব সংগ্রহ করা হয়েছে।

ধ্রুপদী নাচের মধ্যে এখনো যেগুলি দৃশ্যমান অর্থাৎ মঞ্চে বা অনুষ্ঠানে দেখা যায়, সেগুলি হল—প্রধানতঃ, ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী, কুচিপুড়ি ও ওড়িশী। এছাড়া কৃষ্ণনাট্যম্ ও মোহিনী আট্যম্ (নাট্যম্ নয়) নামেও দুটো ধারা আছে। এছাড়া অজস্র রকমের আদিবাসী নৃত্য ও লোকনৃত্য ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নৃত্যের এত ধারা-উপধারার মধ্যে যে ধারাটিকে ঐ দেবদাসী সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করে এসেছেন, সেটি হল ভরতনাট্যম্ নৃত্য পদ্ধতি এবং ওড়িশী ও কুচিপুড়ি। এই ভরতনাট্যম্ নৃত্যপদ্ধতি শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতেই নয় এখন প্রায় সমগ্র ভারতেই এর চর্চা চলছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন এই দেবদাসীরা তামিলনাড়ুর মন্দিরগুলিতেই তাঁদের নৃত্যবিষয়ক ক্রিয়া-কলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। সমাজ বিকাশের নানা পরিবর্তনে ও অর্থনৈতিক কারণে সেই পদ্ধতি অধুনা ক্ষীয়মান। কারণ যাঁরা সেই নৃত্যধারাকে একদা ধর্মীয় আচরণ ও অনুশাসনে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের বেশীরভাগই এখন মন্দির ছেড়ে সাধারণ সমাজের কুলবধূ হয়েছেন, কেউ বা গিয়েছেন বিপথে।

সে যাই হোক, দ্রাবিড় ভাষাভাষী অঞ্চলের এই দেবদাসী নৃত্যপদ্ধতির উপর, দক্ষিণ ইউরোপ, এশিয়া মাইনর, ঈজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি প্রাচীন অঞ্চলের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য চোখে পড়ে। এই দেবদাসী প্রথার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকে অনুমান করেছেন, সুপ্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়গণের পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের মাধ্যমেই উল্লিখিত দেশগুলির ঐ প্রথা আমাদের দেশকে প্রভাবিত করে। এর সঠিক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও কিংবদন্তী ও ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা গেছে তা এবার তুলে ধরছি।

প্রাচীনকালে ধর্মীয় পবিত্রতা ও শিল্পকলা চর্চার আবরণে যে ব্যভিচার চলতো তারই চমৎকার নিদর্শন এই দেবদাসী প্রথা। এদের জীবনকাহিনী নিয়ে এযাবৎ অনেক যৌনগন্ধী মুখরোচক উপন্যাস রচনা হয়েছে। এদের সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তীও চালু আছে। হিব্রু ভাষায় যাকে "temple harlot" বলা হয়েছে, ধর্মের নামে উৎসর্গীকৃত সেই শিল্পী-বনিতা প্রথা অন্যান্য দেশেও

ছিল, এটা জানা যায়। যেমন ইজিপ্টের আমনদেবের মন্দিরে কুমারী মেয়েদের ভগবানের নামে উৎসর্গ করা হতো। এভাবে ভগবানের নামে উৎসর্গ করার পদ্ধতি মেসোপটেমিয়া ও আর্মেনিয়াতেও ছিল। ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত এসব কুমারীদের ভোগ করতো মন্দিরের পুরোহিত বা ঐ জাতীয় মোহান্ত পুরুষেরা। এরা কখনো বিধবা হত না। স্বাভাবিক বিয়ে না করেও এদের সন্তান হতো। এবং সেটা পাপ বলে গণ্য হতো না। বরং ঐ ব্যভিচারকে পবিত্র বলেই দেখা হতো।

এদের সম্বন্ধে ই. থার্ষ্টন (E. Thurston) বলেছেন—"The insignia of the temple dancers, according to the conjeevaram records consist of the figure of Cupid. Married to a sword, a dagger, or the temple deity, a courtesan is never a widow."

অর্থাৎ কাঞ্জিভরম রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেবদাসীরা কামদেব বা মদনদেবের প্রতীক চিহ্ন বা ব্যাজ ধারণ করতো। তাঁরা বিয়ে করতো একটি তরবারি বা একটি ছোরা অথবা মন্দিরের কোন দেবতাকে। এবং তাঁরা কখনো বিধবা হতো না। (যেহেতু দেবতারা অমর)।

১৯১০ খ্রীঃ মহীশূর গভর্ণমেন্টের একটি নির্দেশনামায় দেখা যাচ্ছে—তখনকার সরকার-পরিচালিত মন্দিরগুলিতে এই কুমারী মেয়ে উৎসর্গ করার প্রথাকে রদ করার কথা আছে। এ প্রথা ছিল অদ্ভুত। ধরা যাক, কারো উত্তরাধিকারী দরকার, অথচ তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই। তখন সে তাঁর মেয়েকে দেবমন্দিরে উৎসর্গ করে দেবদাসী করে নিল। যে মুহূর্তে মেয়েটি দেবদাসী হলো, সেই মুহূর্ত থেকেই সে পিতার উত্তরাধিকার পেল। এমন কি ছেলের মতো সকল পারলৌকিক কাজ, যেমন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করার অধিকার পেল। মেয়েটি তখন ইচ্ছে করলে মন্দির ছেড়ে বাপের বাড়ীতে এসেও ঘর জামাইয়ের মত কোন পুরুষ সাথীকে নিয়ে থাকতে পারতো। তাঁর গর্ভে যে সন্তান হতো তাঁরা আসল বাপের নামে চিহ্নিত হতো না। মায়ের নামেই এদের পরিচয় হতো। ছেলে হলে সম্পত্তির মালিক হতো, বা নত্তুভান হতো আর মেয়ে হলে আবার তাঁরা মায়ের মতো দেবদাসী হতো। এসব দেবদাসীদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। এমন কি কোন বিবাহ বা কোন অনুষ্ঠানে এঁদের উপস্থিতি অতি পবিত্র বলে ধরা হতো। তার একমাত্র কারণ তাঁরা কোনদিন বিধবা হতো না। অর্থাৎ

ধর্মীয় ভাষায়, যেহেতু ভগবানের মৃত্যু নেই, সুতরাং ভগবানে উৎসর্গীকৃত মেয়েটিও কোনদিন বিধবা হতো না। অথচ তাঁর জৈবিক চাহিদা মেটাতো যে পুরুষ (জমিদার, ধনী বা ঐ ধরনের কোন লোক) তার কোন প্রাধান্য তেমন ছিল না অর্থাৎ সে নেপথ্যেই থেকে যেত। এ ভাবে দেবতার নামে, ধর্মের নামে এই যে ব্যভিচার তা বন্ধ করার জন্য যুগের পর যুগ কত চেষ্টাই না হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়নি। সমাজের আর দশটি ক্ষতের মতো ওটিও থেকে গেছে লুকিয়ে। কয়েক বছর আগে এই নিয়ে লোকসভায় তুমুল হৈ-চৈ হয়ে গেছে। জানিনা দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে এই প্রথা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে কিনা।

এঁদের সম্বন্ধে বার্নিয়ারের (Bernier) রিপোর্টে দেখছি, "the virgin married to Vishnu at Puri consulted the god for permission to meet the strangers." ভগবানের নামে ব্যভিচারের এও একটি নিদর্শন নয় কি ?

তামিল মন্দিরগুলিতে দেবদাসীরা নাচ ও গান করতেন। এঁরা অনেক সময় মন্দিরে ভর্তি হতেন, কখনো বা এঁদের কিনে আনা হতো। ১৯৩১ সালের একটি Census Report-এ দেখছি, শাস্ত্রমতে এই দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ হলেও, নবম ও দশম শতাব্দীতে এই উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রচুর মন্দির তৈরী হয়। সে সময় দেবদাসীদের কাজ বেঁধে দেওয়া হত। তাঁদের কাছে ছিল মন্দিরের বিগ্রহকে চামর ব্যজন করা, পবিত্র আলো বহন করে নিয়ে যাওয়া, একে বলা হতো কুম্ভারতি, তারপর মন্দিরে ঠাকুরের কাছে নাচ ও গান করা। ১০০৪খ্রীঃ একটি শিলালিপিতে (inscription) দেখছি, তাঞ্জোরের চোল রাজারা রাজরাজেশ্বরের যে মন্দির নির্মাণ করেন তাতে চার শত দেবদাসী ছিল। এঁদের জন্য বিনা ভাড়ায় বাসস্থান দেওয়া হতো। মন্দির চত্বরের মধ্যে লম্বা লম্বা চারটি রাস্তায় এদের বাড়ী ছিল। এরা নিষ্কর জমি পেত। বুকাননের একটি গ্রন্থে (Buchannan's journey from Madras, 1807) দেখছি, কাঞ্জিভরমের মন্দিরে এক শত দেবদাসী ছিল। এবং "Who were kept for the honour of the deities and the amusement of their votaries."

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাদুরা, কাঞ্জিভরম্ ও তাঞ্জোরের বড় বড় মন্দিরের

দেবদাসীরা পেন্‌সন্ পেয়েছেন। এলিয়টের লেখা History of India গ্রন্থে—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়নগর কোর্টে আবত্নর রেজাক নামে যে তুর্কী দূত এসেছিলেন, তাঁর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে—ঐ সব দেবদাসীরা সরকারের দ্বারা পরিচালিত মন্দিরে থাকতেন এবং এঁদের মাধ্যমে যে আয় হতো তার একটা মোটা অংশ তখন পুলিশখাতে ব্যয় হতো।

এঁদের নিয়ে সেন্সাসের লোকেরা কি ঝামেলায় পড়তো দেখুন—"It is a standing puzzle to the census enumerators whether such women be entered as married in the column referring to civil conditions." অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে বিবাহিত কলামে এঁদের নাম লেখা মুস্কিল ছিল।

দেবদাসীরা বিভিন্ন জেলায়, স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন নামে অভিহিত হতেন। যেমন, দেবদাসীদের অনেকের ছেলেদের বলা হয় 'নত্তুভান'। এঁদের কাজ ছিল গান বাজনা ও নাচ শেখানো। এ ছাড়াও আছে কম্মলাদাসী, বলাংগা, ইদাংগা, যোগাম, শনি, কুর্মপাস্, নাগাবাসলু, পিল্লাই, মুদালী প্রভৃতি অদ্ভুত নাম ও উপাধী। এঁরা প্রায় সবাই মন্দিরের নৃত্যশিল্পী।

একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়েই যেখানে দেবদাসী প্রথা রয়েছে, সেখানে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে মালাবার অঞ্চল। মালাবার উপকূলে নৃত্যের উৎকর্ষ হয়েছে কল্পনাতীত। তাহলেও এখানে দেবদাসী প্রথা সামান্য দেখা যায়।

লর্ড ডাফরিণ যখন মাদ্রাজে যান, তখন যে সব দেবদাসী তিনি দেখেছেন, তাঁদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, "the front of the dress hangs in peticoats and the back is only trousers……They read, write, sing, play as well as dance. Hence, of the great objections urged at first against the education of girls was : We don't want our daughters to become dancing girls." শেষের কথাটি দেবদাসীদের সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি।

টিপুসুলতানের কোর্টে ফরাসী জেনারেল বার্টন গিয়েছিলেন। ঐ সূত্রে জানা যায়—তাঁদের আগমনে যে Corps de ballet তৈরী হয়েছিল তাতে native dancing girls-রা যোগ দিয়েছিলেন এবং God save the king

গানও নাকি গেয়েছিলেন। ইতিহাসের পাতায় এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আছে দেবদাসীদের সম্বন্ধে।

দেবদাসীরা যে ধরনেরই জীবন যাপন করুন না কেন, মূলতঃ তাঁরা নৃত্যশিল্পী। ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে এঁদের অবদান কম নয়। অন্ততঃ ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারায় পরিশ্রমসাধ্য ধ্রুপদী রূপটি এরা গতানুগতিকভাবে চর্চা করে এসেছেন, এবং বাঁচিয়ে রেখেছেন বলা যায়। কারণ বিভিন্ন যুগে ভারতের নানা স্থান-এ যখন রাজনৈতিক উত্থান-পতনে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাগুলি ব্যাহত হয়েছে—তখনো মন্দিরাশ্রিত এই দেবদাসীরা প্রাচীন ভারতের এই অমূল্য সম্পদ নৃত্যকলাকে নিভৃতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেদিক দিয়েও এঁদের মূল্য কম নয়। তাঁরা যে ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত ছিল সে কথা আগেই বলেছি। এই ব্যভিচারের জন্য তাঁরা দায়ী নয়। দায়ী সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, ধনীদের সীমাহীন ভোগস্পৃহা, মন্দিরের পুরোহিতদের ভণ্ডামী। কিভাবে তাঁরা মন্দিরের পবিত্র পরিবেশে থেকেও মোহান্তদের অর্থলোলুপতার শিকার হয়েছেন এবং ধনী জমিদারদের সঙ্গদান করতে বাধ্য হয়েছেন, সে কলঙ্কের ইতিহাস বড় করুণ। এঁদের নিয়ে আজও কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়নি। লেখা হলে জানা যাবে এই সামাজিক বিকৃতি কোন স্তরে পৌচেছিল। এই ব্যভিচারের দিকটা বাদ দিলে দেখা যায়, দেবদাসীরা প্রত্যেকেই প্রায় প্রথম শ্রেণীর নৃত্যশিল্পী ছিলেন। অথচ ধর্ম ও শিল্পের নামে এঁদের বারবণিতাদের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বৃটিশ যুগে কলকাতা ও বোম্বাই হাইকোর্টে হিন্দু আইনের আওতায় এই দেবদাসীরা পড়তেন না। তাই আমাদের অঞ্চলে, তথা উত্তর ভারতেও এঁদের প্রাধান্য নেই। মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কোর্টে এই দেবদাসীপ্রথা গৃহীত আইন বলে চলতো। এই জন্যই এই প্রথা দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ। এবং ধর্মের ধ্বজাধারীদের চাপে বৃটিশেরাও দেবদাসী প্রথাকে এক বিশেষ আইন বলে চালু রাখতে বাধ্য হয়েছিল।*

এঁদের সম্বন্ধে আরও জানা যায়—ডঃ সত্যনারায়ণ উল্লেখ করেছেন—

(1) Devadāsis of Colamandalam :—

"It suffices here to mention two parallel instances of

* দেবদাসী—সন্তোষ চ্যাটার্জী (১৯৪৫) দ্রষ্টব্য।

devadāsis in south India of the tenth to the twelfth centuries after christ. These were in the neighbouring kingdoms of Karnātaka and Cola. The great Cola ruler Rājrāja was also a lover and patron of the arts. He, it was who built the Brihadisvara temple at Tānjore. The Colas and the Kannadiga Cālukyas of Kalyāni were incessantly at war during this period. As a result of the peace treaty between Rājrāja and the Cālukyan ruler Satyasrāya, the former carried away enormous wealth from Karnātaka and used much of this for the construction of the Brihadisvar temple. A Large inscription in this temple records grants made by him to a large number of artists. We learn from this inscription that transferred dancing girls dedicated to various temples in the grants are made to no less than four hundred artists who served Brihadisvara, It is interesting to note that the heirs to these artists claiming the grant were to be nominated by the artists themselves from near relatives if these latter were expert dancers. Any other expert dancer could be so nominated if progeny or relatives were not proficient enough.

The temple was surrounded by about a hundred houses each on the east, west, north and south sides wherein the artists resided. Six dance teachers, called annavi and nattuvān in the inscription have also received grants ; five singers, three players of the mukhavinā, two of the hadukkā, two of Kottimāddalam ; three of cengu and several other miscellaneous musicians also shared the grants.

These dancers often named themselves after the town they hailed from. Some of them had interesting and

appropriate names such as Edutta Padam ; Surakulasundari, Vidyādhari, Caturi ; Karanavidyādhari, Sirudaiyl, Sikhandi ; Nandienuman etc, while the nattuvans had titles such as nṛttamarayan, nṛtta vinoda vadya nārayan, Udukki Vidyādharan ; gandharva dasan, gandharvaturai and Currinandan. During this period of political pell-mell, regions belonging to Mysore and Tānjore came to be continuously interchanged, for example, Rājrāja annexed Gangāvadi, Yādigavadi, and Nonambavadi to his Kingdom, Satyāsraya Iriva Bedanga of the Cālukyas captured vengi. It is not improbable that dancers of rare ability were carried away as Prizes on both sides and a cultural liaison resulted there from.

(2) **Māhāris of Karnātaka and Orissā :—**

This inscription of about the twelfth century A. D. is of, particular interest beacause of the word māhāri. This word means a dancing girl dedicated to a temple. It has been used in exactly the same sense in the literature and inscriptions in Orissa also through many a long century. The practice of dedicating dancing girls to temple is older than a millenium in Orissa and is in evidence since the beginnings of the Kesari dynesty. This dynesty was succeeded by the Eastern Gangās who claim their descent from Kāmarnava and are of Karnātaka extraction. They are the descendents of the Western Gangā who ruled at Kulahalapura (modern Kolara in Mysore state) and extended their territory to Kalinga (Orrissā).

The foremost ruler of the Eastern Gangā dynesty was Ananta-Varmā Codangangādeva who flourished in the eleventh twelfth Centuries A. D. Himself an adept in music

and dance, highly pious and learned in sacred lore, he consecrated the famous temple at Puri to Jagannātha. His descendant Anangabhimdeva died in a natamandira (dance theatre) to the temple in the thirteenth century A. D.

Thus it seems quite probable that both the word 'māhāri' and the practice of daily nartana Seva at temples were transplanted from Karnataka by the Eastern Gangās. It is of further interest to note that the dancing, girl is of two catagories in Orissa also the bhitargani māhāris are chaste and pious and are privileged to dance in the adytum of the temple at the time of the 'bada srngār' every night. The 'bāhārgani māhāris are allowed to dance only in the nata-mandira built by Anangabimadeva or near the 'garuda stambha'. These two classes correspond to devara Patra and rule of Karnataka of the above period. The Eastern Gangās instituted many annual festivals in the temple most involving dance recitals and are preserved even to-day.

The māhāris of Orissa are dedicated to Siva, Sakti or Visnu whereas in Karnataka the devara Patra belonged largely to Vishnu temples and less frequently to Siva temples.

Māhāri is a desiya term. It may be regarded as a vernaculari action of the Samskrita 'mukhari' which connotes the chief drummer (Mardangika) to a dancer in nrtta paribhasa.

It is quite possible that this original Kannada term took the route māhari > mahari > mokhari > mukhari into Samskrta. In any event mukha is phonetically deteriorated into 'maha in Karnada To cite an example Janna uses 'mahacaleya vice mukhacaleya.'

The mukhari is described as a composer of vadya prabandha, an expert in teaching dance, expert in accompanying vocal music as having a fine figure, alert, and as the indispensable half of the danseuse.

Primary evidence is available for the existence of mukhari and muhari in the twelfth century A. D. in Karnātaka. Thus an inscription in the Cannarayapattana taluk in Mysore state dated 1184 A.D. refers to Bammaladevi, queen of the Hoysala Balladeva. She was a great danseuse and had the title patracudāmani. Her father Lakhaya was a philanthropist. He was a mokhari and presumably taught his daughter dance and accompanied her dance in mrdanga.

From this it becomes evident that the mukhari could be of either sex, a danseuse became mukhari (or māhari) when she took to teaching and accompaniment also. That this tradition continued in karnataka till recently has been indicated above.

(3) **Devadāsis of Karnātaka :**

The second instance was at the distant Dvarasamudra of the Hoysalas. Pratapa Vira Ballala Hoysaladevas wife Bammaladevi had the titles patracudamani and gitavadya-nrtya Sutradhare. Her father Lakkayya was mukhari, chief drummer to dancers.

This tradition of royal scholarship in an patronage of classical dance goes back to the early fifth century A. D. The palace of Kakutastha Varman of Kadambas resounded with sangita, with the sound of song, instrumentation and dance.

Mandalesvara Kalinga in the last decade of the eleventh

century A. D. was a great expert in dance and other fine arts. Firiya Ketaladevi was desabhasa sangita Vidyadhari. Even saint who brought suspiciousness to royal courts were adepts in music and dance. Thus Bhatta Akalabka was renouned in gita, Vadya and nrtya. The famous pattadakal inscription enlogises the Kannadiga dancer, Natasevya, that his performance filled the hearts of rival with fear as the rear of the lion does even the lust-maddend elephant.

The great expertise in dance of the Hoysala King Visnu vardhana and of his queen Sāntala has been mentioned on a previous occasion. More than a century age, Karnātak had produced other daughters of such outstanding merits. Thus Takki Sundari, queen of the Mahasamanta Sudraka was a Sahaja—Sarasvati in presumably music and dance. The dance of Laccaladevi, queen of Mandalika Udayāditya is described as ever new and equally beautiful in mārga and desi in the eleventh century A. D."[১].

শাস্ত্রীয় মতে দেবদাসী নৃত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ দেখাবার জন্য যে কাহিনী বা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা অনুধাবন করলে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, ঐ কাহিনী ইতিহাস ভিত্তিক নয়। তবে ভরতনাট্যম নৃত্য পদ্ধতির ক্রমবিকাশের অন্ততঃ একটি স্তরে এই কাহিনীর মূল্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই মূল্যবোধের মূলে রয়েছে চিরন্তন ধর্মবোধ।

কথিত আছে,—প্রথম নৃত্য-নাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায়। নাট্যবেদের স্রষ্টা ব্রহ্মা, মুনিভরতকে একটি নৃত্যনাট্য তৈরী করে, ইন্দ্রের বিজয় উৎসবে দেখাবার জন্য বলেন। দানবদের পরাজিত করে ইন্দ্র দেবকুলের সম্মান রেখেছেন। তাই তাঁর সম্মানে আয়োজিত ঐ অনুষ্ঠানে অভিনয়ের জন্য ভরত মুনি তার একশত পুত্রকে নিয়ে রিহার্সাল বা মহড়া

১। "Bharat Natya (a critical Study)" R. Satyanarayan—(Page-284-294).

দেওয়ালেন। কিন্তু এক জায়গায় এসে তিনি অসুবিধায় পড়লেন। কৈশিকী নৃত্য করতে গিয়ে দেখলেন ওটা মেয়েদের দ্বারা হওয়াটাই শোভন। সুতরাং সেই মতে ব্রহ্মাকে বললেন। ব্রহ্মা অপ্সরাদের সৃষ্টি করলেন ঐ নাট্যানুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। যখন পতাকা উৎসবে ঐ নাটক অভিনীত হবে সেই সময় দানবরা অতিপ্রাকৃত শক্তির জাল বিস্তার করে সকল অভিনেতা অভিনেতৃবৃন্দের বাক্‌রুদ্ধ করে দেয় এবং তাঁদের দেহভঙ্গিমাও থেমে যায়। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মণিমাণিক্য খচিত ধ্বজা দিয়ে দানবদের প্রহার করতে থাকেন। এই ইন্দ্রের ধ্বজাকেই বলা হয় পরবর্তীকালে 'জরজরা'। ইন্দ্র ঘোষণা করেন এই জরজরা সকল অভিনেতাদের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করবে। সেই থেকেই 'জরজরা' কে মন্ত্রপুতঃ করা হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পূর্বরঙ্গ' অনুষ্ঠানে তাই জরজরার আচার (Ritual) দেখা যায়।

এই জরজরা কিভাবে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এল তার চমকপ্রদ কাহিনী হল— 'ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে বাঁশ গাছ হয়ে জন্মাল, সেই থেকেই জরজরা পৃথিবীতে এল। একদা ইন্দ্রের সভায় অপ্সরা উর্বশী নৃত্য পরিবেশন করছেন। অকস্মাৎ উর্বশী একবার জয়ন্তের দিকে তাকালেন। এতে ক্ষণিকের জন্য তাল ভঙ্গ হলো, ঐ সভায় উপস্থিত অগস্ত্য মুনি উর্বশী ও জয়ন্তকে অভিশাপ দিলেন—উর্বশী মর্ত্যে দেবদাসী হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে আর জয়ন্ত বিন্ধ্যপর্বতে বাঁশ গাছ হয়ে জন্মাবে। এই অভিশাপে ভীত হয়ে জয়ন্ত ও উর্বশী অগস্ত্যের পায়ে লুটিয়ে পরে মার্জনা ভিক্ষা করলেন। অগস্ত্য তুষ্ট হয়ে শাস্তি কমালেন। তিনি উর্বশীকে নির্দেশ দিলেন নৃত্যশিল্পী হিসেবে প্রথম জনসাধারণের কাছে তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে ভগবানের কাছে নাচ দেখিয়ে। এই আত্ম প্রকাশকে বলে "আরংগেত্রাল" (Arangetral)। আর 'থালাইকোল' (Thalaikole) হবে উপহার। এই থালাইকোল হল জয়ন্ত, অর্থাৎ, অভিশাপ অনুযায়ী সে বাঁশের খুঁটি হয়ে থাকবে।

এরপর অভিশাপের সময়কাল শেষ হলে উর্বশী ও জয়ন্ত স্বর্গে চলে যায়। উর্বশী আবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করলেন কাঞ্চিপুরমের দেবদাসী হয়ে। একদিন আরংগেত্রালের সময় তাকে থালাইকোল দেওয়া হলো—এবং সেই মুহূর্তে উর্বশী ও জয়ন্ত অভিশাপ মুক্ত হয়ে ইন্দ্রের সভায় চলে গেল।

এই কাহিনীর মাধ্যমেই বলা হয়ে থাকে যে, উর্বশীই নাকি দক্ষিণ ভারতের

মন্দিরগুলিতে দেবদাসীদের নাচ শিখিয়েছেন। দেবদাসীদের আত্মনিবেদনমূলক নাচ এভাবেই শত শত বছর ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। সমাজে তাই দেবদাসীরা সম্ভ্রম পেয়েছেন।

ছোটবেলা থেকেই এরা মন্দিরের আওতায় নত্তুভানদের অধীনে থেকে নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষা করে। মন্দিরে প্রবেশের সময়ই পুরোহিতেরা তাঁদের বিয়ে দেন দেবতাদের সাথে। গলায় ঝুলিয়ে দেন 'বত্তু' নামে একটি জিনিষ। তখন এদের নাম দেওয়া হয় 'নিত্য-সুমঙ্গলী' (Nitya Sumangali) অর্থাৎ চিরন্তনভাবে বিবাহিতা।

দেবদাসীদের নৃত্যশিক্ষারম্ভের অনুষ্ঠান খুবই পবিত্র। হাতে ফুল নিয়ে বিনম্র চিত্তে, অবনত মস্তকে, সঙ্গীতের মাধ্যমে নত্তুভানদের কাছে শিক্ষা সুরু হয়। এই শিক্ষা মূলতঃ ধর্ম ও ভক্তিমূলক। পায়ে ঘুংঘুর বেঁধে, হাতে সেই প্রতীক বাঁশের খুঁটি যা সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়ানো থাকে, তা ধরে প্রথম ছন্দে, পদক্ষেপ সুরু হয়। এভাবে সাত বছরে গান ও নাচ শিক্ষা সমাপন করে, প্রথম আরংগেত্রাল অনুষ্ঠিত হয় মন্দিরে। যেমন ভাবে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে সেই ভাবেই অনুষ্ঠান হয়। রাজার উপস্থিতিতে ঐ অনুষ্ঠানে যে ভাল নাচবে তাকে পুরস্কার স্বরূপ উপাধি দেওয়া হয় 'থালাইকোল'। তাঁকে এখন থেকে মন্দিরের নাচ গান ছাড়াও অনেক কাজ করতে হবে।

খ্রীঃ ৯৮৪-১০২০ মধ্যে চোল বংশীয় রাজা রাজরাজ দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় চার শত দেবদাসী, তাঞ্জোর জেলায় উপনিবেশ স্থাপন করেন Bhrahadiswara মন্দিরে আচার (rituals) অনুষ্ঠান করবার জন্য।

অনেকের মতে (Ragini Devi) ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের প্রথম শিক্ষাগুরু হলেন ভাবগত মেলা বা ঐ নামের ব্রাহ্মণগোষ্ঠী। পরে এটা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব চলে যায় নত্তুভ মেলা বা ঐ নামের অব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর হাতে। এখনো পর্যন্ত নাকি উক্ত নত্তুভানদের কাছেই নাট্যশাস্ত্রের গুঢ় জিনিস বা উপাদান

* Reference to the "Thālaikole" is found in Silappadhikaram, a tamil classic of the second century A. D. The Arangātral of Madhabi, a dancing girl takes place at the Indra Festival. in the presence of the King. The "Thālaikole" encased in gold, and net with precious gems is placed upon the stage. (Arangam)

লুক্কায়িত আছে। এই লুক্কায়িত শিল্পই অন্য নামে ভরতনাট্যম্ হিসেবে প্রচলিত। এই শিল্পকলারই অপর নাম হল দাসী আট্যম্ (Dasi Attam), সদিরনাট্যম্ (Sadir Natya) নত্তুভ মেলা (Nattuva Mela).

নাট্যশাস্ত্রের মতে নৃত্যের (উত্থান-পতনে) মূলগত ব্যাপার হল 'করণ' ও 'অঙ্গহার'। করণ হলো ছন্দময় দেহের ভঙ্গি যাতে "gesture, step and attitude are co-ordinated in a harmonius movement."

এই দেহের ছন্দের পরিবর্তিত নৃত্যের প্যাটার্ণের নাম 'অঙ্গহার'। অঙ্গহার হল Combination of Karanas.)

অঙ্গ+হার (Anga+Hara) এই শব্দটি ভাঙলে এই দাঁড়ায়, অঙ্গ :: শরীর, হর :: শিব। সুতরাং বলা হয় শিব তাঁর দেহের ভঙ্গিতে সৃষ্টি করেছেন ৩৬ প্রকারের 'অঙ্গহার'। নাট্যশাস্ত্রে এই ৩৬ প্রকার অঙ্গহারের উল্লেখ আছে। ১০৮ রকম করণের রূপ দেখতে পাই চিদাম্বরমের নটরাজ মন্দিরের নৃত্যভাস্কর্যে। ঔপপত্তিক দিক দিয়ে ঐ করণ অঙ্গহারের অনেকটাই প্রায় লুপ্ত, যদিও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন নৃত্যে কিছু কিছু খণ্ড বিচ্ছিন্ন করণ ও অঙ্গহার দেখা যায় যেমন কথাকলিতে, ভরতনাট্যমে ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য-নাট্যে।

তামিল নৃত্য-ট্র্যাডিশন-এ 'অদাউ' (Adau) হচ্ছে মৌলিক উপাদান। শরীরের একেকটি সংক্ষিপ্ত গতিভঙ্গি যাতে হাত ও পায়ের কাজ থাকে তালসহ —তাকে 'অদাউ' বলে। দশ রকমের 'অদাউ, প্রচলিত আছে। এবং প্রত্যেকটি অদাউতে আবার ১২ রকমের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই অদাউগুলিই নৃত্যের 'বর্ণমালা' সৃষ্টি করে। তাই গোড়াতেই নাচ শেখার সঙ্গে অদাউচর্চা করতে হয়। এই অদাউয়ের সঙ্গে আবৃত্তি থাকে।

এবং এই অদাউ বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে চর্চিত হয়। নত্তুভানরা এই লয়গুলি শিখিয়ে দেন।

তালের মূল ভিত্তি হল যতি। দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রায় এই যতি হয়। যতি পাঁচ প্রকার। যথা, ৩ মাত্রা, ৪ মাত্রা, ৫ মাত্রা, ৭ মাত্রা, ৯ মাত্রা। এদের বলা হয় ত্রিস্র (৩), চতুরস্র (৪), খণ্ড (৫), মিশ্র (৭), সংকীর্ণ (৯), দক্ষিণ ভারতীয় তালে মূল ভিত্তিই হল এই যতি—তা নাচেই হোক বা মৃদঙ্গেই হোক। সাধারণতঃ নাচের নিম্নলিখিত যতি ভাগ দেখানো হয়ে থাকে।

তিস্র যতি :: তা-কি-টা

চতুরস্র যতি :: তা-ক-ধি-মি

:খণ্ড „ : তা-ক-তা-কি-টা

মিশ্র „ :: তা-ক-ধি-নি-তা-কি-টা

সংকীর্ণ „ :: তা-ক-ধি-মি-তা-ক-তা-কি-টা-তা অথবা এভাবেও

কুচিপুড়ি নাচের অদাউতে যতি দেখা যায়—

তাদিত্তাত্তাতোম্।

তাকিটাতাকাঝম্।

ঝম্ঝম্ কিটাতাকাঝম্।

ঝম্ঝম্ কিটাতাকাঝম্।

তাগানাম তাগারোম্।

তাগাকিটা কিটাতাগা।

দ্রিগোরথোম্ দ্রিগোরথোম্।

দ্রিগোরথোম্ দ্রিগোরথোম।

তাকিটা তাকিটা কিটাতাটা।

তা দাদিঘিনা তোম্।

তা দাদিঘিনা তোম্।

তা দাদিঘিনা তোম :...ইত্যাদি

অদাউ-এ যতির মিশ্রণে যে নৃত্যবর্ণমালার সৃষ্টি হয় তাকে বলে অদাউ-যতি। এই অদাউ-যতি যখন বিভিন্ন তাল আবর্তের মধ্যে দিয়ে এসে একটি চরম পরিণতিতে পৌঁছয় তখন তাকে বলে 'তিরমন'।

॥ ভারতীয় শিল্পকলায় নটরাজ ভাবনা ॥

সূচনা :

"স্ববিলাসৈরিদং বিশ্বং যো নর্ত্তয়তি সন্ততম্।
সমীরমূর্ত্তিং তং বন্দে গিরিরাজসুতাপ্রিয়ম্" ॥

ওঁ নম শিবায় নমঃ

(অভিনয় দর্পণ)

এই শ্লোকটির ভাবার্থ অনেকটা এই রকম—যাঁর স্ববিলাস অঙ্গবিক্ষেপে বিশ্ব নৃত্যচঞ্চল হয়ে ওঠে, সেই সমীরমূর্তি, গিরিরাজ কন্যা পার্বতীর প্রিয় শিবকে প্রণাম।

আবার নন্দিকেশ্বর-কৃত 'অভিনয় দর্পণ'-এ নমস্ক্রিয়া প্রসঙ্গে শিবের আরেকটি প্রণাম মন্ত্র আছে।

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ব্ববাঙ্ময়ম্।
আহার্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্" ॥

অর্থাৎ (সমগ্র) ভুবন যাঁহার আঙ্গিক, সর্ববাঙ্ময় যাঁহার বাচিক, চন্দ্রতারাদি যাঁহার আহার্য (ভূষণ), সেই সাত্ত্বিক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

উক্ত দুটি মন্ত্রে শিবকে প্রণাম জানানো হয়েছে দুটি প্রাসঙ্গিক দিক থেকে। এই প্রণাম মন্ত্র দুটির ব্যঞ্জনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ব্যাপারটা আমাদের আলোচনায় সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পাবে। শ্রীরাধার যেমন ক্রমবিকাশ আছে সাহিত্যে ও দর্শনে, তেমনি ভারতীয় সাধনায় শিবেরও ক্রমবিকাশ আছে। ভারতীয় ইতিহাস ও মূর্তিতত্ত্ব (Iconography) অনুধাবন করলেই বিষয়টি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হবে।

ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির জগতে শিবের অনেক রকম মূর্তি বা রূপের কথা জানা যায়। তন্ত্রযুগে যিনি ছিলেন 'শিশ্নদেব', তিনিই আবার পরবর্তীকালে অনার্যযুগে 'পশুপতিনাথ'। এই শিশ্নদেবই আরও পরে 'লিঙ্গরাজ' হয়েছেন। বৈদিক যুগে যিনি 'রুদ্রদেব' অনার্য যুগে তিনিই 'শাম্বদেব'। কখনো তিনি 'বীরূপাক্ষ শিব', কখনো বা 'নটরাজ-শিব'। এভাবে শিব-ভাবনার নানা বিবর্তন ঘটেছে ভারতীয় সার্বিক সংস্কৃতি ভাবনায়। এই শিবকে আমরা কখনো "দ্বারপালকের" ভূমিকায় দেখেছি মন্দির গাত্রে। কখনো নটরাজ শিবের দুই হাত, কখনো চার হাত, আবার কখনো দশহাত বিশিষ্ট নটরাজ শিবও পাওয়া গেছে ভারতীয় ভাস্কর্যে।

শিবের নানা রূপের মধ্যে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত 'নটরাজ শিব'-এর ভাবনাতেই আপাতত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি।

এবার ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে সাধারণভাবে দু-একটি কথা বলে নিয়ে, তারপর আমরা নটরাজ-ভাবনার আলোচনায় যাব।

"ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এর বাণীগুলি অপূর্ব এবং খুবই

তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতরেয় বলেন, শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন, শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্প-সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন।"*

"ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেব শিল্পানি।
এতেষাং বৈ শিল্পানামণুকৃতিরিহ
শিল্পমধিগম্যতে।
আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।
ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমাম
আত্মানং সংস্কুরুতে।"
(—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬, ৫, ১)

শিল্প সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো কথা আর শোনা যেতে পারে না। এইসব মহাবাণী উচ্চারণ করে গেছেন যে মহর্ষি সেই ঐতরেয় ছিলেন আর্য-অনার্য সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও মহনীয় সমন্বয়ঃ ঐতরেয় বলেন, অনার্যেরা পৃথিবীর সন্তান। ইতরা তাই মাতা পৃথিবীকে শরণ করেছিলেন। আর্য-অনার্য, বৈদিক-অবৈদিক মিলনে তাই যে সব বিদ্যার সম্ভাবনা হলো, তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ যোগ যে আছে, তাই চৌযট্টি কলার (শিল্প) তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।

৬৪ কলার নাম—(১) নৃত্য, (২) গীত, (৩) বাদ্য, (৪) উদক বাদ্য, (৫) নাট্য, (৬) সাজ-সজ্জা ও কুরূপকে সুরূপ করবার বিদ্যা বা কৌচুমার যোগ, (৭) নেপথ্য বা বেশ-রচনা, (এই ৬ ও ৭ আহার্য অভিনয়ের অন্তর্গত) (৮) বিশেষকচ্ছেদ্য বা তিলকাদি রচনা, (৯) দশন-বসন-রঞ্জন, (১০) কেশে পুষ্পবিন্যাস, (১১) কেশ-

* ভারতীয় সংস্কৃতি—ক্ষিতিমোহন সেন—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ বিশ্বভারতী—পৃঃ ১৪-১৬।

বিন্যাস, (১২) পুষ্পাস্তরণ, (১৩) মাল্যরচনা বিদ্যা, (১৪) গন্ধযুক্তি, সুগন্ধ প্রস্তুত বিদ্যা, (১৫) আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, (১৬) প্রতিকৃতি নির্মাণ, (১৭) যুদ্ধ বিজয় বিদ্যা, (১৮) বৃক্ষায়ুর্বেদ, (১৯) নানাবিধ পাকবিদ্যা, (২০) পানীয় রচনা, (২১) তক্ষণ বা ছুতোরের বিদ্যা, (২২) চরকা কাটা, (২৩) বেত ও তৃণাদির দ্বারা ডালা-কুলো প্রভৃতি রচনা, (২৪) শয্যা রচনা, (২৫) সূচীকর্ম, (২৬) খেলনা রচনা, (২৭) ভূষণ অর্থাৎ অলংকার রচনা, (২৮) কর্ণপত্র, কর্ণালংকার প্রস্তুত বিধি, (২৯) তণ্ডুল কুসুমাদি দ্বারা পূজোপহার রচনা, (৩০) সম্পাট্য অর্থাৎ হীরা-মণি-রত্নাদি কাটা, (৩১) মণিরত্ন বসানো, (৩২) বাস্তু বিদ্যা, (৩৩) মণিরত্ন জ্ঞান, (৩৪) ধাতুরত্নাদি বিচার, (৩৫) খনিবিদ্যা, (৩৬) ধাতুবিদ্যা (শুক্রনীতি মতে যন্ত্র শিল্প), (৩৭) ইন্দ্রজাল, (৩৮) বস্ত্র গোপন, (৩৯) হস্তলাঘব, (৪০) চিত্রযোগ, (৪১) সূত্র ক্রিয়া, পুতুল নাচ, (৪২) পশু-পক্ষী লড়ানো, (৪৩) পাখি পড়ানো, (৪৪) দ্যূতবিদ্যা, (৪৫) আকর্ষণ ক্রীড়া, (৪৬) অভিধান বিদ্যা, (৪৭) বৈষয়িকীবিদ্যা, (৪৮) দেশভাষা জ্ঞান, (৪৯) ম্লেচ্ছিতক-বিকল্প, ম্লেচ্ছ ভাষার জ্ঞান, (৫০) কাব্য-সমস্যা পূরণ, (৫১) অক্ষর মুষ্টিকা, অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর রচনা, (৫২) উত্তমরূপে পড়িবার বিদ্যা, (৫৩) নাটকাখ্যানাদি দর্শন, (৫৪) মানসী-কাব্য-ক্রিয়া, (৫৫) প্রহেলিকা, (৫৬) যন্ত্র মাতৃকা, (৫৭) উদকঘাত, (৫৮) উৎসাদন, (৫৯) দুর্বচক যোগ, (৬০) পুষ্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান, (৬১) ধারণমাতৃকা, (৬২) ক্রিয়া বিকল্প, (৬৩) ছলিতক যোগ, (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যা।

আর্য-অনার্য বা বৈদিক-অবৈদিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে যেমন ৬৪ কলাবিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি আর্য ও অনার্যদের কুলদেবতাদের গুণাবলী নিয়ে ভবিষ্যতে নটরাজ মূর্তি তৈরি হয়েছিল। সে কথায় আমরা একটু পরে আসছি। উক্ত ৬৪টি কলা বিদ্যাকে ইদানীন্তনকালের রূপতাত্ত্বিকরা মোটামুটি ৫টি ভাগে ভাগ করেছেন। এই পাঁচটি ভাগকেই আমি বলতে চেয়েছি 'শিল্পে-পঞ্চ প্রদীপ'। আমরা যেমন পঞ্চ প্রদীপ জেলে ঠাকুরের আরতি করি, তেমনি সারা পৃথিবীর শিল্পীরা এই পঞ্চ প্রদীপ জেলে তাঁদের দেবতাদের আরাধনা করেন। এই পঞ্চ প্রদীপ হলো—

শিল্পে পঞ্চপ্রদীপ

সাহিত্য	সঙ্গীত	চিত্র	ভাস্কর্য	স্থাপত্য
গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ দর্ভ নিবন্ধ রম্যরচনা ভ্রমণ কাহিনী কাব্য. কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।	গান বাজনা নাচ ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা গজল, গণসঙ্গীত ইত্যাদি। সেতার, সরোদ, বাঁশি, এস্রাজ, তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি। ভরত নাট্যম, কথাকলি, কথক, মণিপুরি, কুচিপুডি, ওড়িশী, রবীন্দ্রনৃত্য, লোকনৃত্য, আদিবাসীনৃত্য ইত্যাদি।	জল রঙ তেল রঙ এচিং মিনিয়েচার স্কেচ ইত্যাদি।	কাঠের মাটির ধাতুর ব্রোঞ্জের পাথরের ইত্যাদি	বহুতল বাড়ি ছোট বাড়ি মন্দির মসজিদ গির্জা গুরুদোয়ারা চৈত্য ইত্যাদি।

এ বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ ছোট্ট প্রবন্ধের ক্যানভাসে সম্ভব নয় বলেই, শুধু বিষয়গুলি উল্লেখ করলাম। এ থেকে অন্তত একটা সাধারণ ধারণা হবে যে ভারতীয় শিল্পের জগৎটা কত বিরাট ও বহুধা বিভক্ত।

॥ নটরাজ পরিকল্পনা ॥

ভারতের অন্তরাত্মা দর্শনস্থলভ উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি-সম্ভূত শিল্পধর্মী। এক উদার দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। শিবের নটরাজ মূর্তির পরিকল্পনার মতো উদাত্ত কল্পনা, এজন্যেই বোধহয় একমাত্র ভারতেই সম্ভব হয়েছে। এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) মূর্তি পৃথিবীর আর কোনো দেশের ভাস্কর্যে দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে আচার্য নন্দলাল বসু যথার্থই লিখেছেন—

'একটা নটরাজ মূর্তি, একটি বুদ্ধমূর্তি বা ত্রিমূর্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সংস্কৃতির জগতে ভারতবাসী মাথা উঁচু করে থাকতে পারে। ভারত শিল্প বা ভারতীয় সভ্যতা এরই মধ্যে সম্পূর্ণ আছে। এতে বিমূর্ত আইডিয়াকে মূর্তি দিয়েছে।'

'স্বভাবের এটা-সেটার নানারকম প্রতিরূপ অনেকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু একটা করুণা বা মৈত্রী বা অন্য কোন আইডিয়ার মূর্তি সমস্ত শিল্পজগতে দুর্লভ। চিহ্ন বা প্রতীক রচনা করেনি, প্রতিমা সৃষ্টি করেছে; অর্থাৎ আইডিয়ার 'বাচন' ওখানে কষ্টকৃত বা কল্পনাকৃত নয়, রসিকের কাছে তার বোধ ব্যাখ্যা-

সাপেক্ষ নয়। আইডিয়াই জন্ম নিয়েছে, আইডিয়াই মূর্তি হয়েছে।' (শিল্পকথা—নন্দলাল বসু, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ বিশ্বভারতী—পৃঃ ৫৫)

তিনি আরও বলেছেন—'বুদ্ধমূর্তির তাৎপর্য কি? বুদ্ধমূর্তি ঘনীভূত ধ্যানের মূর্তি, ব্যক্তি বিশেষের মূর্তি নয়। বিশেষ একপ্রকার ভাব বা উপলব্ধি বিশেষ এক প্রকার বিগ্রহ বা টাইপ সৃষ্টি করতে চায়, সেটি সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার পর সে পথে আর অগ্রসর হওয়া যায় না বুদ্ধমূর্তি এইরকম নিখুঁত একটি সৃষ্টি।'

'নটরাজ এরূপ আর একটি সৃষ্টি। সমস্ত বিশ্ব সংসার নিয়ে যে ছন্দ বা যে গতি এক শান্তির কেন্দ্র থেকে প্রসৃত হয়ে সেইখানেই ফিরে ফিরে আসছে, তারই বিগ্রহ।

'বুদ্ধমূর্তিতে সমস্ত গতিটি নিয়ত শান্তিতেই বিধৃত হয়ে নিশ্চল চেতনারূপে আছে—নিবাত নিষ্কম্প নির্ধূম দীপশিখা তার উপমা।'

(তদেব—পৃঃ ৪২-৪৩)

সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির যে কোনো শাখার কথা বলতে গেলে অবলীলাক্রমে ছান্দসিক নটরাজের কথা এসে যায়। আমরা তাই নাচের প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে ভারতীয় নৃত্যের পুরোধা দেবতা নটরাজকে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাই। যে কোনো নৃত্যশিল্পীর কাছেই নটরাজ আরাধ্য দেবতা। তাছাড়া নৃত্যশিল্পের সঙ্গেও নটরাজ-ভাবনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নটরাজ শিবের তাণ্ডব নৃত্যের ধারণা থেকেই হয়ত পরবর্তীকালে নটরাজ-মহাকালের মূর্তি কল্পিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গি-বিকাশ হয়েছে সেই অপরূপ কল্পনা থেকেই।

নটরাজ বিষয়ে আমাদের দেশে অনেকেই ভাবনাচিন্তা করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, আনন্দকুমারস্বামী, নন্দলাল বসু, উদয়শঙ্কর, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ্র, পি. এল. রাও, শিল্পী হ্যাভেল এবং আরও অনেকে। সকলের ভাবনার কথা বিস্তৃতভাবে বলার অবকাশ এখানে নেই।

১। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি ও নৃত্যভাবনায় নটরাজ কি অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছেন তা কবির কথা ও গানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে

রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগত ও জীবনে অখণ্ড-লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালা গানের এই মর্ম।'

এই পালা গানেরই একটি বিশেষ গানের চারটি স্তবকে নটরাজের চারটি ভাব ও রস উৎসারিত হয়েছে। স্তবক চারটি উল্লেখ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের মণিকাঞ্চন যোগে নটরাজের ব্যঞ্জনা কী ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, এই গানটি তার প্রমাণ। এই গানটির কাব্যমূল্য, সুরমূল্য ও নৃত্যমূল্য অসাধারণ। এই গানে আইডিয়া রূপ পেয়েছে। এই গান আমরা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু রবীন্দ্রভাবে অনুভাবিত হয়ে আমরা কজন এই গানের দার্শনিক দিকটা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই গানে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের অনুভবের জগতের সঙ্গে তাঁর বিশ্বানুভূতি সাঙ্গীকৃত হয়েছে।

প্রথম স্তবক—

'নৃত্যের তালে তালে নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।

তোমার চরণ-পবন পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমলকমল গন্ধ হে।

নমো নমো নমো
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

দ্বিতীয় স্তবক—

'নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়,
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।'

তৃতীয় স্তবক—

'নৃত্যের বশে সুন্দর হলো
বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।
তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।'

চতুর্থ স্তবক—

'মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণি তালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদ মন্দ্র হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।'

২। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এবং মূর্তিতত্ত্বে (Iconography) নটরাজের রূপরেখা অনেকটা এইরকম—

আর্য-অনার্য মিলনে বা বৈদিক-অবৈদিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে যেমন চৌষট্টি কলা বিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি বর্তমানে প্রচলিত চার হাত বিশিষ্ট নটরাজ মূর্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে সম্ভবত আর্য-অনার্য সংস্কৃতির এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। এ যেন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সাঙ্গীকরণে পরবর্তীকালে এক দেহে লীন হয়ে গেছে। একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যায় কিনা—। যেমন আর্যদের গৃহদেবতা ছিলেন রুদ্রদেব। তিনি ভয়াল ভয়ঙ্কর। অপর দিকে অনার্যদের এক গৃহদেবতা ছিলেন শাম্বদেব। ইনি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পুত্র শাম্ব নন। তিনি ছিলেন অনার্যদের শাম্ববী সম্প্রদায়ের দেবতা। তিনি শান্ত প্রসন্ন সমাহিত দেবতা। আর্য-অনার্যের সংঘাতের পর যখন উভয় সংস্কৃতির মিলন হয়ে দেখা দিল এক নবতর সংস্কৃতি, তখন উভয় দেবতার গুণাবলী (qualities) নিয়ে এক নতুন মূর্তি রূপ পেল—তিনিই পরবর্তীকালের নটরাজ!

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের চোল-শিল্পীরা ভাস্কর্য শিল্পে অতি নিপুণ ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত নটরাজ মূর্তি এঁদের সৃষ্টি। বেদের রুদ্র পরে শিব মূর্তিতে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। চিদম্বরম্ মন্দিরের প্রচলিত নটরাজ-মূর্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ বা ছবি অনেকের বাড়িতেই হয়ত আছে। এবার একটু লক্ষ করুন—

৩। **নটরাজ মূর্তির ব্যাখ্যা**—এবার দেখা যাক রুদ্র ও শাম্বের গুণাবলী নটরাজের মূর্তিতে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে। নটরাজের চার হাত। ওপরের ডান হাতে ডমরু, এটা সৃষ্টির প্রতীক (শাম্ব), ওপরের বাম হাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ধ্বংসের প্রতীক (রুদ্র), অপর ডান হাতে বরাভয় মুদ্রা (শাম্ব) অপর বাম হাতে আশ্রয় মুদ্রা (শাম্ব), ডান পা দিয়ে বামনাকৃতি 'অপস্মার' ষড়রিপুর প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য) অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এটাই ব্যঞ্জনা (রুদ্র), বাম পা যেটা কিঞ্চিৎ ওপরে তোলা তা মুক্তির (Salvation) প্রতীক (শাম্ব)। তাহলে দেখা গেল, উভয় দেবতা সাঙ্গীকৃত হয়েছেন, এক দেবতার রূপের মধ্যে। এ ছাড়া মূর্তির চারিদিকে ঘিরে রয়েছে অগ্নির 'প্রভামণ্ডল'। এটা বিশ্ব প্রকৃতির নৃত্যের প্রতীক। অবশ্য এই নটরাজের নানা জনে নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(শিব নটরাজ—ছবি বইয়ের শেষাংশে দেখুন)

আমাদের দেশে নটরাজ-কেন্দ্রিক নাচ মূলত কথাকলি, ভরতনাট্যম্ ও কুচিপুড়িকে বলা যায়। যেমন ওড়িশী নাচ, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা কেন্দ্রিক এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা কেন্দ্রিক নাচ মণিপুরী—নটবরী কথক ইত্যাদি। আমাদের গর্ব, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদয়শঙ্করের নৃত্যভাবনায় নটরাজের প্রভাব অপরিসীম। যেমন, তাঁর গজ-তাণ্ডব নৃত্য, শিব-পার্বতীর নৃত্যদ্বন্দ্ব, প্রভৃতি নৃত্যে নটরাজের ওজঃগুণ প্রকাশ পেয়েছে। যাঁরা উদয়শঙ্করের নাচ মঞ্চে দেখেছেন বা তাঁর অমর সৃষ্টি 'কল্পনা' ছায়াচিত্রটি দেখেছেন তাঁরাই হয়ত এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন। এ ছাড়া উদয়শঙ্কর আরেকটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তা হলো নটরাজ মূর্তির স্থাণু (Static) ভঙ্গিগুলিকে গতিশীল (Dynamic) করার জন্য শারীর বিজ্ঞান মতে উপযুক্ত ভঙ্গির (Anatomically possible movement) কথা ভেবেছেন এবং বিভিন্ন নৃত্যের ব্যঞ্জনায় তা প্রকাশও করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নটরাজকে নিয়ে অনেক গান লিখেছিলেন। তার মধ্য থেকে, কবির নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা পালার এক বিশেষ নটরাজ-ভাবনা কেন্দ্রিক একটি গান দিয়ে এই লেখা আপাতত শেষ করছি।

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ॥
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ॥

নটরাজ পরিকল্পনা বিষয়ে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন—

'স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সৃষ্টি রহস্যের সন্ধান দিতে গিয়ে 'কালিকাবৃত্তি'কার বলেছেন, নন্দিকেশ্বর নটরাজ তাণ্ডব নৃত্য শেষ করে যখন নবপঞ্চবার ঢক্কানিনাদ (ডমরুধ্বনি) করেছিলেন তখন ১৪টি পর্যায়ে বর্ণগুলির সৃষ্টি হয়। নাগোজী ভট্টও 'মহাভাষ্যপ্রদীপোদেগত' গ্রন্থে ও উপমন্যু কাশিকার 'তত্ত্ববিমর্শিনী'—ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। নন্দিকেশ্বর 'কাশিকাবৃত্তি' প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন,—

'নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো
ননাচ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উর্ধর্তু কামঃ সনকাদিসিদ্ধা
নেতাদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥'

নটরাজ-শিবের তাণ্ডবনৃত্যের ধারণা থেকে পরবর্তীকালে শিল্পে নটরাজ-মহাকালের মূর্তি কল্পিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীর বিকাশ

হয়েছে সেই অপরূপ কল্পনা থেকেই। ডঃ আনন্দ কুমার স্বামী "The Dance of Shiva" (1948) গ্রন্থে নটরাজের নৃত্য ও বিকাশভঙ্গীমার কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন প্রথমতঃ শিবপ্রদোষস্তোত্রে শিবের তাণ্ডব-নৃত্য কল্পনা করা হয়েছে ত্রিজগতের জননীকে স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁকে বিচিত্র মণিমাণিক্য দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। শূলপাণি কৈলাস পর্বতের চূড়ায় নৃত্য করছেন। দেবতারা আছেন তাকে চারদিকে পরিবেষ্টন করে। দেবী সরস্বতী বীণার তারে ঝঙ্কার তুলেছেন। ইন্দ্র বেণু বাজাচ্ছেন। ব্রহ্মার করতালের ছন্দে লক্ষ্মী গান করছেন। বিষ্ণু বাজাচ্ছেন মৃদঙ্গ। গন্ধর্ব, যক্ষ অমর ও অপ্সরারা আছেন তাদের চতুর্দিকে। 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে একে শিবের 'সন্ধ্যানৃত্য' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কোন হাত দিয়ে তিনি অসুরকে দমন করছেন না। দেবতারা নৃত্যেশ্বর-শিবের একযোগে স্তুতিগান করছেন ইলোরা, এলিফেন্টা ও ভুবনেশ্বর-এর ভাস্কর্যে, এবং বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের চিদাম্বরম-মন্দিরে চারহাতবিশিষ্ট নৃত্যরত অপরূপ নটরাজ মূর্তি তখনো সৃষ্টি হয়নি বলা যায়। পরবর্তীকালে চিদাম্বরম মন্দিরের নটরাজ মূর্তি শিল্পসৌন্দর্য-এর জগতে অসামান্য স্বর্গীয় কল্পনা এবং সৃষ্টি। সেই অবদান অমূল্য ও অপার্থিব।

ইলোরা, এলিফেন্টা প্রভৃতি গুহায় শিবের তাণ্ডবনৃত্যে তামসিকভাবের প্রকাশ বেশী। শিব সেখানে ভৈরব বা বীরভদ্র দশহাত বিশিষ্ট, শ্মশান প্রাঙ্গনে দেবীর সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত। তিনি ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু চিদাম্বরম্ মন্দিরে নটরাজের নৃত্যের তুলনা নাই। শিল্পী হ্যাভেল বলেছেন, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের প্রকৃতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের রহস্যই প্রকাশ করে।

বেদের রুদ্র পরে শিবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতীয় শিল্পে ভৈরবের আবির্ভাব শিবের প্রলয়ঙ্কর রূপ। শিবের ভয়ঙ্কর মূর্তি ভৈরবের মধ্যে কল্যাণ-সুন্দর, দৈন্য নাই তবে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন গুণের মধ্যে নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য রাজসিকতার অভিব্যক্তি থাকলেও তামসিকতার বিকাশ অধিক। শিব-নটরাজের বা নটেশের যে মূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া যায় তাতে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য দেখা যায়।

শোনা যায় পার্বতীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিব তাণ্ডবনৃত্য করেছিলেন। পার্বতী যে নৃত্য করেছিলেন তার নাম লাস্য। সঙ্গীতে 'তাল' নাকি 'তাণ্ডব'

ও লাস্য শব্দ দুইটির আদি অক্ষর থেকে সৃষ্টি। মনে হয় এই কাহিনীর পিছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। নিছক পৌরাণিক কাহিনী। দক্ষিণ ভারতে শৈব-সম্প্রদায়-এর প্রভাব বেশী—তাই শিব কখনো ধ্যানমৌন শান্ত সমাহিত যোগী, আবার কখনো বা ভয়ঙ্কর বেশে ভৈরব। এলিফেন্টায় ও দক্ষিণ ভারতের শিব-তাণ্ডবে ভয়ঙ্কর মূর্তির প্রকাশ। কিন্তু রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং বা তাম্রশাসনোক্ত খিজিঙ্গকোটের ভগ্নাবশেষ থেকে নটরাজের যে মূর্তি (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতক) আবিষ্কার করেছিলেন তাতে যোগানন্দের প্রসন্নতা ছিল। রায়বাহাদুর চন্দ নটরাজমূর্তির প্রসঙ্গে বলেছেন : 'প্রতিমার দেহের অংশ অধিকাংশ ভাগই এখনও পাওয়া যায় নাই।...নটরাজের মুখমণ্ডল চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধজাত যোগানন্দ-সমাধির ভাব চমৎকার প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কমনীয় দেহখানি ধীর গম্ভীর ভাবে নৃত্যের ছলে বিশ্বলীলার অভিনয় করিতেছে। তামিল দেশের সুপ্রসিদ্ধ নটরাজমূর্তিতে গতিশীলতা প্রবলতর। খিচিং-এর মূর্তির গতির ও স্থিতির—জ্ঞানের ও কর্মের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।'[১]

পি. এস. রাও Sri Siva Nataraja নিবন্ধে বলেছেন :

"In every basic representation of Sri Siva-Nataraja, there is glowing synthesis of creation, projection, and destruction of the worlds. He is a composite of the male and the female and the harmonizer of all contradiction. The primal Lord, who is the soul of everything and the eternal witness and who in his absoluteness is unconditioned and ineffable delineates Himself into the form and sound, weaving spells of beauty across the cidākāsā of every true devotee".[২]

নটরাজের নৃত্য সৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণতঃ নটরাজমূর্তি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ দিকে উপরের হাতে ডমরু—অনন্ত অনাহত শব্দের প্রতীক, অখণ্ড মহাকালের বুকে তা যেন ছন্দ বা তাল ও লয় রক্ষা করছে। ডমরুর

১। রায়বাহাদুর চন্দ : মূর্তি ও মন্দির (১৯২৪), পৃঃ ১০-১১।

২। Vide P. Sama Rao : Sri Siva-Nataraja. appeared in "the Prabudha Bharata." Vol. LXVI, March 1961, P-118-124.

শব্দের সঙ্গে মহাপ্রাণ ও পঞ্চভূতের যোগসূত্র জড়িত। বিশ্ববৈচিত্র্য-এর উপাদান পঞ্চভূত। শব্দ ও তাই নৈয়ায়িকরা 'শব্দগুণমাকাশম্' সূত্রে শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন, শব্দ আকাশ বা মহাকাশের প্রকাশক। নটরাজের বামদিকের উপরের হাতে অর্ধমুদ্রা, তাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড—ধ্বংসের পরিচায়ক। দক্ষিণদিকে নীচেকার হাতে অভয়মুদ্রা—শান্তি ও সান্ত্বনার উদ্বোধক। বামদিকের নীচেকার হাত উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত এবং তা চরণের দিকে নমিত। এই চরণ ভক্তগণকে আশ্রয় দান করছে। যে হাত এই চরণের দিকে নমিত তাতে আছে 'গজহস্তমুদ্রা' এবং তা বিঘ্ননাশক গণপতি বা বিনায়ককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ হাত সর্ববিঘ্ননাশের প্রতীক। পদতলে বামন 'অপস্মার'—পুরুষ বা অসুর ত্রিপুর অজ্ঞান ও অপবিত্রতার নিদর্শন। বামনের হাতে সর্প—বন্ধন বা অজ্ঞানরূপ সংসার চক্রের পরিচায়ক। নটরাজ বামনকে পদদলিত করেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ করে তিনি মুক্তি ও শান্তির আলোক দান করছেন। বামন পদ্মপীঠের ওপর শায়িত। নৃত্যে শিবের পাঁচটি শক্তি বা পঞ্চক্রিয়া বিকশিত: সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। পঞ্চক্রিয়ার অধিদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিব। নটরাজ শিবের হাতে মুদ্রা বা হস্তকরণগুলি নৃত্যে ভাব ও রসের প্রকাশক। নটরাজের চারদিকে প্রভাবমণ্ডল বা অগ্নিশিখার চক্র বিশ্বের ও বিশ্ববাসীগণের—প্রাণশক্তির পরিচায়ক। অধ্যাপক জিমার একে ওঙ্কারেরও প্রতীক বলেছেন। নটরাজের শিরে জটাজাল নৃত্যের তালে তালে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত। জটার বাঁধনে গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কপালে অর্ধচন্দ্র বা অগ্নিজ্ঞানের এবং শির সর্প প্রভৃতি যা প্রাণশক্তির পরিচায়ক। নটরাজের দক্ষিণ কর্ণে মনুষ্যদেহের ও বামকর্ণে নারীদেহের ভূষণ। শিল্পী হ্যাভেল এটিকে বলেছেন, পুরুষ প্রকৃতির মিলিত রূপ ("by which is expressed the nature of the Deity, combining both the male and female principle.")[১]

হ্যাভেলের মতে নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে দুটি ভাব অন্তর্নিহিত: একটি প্রকৃতির বাইরের জড়বিকাশের বিলাস ও অপরটি অধ্যাত্মিক জগতের লীলার অভিব্যক্তি—যাতে মানুষের সকল কিছু কামনা ও অজ্ঞান ও বন্ধনের অবসান

১। (ক) The Ideals of Indian Art (London 1920), P. 80,—Havel
(খ) আনন্দ কুমার স্বামী "The Dance of Shiva (1948) pp 14-87.

হয়।[১] তিনি নটরাজের নৃত্যের একটি পৌরাণিক আখ্যানের পরিচয় দিয়েছেন। আখ্যানটি আদিমকালের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। গল্পটি হোল: একদিন শিব যোগীবেশে অরণ্যে ঋষিদের কাছে গিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন ও ঋষিদের হারিয়ে দিলেন। ঋষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিচারে প্রবৃত্ত হলেন। তারা শিবকে আক্রমণ করার জন্য যজ্ঞাগ্নিতে ভয়ঙ্কর মূর্তি এক ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিলেন। শিব কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ দিয়ে ব্যাঘ্রের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিয়ে নিজের গায়ে পরিধান করলেন। ঋষিরা বিষাক্ত সর্প সৃষ্টি করলেন। কিন্তু শিব সেই সাপকে মালার আকারে গলায় পরে নৃত্য করতে লাগলেন। তখন ঋষিদের যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকটাকার এক বামন রূপ অসুর বেরিয়ে শিবকে আক্রমণ করল। শিব অসুরকে পদভারে দলিত করে তার পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে দিলেন। শিবের এই তাণ্ডবনৃত্য স্বর্গলোকের দেবতা ও ঋষিরা প্রত্যক্ষ করলেন। এই নৃত্যের দৃশ্যই এলিফেন্টার গুহায় চাক্ষুসভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

নটরাজ পরিকল্পনার আগে ও পরে বিভিন্ন যুগে আরও কিছু নৃত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন আমরা পাই। তার কয়েকটি মাত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

॥ দ্বিতীয় শতাব্দী ঃ অমরাবতী ॥

অমরাবতীতে কতকগুলি বড় বড় মেডেলের মতো গোলাকৃতি জিনিস পাওয়া গেছে। তাতে দলবদ্ধ নৃত্যের রূপ দেখা যায়। অনেক লোক এক সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করছে।

॥ ষষ্ঠ শতাব্দী ঃ আইহোল দুর্গামন্দির ॥

দাক্ষিণাত্যের আইভলি অঞ্চলের দুর্গামন্দিরে প্রাপ্ত গন্ধর্বমূর্তিতে দ্বৈত নৃত্যের রূপ দেখা যায়। মূর্তিগুলি যদিও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়নি, তবু যতটুকু পাওয়া গেছে তাতেই নৃত্যের অসাধারণ গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। আইভলিতে আরও কিছু নৃত্যরত মূর্তি পাওয়া গেছে।

এই ষষ্ঠ শতাব্দীতেই তৈরি দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজাদের রাজধানীর একটি গুহায় ষোল হাত যুক্ত নটরাজ-মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রচলিত নটরাজ-মূর্তি থেকে এটি সম্পূর্ণ পৃথক।

১। (ক) The Himalayas in Indian Art (London 1924)
(খ) এস, শিবপদসুন্দরম্ ঃ The Saiva School of Hinduism (London 1934) P—185-186।

॥ সপ্তম শতাব্দী ঃ মামল্লপুরম্ ॥

গঙ্গার মর্তে আগমন বিষয়ে, গঙ্গার দুপাশে যে সকল মূর্তি রয়েছে তাঁদের ভঙ্গি দেখলে মনে হয় দলবদ্ধভাবে নেচে চলেছে। এটি দলগত (Group) নৃত্যের নিদর্শন।

॥ অষ্টম শতাব্দী ঃ এলিফেণ্টা। (মতান্তরে ৫ম শতাব্দী) ॥

এলিফেণ্টাতে প্রাপ্ত মূর্তিটিকে শিবের (তাম্রলিঙ্গ) নটরাজ-মূর্তি বলে উল্লেখ করা আছে। মূর্তিটি ভগ্ন। কাজেই নৃত্যের গতিভঙ্গিটি স্পষ্ট নয়।

৭৫০-৮৫০ খ্রীঃ

এলিয়ার গুহায় নৃত্য-জগতের পুরোধা শিবের নৃত্যরত মূর্তি রয়েছে। দুর্ধর্ষ ভঙ্গিটি দেখে মনে হয় এটি তাণ্ডব নৃত্যের এক বিশেষ ভঙ্গি বা রূপ। এখানে শিবকে দুই হাত যুক্ত দেখা যায়। আরেকটি শিবের মূর্তি আছে চার হাত যুক্ত। এই মূর্তিটির দাঁড়াবার ভঙ্গিতে --দুটি হাঁটু অনেকটা কথাকলি নৃত্যের ত্রিস্রের (ত্রিভুজ সদৃশ্য) মতো। এই মূর্তির পাশেও একদল যন্ত্রী দেখা যায়। প্রাচীনকালে নৃত্যে যে যন্ত্রসংগীত-এর রীতিমত ব্যবহার ছিল—এ তারই প্রমাণ।

॥ নবম শতাব্দী ঃ দক্ষিণভারত ॥

নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ সাপের মাথার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বাঁ-পা সাপের মাথায় রাখা। ডান-পা একটু উপরে তোলা। অনেকটা নাট্যশাস্ত্রের উর্দ্ধজানু করণের মতো। বাঁ হাতে সাপের লেজ ধরা। ডান হাতে বরাভয় মুদ্রা। মূর্তিটি গঠন সৌকর্যে একটি চমৎকার ভাস্কর্য নিদর্শন।

॥ দশম শতাব্দী ঃ চম্পা, ইন্দোচায়না, কম্বোডিয়া ॥

ভারতীয় শিল্পের প্রভাবে ভারতের বাইরে এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে, চম্পার পাওয়া মূর্তিটির নৃত্যের ভঙ্গিমা দক্ষিণ ভারতের নৃত্যের ভঙ্গিমাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মূর্তিটি বসা অবস্থায়।

॥ দশম শতাব্দী ঃ রাজপুতনা ॥

নৃত্যরত গণেশের মূর্তি। গণেশকে নৃত্য ভঙ্গিমায় দেখানো অনেকটা আশ্চর্য মনে হতে পারে। সেই আশ্চর্য মূর্তিটিই পাওয়া গেছে রাজপুতনায়।

মূর্তির পাশে দুদিকে বাদনরত দুটি মূর্তি। মূর্তি দুটি ভাঙ্গা হলেও ভঙ্গি দেখে মনে হয় একটি বাঁশি বাজাচ্ছে, অপরটি করতাল হাতে তাল দিচ্ছে। সুর ও ছন্দে নৃত্যরত লম্বোদর গণেশ।

॥ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী : দক্ষিণভারত ॥

দাক্ষিণাত্যের চোল-শিল্পীগণ ছিলেন ভাস্কর্য শিল্পে অতি নিপুণ। বিশ্ববিখ্যাত নটরাজ মূর্তি এদেরই সৃষ্টি। আশা করি প্রত্যেক পাঠকই এই মূর্তিটি দেখেছেন এবং অনেকের বাড়িতেই এই মূর্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ আছে। এই নটরাজ-মূর্তি পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথা বলবার আছে।

॥ ত্রয়োদশ শতাব্দী : কোনারক ॥

কোনারক নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায় কতকগুলি মূর্তি দেখা যায়। এতে ভারতীয় নৃত্যের কতকগুলি প্রচলিত ভঙ্গিমা লক্ষ্য করা যায়। অপূর্ব কারুকার্য শোভিত প্যানেলগুলির ফাঁকে ফাঁকে মূর্তিগুলি, কোথাও শুধু নৃত্যরত, আবার কোথাও যন্ত্রবাদনরত দেখা যায়। লাইনের পর লাইন এ ধরনের মূর্তি রয়েছে। দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতির ইঙ্গিত এ সব মূর্তিগুলিতে বিদ্যমান।

॥ ত্রয়োদশ শতাব্দী : তিরুভান্নামালাই ॥

তিরুভান্নামালাইয়ের অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে একক নৃত্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমার একটি মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তির পাথরটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় শুধু ভঙ্গিটিই চোখে পড়ে এবং তা অস্পষ্ট। এই মূর্তিটির কোমর থেকে উর্ধাঙ্গ সাপের মতো বাঁকানো। হাত দুটি মাথার উপর গিয়ে আঙুল ধরা অবস্থায়। অনেকটা নাট্যশাস্ত্রের 'গজক্রন্দিত' করণের মতো।

॥ ষোড়শ শতাব্দী : বিজয়নগর ॥

ইতিহাস বিখ্যাত বিজয়নগরের প্রাপ্ত একটি সিংহাসন প্লাটফর্মে ভরত-নাট্যমের ভঙ্গিতে কয়েকটি মূর্তি দেখা যায়। প্রতিটি ভঙ্গি গতিশীল। মনে হয় লাইন দিয়ে দলবদ্ধভাবে নেচে চলেছে।*

---

* মদীয় প্রবন্ধ—"ভারতের নৃত্যভাস্কর্য" রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। (কার্তিক-পৌষ—১৩৭৬ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় নৃত্যের আধুনিক যুগ

(ঊনবিংশ ও বিংশ শতক)

।। পটভূমিকা ।।

ভারতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কিভাবে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হলো, আধুনিকতার কি কি লক্ষণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং তার কারণগুলি কি কি হতে পারে—সেই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকরা বলেছেন—

"In spite of political convulsions and economic retrogression the first century of British rule in India (1757—1858) is in certain respects a memorable epoch in her history. The period witnessed a remarkable outburst of intellectual activity in India and a radical transformation in her social and religious ideas. As a result of all these, India passed from the "medieval" to the "modern" age."[১]

রাজনৈতিক আন্দোলন ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যেও ইংরেজ যুগে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং পুরানো ধ্যান-ধারণার নব-মূল্যায়ন সুরু হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ইতিহাস মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে। এই নব মূল্যায়নের প্রেরণাস্বরূপ ইংরেজী শিক্ষাধারায় মোহমুক্ত বুদ্ধিবাদ নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সবকিছুকে যাচাই করে নেবার যে প্রবণতা দেখা দেয়, সেই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা বলেছেন—"The impetus to these changes came from the introduction of English education. Through this channel came the liberal ideas of the west which stirred the people and roused them from the slumber of ages. A critical outlook on the past and new aspirations for the future marked the new awakening. Reason and judgement took the place of faith and belief; superstition yielded to science; immobility was replaced by progress, and a zeal for

---

১। An Advanced History of India—R. C, Mazumdar, H. C. Raychudhuri, Kalikinkar Datta, (Macmillan New York – 1965, Page 812)

reform of proved abuses overpowered age-long apathy and inertia, and a complacent acquiescence in whatever was current in society. The traditional meaning of the Sāstras was subjected to critical examination and new conceptions of morality and religion remodelled the orthodox belief and habits.

This great change affected at first only a small group of persons, but gradually the ideas spread among larger sections of the people, and ultimately their influence reached, in greater or less degree, even the masses."[১]

ঐতিহাসিকদের উক্ত বক্তব্য এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্—উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে অন্যান্য শিল্পকলার মতো, নৃত্যের জগতেও কিভাবে আধুনিকতা এসেছে বা নৃত্য-কলা নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত হয়েছে।

ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ক্রম-বিবর্তনের বা ক্রমবিকাশের স্তরে 'আধুনিক যুগ' কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আদিমকাল থেকে ভারতবর্ষে যে নৃত্যধারা প্রবহমান, তারই প্রাণবন্ত ফলশ্রুতি হলো আধুনিক যুগের নৃত্যের পুনরুজ্জীবন। এর মূলে রয়েছে বিভিন্ন যুগের সামাজিক আর্থনীতিক ও ধর্মীয় বিবর্তনের প্রভাব। সর্বোপরি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক প্রভাব।

নদী যেমন আপন পথে চলতে চলতে একেকবার বাঁক ফিরে নতুন পথে যাত্রা করে, শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস তেমনি নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীর অসংখ্য ঘটনা ও চিন্তা-চেতনার স্রোত নিয়ে একেকবার বাঁক ফেরে। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে চলতে চলতে বাঁক ফেরা অবস্থাকেই বলি নতুনত্ব বা আধুনিকতা। প্রত্যেক যুগেরই তাই একটা নিজস্ব আধুনিকতা থাকে। 'আজ' যেমন একদিন 'অতীত' হবে, তেমনি আগামীকালও 'বর্তমান' হয়ে থাকে যুগের গতিতে। এভাবেই ইতিহাস অগ্রসর হয়—অতীত থেকে বর্তমান ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে।

এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে উনবিংশ

১। Ibid—Page 812.

শতাব্দী একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন প্রাণস্পন্দন শোনা যায় এবং এক নতুন চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ ও জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার তীব্র আকাঙ্খা অনুভূত হয় অনেকের মধ্যে। একেই বলে 'নবজাগরণ' বা পুনরুজ্জীবন। 'Naissance' ফরাসী কথা, অর্থ হলো 'জন্ম'। সুতরাং **'Re-naissance'** কথার অর্থ হলো পুনর্জন্ম অর্থাৎ নতুন জীবন বা নবজাগরণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষেও ইউরোপীয় ইতিহাসের নবজন্ম আন্দোলনের (**Renaissance**) মত এক আন্দোলন সুরু হয়। দীর্ঘদিনের সুপ্ত দেশ যেন নতুন ভাবে জেগে ওঠে। মৃত সমাজে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারিত হতে থাকে। ভারতের জীবন-জিজ্ঞাসা পুনরায় ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই হয়ে ওঠার মূল কারণ—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমল থেকেই আমাদের ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমাবনতির লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বোম্বেটে বণিক ও লুণ্ঠনকারীদের ক্রমাগত অভিযানে, যুদ্ধ-বিগ্রহে ও অন্যায় অত্যাচারে সমাজের শৃঙ্খলা, সংযম ও সুনীতির বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে ক্রমশঃ চারিদিকে ভাঙন ধরতে থাকে। সমাজে কূপমণ্ডূকের মত মনোভাব, জাতিবর্ণের ভেদ-বৈষম্য, কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, অকাল বৈধব্য, সতীদাহ, চরিত্রহীনতা, দুর্নীতি প্রবণতা প্রভৃতি যত রকমের অধঃপতনের উপসর্গ আছে, সবই পূর্ণযাত্রায় দেখা দেয়। সমাজের যেন আর নড়াচড়া করবার মত শক্তি ছিল না। এই সময় উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংঘাত ও নতুন শিক্ষাদীক্ষার ফলে এদেশের মানুষ সমাজের মালিন্য দূর করে তাকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। অবশ্য এই সময় ও তার আগে থেকে ইউরোপের কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যাবার ফলে মানুষের পুরানো ধ্যান-ধারণা ও জীবনাদর্শের পরিবর্তন হতে থাকে। সেই পরিবর্তনের স্রোত ঘটনাচক্রে ইংরেজদের আগমনের কালে প্রধানত তাঁদেরই মাধ্যমে এদেশে এসে পৌছায়। ১৭৭৫ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তার কয়েক বছর পর ফ্রান্সে আরম্ভ হয় 'ফরাসী বিপ্লব'। ১৪ই জুলাই ১৭৮৯ বাস্তিলের পতন হয়। বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী কেবল ফ্রান্সে নয়, সারা ইউরোপের ও

বিশ্বের মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। রুশো, ভলতেয়ার, বেকন, লক, হিউম, বেন্থাম্, টমপেইন, মিল প্রমুখ দার্শনিক মনীষীদের যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষের ধর্মান্ধ কুসংস্কারগ্রস্ত মন অন্ধকার থেকে প্রচুর আলো-বাতাসের মধ্যে যেন মুক্তি পায়।

এই মুক্তির আলোকে একদিকে ধর্ম-সংস্কারে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুচিন্তা-গোষ্ঠী, আরেক দিকে সমাজ সংস্কারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুসারী-গোষ্ঠী অপর দিকে ভাষা-সাহিত্য ও শিল্প বিকাশে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। সর্বোপরি সর্বভারতীয় শিল্পচর্চার পুনরুজ্জীবনে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর দক্ষিণের দালানের বুধমণ্ডলীর বৈঠকগুলি শিল্পকলার বিকাশে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। ইউরোপ থেকে এসেছেন হ্যাভেল সাহেব, জাপান থেকে এসেছেন ওকাকুরা, সিংহল থেকে এসেছেন রূপতাত্ত্বিক আনন্দ কুমার স্বামী, আর আমাদের দেশের রয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এঁদের সকলের প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ ভারতীয় রীতিতে শিল্পচর্চা ও সমীক্ষার পথটি প্রশস্ত হয়। ভারতের শিল্পান্দোলনের পথ চলার প্রেরণা দেন ভগিনী নিবেদিতা। এর ফলশ্রুতি দেখছি পুরোনো পত্র-পত্রিকায় সেই যুগের নৃত্য সমালোচকরা উদয়শঙ্করের নাচকে বলেছেন, 'Oriental Dance' বা প্রাচ্য-নৃত্য। অবশ্য পরবর্তীকালে এই নৃত্যধারায় যে 'Occidental' বা পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে, তা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

।। বিভিন্ন শিল্পকলার বিকাশ ।।

ভারতের আন্তরাত্মা দর্শনসুলভ উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গিসম্ভূত শিল্পধর্মী। এক উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। তাই নটরাজ পরিকল্পনা মতো এমন উদাত্ত পরিকল্পনা ভারতেই সম্ভব হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় শিল্পীরা শিল্পের আরাধনা করেছেন শিল্পের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে। এই পঞ্চপ্রদীপ হলো—সাহিত্য-সঙ্গীত চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য। আধুনিক যুগে এসেও আমরা দেখেছি এই শিল্পপ্রদীপের অনির্বাণ শিখা জ্বলছে, নতুন আলোকে এই শিখা উদ্ভাসিত। এই পঞ্চপ্রদীপের একটি প্রদীপ—সঙ্গীত। এই সঙ্গীতেরই একটি শাখা নৃত্যকলা। (গীতং বাদ্যং নর্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে)। যদিও আধুনিক-

যুগের নৃত্যকলাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, তবু শুধু একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, নৃত্যের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পকলার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রয়েছে। যেমন একজন ভাল নৃত্য শিল্পী হতে গেলে তাঁকে চিত্রশিল্পী হতে হয় বা চিত্রশিল্পের ধারণা রাখতে হয় কারণ নৃত্য ভঙ্গিতে রেখাজ্ঞান একটি মস্তবড কথা, তেমনি ভাস্কর্যের ভঙ্গী অনুশীলন করে "Sculpture in dynamic form" এ আসতে হয়, যা আমরা এযুগের ওড়িশী নৃত্যে দেখেছি, বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও তালের ধারণা না থাকলে নৃত্যের ভাবময় অভিব্যক্তি সার্থক হয়না, মঞ্চকলা, আলোকসম্পাত, বেশভূষা, প্রভৃতি আহার্য শিল্পকলার জ্ঞানও নৃত্যকলায় অপরিহার্য। নৃত্যের ভাব উপলব্ধিতে সাহিত্য ও সৌন্দর্য তত্ত্বের চর্চা প্রয়োজন। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় নৃত্যের আলোচনায় অন্যান্য শিল্পগুলির আলোচনাও এসে যায়। একেই বলে 'co-relation of Studies' যাই হোক ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহ্য বজায় রেখে নতুন রূপ দেবার একটা প্রবণতা দেখা দেয় এবং এই প্রবণতা থেকেই অন্যান্য শিল্পকলার মত ভারতীয় নৃত্যেও নবযুগের সূচনা হয়।

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

"The spirit of renaissance has also produced a finer appreciation and cultivation of the Fine Arts such as Painting and music. Dr. Abanindranath Tagore has thought and inspired a group of artists; other famous artists of the period are Nandalal Bose of Bengal and Abdur Rahman Chaghatai of the Punjab and some members of the Ukil family. (রণদা উকিল, সারদা উকিল ও বরদা উকিল।) The Bombay School of Art has tried to develop a new style by the application of Western technique and methods to current Indian conditions. The artistic renaissance of India owes a great deal to Mr. E. B. Havell, who was for some years Principal of the Government School of Art in Calcutta and left India

in 1907, and to Dr. A. K. Coomaraswamy, who did much to preach the majesty and glory of Indian Art.

As with painting there has also been a revival of sculpture. Modern Indian architecture divides itself sharply into two classes : (i) that of the indigenous Indian "Master-builder", to be found Chiefly in the Indian States, particularly in Rajputana, and (ii) that based on an imitation of Western models. During recent years, there has been a tendency to revive old architectural styles. A new spirit in the cultivation of music is evident in our country. The efforts of some members of the Tagore family are largely responsible for a finer appreciation of music ; and new schools far the scientific study and practice of Indian music, vocal as well as instrumental, have sprung up in Calcutta, Bombay, Poona, Baroda and several other places. Earnest efforts are being made to revive indigenous types of dances and drama. The "Prachin Kamrupi Nritya Sangha" of Assam is trying to train boys and girls in the characteristic dances of that Province. In South India efforts are being made for the revival and development of Kathakali. Good work is being done in this field by Rabindranath Tagore's Vishwabharati, the Travancore University and the Kerala Kalamandalam."[১]

॥ ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণ পর্ব ॥

(Revivalist Movement)

এভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় ভারতীয় নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের যুগটিকে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আধুনিক যুগের নৃত্য-বিকাশের ধারার দু'টো সময়কাল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। Ibid—Page 966-967.

(১) সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে—বিংশ-শতাব্দীর প্রাক্-স্বাধীনতার যুগ পর্যন্ত।

(২) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ। (১৯৪৭ সালের পর থেকে)।

।। বাংলার নৃত্যচর্চার রূপ-রেখা (১৯৪৭-১৯৮৮) ।।

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নৃত্যচর্চার রূপ-রেখাটি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি এই কারণে যে, এই সূত্রটি পরবর্তী নৃত্যচর্চার দিক্ দর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত এই একচল্লিশ বছরের নৃত্যচর্চার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য থেকে কয়েকটি মৌল বিষয়ের প্রতি আলোক-পাত করা যাক্। তাছাড়া ১৯৪৭ সালের আগেকার অবিভক্ত বঙ্গদেশের নৃত্যচর্চার পটভূমিকাটিও প্রাসঙ্গিক ভাবেই সংক্ষেপে আলোচনা করে নিতে হবে। কারণ আগেকার ধারাবাহিকতার মধ্যেই পরবর্তীকালের রূপরেখাটি বিধৃত হয়ে আছে।

বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীকে 'নৃত্য-মনস্ক' করেছেন রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর, গুরুসদয় দত্ত। ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণে এই তিনজনের অবদান তিন দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে আরেকজন বাঙালীকে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি, যিনি নিজে নৃত্যশিল্পী না হয়েও এই শিল্পকলার প্রচার ও প্রসারে জীবনপাত করেছিলেন, তিনি বিখ্যাত প্রমোদ-পরিচালক (Impresario) হরেন ঘোষ। এই হরেন ঘোষকে ইউরোপের 'ব্যালে' জগতের প্রবাদ পুরুষ সার্জ দ্য দিয়াঘিলেভ (Serge de Diaghilev)-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

নৃত্যের পুনর্নবীকরণে (Revivalist Movement) আধুনিক যুগের নৃত্যবিকাশের মূলধারাটিকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়—

(১) প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত যে পর্বটি রয়েছে, তাতে নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রাধান্য। যেমন রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর, গুরুসদয় দত্ত, ভাল্লাথোল, রুক্মিনী দেবী, হরেণ ঘোষ প্রভৃতির প্রচেষ্টা।

(২) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে দেখা যায় এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারী প্রয়াস এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রেরণা। যেমন, দিল্লীর

সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা।

এই ভাবে ব্যক্তিগত ও সরকারী প্রচেষ্টায় আমাদের নৃত্য জগতে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান এবং এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করেই নৃত্যচর্চা আবর্তিত হয়েছে। এই আবর্তনে একদিকে যেমন রয়েছে 'গুরুমুখী' নৃত্যচর্চার বিশেষ প্রবণতা, তেমনি রয়েছে 'আকাদেমিক' নৃত্যচর্চার আয়োজন। সুতরাং ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্যকলা চর্চার রূপ-রেখাটি বিচার করে দেখতে হবে। বর্তমান নৃত্যজগৎ অগ্রসর হচ্ছে এই ব্যক্তিক ও প্রতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই। তবে মূলতঃ ব্যক্তিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই কিন্তু আমাদের দেশের নব-নৃত্যান্দোলন গড়ে উঠেছিল াক্-স্বাধীনতা যুগে। একেই আমরা নৃত্যের পুনর্নবীকরণ বা Revivalist Movement বলতে চেয়েছি। এবার একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক্।

ভারতীয় নৃত্যের অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় মূলতঃ তিনটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন—

(১) আদিবাসী নৃত্যে—আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ, (২) লোকনৃত্যে—গ্রামীন কৃষিভিত্তিক গণ-সমাজ। (৩) উচ্চাঙ্গ নৃত্যে—নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজের চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলনের ফলে এই নৃত্যধারাগুলির শ্রেণীবিন্যাসে এবং আঙ্গিক প্রকরণে কতগুলি লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই লক্ষণগুলির বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কারণ—সূচনা পর্বেই আমরা এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তাছাড়া আদিবাসী নৃত্য কি ভাবে লোকনৃত্যে পরিণত হলো এবং লোকনৃত্য কি ভাবে উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পরিশীলিত হলো, তার ইতিহাস ব্যাপক ও বহুধা বিভক্ত।

ভারতে প্রচলিত নৃত্যধারাকে মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন—আদিবাসী নৃত্য (Tribal), লোকনৃত্য (Folk) এবং উচ্চাঙ্গ নৃত্য (Classical)। এ তিন ধারার মধ্যে আবার সংযোগ রক্ষাকারী আরও তিনটি উপধারা আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও, উপধারা তিনটি কম মূল্যবান নয়। এই তিনটি উপধারা হলো —আধা-লোক (Quasi-Folk), আধা-উচ্চাঙ্গ (Classico-Folk) এবং নব্য-উচ্চাঙ্গ (Neo-Classical)।

এই নব্য-উচ্চাঙ্গের সঙ্গে প্রায় একই খাতে বয়ে চলেছে Modern, Creative, Innovative Dance ইত্যাদি। তবে এই সকল প্রকার নাচের মধ্যেই লোকনৃত্যের উপাদান সক্রিয় ভাবে কাজ করে চলেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই নৃত্যধারাগুলির ধারাবাহিকতা অনেকটা এই রকম—

Tribal > Quasi-Folk > Folk > Classico-Folk > Classical > Neo-Classical.

Neo-Classical — (1) Modern, (2) Creative, (3) Innovative — **Dances**

উক্ত ধারাবাহিকতায় দেখা গেল সব নাচের মধ্যমণি হলো লোকনৃত্য। লোকনৃত্য মাঝখান থেকে একদিকে আদিবাসী নৃত্য, অপরদিকে নব্য-উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে অদৃশ্য কোন সূত্রের টানাপোড়েনে সব নাচগুলিকে বিধৃত করে আছে। লোকনৃত্যের একটি বাহু আদিবাসী নৃত্যের দিকে প্রসারিত, অপর বাহু নব্য-উচ্চাঙ্গের দিকে বিস্তৃত। সুতরাং লোকনৃত্যকে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র বলা যায়।

আদিবাসী নৃত্য গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য পরম্পরায় স্থানীয় প্রভাবে (Local Influence) লোকনৃত্যগুলি গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে নানা আচার-অনুষ্ঠানের (Rituals) সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি প্রভাব। আরও পরে, এই লোকনৃত্যই আবার আরও পরিশীলিত হয়ে, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উপযোগী মার্জিত হয়ে দেখা দিয়েছে, ধ্রুপদী বা শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ নৃত্য রূপে। এই প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার—(১) ভারতে বর্তমানে প্রচলিত সব ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির উৎপত্তির মূলে লোকনৃত্যের বিভিন্ন উপাদান সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে এবং এখনো করে চলেছে। সোজা কথায় ক্ল্যাসিকাল নাচগুলির জন্ম হয়েছে লোকনৃত্য থেকেই। যেমন, ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী, কুচিপুড়ি প্রভৃতি ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলির Basic Movement বা বুনিয়াদি ভঙ্গি বা মৌল ভঙ্গিগুলি এসেছে লোকনৃত্য থেকেই। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচলনার অবকাশ এখানে নেই। তাছাড়া (২) ক্ল্যাসিক্যাল নাচের বিভিন্ন শৈলীকেও (Style) লোকনৃত্য প্রভাবিত করে থাকে। যেমন, স্থানীয় গুণী নৃত্য গুরুদের শৈলী স্বাতন্ত্র্যও ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলিকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে আসছে।

যাই হোক, এবার আমরা আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আমাদের দেশে যে নব-নৃত্যান্দোলন সুরু হয়েছিল, তার মধ্যমণি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণে এবং নব মূল্যায়নে তাঁর অবদান অপরিসীম। আধুনিক যুগে কেরালার কথাকলি নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে কবি ভাল্লাথোলের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, তামিলনাড়ুতে ভরত নাট্যম্ নৃত্যকে নব মর্যাদা দেবার জন্য রুক্মিণী দেবীর সাধনা, বাংলার লোকনৃত্যের উন্নয়নে গুরুসদয় দত্তের আন্তরিক প্রয়াস, ভারতীয় নৃত্যকে দেশে আদরণীয় ও বিদেশে বরণীয় করে প্রচার করতে উদয়শঙ্করের নিরলস সাধনা-এসব কিছুর পশ্চাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-বিষয়ক প্রেরণা।

এই শতকের গোড়ার দিকে নানা কারণে শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের কাছে নাচের কদর কমে গিয়েছিল। কলকাতায় তখন নাচ বলতে যা ছিল তা বাঈজী নাচেরই রূপান্তর বিশেষ। কাজেই ও সব বিকৃত রুচির নাচকে স্বীকৃতি দিতে তখনকার শিল্পরসিক চিত্ত কুণ্ঠিত হয়েছিল। নৃত্যের সেই চরম দুর্দিনে ভাবতেই অবাক লাগে, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে আর দশটা প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যেও নতুন করে নব-নৃত্যান্দোলনের কথা ভেবেছেন। শুধু ভাবেননি, তাকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে গেছেন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে। এই জন্যই নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। একটি অবহেলিত শিল্পকে বাঈজীদের কবল থেকে মুক্ত করে এনে, নব ব্যঞ্জনায় পরিশীলিত করে, এক পবিত্র আসনে বসালেন। যা ছিল দেহ-সর্বস্ব রূপজ ব্যাপার, তাকেই রূপান্তরিত করলেন আত্ম-নিবেদনের মহান উদ্দেশ্যে 'নটীর পূজা'র শ্রীমতীর নৃত্য পরিকল্পনার মাধ্যমে।

বৃটিশ যুগে গান-বাজনা-নাচ-নাটক-ছবি প্রভৃতি চর্চাকে শিক্ষা-বিবিক্ত (extra-curricular) ব্যাপার বলে ধরা হতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঐ শিক্ষা-বিবিক্ত ব্যাপারটাকে শিক্ষা সম্পৃক্ত (Co-Curricular) করলেন। এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতিকে স্থান দিলেন অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে একই পাঠ্যক্রমে। এরই সুদূর প্রসারী ফল আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। আজ যে ভদ্রঘরের উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, এমন কি কুলবধূরা নাচের চর্চা করতে পারছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে নৃত্যের যে বিশেষ স্থান হয়েছে এবং গবেষণাও হচ্ছে তারও মূলে রবীন্দ্রনাথের ঐ উদার

দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ যে 'আকাদেমিক' নৃত্যচর্চার পথ প্রশস্ত করলেন, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এই নৃত্যচর্চার পথকে আরও সুগম করে দেন। ১৯৬১ সালের পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর নৃত্যচর্চা ও গবেষণার কাজ চলছে। ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য—ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী ও কুচিপুড়ি নৃত্যের চর্চা যেমন হচ্ছে, তেমনি পাশাপাশি লোকনৃত্য ও রবীন্দ্র নৃত্য চর্চার আয়োজন রয়েছে। বর্তমানে নৃত্যজগতে পরিচিত অনেকেই এখানকার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং অনেক নৃত্যগুরু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত রয়েছেন। এইতো গেল আকাদেমিক চর্চার একদিক।

অপর দিকে আরেকটি নৃত্যান্দোলন গড়ে উঠেছিল প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, যা আজও জীবন্ত রয়েছে। সেটি হলো গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত 'ব্রতচারী' আন্দোলন। বৃটিশ যুগে পূর্ববঙ্গের অনেক স্কুলে এই ব্রতচারী নাচ শেখানো হতো খেলাধুলার অঙ্গ হিসাবে। এখনো বিভিন্ন স্কুলে ও ক্লাবে ব্রতচারী নাচ শেখাবার আয়োজন আছে। এই নৃত্যান্দোলনের মূল আদর্শ রূপায়ণে ছিল পাঁচটি ব্রত—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ। আর ভিত্তি ছিল ভূমিবাদ ও ছন্দবাদের উপর—যা এখনো প্রাসঙ্গিক। এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে শরীর গঠন, চরিত্র গঠন, সৌন্দর্য বোধ জাগানো, এবং সর্বোপরি দেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি যুবসমাজকে সচেতন করার একটা আয়োজন আছে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়বার একটা মূল্যবান হাতিয়ার গুরুসদয় দত্ত দিয়ে গেছেন এই ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পাইক, ঢালি, রায়বেঁশের মতো বলিষ্ঠ লোকনৃত্যগুলি ব্রতচারীর কল্যাণেই এখনো বেঁচে আছে।

এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে নৃত্যবিদ মনিবর্দ্ধন ১৯৫৫ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবাংলার লোকনৃত্য ও গ্রাম্য গাঁথা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যচর্চার একটি বিবরণ দেন। পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে সরকারী আনুকূল্যে কত বড় কাজ করা যায়। এই

প্রসঙ্গে বর্তমানে রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি আয়োজিত সঙ্গীত মূল্যায়ন কোর্সটির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এরা শুধু কলকাতাতেই এদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেননি, জেলায় জেলায় বিভিন্ন নৃত্য-বিষয়ক 'সেমিনার' ও 'ওয়ার্কশপ'-এর মাধ্যমে সঙ্গীত নৃত্য ও নাট্য বিষয়ে মানুষকে সজাগ করছেন। এই প্রচেষ্টা সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে নৃত্য-শিল্পীরা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত, হয়েছেন উদয়শঙ্করের নৃত্য-শৈলীর দ্বারা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী উদয়শঙ্করের প্রভাব সারা ভারতের নৃত্যশিল্পীদের ওপরেই পড়েছে। এখন যে নৃত্য জগতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার মূলে একদিকে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্য ব্যালের প্রভাব, তেমনি রয়েছে উদয়শঙ্কর উদ্ভাবিত নৃত্যধারার প্রভাব। উদয়শঙ্কর সব সময়েই নৃত্যের 'কোয়ালিটেটিভ' দিকটির উপরেই নজর দিয়েছেন বেশী। পাশ্চাত্য কোরিও গ্রাফির চিত্র ধর্মিতার সঙ্গে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নাচের আঙ্গিকে যে নৃত্যাভিনয় ও লাবণ্য স্থষ্টির প্রয়াস রয়েছে, তার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর অবয়ব-সংস্থানের রেখা-জ্ঞানের সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে অজন্তা-ইলোরার ভাস্কর্যের প্রভাব। তাঁর পরিমিতি বোধের পরিচয় পাই গন্ধর্ব, ইন্দ্র, কার্তিকেয় প্রভৃতি নৃত্যস্থষ্টিতে। জাভা-বলির ছায়া-নৃত্যের (Wayang) প্রভাব পড়েছে তাঁর 'রামলীলা' ছায়া নৃত্যনাট্যে। তাঁর নৃত্যে ওজঃ গুণ ও প্রসাদ গুণ দুই-ই ছিল। ভারতীয় মার্গনৃত্যের আঙ্গিক সর্বস্ব প্রথাবদ্ধতা অনেক সময় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিবন্ধকতা তিনি দূর করেছেন।

উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' ভারতের প্রথম নৃত্যবহুল ছায়াচিত্র। ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহ্যকে তিনি ছায়াচিত্রে রূপ দিয়েছেন। এই ছায়াচিত্রটি আজও নৃত্য-শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে। স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম দেখা গেল নৃত্যচর্চার একটি উন্নত রূপ। উদয়শঙ্করের 'মহাভিনিষ্ক্রমণ', 'Labour and Machinery' 'Eternal Melody' প্রভৃতি নৃত্যগুলি অনবদ্য স্থষ্টি হয়ে রয়েছে। পরবর্তী যুগে 'সামান্য ক্ষতি', 'প্রকৃতি আনন্দ' এবং সব শেষে তাঁর অপূর্ব স্থষ্টি 'শঙ্করস্কোপ'। এই শঙ্করস্কোপে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মাধ্যমে Stage ও Screen-এর সমন্বয়ে, Reality ও Fantacy-র এক চমৎকারিত্ব স্থষ্টি করলেন। এভাবে

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নৃত্যশিল্পের এত উন্নত ও দীর্ঘায়ত চর্চা আর তেমন দেখা যায় না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্করের নৃত্যধারায় দীর্ঘদিন ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার সার্থক স্বাঙ্গীকরণ ঘটেছে। এই স্বাঙ্গীকরণ অনেকটা রাসায়নিক মিশ্রণের মতো। এতে একদিকে যেমন রয়েছে ভারতীয় ধ্রুপদী নাচগুলির আঙ্গিক প্রকরণসহ নৃত্যাভিনয় পদ্ধতির আভাস, তেমনি রয়েছে নানা আঞ্চলিক লোকনৃত্য ও বিদেশী নৃত্যের পরোক্ষ নির্যাস। এই নৃত্য-সমাবেশ বা মিশ্রণ এত সূক্ষ্মভাবে হয়েছে যে তাতে আগের রূপটি হারিয়ে গেছে নবরূপটির কাছে। এ এক অভিনব সৃষ্টি। এই সৃষ্টি প্রবাহ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্যকলা চর্চাকে প্রভাবিত করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর প্রভৃতির নৃত্য বিষয়ক চিন্তা-চেতনা প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পরবর্তী যুগকে বিধৃত করে আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই সকল নৃত্যধারার সমন্বয়ে নৃত্যের একটি নতুন Form দানা বেঁধে উঠেছে। এই Form-টিকে আমরা Neo-Classical বলতে চেয়েছি। এখানে এই নাচকে 'নিও-ক্ল্যাসিকাল' বলছি এই কারণে যে, আভিধানিক অর্থে 'নিও' উপসর্গটির অনেক মানে থাকলেও তার মধ্যে দুটি অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দু'টি হলো 'Revived in modified form' এবং 'Based upon'। এ ভাবে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ ও লোকনৃত্যকে রবীন্দ্রনৃত্যে এবং উদয়শঙ্করী নৃত্যে 'modify' করে ব্যবহার করা হয়েছে এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য, ভারতীয় নৃত্যের উপর ভিত্তি (Base) করেই তো এই নব নৃত্য সংগঠিত হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, আকাদেমিক প্রচেষ্টা প্রভৃতির মাধ্যমে নৃত্যচর্চার প্রধান ধারাগুলির আলোচনা সংক্ষেপে করা গেল। এবার নৃত্যচর্চার অন্যান্য ধারা-উপধারাগুলির কথা সংক্ষেপে বলা যাক্।

স্বাধীনতা লাভের পর সরাসরি সরকারী প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে 'লোকরঞ্জন শাখা' স্থাপিত হয়। তাতে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা প্রভৃতির চর্চা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি আঞ্চলিক লোকগাঁথা নিয়ে 'মহুয়া' নৃত্যনাট্য প্রভৃতি অভিনীত হয়েছে। এ ছাড়া তখনকার সঙ্গীত নৃত্য নাটক আকাদেমির পশ্চিমবঙ্গ শাখা প্রতি বছরেই

চারুকলা চর্চায় গুণী ব্যক্তিদের সম্মানিত করে চলেছেন। এতে সঙ্গীত ও নাটকের সঙ্গে নৃত্যজগতের গুরুরা ও সম্মানিত হচ্ছেন। এখন এর পরিধি অনেক বেড়েছে। নতুন নামকরণ হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি'। এতে ১৯৬৯-৭০ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা জগতের অনেক বিশিষ্ট শিল্পীকে সম্মানিত করা হয়েছে।

এছাড়া প্রগতিশীল ভাবধারায় পুষ্ট সাংস্কৃতিক শাখা, যেমন I. P. T. A. (গণনাট্যসঙ্ঘ), ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘ প্রভৃতির অবদানও কম নয়। গণনাট্য সঙ্ঘের 'অহল্যা' নৃত্যনাট্য, 'আফ্রিকা', 'রাণার' প্রভৃতি নৃত্যকল্পগুলি পঞ্চাশের দশকে মাতিয়ে রেখেছিল। ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘ প্রথম ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে 'মহুয়া' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে রঙ্মি প্রেক্ষাগৃহে। পঞ্চাশের দশকে এই নৃত্যনাট্য খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছাড়া বেসরকারী সংস্থার মধ্যে রাণাঘাটের ইষ্টার্ণ রেলওয়ে শিল্পী পরিষদ, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, কল্যাণী কংগ্রেস অধিবেশন প্রভৃতি স্থানে 'বঙ্গদর্শন' নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করেন। এতে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গ সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি নৃত্যের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল। কত নৃত্যনাট্য যে তখন রূপায়িত হয়েছে কত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, তার হিসেব করা মুস্কিল। তবু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল যেমন, হরিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 'জটায়ু বধ', নটশ্রী দেবপ্রসাদ বসুর 'শিল্পী ও পাষাণ' শ্যামলকুমারের 'রামায়ন', 'রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'পৃথিবী', গ্রামীণ গীতি সংস্থার সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'মহুয়া বনে আগুণ' নৃত্যনাট্য, কবি সুকান্তর জীবন অবলম্বনে 'কবি কিশোর' একক নৃত্যনাট্য (সুনীত বসু অভিনীত), অতীন লালের 'শ্রীচৈতন্য' C.L.T.র 'রামায়ণ' প্রভৃতি শিশু নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রভারতীর 'শকুন্তলা', 'কুমার সম্ভব' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য। বটু পালের 'নীলদর্পণ' ও 'মহেশ' নৃত্যনাট্য। অসিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কবি' প্রভৃতি।

নৃত্যচর্চার জন্য কত প্রতিষ্ঠান যে আছে তার পরিসংখ্যান হয়তো আজও সম্পূর্ণভাবে করা হয়নি। রবীন্দ্র ভারতী অনুমোদিত অনেক প্রতিষ্ঠান কলকাতা ও মফঃস্বলে আছে। সে সব জায়গায় জুনিয়ার ডিপ্লোমা পর্যায়ে নাচ শেখানো হয়। রবীন্দ্র ভাবধারাপুষ্ট 'দক্ষিণী', 'গীতবিতান', 'কবিতীর্থ, 'সুরঙ্গমা' প্রভৃতি, উদয়শঙ্কর ভাবধারায় পুষ্ট 'উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার' প্রভৃতি।

কথাকলি নাচ শেখার জন্য 'কলকাতা কলামণ্ডলম্' 'মণিপুরী নর্তনালয়' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মণিমেলা, ব্রতচারী সমিতি প্রভৃতি অজস্র প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে, ধারাবাহিক লোকায়ত নৃত্যচর্চার আয়োজন আছে।

সত্তরের দশকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান আবার নৃত্য বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন আলোচনা চক্র, Lecture demonstration প্রভৃতির আয়োজন করেছেন। যেমন, Dancers Forum গোর্কিসদনে ভরত নাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী, কুচিপুড়ির উপর Lecture demonstration-এর আয়োজন করেছিলেন। তাছাড়া 'পদাতিক', 'অনামিকা কলাসঙ্গম' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন নৃত্য গুরুদের কলকাতায় এনে এখানকার শিল্পীদের নাচ শেখার পথকে সুগম করেছেন। এঁদের প্রচেষ্টাতেই গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী, ডঃ পদ্মা সুব্রহ্মণীয়ম বিরজু মহারাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীরা বার বার কলিকাতায় এসে ওয়ার্কশপ করে এখানকার ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। অনামিকা কলা সঙ্গম Chou Dance Festival-এর আয়োজন করেছিলেন সত্তরের দশকে। নৃত্যের ঔপপত্তিক (Theoretical) ও ফলিত চর্চার (Applied) প্রচার ও প্রসার বাড়াতে গেলে এই ধরণের আলোচনাচক্রের প্রয়োজন আছে। এই আলোচনা-চক্রে সেরাইকেলার ছৌ, ময়ূরভঞ্জের ছৌ ও পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সেরাইকেলার ছৌ যেন অনেকটা আধুনিক হয়ে গেছে। এঁরা মুখোশ ব্যবহার করেন। তবে বাদ্যযন্ত্রে সেই প্রাচীন ধারা নেই। আর ময়ূরভঞ্জের ছৌ নাচে প্রাচীনতার কোন ছাপই নেই। এরা মুখোশও ব্যবহার করে না। এঁদের বাদ্যযন্ত্র খুবই আধুনিক। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছি পুরুলিয়ার ছৌ নাচে। এঁরা সেই প্রাচীন ধারাটি বজায় রেখেছেন। এঁরা মুখোশ তো ব্যবহার করেনই, তাছাড়া বাদ্যযন্ত্রেও প্রাচীন ধারা বজায় রেখেছেন। যেমন—বড় বড় ধাম্‌সা, ঢোল এবং সানাই জাতীয় বাঁশি ইত্যাদি। আমাদের ধারণা পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যই আসল রূপ বজায় রেখেছে।

উক্ত আলোচনা চক্রেরও আগে আরেকটি ছৌনৃত্য উৎসবের আয়োজন হয়েছিল ১৯৭২ সালের এপ্রিলে, রবীন্দ্র সদনে। এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা

ছিলেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। আমাদের শহর অঞ্চলে এবং ভারতের বাইরে এই পুরুলিয়ার ছৌ নাচকে তিনিই পরিচিত করান। এই ছৌ নৃত্যের সঙ্গে একমাত্র কেরালার কথাকলি নৃত্যের তুলনা করা যায়। উভয় নাচই খুব বলিষ্ঠ। সীমান্ত বাংলার এই নাচে মূলতঃ তিনটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছে। যেমন, ছৌ নৃত্যের বাদ্যভাণ্ড ডোম জাতির, নৃত্য প্রধানতঃ মুণ্ডা আদিবাসীর, মুখোশ নির্মান, বর্ণ হিন্দুর দান।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি স্থানীয় নাচগুলির অন্যতম হলো—বাউল, ছৌ, গাজন, পাইকান, বায়বেঁশে, ঝুমুর, ঢালি ইত্যাদি। এগুলি যদিও লোকনৃত্যের পর্যায়ভুক্ত, তবু তার মধ্যে বাউল ও ছৌ নাচ লোকনৃত্য হয়েও তাতে ক্ল্যাসিকাল নাচের কিছু কিছু করণ-প্রকরণ, পাদকর্ম, ভ্রমরী, চারা প্রভৃতি প্রথাবদ্ধ নৃত্যের আঙ্গিক উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এজন্য এ দুটি নাচকে আমরা শুধু Folk না বলে, Classico-Folk পর্যায়ে ফেলতে চাই। প্রথমতঃ লোকনৃত্যের যেমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি এবং নিজস্ব ধারায় স্বাধীন বিকাশ আছে, ছৌ নৃত্যে তা কম। এই নাচের একটি সুদৃঢ় পদ্ধতি আছে, একটি, সুসংবদ্ধ ধারা আছে, একটি অবিচল আদর্শ আছে এবং যদিও তার জন্য কোন লিখিত শাস্ত্র আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি, তথাপি তার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিও আছে তার ব্যতিক্রম করার উপায় নেই। সকলকেই সেটা মেনে চলতে হয়। ধ্রুপদী নাচের অনেক উপাদান সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এতে। নানা দিক, বিচার করে তাই একে Classico-Folk বলাই সঙ্গত। বাউল নাচকেও আমরা ঐ একই কারণে উক্ত পর্যায়ের নাচ বলতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব কোন খাঁটি শাস্ত্রীয় নৃত্য গড়ে ওঠেনি। কাজেই শাস্ত্রীয় নৃত্যচর্চার জন্য অন্য প্রদেশের নৃত্যগুরুদের উপর নির্ভর করতে হয়। যদিও বঙ্গদেশে যে নাচের প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই ছিল, তার কিছু কিছু উপাদান প্রাচীন সাহিত্যে মেলে। যেমন, গীতগোবিন্দ, চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে নৃত্যের কিছু কিছু উপাদান ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এতে নাচ ছিল, এবং নাচের কিছু বর্ণনাও পাওয়া যায়। কিন্তু সেই নাচের পদ্ধতি কি ছিল বা নৃত্য-ব্যাকরণ কিরূপ ছিল, তা জানা যায় না। সেজন্যই শাস্ত্রীয় নৃত্যচর্চার ব্যাপারে বহিরাগত নৃত্যগুরুদের উপরেই নির্ভর করতে হয়। অনেক গুরু

কলকাতায় এসে থেকে যান এবং নৃত্য প্রতিষ্ঠান গড়েন। যেমন, গুরু বিপিন সিং মণিপুরী নর্ত্তনালয় স্থাপনা করে এই নাচ শেখার পথ সুগম করেছেন। গুরু গোবিন্দ কুট্টি ও থাঙ্কমনি কুট্টি কলিকাতা কলামণ্ডলম স্থাপনা করে কথাকলি, ভরতনাট্যম ও মোহিনী আট্টম্ শেখার পথ সুগম করেছেন। কোন কোন বাঙ্গালী নৃত্যগুরুও শাস্ত্রীয় নৃত্যে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করে সেই নৃত্য এখানে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যেমন, বেলা অর্ণব কথক নৃত্যের চর্চায় প্রায় তিন দশক ধরে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের শম্ভুমহারাজের ঘরানায় নৃত্য শিক্ষা দিয়ে আসছেন। সেই প্রসঙ্গে বন্দনা সেনের নামও করতে হয়। এদের শিক্ষার ফলে এই নাচগুলির চর্চায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলার লোকনৃত্য চর্চাকে আমরা দু' ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন,

(১) বাঙালীর স্বকীয়তা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বাঙালীর প্রথা, আচার-আচরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের অঙ্গীভূত বাঙালীদের গাজন, বাউল, রায়বেঁশে, ঢালি ইত্যাদি নাচ।

(২) বাংলার জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বাংলার অধিবাসী অবাঙালী প্রান্তিক ও পার্বত্য জাতিদের প্রথাপুষ্ট লোকনৃত্যাদি। যেমন, লেপচাদের 'ধান নাচ', শেরপাদের 'বিয়াচ্ছম্' নাচ, নেপালীদের 'মাদল-খঞ্জনী' নাচ, 'মারুতী নাচ, সাঁওতালদের 'বাদ্‌না' নাচ, ওরাওঁদের 'করম' নাচ ইত্যাদি।

তাছাড়া আঙ্গিক বিনিয়োগের তারতম্যে লোকনৃত্যগুলিকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, সাবলীল দক্ষতায় গোষ্ঠীনৃত্য (Community Dance)।

(২) জটিল তাল, লয়, ছন্দে শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকের গতি, চারী, চলন, উৎপ্লবন, ভ্রমরী, পাদভেদ, হস্তকর্মপুষ্ট লোক সমাজের নাট্যধর্মীয় নৃত্যাদি, যেমন কালীকাচ নাচ, বাউল নাচ প্রভৃতি একক নৃত্য।

এ ছাড়া ধর্মীয় আচরণযুক্ত নৃত্যাদি—যেমন, গাজন, গৃধিনী বিশাল নৃত্য, মেচেনি নৃত্য প্রভৃতি। সামাজিক উৎসবে অনুষ্ঠিত নৃত্যাদি—বহুরূপী, কাঠিনৃত্য, লেটো নৃত্য প্রভৃতি। শক্তিচর্চা ও অঙ্গচালনার কৌশলযুক্ত রণনৃত্যের (Martial Dānce) অঙ্গীভূত নৃত্য ঢালি, পাইকান, রায়বেঁশে প্রভৃতি।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে নৃত্যচর্চার আরেকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেটি হলো পাশ্চাত্য ব্যালের প্রভাব। এর সূত্রপাত করেন, উদয়শঙ্কর তাঁর 'Labour and Machinery' নৃত্যকল্পে। ব্যালের আঙ্গিকে এই নৃত্যটি পরিকল্পিত। ইদানীং কালে বোম্বে প্রবাসী বাঙালী নৃত্যশিল্পী শচীন শঙ্কর প্রায় প্রতি বছরই কলকাতায় আসেন তাঁর ব্যালে গ্রুপ নিয়ে। তাঁর 'ট্রেন' ব্যালেটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

অনেকে আবার রবীন্দ্রনৃত্যকে ব্যালের পর্যায়ে ফেলতে চান। এটা ঠিক নয়। কারণ ব্যালে আসলে এক যৌথ রূপবাদী শিল্পকলা। এর প্রক্রিয়া অনেকটা শ্রমবিভাগের মতো। ব্যালেতে একটি কাহিনীকে খাড়া করে সেই অনুযায়ী সঙ্গীত, মঞ্চ, রূপসজ্জা ও নৃত্য গড়ে ওঠে পৃথক পৃথক প্রচেষ্টায়। কোরিওগ্রাফারের উপর দায়িত্ব থাকে দৃশ্যগুলিকে যথাযথভাবে বিন্যাস করার। ব্যালে শিল্পকলার এই দিকটা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিল। তবু ইওরোপীয় ব্যালে ও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে মৌল পার্থক্য আছে। ইউরোপে বিশুদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীতের উৎকর্ষ ও উপযোগিতার জন্যই ব্যালের উদ্ভবের কারণ ধরা হয়। সেইজন্যই বোধ হয় ইউরোপীয় নৃত্যনাট্য 'বাণীহীন' হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য সেদিক থেকে স্বতন্ত্র। ব্যালেতে বিষয় নির্বাচন, সঙ্গীত রচনা, নৃত্যের প্যাটার্ন বা কোরিওগ্রাফি রচনা আলাদা আলাদা লোকেরা করে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মুখ্য দু'টি বিষয়ের পরিকল্পক ও স্রষ্টা। তিনিই মূল বিষয়টি লিখেছেন, তিনিই সুর দিয়েছেন, আবার তিনিই কোথায় কোন নাচের সমাবেশ ঘটবে তারও নির্দেশ দিয়েছেন। অনেকটাই একক ব্যাপার। তাছাড়া, ব্যালে বিশুদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীতের উপর নির্ভরশীল, আর রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য কণ্ঠসঙ্গীতের উপর ভিত্তি করেই রচিত।

যাই হোক, বর্তমানে যাঁরা নানা স্থানে নৃত্য প্রযোজনা ও নির্দেশনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তাঁদের অনেকের উপরেই সাধনা বোস, অমলা শঙ্কর, অনাদিপ্রসাদ, মণি বর্ধন, মণিশঙ্কর, শান্তি বর্ধন, শচীন শঙ্কর, বুলবুল চৌধুরী, গুরু গোপাল পিল্লাই, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, বালকৃষ্ণ মেনন, ডঃ মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার, শিবশঙ্করণ, মমতা শঙ্কর, বেলা অর্ণব, বন্দনা সেন, মুরলীধর মাঝি, ডেরিক মনরো, অসিত চ্যাটার্জী, বটু পাল, অতীনলাল, শান্তি বসু প্রমুখ নৃত্যশিল্পীদের প্রভাব কম নয়।

উদয় শঙ্করের নৃত্যধারাকে এখনো অমলা শঙ্কর বহন করে চলেছেন। অমলাশঙ্কর সৃষ্ট নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'বাসবদত্তা', 'সীতা স্বয়ম্বরা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মমতা শঙ্করের 'আজকের একলব্য' উল্লেখের দাবি রাখে। রবীন্দ্র নৃত্যধারার সার্থক অনুগামী ছিলেন বালকৃষ্ণ মেনন। তিনি আগে শান্তিনিকেতন পরে কলকাতায় রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরাট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখনকার রবীন্দ্রনৃত্য পরিচালকরা অল্পবিস্তর তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশু নৃত্যনাট্যে যুগান্তর এনেছেন তরুণ গাঙ্গুলী তাঁর "হলদে ঝুঁটি মোরগটি" প্রযোজনা করে। এটি পরে রঙিন ছায়াচিত্রে বিভিন্ন ভাষায় রূপায়িত হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর 'রূপমতী' 'বাজবাহাদুর' ও 'পরমলগ্ন' উল্লেখযোগ্য। তবে শিশু নৃত্যনাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব বোধ হয় C. L. T. সংস্থার। এঁদের প্রযোজিত শিশু নৃত্যনাট্যগুলি সমগ্র ভারতে সমাদৃত হয়েছে।

এখানে নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামাবলি রচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকজনের নাম এবং কয়েকটি সংস্থার নাম উল্লেখ করলাম, নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে এঁদের অবদানের কথা মনে রেখে। এতে অনেকের নাম বাদ পড়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া গত একচল্লিশ বছরের মধ্যে নৃত্য চর্চার ক্ষেত্রে যা যা ঘটে চলেছে তার মধ্যে অনেক কিছুই এখনো পরীক্ষামূলক স্তরে রয়ে গেছে। কাজেই সেগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি।

সব শেষে বলি, আশির দশকের শেষের দিকে ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণের পথ ধরেই শুরু হয়েছে অত্যাধুনিক যুগের Innovation পর্বটি। একেই আমরা বলতে চেয়েছি Modern বা Creative ইত্যাদি। এই Innovation বা নতুন পরিবর্তনটিও এসেছে গুরুমুখী ও আকাদেমিক—এই উভয় পথেই। তবে আগেকার Revivalist Movement এর সঙ্গে Innovationist Movement এর মূলগত পার্থক্য হলো—গুণগত পরিমাণগত নয়। এই গুণগত কারণেই এই Innovation নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। Innovation ব্যাপারটা খারাপ কিছু নয়। এর নামে যা চলছে। তা সর্বক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় কি?

শিল্পকলা গতিশীল। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, সমাজের

প্রয়োজনেই পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনে সৃষ্টিশীল চিন্তার দিকটি সব শিল্পী তেমনভাবে দেখেন না, বিশেষ করে যাঁরা 'পিউরিটান'। কিন্তু উদারনৈতিকরাও সর্বক্ষেত্রে সার্থক হচ্ছেন ? তাঁদের পরিকল্পিত নাচগুলি কি সব সময় রসোত্তীর্ণ হচ্ছে কি ? যদি না হয়, তবে Innovation এর অর্থ হয় না। কয়েক বছর আগে Innovation এর নামে এক বড় ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান দেখেছিলাম। তাতে বাইরের নৃত্যশিল্পীরাই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার শিল্পীরা ছিলেন খানিকটা উপেক্ষিত। অথচ জানি, কলকাতার বহু শিল্পী এই Innovation নিয়ে ভাবছেন এবং ইতিমধ্যেই কিছু রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি উপহার দিয়েছেন। যাই হোক, বাইরের শিল্পীদের অনেকের কাছে Innovation এর প্রচেষ্টা কিছুটা সার্থক হলেও, অনেকটাই তেমন রসোত্তীর্ণ হয়নি। এখানকার শিল্পীরা অংশ নিলে তুলনামূলক ব্যাপারটা বোঝা যেত। উক্ত নৃত্যানুষ্ঠানে কিছু Acrobatics, কিছু Posture (Gesture নয়) ইত্যাদি এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সহায়তায় কিছু নতুন গিমিক সৃষ্টি করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ উদয়শঙ্কর প্রবর্তিত নৃত্যধারাকে Neo-Classical আখ্যা দিলেও এই Innovation এর ফসলকে ঠিক Neo-Classical এর মর্যাদা দেওয়া যায় না। তার কারণ এগুলি আমাদের নৃত্য ঐতিহ্যের কেন্দ্রাভিগ নয়, কেন্দ্রাতিগ।

নতুন চিন্তাকে আমরা সব সময়েই স্বাগত জানাবো। কিন্তু তা যেন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে হয়। নতুনত্বের নামে যা খুশি, তা যেন না হয়। তা হলে তা বাতিল হতে বাধ্য। যদিও নৃত্যজগতে চিরকালই ঐতিহ্যবাদী ও প্রগতিবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটা থেকেই গেছে, এখনো আছে। শুধু আমাদের বক্তব্য নৃত্য ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা না করে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারলে Innovation চিন্তা সার্থক হবে। অন্ততঃ নাচের ক্ষেত্রে তো বটেই। অন্যথায় মহতী বিনষ্টি।

॥ ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণ পর্ব (Revivalist Movement) ॥

স্বাধীনতালাভের পর, যতদূর জানি, প্রথম সবচেয়ে বড় নৃত্যবিষয়ক 'সেমিনার' হয়েছিল নয়াদিল্লীতে ১৯৫৮ সালে। তারপর হয়তো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু নৃত্য বিষয়ক সেমিনার হয়ে থাকবে। তাহলেও বলবো একসঙ্গে এতজন গুণী শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ বোধহয় এভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ

করেন নি। এর আগে নানা দিক থেকে তাই উক্ত নৃত্যবিষয়ক সেমিনার আধুনিক ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নয়াদিল্লীর সঙ্গীত নাটক-একাডেমী আয়োজিত উক্ত নৃত্যবিষয়ক সেমিনার-এ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে আলোচনায় ঝোঁকটা লক্ষ্য করেছি প্রাচীন নৃত্যধারার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যার দিকেই বেশী। আধুনিক যুগের নৃত্যের পুনরুজ্জীবন-এর কথা অপেক্ষাকৃত কম। তা হলেও প্রতিটি আলোচ্য বিষয় অনুধাবনযোগ্য। উক্ত সেমিনারের লিখিত প্রতিবেদন যতটা আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হল। তালিকায় প্রদত্ত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে উক্ত সেমিনারের অভিনবত্ব। যদিও ভারতে প্রচলিত আরও অজস্র নৃত্য রয়েছে যা উক্ত সেমিনারে আলোচিত হয় নি অথচ যা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যাই হোক, নয়াদিল্লীতে ১৯৫৮ সালের সঙ্গীত নাটক একাডেমী আয়োজিত নৃত্য-আলোচনা চক্রের তালিকা :

1. Kuchipudi School of Dance, by Shri V. Apparao (No. of pages 23)

2. The folk Dances of Rajasthan, by Shri Devilal Sarma (No. of pages 32)

3. Dance Traditions in Bihar, by Shri Hari Uppal (No. of pages 16)

4. The Ceylon Traditional to Classical Dance Kandyan Dances by Noeyal Peiris demonstrated by Kala Guru Nittawala Guneya. (No. of pages 7)

5. Nayikas as a theme for the Bharat Natyam Classical Dance Style, by Kumari Roshan Vajifdor (No. of pages 24)

6. Dancing in Films : by Shri Binod Chopra (No. of pages 12)

7. Dance Tradition in Assam by Dr. Maheswar Neogi (No. of pages 47)

8. Odisi Dance, by Shri Kali Charan Pattanaik (No. of pages 32)

9. Dance Tradition in Bengal, by Shri Santidev Ghosh
(No. of pages 32)

10. Kathakali, by Guru Gopinath („ „ „ 19)

11. Literature and other sources in Indian Classical Dances, by Shri K. Vasudeva Shastri. (No. of pages 28)

12. Bhagabata Mela Dance Drama foim of Bharat Natya by Shri E. Krishna Iyer. (No. of pages 26) (from page 19-25 not found)

13. Yakshagana, by Shri K. Shivaram Karanth
(No. of pages 20)

14. Raslila and other Dance-Dramas of Uttar Pradesh, by Suresh Awasthi (··· found up to 17)

।। ভারতীয় নৃত্যের পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গ ।।

নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রাক্‌কালে নৃত্যবিষয়ে মানসিকতা কেমন ছিল, তা বুঝতে এই উদ্ধৃতিটিই যথেষ্ট—(১৯৭৩ সালে গবেষণা নিবন্ধে লিখেছিলাম)

"আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে দেখছি—(৩১ জানুয়ারী ১৯২৩।১৭ মাঘ, ১৩২৯) 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী ও নৃত্যকলা বিষয়ে লেখা হয়েছে—

"গুড ফ্রাইডের ছুটিতে কলিকাতায় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই সঙ্গীত সম্মিলনীতে গীতবাদ্যের আয়োজন নির্ধারিত ছিল। কিছুদিন পূর্বে আমরা উহার মধ্যে নৃত্যকেও স্থান দিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। শুনিয়া খুশী হইলাম যে, সম্মিলনীতে নৃত্যকলাও স্থান পাইবে। কিন্তু এই সংবাদ পাইয়া 'সঞ্জীবনী' (তখনকার রক্ষণশীল, পিউরিটান পত্রিকা) হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হইয়া লাট সাহেবের বাড়ীর বারান্দায় আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন। আঃ বাই নাচ। যেহেতু নর্তকীরা একান্ত দেশীয়, তাহারা একেবারে 'বাই' এবং সঞ্জীবনীর মতে ভদ্র সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইবার অযোগ্য। কিন্তু এই 'বাই' যদি মডেলের অনুরূপে প্রায় উলঙ্গিনী হইয়া দর্শন দানে ধন্য করেন বা যদি ম্যাডাম প্যাভলোভা রূপে বক্ষ

ও বন্ধুর (বাহুর) নগ্ন সৌন্দর্য্য লীলায়িত করিয়া বিকাশ (বিকশিত হয়) তাহা হইতে কিন্তু সঞ্জীবনীর চিদঘন আনন্দ উন্মলিয়া উঠে।"...ইত্যাদি ইত্যাদি।

নৃত্যের আধুনিক যুগের ধারার কথা বলতে গিয়ে ডঃ মহেশ্বর নিয়োগী যথার্থই উল্লেখ করেছেন—

'It is as late as 1934 that the poet Rabindranath Tagore bewailed "Lord Siva gave his dance to the Indonesians and left India only with his ashes." But, as Faubion Bowers has beautifully said 'phoneix-like, out of Siva's ashes has risen the dance of India today. We today recognise universally four school of classical Indian dances, the graceful and most Bharat like Bharat-natyam ; the masculine and vigorous Kathakali, deviating much as it does from Bharata Muni's code, the nautch' type of Kathak with its Muslim court influence and its minimised language of finger and the Manipuri style, coming into its present shape by the 18th century, with its variety beauty and vigour. This classification looks some arbitrary depending as it does on the prior re-emergence of these styles in recent times, and paying no attention to any connected history of the dance of India from Bharata down to the centuries. No such history, of course, does exist today and it still awaits the hand of some artist historian to create it.

Even these now acknowledged forms of Classical Indian dance were scarely known in the beginning of the present century. It is only when there was a revival of cultural interest alongside of a general national upsurge that dance artists turned their eyes on them, and brought them to limelight. If by the term classical Indian dance we mean dances based on authoritative treatise like Bharat's Natyasastra and

Nandikesvara's Abhinaya Darpana, there would be more than at least ten such different schools of dances still lying obscure in different parts of India. Several of these may be found in the South, while in Eastern India, Orissa and Assam have to present quite a few forms.

It has been claimed on behalf of the Odissi dance of Orrissa that this classical form has been in existence for about two thousand years, and is believed to have taken definite shape during the Temple Age of Utkal history. It is quite likely, however, that this style originated or came to its present shape in the 15th century, under neo-Vaishnava influences, when Purushottama, the Gajapati conquered Vijoyanagara, and brought the Sakshi Gopala idol and a jewelled throne for the Puri temple of Jagannath. The Natamandir, the actual place of the temple dances, which was erected sometime between the reign of Ananta Varman Chadaganga (11th-12th century) and Purushottama, might have something to do with the early history of the evolution of the Odissi style. During the reign of Purushottama's son, Prataparudra, orders were issued in 1499 to the effect that the dancing girls including the Telinga batch, were to perform the Gitagovinda only. As it has been executed on different occassions in the last few years, this Puri temple dance seems to have a large admixture of Bharat-Natyam technique, which however, might have come from a direct study of the Natyasastra. A treatise on dance, Abhinaya-chandrika, written by Maheswar Mohapatra of the 12th century, is also available in Orissa. We welcome the efforts of Utkal artists to obtain general recognition of this school of classical dance."[১]

১। Seminer Paper—Dr, Maheswar Neogi. Sangeet Natak Academy, New Delhi, 1958. Page-5.

নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—ওড্রো, অবন্তী, পাঞ্চালী, সৌরসেনী, কর্ণাটক, (কেরালা) মাগধী নৃত্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য। এগুলি আপন বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। যেমন—

ওড্রো—ভাবপ্রকাশে

সৌরসেনী—অঙ্গসঞ্চালনে

কর্ণাটক—সমস্ত বিষয়ে

কেরালায়—অনুষ্ঠানের প্রাধান্য

পাঞ্চালী—যুগল নৃত্যের প্রাধান্য

মাগধী—ভাবপ্রকাশে শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

এ যুগে যেমন ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলি প্রায় অঞ্চল ভিত্তিক হয়ে পড়েছে যেমন তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম্, কেরালায়—কথাকলি, কৃষ্ণনাট্যম্, মোহিনী আটাম্, মণিপুরের—মণিপুরী, জয়পুর-লক্ষ্ণৌ—বেনারসের কথক, অন্ধ্রের কুচিপুড়ি উড়িষ্যার ওড়িশী, মহীশূরের যক্ষগণ প্রভৃতি, তেমনি নাট্যশাস্ত্রের যুগেও ঐ অঞ্চলভিত্তিক নাচগুলির কতগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা থেকে ঐ আঞ্চলিক নাচগুলির আঙ্গিক ও পদ্ধতিগত পার্থক্য ধরা পড়েছিল।

॥ ভারতের অঞ্চলভিত্তিক নৃত্যধারা ॥

ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে ভারতীয় নৃত্যধারাকে অঞ্চলভিত্তিক ভাগ করে দেখানো যেতে পারে। উনবিংশ-বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র ভারতজুড়ে 'ট্রাডিশনাল্' মূল নৃত্যধারাগুলি নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে, পল্লবিত, পুষ্পিত হয়ে ওঠে। এই ধারা-উপধারা, সামগ্রিক পরিচয় অল্পপরিসরে-এ দেওয়া সম্ভব নয় বলেই, শুধুমাত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা-উপধারার নৃত্যকল্পগুলিকেই এখানকার আলোচনায় বিষয়বস্তু করা হল। যেমন—

(১) পূর্বঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত নৃত্যধারা প্রধানতঃ কুচিপুড়ি (অন্ধ্র), ওড়িশী (উড়িষ্যা) ভরতনাট্যম (তাঞ্জোর), এ ছাড়া কুরুভঞ্জি, সদিরনাট্য, ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্য, মেলাতুর প্রভৃতি।

(২) পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত নৃত্য ধারা প্রধানতঃ—কথাকলি, কৃষ্ণ-নাট্যম্, মোহিনী আট্যম্, অন্যান্য 'কলিনাচ' প্রভৃতি।

(৩) মধ্য থেকে দক্ষিণাপথ (বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ)—ভাগবতমেলা নৃত্যগোষ্ঠী, যক্ষগণ প্রভৃতি।

(৪) আর্যাবর্ত—উত্তরাঞ্চল, (বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর) গুজরাট, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশের নৃত্য—প্রবাহ। কথক নৃত্যশৈলী ও বিভিন্ন লোকনৃত্যের সমাবেশ।

(৫) পূর্বাঞ্চল—মণিপুরী নৃত্য, আসামের নটীনৃত্য (দেবদাসী) ওঝাপালী নৃত্য, সাত্রা নৃত্য প্রভৃতি। বাংলার ব্রতচারী, বাউল, ছৌ প্রভৃতি, বিহারের ছৌ, উড়িষ্যার ছৌ, অন্যান্য নৃত্য শৈলী।

যে সকল প্রধান প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নৃত্যধারার নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী', ভাল্লাথোলের "কেরালা কলামণ্ডলম্' 'আসামের প্রাচীন কামরূপী নৃত্যসঙ্ঘ, উদয়শঙ্করের 'আলমোড়া নৃত্য কেন্দ্র' রুক্মিণী দেবীর 'কলাক্ষেত্র'। প্রভৃতি তো আছেই তাছাড়া বর্তমানে তো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতকোত্তর বিভাগেও নৃত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে এবং ভারতের সর্বত্র শত শত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ধমনীতে নৃত্যের ছন্দ স্পন্দিত হচ্ছে।

পূর্বঘাট পর্বতমালার প্রায় একই ধারার তিনটি ক্ল্যাসিক্যাল নাচ—কুচিপুড়ি, ওড়িশী ও ভরত নাট্যম। আর এর আনুষঙ্গিক আলোচনায় থাকছে সদির নাট্য, কুরুভঞ্জি, মেলাতুর প্রভৃতি—

।। অন্ধ্রের কুচিপুড়ি-নৃত্য প্রসঙ্গ ।।

ধ্রুপদী নাচের মধ্যে এখনো যেগুলি দৃশ্যমান অর্থাৎ মঞ্চে বা অনুষ্ঠানে দেখা যায়, সেগুলি হল প্রধানতঃ ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী। এ ছাড়া মোহিনী আট্যম্ (নাট্যম্ নয়) ও কৃষ্ণনাট্যম্ নামেও দুটি ধারা প্রায় ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে। তবে ইদানীং আর দুটি ধারার প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি পড়েছে—ধারা দুটি হল কুচিপুডী ও ওড়িশী। প্রাচীন ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্যের ধারা বেয়েই নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে, কুচিপুড়ি প্রভৃতি নাচগুলি ধীরে ধীরে মন্দির ছেড়ে মঞ্চে এসেছে।

ভৌগোলিক সংস্থানের দিক দিয়ে ভরতনাট্যম্, কুচিপুড়ি ও ওড়িশী—একই পূর্বঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত। ঔপপত্তিক দিক দিয়েও এই তিন ধারার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান। কারণ এই তিনটি ধারাই ভরতের নাট্যশাস্ত্র-কেন্দ্রিক

* মদীয় প্রবন্ধ—অন্ধ্রের কুচিপুড়ি নৃত্য প্রসঙ্গ—রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা—একাদশ বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০।

করণ-প্রকরণে সিদ্ধ ও নাট্যশাস্ত্রের অনুচিন্তা-গোষ্ঠী দ্বারা সমৃদ্ধ। পার্থক্য যেটুকু রয়েছে তা হল স্থানীয় প্রভাবজাত পদ্ধতিতে এবং প্রতিভাধর গুণী গুরুদের ব্যক্তিগত শৈলী স্বাতন্ত্র্যে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে-রেখে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ভরতনাট্যম্, কুচিপুড়ি ও ওড়িশীর মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য আছে—ভারতীয় চিরন্তন সাধনা, বহুর মধ্যে একের মতো।

অন্ধ্রপ্রদেশের একটি সরকারী রিপোর্টে দেখছি, তাঁরা লিখেছেন—The purest type of Bharat Natyam as enunciated by Bharatmuni can be seen only in Andhra of all the states of India. Kuchipudi, the seat of pure Bharat Natyam and Dance Drama is now attracting the attention of the whole World"[১] আরেকটি সমসাময়িক পুস্তিকায় দেখেছি, তাঁরা সরাসরি বলছেন, 'Bharat Natyam and Kuchipudi - which are particularly ancient and classical Andhra Art'[২]. উপরের প্রতিবেদন ও নীচের বক্তব্যে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ভরতনাট্যম্ ও কুচিপুড়ি—এই উভয়-নৃত্যকলাতেই অন্ধ্রের প্রাধান্য স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি আরও স্পষ্ট দেখতে পাই রাগিণী দেবীর এখনকার একটি উক্তিতে। ভরতনাট্যম্ ও কুচিপুড়ির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন—'The gurus of Kuchipudi have also preserved the Andhra style of Bharat Natyam, and have composed Jatiswarams, Varnams and Tillanas in the Devadasi tradition'.[৩]

কুচিপুড়ি নাচের চর্চা করতে গিয়ে তাই লক্ষ্য করেছি—এযেন অন্য নামে ভরতনাট্যম্। তবে পার্থক্য যা আছে তা ফলিত চর্চায় ধরা যায়।

তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম্ যেমন সদির নাট্যম্, দেবদাসী, কুরুভঞ্জি প্রভৃতি নৃত্যধারার পথ বেয়ে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে, মালাবার উপকূলের মহীশূরের যক্ষগণ নৃত্যনাট্য এবং অন্ততঃ দশ প্রকার 'কলি' নৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যেমন বর্তমান কেরালায় কথাকলি নৃত্য নব্যতর রূপ লাভ

১। Report of the Survey, conducted by Sangeet Matak Academy. Andhra Prodesh, Hyderabad, 1960 Preface.

২। Souvenir—Nritya Niketan, Hyderabad.

৩। Dance Dialects of India—Ragini Devi (Vikash Publication India Bombay).

করেছে, তেমনি অন্ধ্রের কুচিপুড়ি নৃত্যও প্রাচীন ভাগবত মেলা নৃত্যনাট্যের গতি বেয়েই বর্তমানে এসে পৌঁচেছে। ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ অনুশীলন-এ দেখা গেছে কুচিপুড়ির সঙ্গে ভরতনাট্যম্ ও ওড়িশীর প্রচুর মিল আছে। আবার পার্থক্যও রয়েছে। তবে মনে হয়, ভরতনাট্যম্ অপেক্ষা ওডিশীর সঙ্গেই কুচিপুড়ির সাদৃশ্য বেশি। সম্ভবতঃ পাশাপাশি রাজ্য উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মিলনের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। কুচিপুড়ি নৃত্য তাই ভরতনাট্যম্ ও ওড়িশীর এক অপূর্ব স্বাঙ্গীকরণ। অথবা কথাটাকে অন্যভাবে বলা যায় একই ত্রিভুজের তিনটি বাহু—ভরতনাট্যম্, কুচিপুড়ি ও ওড়িশী। এই তিনটি নাচকে এক করে দেখার মধ্যে নৃত্যতত্ত্বের পিউরিটানরা একটু 'কিন্তু' ধরতে পারেন। তার কারণ ভরতনাট্যম্ ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ে উন্নীত হলেও কুচিপুড়ি ও ওড়িশীকে ক্ল্যাসিক্যাল বলতে এঁদের সংস্কারে এখনো একটু বাধে। যেহেতু কুচিপুড়ি ও ওড়িশী বহুল প্রচারিত নয়, সেজন্যও এঁরা ভরতনাট্যম্-এর সঙ্গে এক করে দেখতে রাজি হন না। অথচ একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই দুটি নাচেও ক্ল্যাসিক্যাল নাচের সবগুলি সম্ভাব্য গুণই উপস্থিত। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নৃত্য সমালোচক ডঃ চার্লস ফেব্রির (Dr. Charles Fabri) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'Kuchipudi in Andhra is a brave variety of Bharat-Natyam, certainly classical and taught by learned Vidwans, similar but not identical with Bharatnatyam !'[১]

ডঃ চার্লস ফেব্রি কুচিপুড়ি নৃত্যকে ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ভুক্ত করলেও প্রসিদ্ধ নৃত্য সমালোচক প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু কুচিপুড়িকে লোক নৃত্যের পর্যায়ে দেখিয়ে বলেছেন 'Kuchipudi or Kuchipura is a village in Kistna (Krishna) District of Andhra which is the birth place of this particular folk dance'.[২] নৃত্য ও নাট্যের আঙ্গিকে 'শিবাজিয়া' নামক এক বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকনৃত্যের সমন্বয়ে এই কুচিপুড়ি নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে, এ কথাও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ডঃ চার্লস ফেব্রি ও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও, মূলতঃ প্রায় ঠিক কথাই

১। Classical and Folk Dances of India—Marg Publication Bombay Page 37.

২। Folk Dance of India—Projesh Banerjee—Kitabistan Allahabad. Page 21.

বলেছেন। কারণ নাচের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—যে কোন ক্ল্যাসিক্যাল নাচের উদ্ভব হয়েছে লোকনৃত্য থেকে! এদিক থেকে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। এবং ডঃ চার্লস্ ফেব্রি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে কুচিপুড়ির পরিশীলিত রূপটি দেখে একে ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। সুতরাং সঙ্গত কারণেই ধরে নেওয়া যায় 'কুচিপুড়ি নাচ' Quasi Folk বা 'ক্ল্যাসিকো ফোক্' পর্যায় অতিক্রম করে ধীরে ধীরে পুরো ক্ল্যাসিক্যালের দিকে যাত্রা করেছে। দীর্ঘদিন ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ অনুশীলন করে আমার তো মনে হয়েছে, 'ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য' এ কথাটি শুধুমাত্র ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী—এই চারটিতেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও অন্ততঃ চারটিতে আছেই—কুচিপুড়ি, ওড়িশী, মোহিনী আটাম্ ও মেলাতুর। কম করে মোট আটটি বলা উচিত। তবে এটুকু বললে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হয় না যে, এই সংখ্যা নিয়ে নানা পার্থক্য বিদ্যমান। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন—

১। হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত 'নৃত্য নিকেতন' পুস্তিকায় 'India and the Art of Dance' নামক প্রবন্ধের লেখক প্রথমেই লিখছেন, 'The classical dance styles obtainning at the present day in India, can be classified into nine kinds and they are as follows :—

(১) Devadasi Dance and Kuchipudi Bhagavatam of Andhra.

(২) Bharat Natyam and Bhagavat Natyam of Tamilnad.

(৩) Kathak, Ramleela and Nautanki dance of Uttar Prodesh, Bombay, Rajputana and Punjab.

(৪) Manipuri of Bengal and Manipur (এখানে বোধ হয় Manipuri of Bengal বলতে মণিপুর নৃত্য সমৃদ্ধ রবীন্দ্র নৃত্য প্রবাহকে বোঝানো হয়েছে।)

(৫) Kathakali and Mohini Attam of Malabar.

(৬) Chow of Seraikella Samsthanam (এখানে কেন যে, ময়ূরভঞ্জ ও পুরুলিয়ার ছৌ নাচ বাদ গেল, বোঝা গেল না।)

(৭) Ankhianata and Ojapali dances of Assam.

(৮) Odissi and Sokhinata dance of Orissa.

(৯) 'Yakshagana and Brajaratanatyam of Kornataka'.

২। ডঃ চার্লস ফেব্রি অন্যভাবে ৯ প্রকার ক্ল্যাসিক্যাল নাচের কথা বলেছেন, যেমন—ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ওড়িশী (এই Odissi শব্দটি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন) মেলাতুর, কৃষ্ণনাট্যম্, মোহিনী আট্যম্ ও কুচিপুড়ি।

৩। এনাক্ষী ভবানী আবার অন্যভাবে ভাগ করে দেখিয়েছেন। তিনি প্রথম পর্যায়ে বলেছেন—ভরতনাট্যম্, কুরুভঞ্জি, কথক, কথাকলি ও কুর্মি। দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ল্যাসিক্যাল নাচ বলেছেন—ওড়িশী, কুচিপুড়ি, মণিপুরী, সেরাইকেল্লার ছৌ-নাচ, (পুরুলিয়া ও ময়ূরভঞ্জের ছৌ-নাচ কেন বাদ গেল তা এখনো অনধিগম্য), মোহিনী আট্যম্, কৃষ্ণ নাট্যম্, ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্য এবং যক্ষগণ।[১]

এখানে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—কেন এই নাচগুলি ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ভুক্ত হল এবং কেন অন্যান্য নাচগুলি এই পর্যায় হল না, তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। এমন কি ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের সংজ্ঞা পর্যন্ত এঁরা নির্ণয় করেন নি। জানি না এই অনীহার কারণ কি?

যেহেতু এই প্রবন্ধের বিষয় তুলনামূলক নৃত্য-বিচার নয়, সুতরাং ঐ বিতর্কিত বিষয়ে কালক্ষেপ না করে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি অন্ধ্রের স্বল্প পরিচিত, অধুনা সুধীমহলে স্বীকৃত, দৃষ্টিনন্দন কুচিপুড়ি নৃত্যের দিকে। শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক আলোচনাটুকু সেরে নিলাম সূচনাতে।

॥ কুচিপুড়ি নৃত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ॥

অন্ধ্রের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। যীশুখ্রীষ্ট-এর জন্মের প্রায় এক হাজার বছর পূর্বেকার লেখা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্রের কথা আছে। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে অন্ধ্রের তদানীন্তন রাজত্বের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে সাতবাহন, ইক্ষাকু, চোল, পল্লব, বিষ্ণুকুন্তিয়া, কাকতীয়, হাম্পি, বিজয়নগর, মাদুরা ও তাঞ্জোরের নায়ক, গজপতি-জগপতি, ভেতল্, রেড্ডি, কম্মা-জমিদার, গোলকুণ্ডার পদ্‌শা, তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্রীয় শাসক প্রভৃতি বংশের নৃপতিরা বিভিন্ন

১। The Dance in India—Enakshi Bhavani--সূচীপত্র দ্রষ্টব্য।

যুগে অন্ধ্রের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। এ ছাড়া মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসকরা তো আছেনই।

তবে বর্তমানে আমরা যে কুচিপুড়ি-নাচ দেখে থাকি তার উদ্ভবকাল ধরা হয় ১৩৩৬ খ্রীঃ থেকে অর্থাৎ বিজয়নগর রাজত্বের সময় থেকে। দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিজয়নগরের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। ঐতিহাসিকরা যথার্থ ই বলেছেন—"Work's on music, dancing, drama, grammar, logic philosophy etc. received encouragement from the emperors and their ministers. In short the Vijoynagar Empire was a synthesis of South Indian Culture.[১]

দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতি চর্চায় অন্ধ্রের যে বিশিষ্ট অবদান আছে তার মূলে তেলেগু ভাষা, যা একদা সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়েই প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন। এই তেলেগু ভাষা প্রসঙ্গে বলা হয় 'The Italian of the East' এবং 'The cultural language of South India'. এই তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করেই সঙ্গীত ও নৃত্যের বিপুলায়তন চর্চা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে ধর্মের প্রভাব। মধ্য যুগে ধর্মকে কেন্দ্র করেই শিল্প-সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। কারণ সে যুগের মানুষ মনে করতো হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। সুতরাং মর্মাশ্রয়ী করে কিছু করতে গেলে তাকে ধর্মাশ্রয়ী হতে হত। এর প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করেছি মন্দির-কেন্দ্রিক দেবদাসী নৃত্যে। তবে বিজয়নগরের রাজারা যে ধর্মের ব্যাপারে বেশ খানিকটা উদার ছিলেন তার পরিচয় ইতিহাসে রয়েছে—"Epigraphic and literary evidence clearly shows that the rulers of Vijoynagar were pious disposition and devoted to Dharma. But they were not fanatics. Their attitude towards the prevailing four sects, Saiva, Baudha. Vaishnava and Jaina, and even alien creeds, Christian, Jewish and Moorish, was liberal".[২]

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে অন্ধ্রের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ভাস্কর্য,

১। An Advanced History of India—Majumder, Roy Chowdhury. Dutta (Macmillan 1965, Page 378).

২। Ibid—Page 379.

স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পকলায় বিভিন্ন যুগে, বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব ও ভক্তিবাদের প্রভাব রয়েছে। এই ধর্মকেন্দ্রিক চারুকলা বিকাশে ও প্রচারে অন্ধ্রের মুখ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি হল—শ্রীশৈলম্, কলাহস্তী, আলমপচ, ডেমুলা-ওয়াড়া, সিংহপুরী, অমরাবতী, দ্রাক্ষারম প্রভৃতি। যাই হোক, দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান ও পতন ইতিহাসের একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সেই আর্য যুগ থেকেই ভারতের ইতিহাসে দক্ষিণ ভারতের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বরাবরই ছিল। আর্য ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তার দক্ষিণে অনেক পরে হয়েছিল। (এই প্রসঙ্গে মুনি অগস্ত্যের সেই অতি পরিচিত অথচ প্রতীক ধর্মী কাহিনীটি স্মরণ করতে পাঠকদের অনুরোধ করি। অর্থাৎ অগস্ত্যের আদেশে তাঁর শিষ্য বিন্ধ্য পর্বত মাথা নত করেন সেই কিংবদন্তীটি। দাক্ষিণাত্যে আর্যীকরণ শুরু হয় এই সময়েই।) এর পর মুসলমান আমলে প্রথম খিলজী সুলতানরা দক্ষিণের দিকে দৃষ্টি দেন, তুঘলকেরা সেই নীতিই অনুসরণ করেন। মহম্মদ তুঘলক দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) রাজধানী পর্যন্ত স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দেবগিরির যাদব-বংশের বিপর্যয়ে এবং দক্ষিণে সুলতানদের অভিযানে আংশিক সাফল্যে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুরা বিচলিত হলেও, হতাশ হন নি। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্য সম্বন্ধে অতি সচেতন বলে তাঁরা ভেতরে ভেতরে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছেন। দক্ষিণ ভারতে শৈব ধর্মের প্রাবল্য ছিল। শৈবদের মধ্যে একাত্মবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ খুব দৃঢ় ছিল। মুসলমানরা যেমন বিধর্মী হিন্দুদের 'কাফের' বলতেন শৈবরা তেমনি বিধর্মী মুসলমানদের বলতেন 'ভাবী'। এক ডাকে শৈবরা একজোট হতে পারতেন এবং ধর্মরক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। এই অবস্থায় দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর প্রসার ও প্রভুত্ব খর্ব করতে সংকল্প করেছেন। এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিরোধ থেকে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান সম্ভব হয়েছে।

এই বিজয়নগর রাজ্যের রাজা বীর নরসিংহ রায়ের রাজত্বের সময় কুচিপুড়ি নাচের প্রভূত উন্নতি হয়। অবশ্য পরবর্তী রাজাদের আমলেও, বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫৩০), অচ্যুত রায় ও সদাশিব রায়-এর সময়েও (১৫৬৫) এই কুচিপুড়ি নাচের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী বিজয়নগরের রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক

ব্যবস্থার ভিত গঠিত হয়েছিল। মধ্যযুগের রাজকীয় ঐশ্বর্যবিলাসে আর কিছু না হোক, শিল্পকলার চর্চা ও উন্নতি হয়েছে। বিজয়নগর রাজধানী এক বিস্ময়ের বস্তু ছিল ঐশ্বর্যবিলাসের জন্য। এই পরিবেশেই কুচিপুড়ি নাচের নতুন 'ফর্ম' দানা বেধে উঠেছে। যদিও কুচিপুড়ি নাচের উদ্ভবস্থান ধরা হয় অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত কিস্তনা (Krishna) জেলায় কুচিপুড়ি বা কুচেলাপুরম্ নামক গ্রামকে। সেখানকার ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত নৃত্যকলাই গত ৫০০ বছর ধরে চর্চার ফলে বর্তমান কুচিপুড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে—একদা যা ছিল স্থানীয় লোকনৃত্যের পর্যায়ে। পরবর্তীকালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায়, নগর-কেন্দ্রিক পরিবেশের মার্জিত উন্নতরূপে তা ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে। এইজন্যই কুচিপুড়ি নাচের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক স্তরগুলি জানা দরকার।

কুচিপুড়ি নাচ যে একদা গ্রামের আঙ্গিনা ছেড়ে মন্দিরের দেবদাসী নৃত্যে পরিণত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজলে পাওয়া যাবে। বিজয়নগরের রাজারা প্রাসাদ, অট্টালিকা, দুর্গ, সেচনালা, জলাশয়, দেবদেউল নির্মাণে অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন। দেবালয় স্থাপত্যের মধ্যে বিজয়নগরের ঐতিহাসিক সত্তার বলিষ্ঠতম প্রকাশ হয়েছে বলা যায়। নতুন দেবালয়ে 'কল্যাণ মণ্ডপ' 'হাজার স্তম্ভ মণ্ডপ' ইত্যাদি অঙ্গ-সংযোজিত হয়েছিল। এমন কি পুরোনো দেবালয়ও সংস্কার করা হয়েছিল। শত শত হাজার হাজার স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ একটা বড় বৈশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্তম্ভের গায়ে মানুষ ও পশুর মূর্তি খোদাই করা হত। দেবালয়ের মধ্যে বিথল বা বিষ্ণু মন্দির, হাজার রামের মন্দির, কাঞ্চিপুরমের একাগ্রনাথের ও বরদারাজের মন্দির ইত্যাদি বিখ্যাত। বিজয়নগরের শেষ পর্বে মাদুরার শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মাদুরার বিখ্যাত সুন্দরেশ্বর মীনাক্ষী মন্দির অন্যতম নিদর্শন। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের মন্দির (দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর মন্দির) এই পর্বের কীর্তি। এই মন্দিরগুলিতে অপূর্ব কারুকার্য সুশোভিত নৃত্যভাস্কর্য প্রমাণ করে সে যুগের নৃত্যের প্রভাবের কথা। উড়িষ্যার মতো অন্ধ্রের মন্দিরেও দেবদেউলের সঙ্গে নাটমন্দির সংলগ্ন দেখা যায়। এই নাট-মন্দিরগুলিতেই দেবদাসীরা নাচতেন। এই প্রসঙ্গে বলি, আমি ১৯৭২ সালে বিশাখাপত্তনমের সীম্হাচলম্ (পাহাড়ের উপরে) মন্দিরের সংলগ্ন তেমন নাটমন্দির প্রত্যক্ষ করে এসেছি। বিজয়নগরের যুগে এমন অজস্র দেবমন্দিরের নাটমন্দিরে

নিশ্চয়ই দেবদাসী নৃত্যের প্রভূত প্রচলন ছিল। এবং এভাবেই কুচিপুড়ি গ্রামীন নৃত্য, ধীরে ধীরে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় আচরণের মধ্য দিয়ে, মন্দিরের দেবদাসী নৃত্যে পরিণত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ঐ নৃত্যধারাই মন্দির ছেড়ে আবার মঞ্চে চলে এসেছে। ঐ ভাবেই আমরা বর্তমানে কুচিপুড়ি নাচকে পেয়েছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই নাটমন্দির ব্যাপারটা উড়িষ্যা, অন্ধ্র এবং দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। নৃত্যের ইতিহাসে এই নাটমন্দিরগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উড়িষ্যায় দেখেছি, পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনার্কে প্রায় এক স্থাপত্য ধরনে মন্দিরগুলি চারভাগে বিভক্ত—দেবদেউল (দেবতা যেখানে থাকেন), জগমোহন (দর্শকদের গ্যালারী), নাটমন্দির (যেখানে নাচ-গান হত), ভোগ মণ্ডপ (ঠাকুরের ভোগ করানো হয় যেখানে)। স্থতরাং মূল মন্দিরের সঙ্গে একটি নাটমন্দির যেন অপরিহার্য ছিল। তবে কোনার্কে উক্ত চারটে ভাগ নেই। আছে ছুটি ভাগ—দেবদেউল ও নাটমন্দির। জগমোহন ও ভোগমণ্ডপ অনুপস্থিত। এই না থাকার মূল কারণ বলার অবকাশ এখানে নেই। কারণ তার কাহিনী বিস্তৃত ও বহুধা বিভক্ত।

।। কুচিপুড়ি নৃত্যের প্রথম উদ্ভবকাল ।।

অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলি থেকে জানা যায়—কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ সমগ্র দ্রাবিড় অঞ্চল এবং কর্ণাটক প্রদেশে এক বিশেষ ধরনের শিল্পী সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের নাম ছিল 'নত্তুভ মেলা' (Nattuva Melas)। এই সম্প্রদায়ের নাকি মহিলা শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতেন। সে যুগে এটা ভাবা যায় না। তা হলেও এঁদের শিল্পকলা ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। তার কারণ অতি স্পষ্ট। সুন্দরী মহিলাদের সাহচর্যে এসে অনেক প্রতিভাধর নটের পদস্খলন হয়। এ ভাবেই নানা কারণে এদের শিল্পকলা বিঘ্নিত হয়। অচিরেই এই প্রাচীন শিল্পকলার পবিত্র ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল রক্ষণশীল শিল্পীদের মধ্যে। তারই ফলশ্রুতি 'ব্রাহ্মণ মেলা' নামে এক শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এঁরা অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলেন তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো মহিলা শিল্পীদের স্থান থাকবে না। এই পর্বে পুরুষরাই নারীচরিত্রে অভিনয় করতে

সুরু করেন। সুতরাং তখন থেকে এঁদের প্রধান কাজ হল এই শিল্পকলার পবিত্র সৌন্দর্য রক্ষা করা। সৃষ্টি হল 'কুচিপুড়ি ভাগবত মেলার'। এ ভাবেই নত্তুভ মেলা, ব্রাহ্মমেলা ও কুচিপুড়ি ভাগবত মেলা হল। এই ভাগবত মেলারও একটি ধর্মীয় পটভূমি রয়েছে। নৃত্য ও নাট্যের আঙ্গিকে 'শিবালিয়া' নামক একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকনৃত্যের সমন্বয়ে এই কুচিপুডির উদ্ভব হয়েছে। এই শিবালিয়া নৃত্যের কথা সূচনাতে উল্লেখ করেছি। শিবালিয়া হল শিবের নানা আচার অনুষ্ঠান (Rituals)। প্রথমদিকে এই নৃত্য ছিল শৈব-প্রধান। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্যে ভাগবতপুরাণের কাহিনী বিন্যাসে এই নৃত্যকলার চর্চা যাঁরা করতেন তাঁদের বলা হত 'ভাগবতুলু' (Bhagabatulu) এই ভাগবতুলুরাই কুচিপুড়ি ভাগবত মেলার প্রধান শিল্পী।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থটি, ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে—বিশেষ করে মণিপুরী, ওড়িশী ও কুচিপুড়ি নাচে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে।

কুচিপুড়ি ভাগবত মেলার সদস্যগণ সকলেই প্রায় সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাদের সংস্কৃতচর্চায় ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' (ভারতীয় নৃত্য জগতের প্রামাণ্য দলিল) নন্দিকেশ্বর-এর 'অভিনয় দর্পণ' ও 'অলংকার শাস্ত্র' প্রাধান্য পেয়েছিল।

১৫০২ খ্রীঃ লেখা 'মছুপল্লী কৈফিয়ৎ' নামে এক গ্রন্থে দেখা যায়, এই ভাগবতুলুরা ঐ সময় বিজয়নগর রাজ্যে গমন করেন। ১৪৮৬ সালের পর বীর নরসিংহ রায় ঐ ভাগবতুলুদের কয়েকজনকে নৃত্যকলা প্রদর্শনের জন্য বিজয়নগর নিয়ে আসেন। ঐ নৃত্যশিল্পীরা সিদ্ধবতমের রাজা সমেত গুরুভরাজুর অত্যাচারের কাহিনী নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। রাজা সপরিবারে ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ অত্যাচারের কাহিনী দেখে বিচলিত হন, এবং অচিরেই তা বন্ধ করতে আদেশ দেন। (এখানে স্মরণীয়—এ যেন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ ইংলণ্ডে পৌছোবার পর সেখানকার পার্লিয়ামেণ্ট প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অনেকটা সেই রকমই।) এই ভ্রাম্যমান নৃত্যসম্প্রদায় শিবলীলা নাট্যম্ অনুষ্ঠান করতেন।

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পীদের বেশির ভাগ তাঞ্জোরে

চলে আসেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন 'নায়ক' রাজারা। রাজা অচ্যুতনাপ্পা নায়ক (১৫৬১-১৬১৪ খ্রীঃ) ঐ সম্প্রদায়ের কয়েক শত ব্রাহ্মণ পরিবারকে 'অগ্রহারম্' অনুদান (অনেকটা নিষ্কর জমি দান) দিয়ে তাঁদের নৃত্যশিল্পের চর্চায় ও সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেন। এই অগ্রহারম্ বা ভূমিদানের ফলে যে জায়গাটির উদ্ভব হল, তার নাম দেওয়া হল 'অচ্যুৎপুরম্'। এই অচ্যুতপুরম্ই বর্তমান 'মেলাতুর'। এই মেলাতুর স্থানটি তাঞ্জোর থেকে ১০ মাইলের মধ্যে। তেলেগু ভাষায় লেখা 'যক্ষগণ' নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে মেলাতুর ও তার সংলগ্ন গ্রামগুলি একদা মুখরিত হয়ে উঠতো। এতে অংশ গ্রহণ করতেন ব্রাহ্মণমেলা নামক সম্প্রদায়। আজও দেখা যায়, মেলাতুরের ভাগবত মেলা উৎসবে অনুষ্ঠিত তেলেগু ভাষায় লেখা কবি ভেঙ্কটরামনের রচনা অভিনীত হয়। ইনি বিখ্যাত সঙ্গীতসাধক ত্যাগরাজের সমসাময়িক। এ ভাবেই দেখা যায় কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্য ও মেলাতুর নৃত্যের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে—যেমন প্রবেশ দারুভু যা মঞ্চে শিল্পীদের পরিচিতি দেয়। এ ছাড়া 'রক্তিরাগ' অনুষ্ঠান—মন্দিরের সন্নিহিত মুক্ত'ঙ্গন মঞ্চে মুখে মুখে ছড়া বেঁধে অভিনয়, এতে থাকে দুটি বড় মশাল, বাজনার মধ্যে থাকে মৃদঙ্গম্ এবং অন্যান্য নেপথ্য যন্ত্র-সঙ্গীত।

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর যাঁরা তাঞ্জোরে চলে গেলেন, তাঁদের বলা হত তাঞ্জোর-গোষ্ঠী, আর যাঁরা আন্ধ্রে রয়ে গেলেন তাঁদের বলা হত অন্ধ্র-গোষ্ঠী। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অন্ধ্রের কুচিপুড়ি নাচ তাঞ্জোরের কাছাকাছি মেলাতুরে গিয়ে তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম্‌কে প্রভাবিত করেছে একথা যেমন গ্রহণযোগ্য, তেমনি তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম্ নাচও কুচিপুড়ি নাচকে আধুনিক ফর্মে আনতে প্রভাবিত করে সাহায্য করেছে, এ কথাও যুক্তিগ্রাহ্য। কারণ মেলাতুরের নৃত্যনাট্যের সঙ্গে অন্ধ্রের কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তুর মিল অনেক (তালিকাটি দেখলেই বোঝা যাবে)। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভরতনাট্যমের সঙ্গে কুচিপুড়ি-ও মেলাতুরের নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান।

আধুনিককালে কুচিপুড়ি শিল্পীরা এবং মেলাতুর শিল্পীরা যে সকল নৃত্যনাট্য সাধারণতঃ অভিনয় করে থাকেন সেগুলি হল—

কুচিপুড়ি

১। ভামকলাপম্
২। গোল্লাকলাপম্
৩। প্রহ্লাদ চরিতম্
৪। ঊষা পরিণয়ম্
৫। শশিরেখা পরিণয়ম্
৬। মোহিনী রুক্মাংগদা
৭। হরিশ্চন্দ্র
৮। গায়োপাখ্যানাম্
৯। রাম নাটকম্
১০। রুক্মিণী কল্যাণম্

মেলাতুর

১। প্রহ্লাদ চরিতম্
২। ঊষা পরিণয়ম্
৩। রুক্মাংগদা
৪। হরিশ্চন্দ্র
৫। মার্কণ্ডেয় (পুরাণ ?)
৬। সীতা কল্যাণম্
৭। রুক্মিণী কল্যাণম্
৮। ধ্রুব চরিতম্
৯। কংসবধম
১০। ভস্মাসুরবধম্
১১। শিবরাত্রি বৈভবম
১২। গোল্লা ভাম

।। কুচিপুড়ি নৃত্যের পরবর্তী অধ্যায় ।।

কুচিপুড়ি নৃত্যের পরবর্তী ক্রমবিকাশের রূপ দেখা যায়—'মুভ্যাগোপাল' পদের প্রচলন থেকে। এটা অভিসারের আঙ্গিকে লাস্য ধরনের নৃত্য পদ্ধতি। এই পদগুলি নায়ক-নায়িকা ভাবে অভিনীত হয় এবং তার প্রকাশে খানিকটা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও থাকে। এই পদগুলির রচয়িতা হলেন, ক্ষেত্রয়্য (ভক্ত ক্ষেত্রয়্য)। ইনি কুচিপুডি গ্রামের কাছেই 'মুভ্য' নামে একটি গ্রামে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পের চর্চা করে অভিনন্দিত হন। 'মুভ্য' শব্দ ঘুঙুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পরে তিনি তাঞ্জোরের বিজয় রাঘব নায়কের পৃষ্ঠপোষকতায় নৃত্যের চর্চা করে আরও বড় হন। অচিরেই ক্ষেত্রয়্যের ঐ পদগুলি অভিনয় গুণে রসাভিনয় তথা সাত্ত্বিকাভিনয়ের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পীরা তাই ক্ষেত্রয়্যের পদগুলির অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেদের নৃত্য বিশেষজ্ঞ করে তোলেন। এই ক্ষেত্রয়্যের পদগুলি বেশি প্রভাবিত করেছে মেলাতুরের নৃত্য ঘরোয়ানাকে।

এই কুচিপুড়ি নাচের দুটি ঘরোয়ানা তৈরি হয়েছিল। বিজয়নগরের পতনের পর যাঁরা তাঞ্জোর তথা মেলাতুরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের এক ঘরোয়ানা। আর যাঁরা অন্ধ্রে রয়ে গেলেন, তাঁদের আরেক ঘরোয়ানা। (তালিকাটি দেখলেই বোঝা যাবে)।

কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্য সম্প্রদায়

যাঁরা তাঞ্জোর বা মেলাতুরে চলে গেলেন। তাঞ্জোরগোষ্ঠী।	যাঁরা অন্ধ্রে রয়ে গেলেন। অন্ধ্রগোষ্ঠী।
১। ভক্ত ক্ষেত্রয়্য (মুভ্যগোপাল পদের স্রষ্টা)	১। ভক্ত সিদ্ধেন্দ্র যোগী।
২। তীর্থ নারায়ণ যাতি। (কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী ও যক্ষগণের স্রষ্টা)	(বিখ্যাত ভামকলাপম্ ও পারিজাত হরনমের স্রষ্টা। বর্তমানে আমরা যে কুচিপুড়ি নাচ দেখছি, তা সিদ্ধেন্দ্র যোগীরই অবদান)

ভক্ত ক্ষেত্রয়্যের প্রবর্তিত 'রসাভিনয়' এতটা কার্যকরী হয়েছিল যে, তদানীন্তন ব্রাহ্মণ ভাগবতুলু এবং রাজনর্তকীরা তা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

এই ভক্ত ক্ষেত্রয়্যের পর আরেকজন গুণীকে পাই, তিনি ভক্ত তীর্থনারায়ণ যাতি (১৬২০-১৭০০)। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী' রচিত হয় ১৬৮০-১৬৯০ মধ্যে। এই 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী' সুর সহযোগে গাওয়া হত। এই বইয়ের শব্দ বা শোল্লোকত্তু (Sollokattu) অনেকটা আমাদের বৈষ্ণব কাব্যের ভণিতার মতো। এতে নাট্য অর্থে যাতির উল্লেখ দেখা যায়। এতেই তার সঙ্গীতে যে নৃত্যের স্থান ছিল তা অনুমান করা যায়। এই তরঙ্গ অভিনয়ের মধ্য দিয়েই কুচিপুড়ি নৃত্যের উৎকর্ষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পীরা অষ্টপদীর উপরও নৃত্য প্রযোজনা করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত এবং প্রচলিত 'গোল্লাকলাপম্' নামে একটি চমৎকার দার্শনিক কথোপকথন-মুলক কাহিনী কুচিপুড়ি নাচে অভিনীত হতে দেখা গেছে। এই কথোপকথন হতো একদল ব্রাহ্মণ ও একজন গোয়ালিনীর মধ্যে।

ভক্ত তীর্থনারায়ণ যাতি 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী' রচনা করেন সংস্কৃতে। এতে 'যক্ষগণ' নামে একপ্রকার সঙ্গীতের রাগ ও লয় বিন্যাসের সঙ্গে নৃত্য সংযোজিত হয়েছিল। এই 'যক্ষগণ' গান, পরে যক্ষগন নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। এর বিরাট ইতিহাস আছে। একদা সোমনাথ নামে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি 'বহু নাটক' নামে দশ প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে 'শিবলীলা' লেখেন এবং পরে এই

শিবলীলাই যক্ষগণ-এ রূপান্তরিত হয়। এই যক্ষগণ গান ও নৃত্যনাট্য ভারতের বহু জায়গায় আজও অভিনীত হয়। এখন এই ধারাটিও অবক্ষয়িত হয়ে এসেছে। এই যক্ষগণই ভিন্ন ভিন্ন নামে আজও বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন—মহারাষ্ট্রে এর নাম 'ললিতা', গুজরাটে 'ভাবাই', বাংলায় 'যাত্রা', নেপালে 'গন্ধর্ব গান', অন্ধ্র, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে 'যক্ষগণ'। (বাংলায় যাত্রার সঙ্গে যক্ষগণের কি সাদৃশ্য আছে তা 'বিবেক' চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। যক্ষগণ-বিবেককে বলা হয় "আত্মা বিবেক" (Inner-self)।

ঐ 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী' অভিনয়ের সময় শিল্পীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গির সঙ্গে মুখের ভাবাভিব্যক্তিতে এক রস সঞ্চার হত যা নিতান্তই চরিত্রানুগ। বিখ্যাত কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্য 'রুক্‌মাংগদা'তে প্রাচীন ভাগবত মেলা নাটকের প্রথানুযায়ী সঙ্গীত ও নৃত্য প্রযোজনা করে অভিনয় চলার এক নতুন দিক উন্মোচন করেন তীর্থনারায়ণ যাতি। যদিও তিনি তাঞ্জোর-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তা হলেও অন্ধ্রের কুচিপুড়ির পরোক্ষ প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। পরবর্তীকালে তাঁর অনেক শিষ্যের মধ্যে তা সংক্রামিত হয়েছে। তীর্থনারায়ণ যাতি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মেলাতুরে কিছুদিন অবস্থান করেন।

ভক্ত ক্ষেত্রয় ও তীর্থনারায়ণ যাতির পরে কুচিপুড়ি নৃত্যকে যিনি নানাভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন, তিনি হলেন সিদ্ধেন্দ্র যোগী। কুচিপুড়ি নাচের ইতিহাসে এই সিদ্ধেন্দ্র যোগীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বর্তমানে আমরা যে কুচিপুড়ি নাচ দেখি তার মূল রূপান্তরে সিদ্ধেন্দ্র যোগীর অবদান অনেকখানি। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিককার লোক। কুচিপুড়ি নৃত্যশৈলী বা পদ্ধতিতে কিছু নতুন ভাবনা-চিন্তা সংযোজিত হয় সিদ্ধেন্দ্র যোগীর প্রচেষ্টায়। তাঁর সময়ে বিভিন্ন শিল্পীদের প্রচেষ্টায় কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, বীর ও অন্যান্য রস সমৃদ্ধ অভিনয়ের প্রচলন থাকলেও শিল্পীর দিক থেকে মুন্সিয়ানার পরিচয় হত যিনি একই রসকে কেন্দ্র করে সমগ্র পদাভিনয় করে যেতে পারতেন। বিশেষ করে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসকে কেন্দ্র করে। এ ভাবেই তখন ভাবাভিনয়ের চরম উন্নতি হয়েছিল এবং এ থেকেই নৃত্যনাট্যে একক অভিনয়ের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।

সিদ্ধেন্দ্র যোগী রচিত নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল 'ভামকলাপম্' ও 'পারিজাতম্'। বহুল প্রচারিত কাহিনী—শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার

পারিজাত বৃক্ষের রোপণ বিষয়কে কেন্দ্র করে এই নৃত্যনাট্য ছুটির উদ্ভব। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রাবল্য রয়েছে।

বিজয়নগরের পতনের পরেও কিন্তু সিদ্ধেন্দ্র যোগী দেশ ছেড়ে যান নি। বরং কুচিপুড়ি গ্রামের ব্রাহ্মণ বালকদের এই 'পারিজাতম্' অভিনয়ে দীক্ষিত করেন। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষদের ধর্মসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন অন্ততঃ জীবনে একবার যেন তাঁরা সত্যভামার (স্ত্রী চরিত্রে) চরিত্র অভিনয় করেন। (কারণ তখন কুচিপুড়ি নাচে নারীদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল । সিদ্ধেন্দ্র যোগীর প্রচেষ্টায় শিল্পীদের উৎসাহিত করবার জন্য গোলকুণ্ডার নবাব আবুল হাসান কুতুব শাহ (১৬৭২-১৬৮৭) তাম্রশাসনে লিখে ব্রাহ্মণ পরিবারের কুচিপুড়ি গ্রামকে 'অগ্রহারম্' হিসেবে অনুদান করেছিলেন। ব্রাহ্মণরাও তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন এবং বংশ পরম্পরায় এই নৃত্যের মহান ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখে এসেছেন। 'ভামকলাপম্'-এর মধ্য দিয়েই কুচিপুড়ি নাচের চরম বিকাশ হয়েছিল।

কেন যে যাতি ও যোগীরা নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে জানা যায়—এঁরা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন এবং হিন্দুধর্মের পুনর্ণবীকরণ-এ ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নৃত্যনাট্যকে গ্রহণ করেছিলেন, যেমন একদা মীরা, চৈতন্য, তুকারাম, কবীর, তুলসীদাস, রামদাস প্রভৃতিরা গানের মাধ্যমে জনগণের মনে ভক্তিভাব সঞ্চারিত করেছিলেন। সে যুগের চারণকবিরাও গানের সঙ্গে নৃত্যের উপাদান গ্রহণ করেছিলেন ভক্তিভাবের প্রচারমাধ্যম হিসেবে। আসামের শঙ্করদেব একদা কিছু নৃত্যনাট্য রচনা করে দক্ষিণ ভারতে যান এবং প্রচার করেন যে, যদি কেউ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নৃত্যনাট্য রচনা না করেন, তবে তাঁর মুক্তি হবে না এবং ধর্মীয় নেতাও হতে পারবেন না। অনেকে অনুমান করেন, সম্ভবতঃ উক্ত কথায় প্রভাবিত হয়ে তীর্থনারায়ণ যাতি ও সিদ্ধেন্দ্র যোগী পারিজাত বিষয়ক নৃত্যনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

কুচিপুড়ি নাচের শিল্পীদের সঠিক বংশলতিকা জানা যায় না। তবে গত ১২০ বছরে যে কয়জন শিল্পী কুচিপুড়ি নাচকে সমৃদ্ধ করেছেন তারা হলেন, পশুমূর্তি সীতাইয়া, চিন্তাভেঙ্কটরতনম্, ভেঙ্কটরামাইয়া, চিন্তা কৃষ্ণমূর্তি, চিন্তা নারায়ণমূর্তি, ভেম্পাতি ভেঙ্কটনারায়ণ, বেদান্ত লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী,

পেন্দিভোটালা দশরথ রামাইয়া (১৮৫০ খ্রীঃ), ভেম্পাতি সত্যম্, বেদান্ত রামাইয়া, পশুমূর্তি কৃষ্ণমূর্তি, তাণ্ডব কৃষ্ণ, মিস্ এম্. কাঞ্চনমালা, নটরাজ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে তাণ্ডবকৃষ্ণ, কাঞ্চনমালা ও রামকৃষ্ণ গ্রাজুয়েট। নটরাজ রামকৃষ্ণ বর্তমানে হায়দ্রাবাদের 'নৃত্যনিকেতন' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ভারতীয় নৃত্যবিষয়ে গবেষণারত। অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গীত নাটক একাডেমীর ১৯৬০ সালের প্রতিবেদনে দেখছি "776 Dramatic Associations, 113 Music Institutions and 61 Dance Institutions are functioning actively in the whole of Andhra Prodesh and more than 1600 artists are participating in their performances." বর্তমানে নিশ্চয়ই এই সংখ্যা বেড়েছে।

কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যের মধ্যে বর্তমানে যেগুলি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচারিত সেগুলি হলো—

১। ভামকলাপম্—সিদ্ধেন্দ্র যোগীর রচনা। তবে ঐ নামে অনেক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে যা সিদ্ধেন্দ্র যোগীর মূল রচনা থেকে অনেকখানি পরিবর্তিত।

২। গোল্লাকলাপম্—ভাগবতুলু রামাইয়া রচিত। প্রায় ৮০।৯০ বছর আগের রচনা। রামাইয়া ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। মূল পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে। এই বইয়ের পুরানো নাম ছিল 'ধরা গোল্লা বেশম্'। প্রতি যান্নর কাণ্ডাগি নামে একটি হাস্যরসাত্মক চরিত্র আছে।

৩। প্রহ্লাদ চরিত্রম্—তীর্থনারায়ণ আচারুলু রচিত। ইনি প্রায় একশো বছর আগে জীবিত ছিলেন। ষাট বছর আগে বইটি মুদ্রিত হয়।

৪। শশিরেখা পরিণয়ম্—লেখক বল্লভসেনী চৌধুরী। ইনি গোলিভে-পল্লী নামক স্থানের অধিবাসী। বইটি চল্লিশ বছর আগে লেখা ও ছাপানো হয়।

৫। মোহিনী রুক্মাংগদা—লেখক বেটা ভগবন্ত রাও। এই বইটি আধুনিক কালে রচিত ও মুদ্রিত। এতে অনেক গান আছে।

৬। উষা পরিণয়ম্—লেখক চিদাম্বরম্ কৈর। বইটি মুদ্রিত।

৭। হরিশ্চন্দ্র নাটকম্—বইটি খুবই প্রাচীন। লেখকের নাম জানা যায় নি।

৮। গয়োপাখ্যানম্—উক্ত বল্লভসেনী রচিত।

৯। রাম নাটকম্ (উত্তর রামচরিতম্)—খুবই প্রাচীন রচনা।

১০। রুক্মিণী কল্যাণম্—খুবই প্রাচীন রচনা।

এ ছাড়া কুরুভঞ্জি (প্রাচীন নৃত্যনাট্য), দাদিনাম্মা (চোল রাজকন্যাদের কাহিনী), বেলিগুবেসম্ (একটি তরুণীর কাহিনী) প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

কুচিপুড়ি নাচের ভামকলাপম্, গোল্লাকলাপম্ ও দশাবতার নৃত্য প্রধান। এ ছাড়া পদ্ধতিগত দিক থেকে তরঙ্গ নৃত্য, পদাভিনয়, শব্দ, মুক্তয়ি, তিরমনম্, যক্কিনী, দারুভু, শব্দ পল্লবী, মণ্ডূক শব্দ, কাগুর্দম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (এখানে উল্লেখ্য যে, দশাবতার নৃত্য ও পল্লবী, ওড়িশী নাচে লক্ষ্য করা গেছে)।

তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম্ নামে যা প্রচলিত এবং যাতে আছে আলারিপু, যতিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্, পদম্, তিলানা প্রভৃতি, তার উৎপত্তি খুব বেশি দিন আগেকার নয়—দেড়শো বছরের বেশী প্রাচীন নয়। এই ধারা দেবদাসীদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে এসেছে এবং এটা একক নৃত্যপদ্ধতিতে (Solo) পরিণত হয়েছে—মন্দিরে বা রাজদরবারে অথবা শাসকদের সমাজে। গত ১০০ বছর আগেও ভরতনাট্যমের রাগ আলাপন এবং পদাবলী সঙ্গীত প্রভাবিত হত কাচেরী সঙ্গীতের দ্বারা, সেক্ষেত্রে কুচিপুডি স্টাইলে এসে মিশেছে প্রাক্ ত্যাগ-রাজের সঙ্গীত সুষমা এবং নৃত্য, নৃত্ত, শব্দ, মুক্তয়ি এবং তিরমনম্-এর আঙ্গিক পদ্ধতিগুলি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ভাগবত কথা বা বাণীর একটা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

বর্তমান মহীশূরের প্রচলিত প্রাচীন নাচ 'যক্ষগণ' অনেক সময় অনুষ্ঠিত হত দরবারের রাজনর্তকীদের দ্বারা। মন্দির-কেন্দ্রিক নৃত্যধারা যা দেবদাসীরা চর্চা করে এসেছেন তার সঙ্গে রাজনর্তকীদের নৃত্যশৈলীর কিছু মৌল পার্থক্য ছিল। মজার ব্যাপার হল—প্রয়োজন হলে দেবদাসীরা রাজদরবারে নাচতে যেতে পারতেন, কিন্তু যিনি রাজনর্তকী বলে চিহ্নিত হতেন তাঁর পক্ষে মন্দিরে গিয়ে নাচে অংশগ্রহণ করা তখনকার সমাজব্যবস্থায় সম্ভব ছিল না।

কল্যাণ মণ্ডপে 'যক্ষগণ' অনুষ্ঠিত হত। তখনকার দিনে সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল মন্দিরগুলি। মন্দিরে দেবদাসীরা নাচতেন, আর কল্যাণ মণ্ডপে হত যক্ষগণের অনুষ্ঠান। এতে স্বভাবতই দেবদাসী নৃত্যপদ্ধতি ও যক্ষগণ নৃত্য পদ্ধতির মধ্যে একটি মিশ্র পদ্ধতি দেখা দিল। পারস্পরিক বোঝা-পড়াতে যক্ষগণ নৃত্যে খানিকটা নতুনত্ব এল। ইতিমধ্যে ভ্রাম্যমান কুচিপুড়ি—

ব্রাহ্মণমেলা নৃত্যধারা এসে মিশলো দেবদাসী ও রাজনর্তকীদের সঙ্গে, বিভিন্ন মন্দির ও সংস্থানমে।

দেবদাসীদের মধ্যে যাঁরা বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাঁরা কুচিপুড়ি 'পারিজাত হরণম্' নৃত্যনাট্য শিখতে লাগলেন কুচিপুড়ি শিল্পীদের কাছে। ধীরে ধীরে তা মন্দিরের বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করলো। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, দেবদাসীরা যে দারুভু, আঙ্গিকাভিনয়, নৃত্য, শব্দ, তিরমন্ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করতেন তা কুচিপুড়ি থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিল।

যাই হোক, 'ভামকলাপম্' তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলে এত জনপ্রিয় ছিল যে, বিভিন্ন জেলার ভরতাচার্যগণ অনেকগুলি 'কলাপম্' রচনা করেছিলেন। তবে তা কুচিপুড়ি 'কলাপম্' থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিল। তাইতো দেখি বিশাখাপত্তনম্ অঞ্চলের 'কলাপম্' কুচিপুড়ি 'কলাপম্' থেকে আলাদা। ভামকলাপম্-এ কমপক্ষে ৮০ প্রকার দারু, জটিল নৃত্ত যাকে (তিরমনম্ বলা হয়) ও সুন্দর পায়ের কাজ হত নানা তালে। আমাদের যাত্রাদলের বিবেকের মতো ভামকলাপমের দলনেতার একটি বিশেষ চরিত্র আছে, তাঁকে বলা হয় 'আলমা বিবেক'। (The Leader of the party personifies 'Alma Viveka' —The Wisdom of the inner self.)

'গোল্লাপকলাপম্' ছিল ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা—আমোদ অপেক্ষা শিক্ষণীয় বিষয় থাকতো বেশি। আদি জটিল ৭২ মাত্রার 'বিনায়ক তাল' ও ১০৮ মাত্রার 'সিংহনাদ তাল' নাকি পুরোনো দিনের কুচিপুড়ি শিল্পীরা ব্যবহার করে নাচতেন। আদি বা ত্রিপুট তালে এখনকার কুচিপুড়ি শিল্পীরা নাচেন বলে শুনেছি। কুচিপুড়ি একক নৃত্যে ব্যবহৃত, সংস্কৃত ও তেলেগু মিশ্রিত অজস্র পদ পাওয়া যায়। তার মধ্যে তাণ্ডবাঙ্গের একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি—

'ওঙ্কার ওয়াচ্চম্—৩ বার
উরাগা পুং গাওয়া ভূষিতাম্ গম্
বিয়াব্রাজিনাম্ ভয়োধরম্
জেটিলম্ ত্রিনেত্রম্ পাশাংকুশোধরম্
অভয়াভয়াপ্রদম্ শুলপাণিম্
কৈলাশ ভূধর প্রতিম্
প্রণতস্মি নিচ্ছন্, প্রণতস্মি নিচ্ছন্, প্রণতস্মি নিচ্ছন্' (৩ বার)

কুচিপুড়ি ভ্রাম্যমাণ নাচের মতোই আরেকটি জনপ্রিয় শিল্পীগোষ্ঠীও আছেন—তাঁরা হলেন পুতুল নাচিয়ে দল—অন্ধ্রের **Leather Puppet play** বা চামড়ার পুতুল নাচ অনেকটা জাভাবলির **'Shadow play'** বা ছায়া নৃত্যের মতো। মনে হয় জাভাবলির ঐ নৃত্যে অন্ধ্রের চামড়ার পুতুলের নাচের প্রভাব রয়েছে। পুতুলগুলি দেখতে ঠিক জাভাবলির পুতুলের মতো। অলংকারণেও মিল যথেষ্ট। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে অবিকল একই জিনিস।

॥ ওড়িশী নৃত্য প্রসঙ্গ ॥

॥ পাণ্ডুলিপিতে ওড়িশী নৃত্যের উপাদান ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে যে দুইটি গ্রন্থকে (চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) ধরা হয়, সেই বই দুইটিও গবেষকরা অনেক অন্বেষণের পর আবিষ্কার করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র বা পাঠক মাত্রই জানেন কিভাবে নেপালের রাজদরবারের লাইব্রেরীতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "চর্যাপদ" আবিষ্কার করে এনে আমাদের উপহার দেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এক ঢেঁকিঘর থেকে "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন।

এভাবেই নানা খোঁজাখুঁজির পর ওড়িশী নৃত্যের পাণ্ডুলিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায় সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ে তালপাতার হাতে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে। সংগ্রহ করেন প্রাদেশিক মিউজিয়াম, জগন্নাথ গবেষণা সমিতি। এই পাণ্ডুলিপি রঘুনন্দন লাইব্রেরী (পুরী) এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, প্রায় দশ বছর পরিশ্রম করে সংগ্রহ করেছেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির কয়েকটির সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

(১) অভিনয় দর্পণ ঃ

এই বইটি ১৭শ শতাব্দীতে রাজা যদুনাথ সিংহ প্রণয়ন করেন। এই একই নামে তিনটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটিতে উড়িষ্যার তদানীন্তন কালের নৃত্যের দুটি ছবি আঁকা রয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি সংস্কৃতে লেখা। এতে ওড়িশী নৃত্যের নিম্নলিখিত উপাদান আছে।

১। শিষ্টাচার (Invocatory dance).

২। নৃত্যের ১০ রকমের চিহ্ন।

৩। নৃত্যের উপাদান।

৪। সাত রকমের নৃত্য।

৫। ২৮ প্রকারের হস্তমুদ্রা।

৬। নাট্যের বিশেষত্ব।

৭। তালের বৈশিষ্ট্য।

৮। ১০ প্রকারের তাল।

এ ছাড়া নৃত্যের 'বিনিয়োগ বিধি' (application of technical form) বিস্তারিতভাবে আলোচনা আছে। এই বইটির সব কিছুর উপাদানই ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ও 'নন্দিকেশ্বরের' অভিনয় দর্পণ এর অনুসারি বা অনুগামী।

(২) **নৃত্য কৌমুদী ঃ**

উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাপ্ত উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি অভিনয় দর্পণেরই অনুগামী। নৃত্য বিষয়ে এই বইটিতে নিম্নরূপ উপাদান পাওয়া যায়।

১। নৃত্য প্রশংসা (Praise of dancing).

২। লাস্য ও তাণ্ডব নৃত্য।

৩। বাদ্য প্রশংসা (Praise of musical instruments).

৪। হস্তক বিচার (Gesture of the hands).

(৩) **নাট্য মনোরমা ঃ**

এই পাণ্ডুলিপিটির রচয়িতা রঘুনাথ রথ। এতে উড়িশী নৃত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) উদ্র (udra) ও (২) অন্তর্বেদী (Antarbedi). এই নাট্যমনোরমা ধরনের আরও প্রায় ৭।৮টি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার সাহিত্য একাডেমী বইটি ছেপে প্রকাশ করেছেন। নিম্নলিখিত উপাদান এতে রয়েছে—

১। সঙ্গীত প্রশংসা। (Praise of music)

২। নাদতন্ত্র। (Theory of Nāda)

৩। রাগ তত্ত্ব। (Theory of Rāga)

৪। গ্রহ ও স্বর রহস্য।

৫। রাগের মূর্তিতত্ত্ব (Iconography of Rāgas).

৬। অবতরণ কর্ম।

৭। গীত লক্ষণ (Notation of songs).

৮। তালের উদাহরণ।

৯। ক্ষুদ্র গীত লক্ষণ।

১০। বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা।

১১। বিভিন্ন ধরনের নৃত্যের বর্ণনা।

(৪) সঙ্গীত নারায়ণ নৃত্য খণ্ড ঃ

এটি লিখেছেন, গজপতি নারায়ণ দেব। ইনি পারলের লোক। গ্রন্থটি ১৫শ শতাব্দীতে লেখা। এই পাণ্ডুলিপিটি অন্যান্য পাণ্ডুলিপির তুলনায় অনেক বেশী তথ্য সমৃদ্ধ। এর তিনটি কপি পাওয়া গেছে। এতে রয়েছে—

১। নটী লক্ষণ।

২। উগ্র ও লাস্য লক্ষণ।

৩। স্বরলিপি।

৪। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য।

৫। যবনিকা লক্ষণ।

৬। সংযোজন।

৭। বেশ পদ্ধতি।

৮। হস্ত মুদ্রা।

(৫) অভিনয় চন্দ্রিকা ঃ

এই বইটির লেখকের নাম জানা যায়নি। বইটি বর্তমানে কবিচন্দ্র কালিচরণ পট্টনায়কের কাছে আছে। এর মধ্যে অনেক উড়িয়া গান রয়েছে। মহেশ্বর মহাপাত্র সংস্কৃতে এটি পুনঃ লিখেছেন। দক্ষিণ উড়িষ্যা থেকে তিনটি এই ধরনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এতে অনেক নৃত্য বিষয়ক ছবি আছে। নৃত্যকলার নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি তিনটি ভাগে বিভক্ত।

১। নৃত্য খণ্ড।

২। ভাব খণ্ড।

৩। ছন্দ খণ্ড।

[illegible] খণ্ড ॥

২। নৃত্য প্রশংসা।

৩। চার রকমের পদমুদ্রা (পদকর্ম লেখাই উচিত)

৪। অসংযুক্ত ও সংযুক্ত মুদ্রা।

৫। Ascertaining of Bandha. (বন্ধনৃত্য)

৬। Ascertaining of Tala. (তালতত্ত্ব)

৭। Costumes. (বেশভূষা)

৮। Introduction to the Author. (লেখক বিষয়ে ভূমিকা)

॥ **ভাবখণ্ড** ॥

১। ভাব প্রশংসা।

২। Ascertaining of Rasa. (রসতত্ত্ব)

৩। Expressions of the face. (মুখজ অভিনয়)

৪। ১৬ রকমের চোখের কাজ।

৫। বটু নৃত্য প্রসঙ্গ।

৬। অবতারণ পদ্ধতি।

এরপর **ছন্দ খণ্ডে** সঙ্গীত ও নৃত্যে ব্যবহৃত ছন্দ, গানের সঙ্গে নাচের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। বাদ্য রহস্য, Gandabikaran Veda, খণ্ডকাব্য পদ্ধতি প্রভৃতি ৫৩ রকমের বিষয় আলোচিত হয়েছে। উড্র নৃত্যের (Udra Dance) চমৎকার বর্ণনা আছে। অভিনয় চন্দ্রিকা ঐ উড্র নৃত্যের একটি প্রামাণ্য দলিল। এই বইয়ের মতে, ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতিই ভারতের একমাত্র শাস্ত্রীয় নৃত্য। উড়িশী নৃত্য ভরতনাট্যমেরই 'revised version'.

'Gotipua Dance'কে 'royal dance' বলা হয়েছে। মুদ্রা এবং সঙ্গীত সহযোগে উড়িশী নৃত্যের কথা আছে। 'ভঙ্গী' ও 'করণ' ভালভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সবকিছু বিষয়ই উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা আছে। ছবিও অনেক রয়েছে।

(৬) দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতি :

এই পাণ্ডুলিপিটি নারায়ণ মিশ্রের লেখা। এতে নাচের মৌল বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা নেই।

(৭) নীলাদ্রি :

এটি কোনও এক দেবদাসীর রচনা। এতে নৃত্য বিষয়ে প্রচুর আলোচনা

আছে। Māhari (মাহারী)-দের রীতি-নীতি আলোচিত হয়েছে। নৃত্যের সময় ভাগ, নৃত্যের নিয়ম-কানুন, মুখাভিনয় (মূকাভিনয় নয়) প্রভৃতির আলোচনা আছে। এই পাণ্ডুলিপিটির ভাষা উড়িয়া। ১৮১৪ খ্রীঃ লিখিত।

এছাড়া অজস্র নৃত্যের পাণ্ডুলিপি উড়িষ্যার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এগুলি এখনো সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে। উড়িষ্যার নৃত্য সঙ্গীত একাডেমী এ বিষয়ে যত্নবান হয়েছেন, তাই আশা করা যায় এ বিষয়ে আরও গবেষণা হবে।

'ওড়িশী' (Odissi) শব্দটি যিনি প্রথম ব্যবহার করেন সেই নৃত্যতাত্ত্বিক 'Charles Fabri'-র বচন দিয়েই সুরু করি। তিনি লিখেছেন—

"A great classical system of dancing, under the name of Orissa, is surviving in the state of Orissa. We have been accustomed to believe and to declare that India possessed four classical systems of dancing (four is almost a sacred number, there being four Vedas, four Budhist Truths, four States of life etc.) and none more : Bharat Natyam, Kathakali, Kathak and Manipuri···

For some time past it has been reluctantly realised that Mohini Attam was a classical system ; undoubtedly related to Bharat Natyam and in an undefined way, to Kathakali too, yet different from both but no one seems to have come to the logical conclusion that there were in fact, not four but five classical systems of Indian Dances.

Then came an realisation that Kuchipudi in Andhra, is a brave variety of Bharat Natyam, certainly classical and taught by learned Vidwans, similar, but not identical with Bharat Natyam : and though this was pushed into the consciousness more vigorously than Mohini Attam have never heard it referred to as the sixth system of classical Indian dancing. Mr. Krishna Ayer propagated it that the Melattur style of dancing was some kind of other form of some ancient

Bharat Natyam system and that, indeed, there seems to be at least seven different varieties of classical dancing, of which at last five derive from some Ur-form, some Premordial, some original form of what have once been the genuine, first Bharat Natyam, and not what goes now-a-days by that name.

CLASSICAL DANCE.

(1) Bharat Natyam (Tanjore).

(2) Kathakali (Kerala).

(3) Kathak (Lucknow, Joypur).

(4) Manipuri (Manipur).

(5) Mohini Attam. Krishna Natyam (Kerala).

(6) Kuchipudi (Andhra).

(7) Melattur (Namilnadu).

(8) Orissi (Orissa).

The Academy most reluctantly accepted Orissa as a variety of Bharat Natyam and equivalent of it for the purpose of the annual awards,·········

The Majority of people still talk, confidently, of four systems of classical dancing, when the correct number is at least eight".[১]

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, উড়িষ্যাবাসী ছাড়া অন্যান্য সকলের কাছেই এই উড়িশী নৃত্য প্রায় অজ্ঞাত ছিল। এর কারণ একাধিক।

প্রথমতঃ উড়িষ্যাবাসীরা একটু লাজুক প্রকৃতির, এবং প্রচার-বিমুখ। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা এই নৃত্যকলাকে বংশপরম্পরা বাঁচিয়ে রেখেছে, তাঁদের জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত। অর্থাৎ পুরী জগন্নাথদেবের মন্দিরে রোজ রাত্রে যে-সকল মেয়েরা আত্মনিবেদনের নাচ নাচতো, কালের প্রভাবে তাঁদের মধ্যে

১। Classical and Folk Dances of India—Mary Publications (Bombay) Introduction to Orissi Dance—Charles Fabri. (Big-Vol.)

(দেবদাসীদের মধ্যে) নানা বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়, কেউ ফিল্মের দিকে ঝোঁকে, কেউ বা অর্থনৈতিক কারণে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কোন ধর্মীয় লালসা চরিতার্থ করতে শিল্পচর্চা ছেড়ে দেয়, অনেকে এই দেবদাসীর বৃত্তি ছেড়ে বারবণিতার বৃত্তি নিয়েছে, এমন নজির আছে। এ সকল কারণে এই নাচের কদর কমে যায়। এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়।

তাছাড়া উড়িশী নাচ মন্দিরের পরিবেশ ছাড়া বাইরে অনুষ্ঠিত হতো না। চিত্তবিনোদনই এই নৃত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ধর্মীয় আচারের মাধ্যমেই এই নাচ নাচা হতো। এতদিন মন্দিরে আবদ্ধ থাকা উড়িশী নাচ এখন লোক-সমক্ষে অভিনীত হয়। এমনকি থিয়েটারের স্টেজেও এখন এই নাচ দেখা যায়। এভাবেই ক্রমশঃ এই নাচ জনসাধারণ দেখতে শিখলেন। বর্তমানে এই নাচের জনপ্রিয়তা এবং বিদগ্ধমনের যে দৃষ্টি এদিকে পড়েছে তার কারণ এই নৃত্য মন্দির-কেন্দ্রিকতা ছেড়ে সাধারন স্টেজে নেমেছে।

অপর দিকে, এ পর্যন্ত গবেষণায় যা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় বর্তমান উড়িশী নৃত্যের সূত্রপাত ৭০০ শত বছর আগে থেকে। উড়িষ্যায় পণ্ডিতগণ তালপাতায় পুঁথি থেকে নৃত্য সম্বন্ধে যা উদ্ধার করেছেন তাতে দেখা যায়—ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নৃত্য ও নাট্যে করণ-প্রকরণ নিয়েই উড়িষ্যার নৃত্য সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিগুলি গড়ে উঠেছে। (কেউবা নন্দিকেশ্বরের—'অভিনয় দর্পণকে'ও অনুসরণ করেছেন।) এই পাণ্ডুলিপিগুলি ১২ শ। ১৫ শ। ১৬ শ শতাব্দীর। এর প্রত্যেকটি নাচের ভঙ্গি (pose) লাইন এবং ড্রইং করা আছে। এইগুলি প্রকাশিত হওয়া দরকার।

কোনারকের সূর্যমন্দিরের নৃত্য ভাস্কর্য্যের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত ভঙ্গি-(pose) গুলি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এই নৃত্য কত প্রাচীন। কোনারকের মন্দিরের নির্মাণকাজ শেষ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সুতরাং উড়িশী—নৃত্য এই দিক থেকে প্রায় ৬০০ শত বছরের প্রাচীন।

উড়িষী নৃত্যের সঙ্গে ভরতনাট্যমের যতটা মিল, তার চেয়েও বেশী মিল অন্ধ্রের কুচিপুড়ির সঙ্গে। উড়িষ্যার বৃহত্তর অংশ একদা অন্ধ্রের রাজাদের অধীনে ছিল। সেই সূত্রে প্রচুর তেলেগু ভাষায় পাণ্ডুলিপি উড়িষ্যায় পাওয়া গেছে। তাছাড়া উড়িষ্যা ও অন্ধ্র পাশাপাশি প্রদেশ। সুতরাং সাংস্কৃতিক দিক থেকে উভয় দেশেরই মিল যথেষ্ট।

ভরতনাট্যমের সঙ্গেও হস্ত ও পদকর্মে মিল আছে। তাহলেও এই প্রসঙ্গে Charles Fabri-র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন—"Either we accept that Orissi has deteriorated and we have the pure system in the Madrasi form of Bharat Natyam : or else we believe that what is simpler is older : hence Orissi is the more unspoilt, the more ancient, more primitive form, whilst that is now called Bharat Natyam is a more evolved, a later developed and hence more complicated system."

"...And dancing in Orissi is not taught by learned vidwans and pandits—it goes from mother to daughter." (অথচ অন্ধ্রের 'কুচিপুড়ি' নৃত্যপ্রসঙ্গে তিনি আগেই বলেছেন—Taught by learned vidwans"। কিন্তু ওড়িশীর ব্যাপারে বললেন "it goes from mother to doughter".) প্রাচীনকালে ওড়িশী নৃত্য 'গুটিপো'দের দ্বারা চর্চিত হয়েছে বিভিন্ন আখড়ায়—মন্দিরে নয়! মন্দিরে নেচেছেন 'মাহারী' বা দেবদাসীরা। ওড়িশী নৃত্যের বিবর্তন ও পুষ্টিসাধনে গুটিপু ও মাহারীদের অবদান অনেকখানি। বর্তমান ওড়িশী নৃত্যগুরুরা অনেকেই গুটিপু ছিলেন প্রথম জীবনে।

উড়িষ্যা প্রদেশে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সং ৃা ও আর্যাবর্তের আর্য সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান।

..."her dancing is obviously near to the Dravidian forms of classical dancing (Tanjore, Melattur and Andhra), the music that accompanies it is not Karnataka but Hindustani in character." (Ibid)

উড়িষ্যা নামটা এসেছে ওড্রো দেশ থেকে। ওড়িশী নৃত্য এসেছে 'ওড্রো নৃত্য' থেকে। শ্রীমহাপাত্র তার অভিনয় চন্দ্রিকায় এই নাচকে ওড্রো নৃত্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। অভিনয় চন্দ্রিকাকে ওড়িশী নাচের আকর গ্রন্থ বলা হয়। 'Orissi' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Dr. Charles Fabri.

॥ ওড়িশী নৃত্যের ফলিত (Applied) চর্চা ॥

ওড়িশী নৃত্যে বিভিন্ন আঙ্গিকের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—উঠ, বৈঠ, স্থানক, চালি, বুরহা, ভাস, ভউনরী, পালি। এইগুলির সমষ্টিকে 'বেলি' বলা হয়। উৎপ্লাবনকে 'উঠ', উপবেশনকে 'বৈঠ' স্থানক দাঁড়ানো ভঙ্গি, চালি—গতি, বুরহা—হাত ও পায়ের তীব্র গতি, ভাস—শিল্পীর সাঁতার কাটার ভঙ্গি। ভউনরী—ভ্রমরী। পালি—নতুন নাচ আরম্ভ করা পূর্বেকার ভঙ্গি।

নৃত্যাংশের মৌলিক অবস্থানকে 'ভঙ্গী' বলা হয়। এখন কতকগুলি ভঙ্গির নাম—স্থায়ী, চৌকা, চির, লখী, নটবর, বৈঠী। ওড়িশী নৃত্যে অধস্তন করণগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়—নিবেদন, প্রণতা, উত্তোলিতা, বিরাজ, আকুঞ্চন, সংরক্ষণ, গোপন, অভিমান, কুঞ্জরবক্র, তরঙ্গ, নিকুঞ্চন, মর্দন, আরত্রিকা, সগদীয়া। ওড়িশী নৃত্যে কয়েকটি অংশ আছে—যথা—ভূমি, প্রণাম, বিঘ্নরাজ পূজা, বটু নৃত্য, ইষ্টদেবতা বন্দনা, স্বরপল্লবী, বাদ্যপল্লবী, মোক্ষ, দশাবতার, সাভিনয় ও তারিঝম্ ইত্যাদি।

ভূমি প্রণাম অথবা মঙ্গলাচরণে নর্তক সমস্থানকে দাঁড়ান। এর পর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি করে 'উকুট্ট' অর্থাৎ বোলের সঙ্গে ভূমিকে প্রণাম করেন। এর পর বিঘ্ননাশের নামে মঙ্গলাচরণ হয় এবং নৃত্যশিল্পী কখনও কখনও নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা তাহার অর্থ ব্যক্ত করেন। এই অংশটিকে 'বিঘ্নরাজ' বলা হয়।

পরবর্তী অংশ বটু নৃত্য। বটুকেশ্বর বা মহাদেবের সম্মানার্থে এই নাচ। এতে নৃত্য ও নৃত্তের প্রয়োগ হয়। বটু নৃত্যের শেষে থাকে বন্দনা। এই বন্দনার আরেক নাম 'মোক্ষনট'।

'ইষ্টদেব' বন্দনাতে ইষ্টদেবতাকে অঞ্জলি দেওয়া হয়। শ্লোক ও গীতের সাহায্যে এই নৃত্যাভিনয় হয়। এর ভাষা সংস্কৃত।

'স্বরপল্লবী'—নৃত্যে, নৃত্য ও নৃত্ত উভয়েরই প্রয়োগ দেখা যায়। স্বরপল্লবীর অর্থ 'ব্যাখ্যা' স্বরালাপের সঙ্গে নৃত্যের সূত্রপাত। এতে রাগরূপ প্রকাশ পায়। অনেক সময় এতে শিল্পী নিজেও গান করেন। আলাপের সঙ্গে চক্ষু ও ভ্রূ চালনা করেন। এর নাম 'নখী'। এর পর নৃত্ত সুরু হয়। এই নৃত্ত দুইভাবে হয়—স্বরপল্লবী ও বাদ্য বা তালপল্লবী। তালের প্রাধান্য থাকে।

'সাভিনয় নৃত্যে' সাহিত্য ও অভিনয়কে সমান প্রাধান্য দেওয়া হয়। এতে থাকে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। সাভিনয় নৃত্যের শেষাংশের নাম 'তারিঝম্

এতে সম্পূর্ণভাবে নৃত্তের প্রাধান্য থাকে। এই নৃত্য 'ঝুলা' বা 'পহপত' তালে দ্রুত লয়ে করা হয়। একে আবার 'আনন্দ নৃত্য' বা 'নটঙ্গী' বলা হয়ে থাকে।

॥ উড়িষ্যার মন্দিরে নৃত্যভাস্কর্য ॥

ভারতীয় মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্য অলঙ্করণের কাজে নৃত্য ভঙ্গিমাগুলি একটি বিশেষ তাৎপর্য দান করেছে। মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন বিষয়ের ভাস্কর্য থাকে। পুরাণ এবং ধর্মীয় কাহিনীর সঙ্গে নৃত্যেও যেন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এটা সারা ভারতেই প্রায় দেখা যায়। সেদিক থেকে, মন্দির ও নৃত্যের জন্য উড়িষ্যার প্রসিদ্ধি উল্লেখযোগ্য।

ভুবনেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত পাথর কেটে গুহা মন্দির খণ্ডগিরি, উদয়গিরির হাতীগুম্ফা, রাণীগুম্ফা, যক্ষপুরী, স্বর্গপুরী প্রভৃতিতে জৈন প্রভাব সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিকদের মতে এগুলির সময়কাল কলিঙ্গের রাজা খারবেলের রাজত্বকাল। খ্রীষ্টপূর্বাব্দের শেষ দিক। (আনুমানিক ১৮৭ খ্রীঃ পূঃ)

এই সময়কার নৃত্যভঙ্গিগুলিকে কেউ কেউ বলেছেন 'কাল্পনিক'। আমাদের জানা নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে এইগুলির তেমন সাযুজ্য নেই। অর্থাৎ এখনকার প্রচলিত ওড়িশী নৃত্যের ভঙ্গির সঙ্গে তেমন কোন মিল নেই। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে অনেক মিল আছে। খোদাই করা নরনারীর মূর্তিগুলিতে গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরদের দেখা যায়। উদয়গিরির রাণীগুম্ফায় পবিত্র বৃক্ষের চারপাশে নৃত্যপর নরনারীর মূর্তি রয়েছে। একদিকে রয়েছেন যন্ত্রশিল্পীরা।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব ও প্রসার সুরু হয়। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বকালে উড়িশ্যায় বৌদ্ধ প্রভাব প্রাধান্য লাভ করে। রাজা খারবেলের রাজত্বকাল (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) জৈনধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্বীকৃতি পায়। এরপর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত আবার বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য, তারপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আবার পুরোনো মর্যাদা ফিরে পায়। অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজা ভৌম (Bhauma) এবং কর (Kara)-দের রাজত্বকালে দেখা যায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা করেছেন। এরপর সুরু হয় তান্ত্রিক প্রভাব। অর্থাৎ বজ্রযান বৌদ্ধদের প্রভাব এবং এই প্রভাবের সঙ্গে গুপ্ত যুগের শিল্পধারা অনেকটা মিশে যায়।

খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী—বৌদ্ধ প্রভাব।
" " ২য় " —জৈন প্রভাব।
খ্রীঃ ৩য় শতাব্দী —বৌদ্ধ প্রভাব।
" ৫ম " —ব্রাহ্মণ্য প্রভাব।
" ৮ম " —মহাযান বৌদ্ধদের প্রাধান্যকাল।
" ৯ম " —তান্ত্রিক তথা বজ্রযান বৌদ্ধদের প্রাধান্যকাল।

এই বজ্রযান ধর্মাবলম্বীদের সময় থেকেই উড়িষ্যার সর্বত্র বিশেষ করে কটক জেলার ললিতগিরি, উদয়গিরি, রত্নগিরি, প্রভৃতি জায়গায় সৃষ্টিশীল শিল্পকলার চর্চা ব্যাপকভাবে সুরু হয়। মন্দিরের দরজার ফ্রেমে, গ্রীলে, লিনটেলে নৃত্যপর নরনারীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। এই মূর্তিগুলির নৃত্যভঙ্গিমায় এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত ওড়িশী নাচের মিল দেখা যায়। এই থেকেই বলা যায় ওড়িশী নৃত্যের উৎস খুঁজতে হয় বৌদ্ধযুগের নৃত্যভাস্কর্যের মধ্যে।

বৌদ্ধযুগের দেবদেবীরাও ঐ নৃত্য ভাস্কর্যে স্থান করে নিয়েছেন। হেরুকা, মারিচী, বজ্রবরাহী, অচলা, অপরাজিতা প্রভৃতি দেবদেবীদের মূর্তি, উদয়গিরি, ললিতগিরি, রত্নগিরি, আলমগিরি, উদলা, খিচিং, চৌদুয়ার, বৌদ্ধ, সেলিমপুর, অযোধ্যা, খড়িপদা, অস্ত্রঙ্গা প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া গেছে।

ভুবনেশ্বরের হিন্দু মন্দির নির্মিত হয় খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে। এ সময় থেকে তিনশত বছরের মধ্যেই ভুবনেশ্বরের অন্ততঃ পাঁচশত মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরময় ভুবনেশ্বর শৈবপ্রধান অঞ্চল। ঐ একটি মন্দির ছাড়া সবই শাক্তদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ভরতেশ্বর, লক্ষণেশ্বর, শত্রুঘ্নেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের নামকরণ দেখেই শাক্তপ্রভাব প্রমাণিত হয়।

এই মন্দিরগুলির নির্মাণ পদ্ধতিতে আর্য ও দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট। এই দুইয়ের মিশ্রণে যে শিল্পশৈলীর সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হয় কলিঙ্গ শৈলী। পরশুরামেশ্বর মন্দিরের গঠনশৈলী খুবই সরল। কিন্তু ভৌম রাজাদের আমলে তৈরী বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে অলঙ্করণের প্রাবল্য দেখা যায়। এর প্রমাণ মার্কণ্ডেয় ও শিশিরেশ্বর মন্দিরযুগল।

হিন্দুধর্ম প্রভাবিত মন্দিরে একটি করে বর্ধিত চত্বর আছে। শ্রীমন্দিরে তা দেখা যায়। আরও দেখা যায়—ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ও পুরীর জগন্নাথ

মন্দিরে। এই বর্ধিত চত্বরকে বলা হয় 'বড় দেউল'। এই বড় দেউলের পর জগমোহন। দর্শকদের হল, এর পর নাটমন্দির বা নৃত্যঘর। এর পাশেই থাকে ভোগমন্দির।

অষ্টম শতাব্দীর নির্মিত পরশুরামেশ্বর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল—স্থাপত্য শিল্প যেন ভাস্কর্যে রূপান্তরিত হয়েছে, ফল, ফুল, পশু, পাখীর সঙ্গে নৃত্যপর মানুষের ভাস্কর্য দেখা যায়। তাণ্ডবনৃত্যভঙ্গির সুচারু রূপটি এখানে দৃশ্যমান।

ষষ্ঠ শতাব্দীর নির্মিত ভুবনেশ্বরের ভরতেশ্বর মন্দিরে শিবের বিবাহ সভায় দলবদ্ধ নৃত্যপর মেয়েদের দেখা যায়।

উড়িষ্যার প্রাচীনতম হিন্দু মন্দির—পরশুরামেশ্বর মন্দির। এই মন্দিরের কিছু কিছু প্যানেল তুলে নিয়ে অন্য মন্দিরে লাগানো হয়েছে—এমন অনুমান অনেকে করেছেন। এই সকল প্যানেলে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলিতে নৃত্যের ভঙ্গিমা দেখা যায়। এই প্যানেলেরই বিখ্যাত নটরাজ মূর্তিটি এখন মুক্তেশ্বর মন্দিরে রয়েছে।

এই পরশুরামেশ্বর মন্দির নির্মিত হয় ৭ম।৮ম শতাব্দীতে। এবং ৮ম।৯ম শতাব্দীর ভৌমদের সময়ে আরও দুটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। মন্দির দুটি "বৈতাল দেউল" এবং "শিশিরেশ্বর"। প্রথমটির স্থাপত্যে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং মন্দিরটি খুবই ছোট।

William Willetts-এর মতে শিশিরেশ্বর মন্দির, "the richest art-historical monument in Bhubaneswara" এবং "বৈতাল দেউল" প্রসঙ্গে লিখেছেন—"the most aesthetically satisfying."

এই উভয় মন্দিরেই নৃত্য ভাস্কর্য রয়েছে বৈতাল দেউলের নটরাজ নিছক নটরাজ, এবং শিশিরেশ্বরের নটরাজ দ্বারপালকের মূর্তিতে নৃত্যপর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন দেখা যায়। এই ধরনের দ্বারপালকের মূর্তি ললিতগিরিতে দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, সারা এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে একদা যে শিল্পশৈলীর সৃষ্টি হয়েছিল, ৮ম।৯ম শতাব্দীতে ভৌম রাজাদের আমলে তৈরী এই মন্দিরগুলিতে তা বিদ্যমান।

ভৌম যুগের পর কলিঙ্গ স্টাইলের তৈরী লিঙ্গরাজ মন্দিরের সময় পর্যন্ত ভুবনেশ্বরে অনেক মন্দির তৈরী হয়। এই মন্দিরগুলিতে অজস্র নৃত্য ভাস্কর্য

রয়েছে। পাথরে কবিতার মতো সুন্দর মুক্তেশ্বর মন্দিরে নটরাজ, নায়িকা প্রভৃতি ধরনের নৃত্যভাস্কর্য চোখে পড়ে।

জগমোহন মন্দিরের সিলিং-এ গণেশের যে মূর্তি রয়েছে তা উড়িষ্যায় অনন্য। ভুবনেশ্বরের বৈষ্ণব মন্দির অনন্ত বাসুদেব নৃত্য ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। কপিলেশ্বর মন্দিরের ভাস্কর্যে নৃত্য ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের মূর্তি দেখা যায়।

খ্রীঃ ১০০০-তে, গঙ্গা যুগে রাজারানীতে মিথুন মূর্তির প্রাবল্য লক্ষ্য করার মতো। এই সমসাময়িক মন্দির হল, লিঙ্গরাজ, ভুবনেশ্বর ও পুরীর জগন্নাথের মন্দির। এইগুলিতে বিশেষ করে মিথুনযুগল, অপ্সরা, নায়িকা প্রভৃতি দেখা যায়।

এর পরবর্তীকালে কোনারকের সূর্যমন্দির। এই মন্দির প্রসঙ্গে বলা হয়—"The grandest achievement of the eastern school of architecture."

ভুবনেশ্বর শৈবপ্রধান মন্দির হিসেবে নটরাজের মূর্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। উড়িষ্যায় পাণ্ডুলিপিতে, বিশেষ করে 'অভিনয় চন্দ্রিকা', 'শৈব করণাগম', 'অংশভেদগম্', 'শৌধিভেদগম্' প্রভৃতি গ্রন্থে শিব তাণ্ডবের যে বর্ণনা আছে, এই মন্দিরগুলির নৃত্য ভাস্কর্যে তা পরিস্ফুট।

এই সকল গ্রন্থে শিবের ৭ প্রকার তাণ্ডবের কথা—আনন্দ. কালিকা, গৌরী, পার্বতী, সন্ধ্যা. ত্রিপুর, সংহার প্রভৃতির সঙ্গে সৌম্য, ব্রহ্ম, নন্দী, হ্রী, বিজ্ঞেস প্রভৃতি তাণ্ডবের বর্ণনা আছে। এই সকল তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গিমা প্রায় সকল মন্দিরেই রয়েছে, বিশেষ করে মুক্তেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর মন্দিরে।

ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জরাজাদের আমলে তৈরী খিচিং মন্দিরেও নটরাজের মূর্তি দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে উড়িষ্যায় নটরাজ খুবই প্রাচীন দেবতা।

নটরাজের প্রচলিত মূর্তি ছাড়াও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে এক বিশেষ ধরনের নটরাজের মূর্তি দেখা যায়। বৈতাল,—মার্কণ্ডেশ্বর ও শিশিরেশ্বর মন্দিরের প্রথমেই চোখে পড়ে নটরাজের মূর্তি। এই মূর্তিগুলি গোলাকার চৈত্যের জানালায় দেখা যায়। পরশুরামেশ্বরের রথের সামনে আনন্দ তাণ্ডবের মূর্তি থাকলেও, বাঁ হাতে বরাভয় (Protection) মুদ্রা (প্রচলিত তাণ্ডবে ডান হাতে ঐ মুদ্রা থাকে)। মুক্তেশ্বরের নটরাজে বিজাপুর জেলার বাদামী মন্দিরের প্রভাব আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, নটরাজের মূর্তি বিভিন্ন যুগে,

অনুকৃতিমূলক কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মন্দিরে রূপ নিয়েছে। তবে মনে হয় উড়িষ্যার নটরাজ খুবই প্রাচীন। ভুবনেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর ও শোভনেশ্বর মন্দিরেও নটরাজ মূর্তি আছে।

শিবের এই তাণ্ডব মূর্তি ছাড়াও, শিবের বিবাহের শোভাযাত্রায় নৃত্যপর বালিকাদের দেখা যায়। এই ধরনের মূর্তি ভরতেশ্বর, পরশুরামেশ্বর ও রাজরাণী মন্দিরে দেখা যায়। শিবের সঙ্গে নৃত্যপর পার্বতীকেও রূপ দেওয়া হয়েছ অনেক জায়গায়।

৮ম থেকে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যায় প্রচুর মন্দির তৈরী হয়েছে। শেষ পর্যায়ে প্রস্তুত মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম কোনারক। পৃথিবী বিখ্যাত এই মন্দির সূর্যদেবের স্তুতিতে নিবেদিত। আনুমানিক ১২৫০ খ্রীঃ গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহের সময় এই মন্দির নির্মিত হয়। পুরো মন্দিরটাই যেন একটি রথ। এতে ২৪টি চাকা। মূল মন্দির 'বড় দেউল'। এর সঙ্গে রয়েছে নাটমন্দির। এই মন্দিরের ভাস্কর্যে জীব-জন্তু, পাখী থেকে মিথুন মূর্তি, নৃত্যশিল্পী, ও বাদ্যকরদের মূর্তি রয়েছে (মহিলা বাদ্যকর)। মন্দির চূড়ায় প্রমাণ সাইজের নৃত্যপর মূর্তি দেখা যায়। নাটমন্দিরের প্রতিটি অংশ নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পীদের মূর্তিতে পূর্ণ।

উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যে নৃত্যভাস্কর্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এখানে নটরাজ, পার্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মূর্তি রয়েছে। নায়িকাদের নৃত্যভঙ্গিমায় মন্দির সুশোভিত। নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন করণসমৃদ্ধ মূর্তিভঙ্গিও দৃশ্যমান। 'ওড়িশী' নৃত্যের 'নৃত্ত' ভাগের ভঙ্গিও বিভিন্ন মূর্তিতে আকীর্ণ। এই পাষাণেই ওড়িশী নৃত্যের অনেক উপাদান ছড়িয়ে আছে। এই ভঙ্গিগুলির সঙ্গে বর্তমান ওড়িশী নৃত্যের কিছু পার্থক্য থাকলেও ধারাবাহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করতেও এই নৃত্যভাস্কর্য সাহায্য করে।

বর্তমান নৃত্যশিল্পীরা মন্দিরের এই নৃত্যভাস্কর্য পর্যবেক্ষণ করলে নানা উপাদান পেতে পারেন এবং প্রেরণাও পাবেন।

॥ পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা ও ঐতিহাসিক তথ্যে ওড়িশী নৃত্য ॥

উড়িষ্যা নামটা এসেছে "ওড্রো" দেশ থেকে। ওড়িশী নৃত্য এসেছে "ওড্রো নৃত্ত" থেকে। "অভিনয় চন্দ্রিকা" গ্রন্থে এই নাচকে ওড্রো নৃত্ত হিসেবে অভিহিত

করা হয়েছে। অভিনয় চন্দ্রিকাকে ওড়িশী নৃত্যের আকর গ্রন্থ বলা হয়। "ওড়িশী" (Orissi) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Dr. Charles Fabri.

ওড়িশী নৃত্যের প্রাচীনতা প্রায় ২ হাজার বছরের। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এ নৃত্য ও নাট্য শিল্পকে চারটি অঞ্চলভিত্তিক ভাগ করা হয়েছে। যথা—অবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী ও ওড্রমাগধী।

এই ওড্র-মাগধী ধারা আবার প্রচলিত ছিল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বৎস, ওড্র, মগধ, পৌণ্ড্র এবং পূর্বভারতের কিছু অঞ্চল। এই কলিঙ্গ ও ওড্র-ই হল বর্তমান উড়িষ্যা। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ২য়।৩য় শতাব্দী ধরা হলেও ওড়িশী নৃত্য যে সে সময় প্রচলিত ছিল (না হলে নাট্যশাস্ত্রে উড়িষ্যার কথা এল কি করে ?) এবং তা যদি হয়, তা হলে প্রায় বাইশ শ' বছরের প্রাচীন এই ওড়িশী নৃত্য—এটা ধরা যায় (তাছাড়া খারবেলের শিলালিপিতেও তা প্রমাণিত)।

ওড়িশী নৃত্যের করণ, হস্তমুদ্রা ও কিছু ভঙ্গিমা—নাট্যশাস্ত্রের অনুযায়ী। (ভারতে নাচ সম্বন্ধে যত বই পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগ বইতেই নৃত্যের উৎপত্তির মূলে কোন দেবতাকে বলা হয়েছে)। দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা মহেশ্বর মহাপাত্রের 'অভিনয় চন্দ্রিকায়' দেখা যায় নৃত্যের স্রষ্টা স্বয়ং শিব। শিব গণেশকে শেখান, গণেশ মণি, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাদের শেখান। এঁরা মুনি ভরতকে শেখান। ভরতের পরে ওই শিল্পকে বহন করে নেয় গর্গাচার্য, বিকটাচার্য, কুমারাচার্য, রন্তিদেব (Rantideva) এবং সব শেষে অট্টহাস (Attahas), এই অট্টহাস ওড়িশী নাচ শেখান উড়িষ্যার দেবদাসীদের—এবং এভাবেই নাকি ওড়িশী নৃত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। ঐতিহাসিক তথ্যে দেখা যায়, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কলিঙ্গের জৈন রাজা খারবেলের সময় থেকেই নৃত্যের চর্চা যে উড়িষ্যায় ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। উদয়গিরির হাতীগুম্ফায় প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা একটি শিলালিপিতে (Inscription) দেখা যায় রাজা খারবেল তার নিজের রাজত্বের তৃতীয় বছরে, নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাতে রাজা স্বয়ং নৃত্য ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। এতে 'তাণ্ডব নৃত্য' ও 'অভিনয়' অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া উদয়গিরির রাণীনাহার গুম্ফায় প্রাপ্ত, একই যুগের প্যানেলে দেখা যায় রাজা বসে নৃত্য-গীত অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন।

খারবেলের রাজত্বের পরে কয়েক শতাব্দী উড়িষ্যায় নৃত্য বিষয়ে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই সময়ে উড়িষ্যার রাজনৈতিক ইতিহাসও অন্ধকারময়। এই অবস্থা চলে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত। তারপর ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে আবার নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিলালিপিতে কেশরী রাজা উদ্যতের (Uddyota) মা কলাবতী এক শিব মন্দির নির্মাণ করিয়ে তাতে অনেক বালিকা নৃত্যশিল্পীকে নিবেদন করেন। হিন্দু মন্দিরে এভাবে মেয়েদের নাচের জন্য উৎসর্গ করার রীতি খুবই প্রাচীন। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে প্রণীত পুরাণগুলিতে এই ধরনেয় তথ্য পাওয়া যায়। শিব-পুরাণে আছে, শিবের নামে মন্দির নির্মিত হলেই তাতে শত শত মেয়েদের উৎসর্গ করা হতো যাঁরা নৃত্যে ও সঙ্গীতে পারদর্শিনী। স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও এ ধরণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেব মন্দিরে মেয়ে উৎসর্গ করার রীতি একদা ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল অন্ততঃ ঐতিহাসিকেরা তাই বলতে চান। এ ভাবে দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়—কাশ্মীর, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্র, মহিশূর, তামিলনাদ এবং কেরালায়। নানা কারণে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতি উড়িষ্যা ছাড়া প্রায় সর্বত্রই লোপ পেয়েছে। কোথাও আইন করে বন্ধ করা হয়েছে বৃটিশ যুগে। তার প্রমাণ আছে। স্বাধীনতার পরও এই প্রথা, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জায়গায় আইন করে এই দেবদাসী প্রথা রদ হয়েছে।

ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে উড়িষ্যায় দেবদাসী পদ্ধতির সূচনা ধরা হয় ১২০০ শত বছর আগে। এই দেবদাসীরাই ওড়িশী নৃত্যের প্রথম শিল্পী বলা যায়। সুতরাং ওড়িশী নৃত্যের ইতিহাস মানেই দেবদাসীদের ইতিহাস। উড়িষ্যায় এই দেবদাসীদের বলে মাহরী (Māhari)। রাজা উদ্যত কেশরীর রাজত্বকাল নবম শতাব্দী। এই রাজত্বকাল চলে একটানা ৩০০ শত বছর। এই তিনশ বছরের মধ্যে নৃত্যকেশরী ও গন্ধর্ব কেশরী নামে দুজন রাজার নাম পাওয়া যায়। নৃত্যকেশরী নৃত্যে ও গন্ধর্বকেশরী সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। এঁদের সময়ের বৌদ্ধধর্মের ক্ষয়িষ্ণু কাল শুরু হয়। দেখা দেয় ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পথ বেয়েই জগন্নাথের উদ্ভব এবং এই জগন্নাথের মন্দিরকে কেন্দ্র করেই মাহারীদের বা দেবদাসীদের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে।

কেশরী রাজাদের পরে গঙ্গাবংশীয় রাজাদের রাজত্বকাল শুরু হয়। ছোট (চোড়) গঙ্গাদেব ১০৭৭ থেকে ১১৪৭ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার সময়ে উড়িষ্যাতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে পারঙ্গম ছিলেন। ললিতকলায় তার ব্যুৎপত্তি সর্বজনবিদিত। পুরীর জগন্নাথের মন্দির তিনিই তৈরী করান। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে অচিরেই উড়িষ্যায় ধর্ম ও সংস্কৃতির জগতে একটা নবজাগরণ শুরু হয়। তিনি উক্ত মন্দিরে অনেক মাহারীকে (Mahari) নিযুক্ত করেন পূজা অর্চনার কাজে। এই মাহারীদের থেকেই দেবদাসী নৃত্যসম্প্রদায় বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে।

এর পরবর্তী অধ্যায় প্রসঙ্গে মোহন খোকার উল্লেখ করেছেন—

"In 1194, 47 years after Chadagangadeva's death, Anangabhimadeva became the ruler. He built several temples and he also constructed the Natamandira or Hall of Dance as an annexure to the temple of Jagannath at Puri. This Natamandira was intended for the performances of the Māharis and musicians who were in the service of the temple. Joydeva the celebrated composer, also lived at this time, and the recital of his Gita-Govinda later become and indispensable part of the rituals of the Jagannath temple and this is a tradition which continues to this day. The 'Abinya Chandrika' which is considered to be the foremost Shastra on Orissa Dance, was also written at this time and its another Maheswar Mahapatra, adorned the court of king Anangabhimadeva It is also recorded that towards the close of the Ganga rule, king Rajrajdeva appointed a Binakar or Veena player, a Getagani or Vocalist, a Madela or Drummer and 20 Nachunis or dancing girls for service in the temple of Jagannath.

In 1435, Kapilendradeva established the rule of the Surya-Vansa the Solar Dynastry. Kapilendradeva seems to have

been on enlightened ruler as he was an outstanding scholar and writer. He introduced the custom of having the Māharis Dance twice every day in the temple of Jagannath, once at the time of Bhog or the Lord's mid-day meal and again at the time of Barha Singer or the Lord's ritual adornment before being sent to bed. He also started the tradition of having the Geeta Govinda Sung as part of the daily ritual of the Jagannath Temple.

Kapilendradeva was succeeded by his son Purusottama-deva. Purusottamadeva fought with Narasing Salva of Kanchipuram and defeated him and married his daughter Rupambika, who was re-named Padmavati. Padmavati of her own accord., enlisted herself as a Māharis to serve the Lord Jagannath, and it is recorded that, later the temple honoured her by presenting her with a Gopa Sari. This shows that Māharis were held in respect at that time and that women considered at a great honour to be permitted to serve the Lord as a dancing girl.

Purusottamadeva died in 1497 and his son Protap-rudradeva succeeded him. Protaprudradeva made a strict rulling that only the Gita Gobinda and no other text should be recited in the Jagannath temple—a covenant which holds good to this day. The saint and singer Chaitanya also lived at this time and when he met Ramananda Pattanaik whom Protaprudradeva had appointed Governor of Rajmahendri, he brought about a lasting change in the later's life, Ramananda Pattanaik was so impressed with Chaitanya's discourse that he fourthwith relinquished the governorship and spent the rest of his life in serving the Lord—Jagannath

at Puri. He thereafter came to be known as Ramananda Raja. He was a musician and a poet and he wrote the opera Jagannath Ballav, which is a minor classic of Sanskrit literature. He is also credited with having introduced abhinaya in the dance of the Māharis and he was also the first to engage Māharis to take part in drama, for till them, the performances in dramas had been exclusively men and boys. The reign of purushotamadeva did not achieve very much politically, but Vaisnavism as a religion became supreme and the cult of Bhakti received a strong impetus.

By the end of the 16th century, Orissa had lost her independence and came under the rule, successively, of the Bhois, Pathans, Mughals, Marathas and finally the British. For over 300 years the political life of the region remained in turmoil which affected the religions, social and cultural aspects of life. Many times during this period the seva padhatis or ritual services, connected with the temple of Jagannath had to be suspended. From the time of Ramachandradeva, that is, about 1600 A.D. the Māharis, who were originally intended for temples and Gods alone, came to be employed in royal courts as well. From now on the Māharis ceased to be respected as dasis of the Lord and came to be associated with concubinage, a situation which persists to this day. About the same time, that is, during Ramachandradeva's rule, a class of boy known as Gotipuas also into being these boys dressed themselves as dancing girls and danced in the temple and also for the general entertainment of the people. The Gotipuas were supported by the Akhadas or gymnasia, which were established in

several parts of the districts of Puri and Ganjam. Later, they were also encouraged by certain zaminder families of Orissa. Some of which maintained their own Gotipuas parties.

With the passage of time the dance of the Māharis, as well as of the Gotipuas, deteriorated. There is so denying that it is in debilitated form that the original art of Odissi has come to us. All the same, we have to be thankful to the Māharis and the Gotipuas, for it is solely on account of them that the tradition of Odissi dance has been maintained and perpetuated.

Before the transfer of power from British to Indian hands, the world knew nothing of Odissi-dance. But to day, thanks to the pioneering efferts of a few individuals and certain institutions, this art is again beginning to find its rightful place on the dance map of India. Scholars like Kali Charan Pattanaik, Dhirendranath Pattanaik and Sadasiva Nath Sarma, Gurus like Mohan Mahapatra, Pankaj Charan Das, Debi Prossad Das and Kelu Charan Mahapatra, Māharis like Haripriya and Kokilaprobha and institutions and organisations like the Kala Vikash Kendra and the Utkal Nritya Sangeet Kala Parishad have all, in their own way, helped to further the cause of Orissi. Credit must also be given to the dancer Indrani Rahman, who with the co-operation of Dr. M. Manshinha and Charles Fabri and her Guru Deva Prossad Das, has been the first to carry Odissi outside India and to put it on the dance map of the world.

Odissi has survived. It has also recaptured (restore) and sufficiently and is more rapidly regaining its lost prestige.

The day is not far off when Odissi will be as popular and admired and respected like the sister styles Bharat Natyam or Kathak.[১]

॥ ভরতনাট্যম্ নৃত্য প্রসঙ্গ ॥

॥ দক্ষিণ ভারতে নৃত্যের পুনরুজ্জীবন ॥

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র তামিলনাদে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে নৃত্যকলার তামস-যুগ। একালেই ভরতনাট্যম ও কথাকলি নৃত্য বহুলাংশে ভ্রষ্ট, লঘু ও বিকৃত হয় এবং নৃত্যের রুচি বিকৃতির ও ঘৃণ্য উপজীবিকার অঙ্গ হওয়ার জন্য নাচ বিরোধী আন্দোলনও সুরু হয়।

এই সময় দক্ষিণভারতে দুই জনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়—একজন কেরালার কবি ভাল্লাথোল, অপরজন তাঞ্জোরের উচ্চশিক্ষিত নৃত্যবিশেষজ্ঞ কৃষ্ণ আয়ার। এঁরা দুইজন কথাকলি ও ভরতনাট্যম্ নাচের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে প্রথম ব্রতী হন। এঁদের প্রচেষ্টাতেই কথাকলি ও ভরতনাট্যম্ শুধু পূর্ব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিতই হয়নি, পরন্তু বহির্ভারতেও পরিচিতি অর্জন করেছে। অবশ্য আরেকটি ঘটনা দক্ষিণ ভারতে নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনকে বিশেষ-ভাবে অনুপ্রাণিত করে। ১৯২৯ সালে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী 'অ্যানাপাবলোভা' ভারতে নৃত্য প্রদর্শন করতে এসে দক্ষিণ ভারতের নৃত্যকলা ও ভাস্কর্য-সম্পদের বিশেষ প্রশংসা এবং নৃত্যের সামাজিক হতাদর এবং জনসাধারণের নৃত্যের উন্নয়নে অনাগ্রহের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। ফলে সংস্কৃতি দরদীদের মধ্যে নব নৃত্য আন্দোলনে সাড়া জাগে।

ই. কৃষ্ণ আয়ার ১৯৩৪ সালে প্রতিভাসম্পন্না বালাসরস্বতী এবং সুদর্শন প্রতিভা দৃপ্ত তরুণ শিল্পী রামগোপালকে ১৯৪০ সালে আবিষ্কার করে তাঞ্জোরের বিশিষ্ট গুরুদের কাছ থেকে ভরতনাট্যমের পত্তনাল্লুব পদ্ধতির নৃত্যে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে সাধারণ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। শ্রীমতী বালাসরস্বতীর অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা ও শিল্পকর্ম সমন্বিত নৃত্যে নৈপুণ্যে এবং সুদর্শন নট

১। **Classical and Folk Dances of India—Marg Publication (Bombay) Odissi Dance—Mohan Khokar.** (দ্রষ্টব্য)

রামগোপালের নৃত্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের দেবমূর্তির প্রতিচ্ছবি দেখে জনসাধারণ মুগ্ধ হলো ও ভারতীয় নৃত্যকলার প্রকৃত স্বরূপ সবাই বুঝতে পারলো। তারই ফলে এই নৃত্য মন্দিরাদির বাইরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতেও যে হওয়ার উপযোগী এবং এতে রমণী ছাড়াও পুরুষেরাও অংশ নিতে পারে, সর্বোপরি এই নৃত্য ভদ্র পরিবেশে ভদ্র সন্তানদের দ্বারা যে অনুষ্ঠিত হতে পারে এ ধারণা জন্মাল। ভরতনাট্যম্ নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে রুক্মিণীদেবী আরুণ্ডেলের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। (এই প্রসঙ্গে পরে আলোচনা আছে।)

ভরতনাট্যমের পুনরুজ্জীবন, এই প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে ই-কৃষ্ণ-আয়ারের বক্তব্য থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—

·· The frequent invasions and political upheavals in the North, and the impact of the then alien cultures, led to the deterioration and final disappearance of the common classical dance tradition there. And though under these alien influences music was enriched and grew as the glorius Hindustani system, classical dance declined and died in the North giving place to other mixed arts. It is the good fortune of india that the original, national, common classical dance tradition was preserved intact and developed with sustained patronage from successive generations of kings and nobles in South India. It must also be, remembered that while all the other chief styles of dancing grew from their early regional folk art, Bharat Natyam was throughout based on the Natyashastra, through it innibed some other elements and developed into its present forms.

In spite of the prolonged continuity of its ancient and common original tradition, and the special features of its later forms, the dance art of India as a whole was more or less forgotten in the latter part of 19th century and the first quarter of the 20th century, chiefly as a result of foreign rule.

Foreign imperialist propaganda was interested in misrepresenting Indian art as intigrated, crude, immoral, vulgar and even aboriginal. English educated Indians also became victims of this kind of snobbery and developed a mentality that regarded everything Western as great and almost everything of their own as debased.

The devadasi system which had been helpful for ages in the past to preserve the best classical traditions in dance, deteriorated. Temple ritual dances became a lifeless formality. Patronage from discerning Royal Court declined and shifted to a few rich marriage parties. Though at such marriage Parties, Bharat Natyam was encouraged as Gandharba priti (Propitiation of Gandharvas), a sort of low atmosphere surrounded the whole thing. The life of devadasi was none to respectable. Though there were a few traditional families of dancers and dance-masters of distinction, they commended little respect and became steadily dispirited. All these facts were taken advantage of by social reformers, under Western influence, tomake dance synonymous with the decadent life and to set up a vigorous Anti-National movement to condemn the art itself as a moral evil in our society. One Miss Tenamp came all the way from England to persuade cultural and high placed Indian in Madras and elsewhere not to have anything to do with this art and collected signed promises from them to this effect.

The alien Government took no interest in the art. Thus the richest dance culture of the county lay neglected and decayed, except in one or two of its forms in South India, among a few families which preserved it tenaciously against the most dispiriting circumstances.

The renaissance of Bharat Natyam may be said to have been form on 1st January 1933 (Though a function of the Music Academy of Madras.).

In 1934, Balasarawati went to Benaras for a Bharat Natyam performance at the All India Music conference Gurudev Tagore was also at Benaras at that time in connection with a University function, He appeared to be anxious that modern generations should prove worthy of the legacy inherited from the genious of our ancestors. After that Varalakshmi and Bhanumati too have visited North India and helped to popularise it. (Bharat Natyam). Then Kalanidhi and Rukhmini Devi opened a new chapter in the history of the renaissance.*

॥ **ভরতনাট্যম্** ॥

দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশৈলী 'ভরতনাট্যম্'কে ভারতীয় নৃত্যকলার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপায়ণ বলে চিহ্নিত করা হয়।

এই নৃত্যশৈলীর উৎপত্তি ও নামকরণ বিষয়ে নানা মতবাদ রয়েছে। যেমন কেউ বলেন, যেহেতু ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুসারী করণ-প্রকরণ মুদ্রার ব্যবহারের প্রাচুর্য এই নৃত্যে রয়েছে সুতরাং এর নাম 'ভরতনাট্যম্'। কোনো মতে এটি ভরতমুনির সৃষ্টি তাই এর নামে ভরতনাট্যম্। ভিন্ন মতে ভাব, রাগ ও তাল, এ তিনটি বিষয়ের প্রথম তিনটি বর্ণ বা আদ্যক্ষর নিয়ে (ভ+র+ত) সমন্বয়ের ফলেই এর নাম রাখা হয়েছে ভরতনাট্যম্। কারণ এই তিনটি বিষয়ই ভরতনাট্যমে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা হলো—ভারতের প্রায় সবকটি উচ্চাঙ্গের নাচেই তো ভাব-রাগ-তালের ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং আদ্যক্ষর যুক্ত যুক্তির সারবত্তা কম। বরং বলা যায় ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে এর নাম ভরতনাট্যম্ বলা যায়—যেহেতু মুনি ভরতের নাম এর

* A Brief Historical Survey of Bharat Natyam—Medern period.—E. Krishna Iyer. (Marg Publication—Page 7.)

সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া 'ভরতনাট্যম' কি 'ভারতনাট্যম্' এ নিয়েও তো দ্বন্দ্ব আছে। জটিল বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় কথাটা হওয়া উচিত 'ভরতনাট্যম্' 'ভারতনাট্যম্' নয়। কারণ ভারতনাট্যম্ বলতে সমগ্র ভারতের এক বিশেষ নৃত্যশৈলীকেই ধরতে হয়। তা হলে ভারতে প্রচলিত এবং নাট্যশাস্ত্র অনুসৃত সকল ধারাকেই এই ভারতনাট্যমের নামকরণের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। কিন্তু তা সমীচীন নয়। কারণ যদিও ভরতনাট্যম্ ধরণের নাচ একদা সর্বভারতীয় নাচরূপে অনুশীলিত হয়ে এসেছে তবু বলবো এখন যে ভরতনাট্যম্ আমরা দেখে থাকি তা একান্ত দক্ষিণ ভারতীয় প্রভাবজাত এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুগামী নৃত্য ব্যাকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ। সুতরাং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে একে 'ভরতনাট্যম্' বলাই সমীচীন। (এ বিষয়ে আধুনিক যুগে ডঃ পদ্মা সুব্রহ্মনিয়াম 'ভরতনাট্যম্' বিষয়ে গবেষণা করে কিছু নতুন বক্তব্য রেখেছেন। সেই নিয়েও পণ্ডিতদের মতভেদের অন্ত নেই।)

ভরতনাট্যম্ শুধু দক্ষি ভারতেই নয়—সর্বভারতীয় নৃত্যশৈলী—আগেও ছিল, এখনো ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই নাচের চর্চা হচ্ছে। একদা সারা উত্তর ভারতেও এই নৃত্য প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে উত্তর ভারতের সংস্কৃতি যখন বিপন্ন ভরতনাট্যমের প্রগতি ব্যাহত হয় সেই সময় থেকে। অবশিষ্ট যা রইলো তারও মধ্যে অনুপ্রবেশ করল বিদেশী প্রভাব। (কথক নৃত্যে এই বিদেশী প্রভাব লক্ষ্যণীয়) কিন্তু দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ভরতনাট্যম্ এই বিপর্যয় থেকে অনেকাংশে অব্যাহতি পেয়েছিল। তাই তার মধ্যে প্রধান রীতি বর্তমান রইল। তাছাডা স্থানীয় রাজন্যবর্গের অনুগ্রহের জন্যও এই ধর্মভিত্তিক নৃত্যধারার প্রগতি প্রায় সমানভাবেই এগিযে চলছিল।

আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে কোন আচার ব্যবহার বা কলাবিদ্যার সঙ্গেই ধর্ম জড়িয়ে রয়েছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। সঙ্গীত বা নৃত্যকলাতেও তার প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। দেবতাদির পরিতৃপ্তির জন্য অনুষ্ঠান হতো—এর প্রমাণ দেবদাসী নৃত্যপদ্ধতি। ভারতের সমস্ত প্রান্তীয় মন্দিরেই এক সময় দেবদাসী সম্প্রদায় নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবতাদের প্রসন্ন করতেন। দেবদাসীরা যে শৈলীর নৃত্য করতেন তারই নাম ভরতনাট্যম্। উত্তর ভারতে প্রচলিত ভরতনাট্যমের জাত নষ্ট হলেও, দক্ষিণ ভারতের দেবদাসী এবং রাজন্যবর্গের প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতা ভরতনাট্যম্কে তার পূর্ব বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট

হতে দেয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালে দক্ষিণ প্রান্তীয় নৃত্যবৈশিষ্ট্য-এর কিছু মিশিয়ে একে আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে বর্তমানে যে সাতটি রীতি প্রদর্শিত হয়, সেই আলারিপু, যতিশ্বরম্, (এই যতিশ্বরই কুচিপুড়ি নাচে স্বরযতি নামে ব্যবহৃত হতে দেখেছি।) শব্দম্, বর্ণম্, পদম্ তিল্লানা (এটা উত্তর ভারতীয় প্রভাবে হয়েছে), শ্লোকম্। এগুলি পরবর্তীকালের অবদান। তাঞ্জোরের রাজা যায়কোজির পৃষ্ঠপোষকতায় নৃত্যবিদ চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম্ ও ওয়ারিভেল্ বা ভেদিভেল্ নামক চার ভাই এই রীতি-গুলির প্রবর্তক। তার আগে ভরতনাটাম্ বলতে বোঝাতো সদিরনাট্যম্, ভাগবতমেলা নাটক, কুরুভঞ্জি ও কুচিপুডি নৃত্যরীতি। এই কুচিপুড়ি, ওড়িশী ও ভরতনাটাম্ যে একই নৃত্যশৈলীর বিভিন্ন রূপমাত্র—যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

যাই হোক কণ্ঠসঙ্গীত এই নৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। কণ্ঠসঙ্গীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ব্যবহৃত হয়, এবং তানপুরা, বীণা, সুরশৃঙ্গার, বেহালা, বাঁশী, নাগেশ্বরম্, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গম্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলি এই নৃত্যের আবহ-সঙ্গীত রচনা করে থাকে। সাধারণতঃ এতে নয়টি তাল ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন মাত্রা ও যতিতে বিভক্ত।

এতে অভিনয়ের চারটি অঙ্গই—আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য, ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই নৃত্যের অন্যান্য লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো—

ধর্ম—দুই প্রকার—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী।

বৃত্তি—চারপ্রকার—ভারতী, সাত্ত্বকী, কৈশিকী ও আরভটি।

সিদ্ধি—দুই প্রকার—দৈবী ও মানুষী।

আসন—পাঁচপ্রকার—পদ্মাসনম্, সিংহাসনম্, যোগাসনম্, বীরাসনম্ ও সিদ্ধাসনম্।

মণ্ডলা—চারপ্রকার—মণ্ডলা, অর্ধ মণ্ডলা, সমমণ্ডলা ও নৃত্যমণ্ডলা।

পাদবিক্ষেপ—তিনপ্রকার—অঞ্চিতা, কুঞ্চিতা ও অর্ধঞ্চিতা।

ভঙ্গি—তিনপ্রকার—সম, বলিতা, ললিতা।

অঙ্গভেদ—তিনপ্রকার—করণ, অঙ্গহার ও মুদ্রা।

।। ভরতনাট্যমের সাতটি রীতি ।।

আলারিপু—(তেলেগু, শব্দ, রেচক প্রধান)
যতিস্বরম্—(তাল ও স্বর)।
শব্দম্—(অভিনয় প্রধান)।
ভরনম্—(নৃত্ত ও অভিনয়)।
পদম্—(গান ও পদের সঙ্গে অভিনয়, বিশেষ করে জয়দেবের পদ)।
জাভেল্লি—
তিল্লানা—(উত্তর ভারতীয় প্রভাব)।

ভারতীয় নৃত্যকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়—ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী। এই নাচগুলির বিষয়বস্তু, পদ্ধতিগত রীতি, প্রথাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ে নানা পার্থক্য আছে। রসপ্রকরণের দিক থেকে ভরতনাট্যমের 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' দুই রূপই দেখা যায়। নৃত্ত হল Pure বা abstract dance এবং নৃত্য হল অভিনয়প্রধান মুদ্রাসহ অঙ্গভঙ্গি। (নাট্য-রসাশ্রয়, নৃত্য-ভাবাশ্রয়, নৃত্ত-তাললয়াশ্রয়)। এই নৃত্য প্রধানতঃ মহিলা সম্প্রদায়ের জন্য। এতে যে মৃদঙ্গ, বাঁশী ইত্যাদি বাজে তাতে প্রাচীনকালের ছন্দবাদ্য কুতপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ছন্দবাদ্য নৃত্যের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এই নৃত্য দেবদাসীরা চর্চা করতেন। এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজদরবারেও এর প্রচলন ছিল। পূর্বে এর নাম ছিল—'দাসীআট্যম্' (Dassiyattam)।

বর্তমানে প্রচলিত ভরতনাট্যম্—আলারিপু, যতিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্, পদম্ ও তিলানা এই আঙ্গিকগুলি ব্যবহৃত হয়। অথচ প্রাচীনকালে এই ভরতনাট্যমে সদির আট্যম্ ভাগবতমেলা নাটক, কুরুভঙ্গি এবং কুচিপুড়ি প্রভৃতি আঙ্গিক ব্যবহৃত হতো। এই সাদির নাট্যমে ছিল—দাসীআটাম চিন্নয়ামেলম্ (Cinuamelam), ভোগমেলম্, তাঞ্জোরী প্রভৃতি।

ভাগবতমেলাম্ ছিল প্রধানতঃ ধর্মীয় ভাব এবং ব্রাহ্মণরাই এর চর্চা করতেন। কুরুভঞ্জি ছিল অনেকটা ব্যালে নৃত্যের মতো। বিশেষ করে 'ছন্দনৃত্য' বলা যায়। এটা মহিলারাই করতেন। এই কুরুভঞ্জির প্রাচীন নাম ছিল 'কুত্রাল-কুরুভঞ্জি'। সিদ্ধেন্দ্র যোগী কুচিপুড়ি নাচের প্রচলন করেন। কুচিপুড়ি মূলতঃ পুরুষদের।

শিল্পী পূর্বাঙ্গ করে আলারিপু দিয়ে। তার পর যতি+স্বরম্ ব্যবহৃত হয়। এতে তাল ও সরগম্ চলে। মৃদঙ্গ, মন্দিরা সহযোগে এই যতিস্বরম্ ধীরে ধীরে শব্দম্-এ পরিণত হয়। ধর্মীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শব্দম্ চলে। এর পর শুরু হয় বর্ণম্-এর। এই বর্ণমে থাকে নৃত্য-নাট্য ও নৃত্ত এই তিন অঙ্গ। এই তিন অঙ্গই অভিনয়ে লাগে। সবশেষে বিলম্বিত মধ্যম—দ্রুত তালে 'তিলানা' হয়।

ভরতনাট্যম্-এর মূল রস, আদিরস বা শৃঙ্গার। স্বর্গীয় ভাব প্রকাশে এই রস প্রধান।

যে ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্য, সদির নাট্য, কুরুভঞ্জি কুচিপুড়ি প্রভৃতির পথ পরিক্রমণ করে ভরতনাট্যম্, বর্তমান আকারে এসে রূপলাভ করেছে তার মধ্যে কুচিপুড়ির পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। এখানে সদির নাট্য, কুরুভঞ্জি ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্য তথা মেলাতুর পদ্ধতি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু উদ্ধৃত করা হলো। ভরত নাট্যমের মূল সূত্রটি বুঝতে এগুলির প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে মোহন খোকার উল্লেখ করেছেন[১]—

(1) Sadi'r Natya :—The Sadir Natya is the best known facet of Bhart Natyam. This is, in fact, the correct and original name for the dance art we refer to as Bharat Natyam today. It is the dance which was for centuries performed by the Devadasis in the temples and Darbars of South India, in particular, of course, of Tamil Nad. It consists of Nritta, pure dance, as well as Nritya, experiment dance. It is performed Solo, conventioning by women alone, and its abhinaya is based principally on the Sringara Rasa. The Sadir Natyam has also been known by other names, as Dasi Attam, Chinna Melam, Bhoga Melam, Tanjari, Nautch, Sadir Nautch or even simply as Sadir. It is only in the last, two decades or so that the appellation. Bharata Natyam has come to be freely used whre actually only the Sadir is meant.

১। Classical and folk Dances of India, Bombay, Marg Publication (Big-Vol)—Mohan Khokar, Page-27.

(2) **Kuruvanji :—**

The second variety of Bharat Natyam is the Kuruvanji. This is a type of ballet in which six to eight women take part. The kuruvanji are a type of literary composition written in poetic form suitable for interpretation through the dance. They are all based on the stock-theme of the fruition of the love of a girl for her hero, and this hero is either the deity of the temple or the patron king to whom the kuruvanji is dedicated. The oldest extent Kuruvanji is the Kutrala Kuruvanji. This was composed by Tirukuda Rajappa Kavirayer in the 18th century. In our own time, Kukmani Devi of Adyar has frequently presented this Kuruvanji as a dance ballet with her troupe of Kalakshetra artists.

এণাক্ষী ভবানী কুরুভঞ্জি নৃত্যকে লোক নৃত্যের পর্যায়ে ফেলেছেন—এবং একদা এই নৃত্য যে জিপসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হতো তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

"KURUVANJI"

Kuruvanji is a folk dance of Tamil Nad, performed in a crude and primitive form of Bharat Natyam technique. Its performers and Kurati, a hill tribe who are something like gypsys in that they are nomadic and earn their living by telling fortunes. The dancers usually are young pretty girls, whose cheeks have been tattooed in small mystic designs in order to prevent the gods from being attracted to them and therefore from taking them away from this world into the heavens. These girls wonder over the countryside and for a few pennies they dance and head fortunes for anyone who calls them. The technique of Kuruvanji dancing is freer and more casual than in Bharat Natyam, but of course the variety of gestures any rhythms is cosiderably more

limited. A number of Knruvanji ballet have been created and performed with success in Madras. These ballets utilise both the folk and professional techniques, and their stories usually concerned the part that the dancing fortune teller plays in match making or some similar romantic episode.[১]

॥ মেলাতুর ॥

মেলাতুর একটি জায়গার নাম। এই জায়গার নামেই একটি নাচের নাম 'মেলাতুর'। যেমন কুচেলাপুরমের নামে কুচিপুড়ি। বর্তমান তাঞ্জোর থেকে ১০ মাইলের মধ্যে এই মেলাতুর জায়গাটি অবস্থিত। এখানে দুটি নৃত্যধারার রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটেছে। এই দুটি ধারা হলো কুচিপুড়ি ও ভরতনাটাম্। অবশ্য কুচিপুড়ির প্রভাবই বেশী। এই কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যের ধারাটি এসেছে অন্ধ্র প্রদেশ থেকে। আব দশ মাইলের মধ্যে তাঞ্জোরের ভরতনাট্যম্ তো আছেই।

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর কুচিপুড়ি ভাগবত মেলা নৃত্যশিল্পীরা তাঞ্জোরে চলে যান। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন 'নায়ক' রাজারা। রাজা অচ্যুতাপ্পা নায়ক (১৫৬১-১৬১৪ খ্রীঃ) উক্ত ব্রাহ্মণ ভাগবত মেলার একশত ব্রাহ্মণ পরিবারকে 'অগ্রহায়ম্' (নিষ্কর জমিদান) অনুদান দিয়ে তাঁদের নৃত্যশিল্পের চর্চায় ও সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেন। এই অগ্রহায়ম বা ভূমিদানের ফলে যে জায়গাটির উদ্ভব হলো তার নাম অচ্যুৎপুরম্। রাজার নামেই এই জায়গার নাম। এই অচ্যুতপুরমকেই বলা যায় মেলাতুর।

তেলেগু ভাষায় লেখা 'যক্ষগণ' নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে মেলাতুর ও তার সংলগ্ন গ্রামগুলি একদা মুখরিত হয়ে উঠতো। এতে অংশ গ্রহণ করতের ব্রাহ্মন মেলা সম্প্রদায়। আজও মেলাতুরের ভাগবতমেলা উৎসবে তেলেগু ভাষায় লেখা কবি ভেঙ্কটরামণের রচনা অভিনীত হতে দেখা যায়। ইনি বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক ত্যাগরাজের সমসাময়িক ছিলেন বলে ধরা হয়।

॥ ভাগবত ॥

ভাগবত বলতে সাধারণতঃ আমরা হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'কেই বুঝি। কিন্তু 'ভাগবত' যে প্রাচীনকালে উপাধী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১। The Dance in India—Enakshi Bhabani, Page-157.

প্রথমতঃ দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে পুরোনো ব্রাহ্মণ ভাগবততুলুদের দ্বারা পরিচালিত 'ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্য' ভ্রাম্যমান ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। এই নৃত্যনাট্য সম্প্রদায়ের নাম 'ভাগবতমেলা' হবার কারণ, এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যাঁরা তে'লগু ভাষায় 'ভাগবতুলু' নামে উপাধিতে ভূষিত এবং পরিচিত। এই ভাগবত মেলা নৃত্যনাট্য ধারা থেকেই পরবর্তীকালে ভায়তীয় বিভিন্ন নৃত্যধারায় নৃত্যনাট্যগুলি গড়ে উঠেছে। এই তো গেল আমাদের দেশের কথা। বিদেশীরাও যে "ভাগবত" উপাধি ধারণ করতেন, সে কথা উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার। তিনি লিখেছেন—

"In the second century before christ, a greek named Heliodoros the son of Dion, when travelling in India on an embassy, could adore Vishnu and erect a column in honour of the Hindu God. Men considered it quite natural that he should do so and take to himself the title of a Bhagabat or Vaishnav. (*The Besnagar pillar—inscription in the Brahmi script records—"This column, surmounted by the figure of Garnda (the boid sacred to Vishnu) was created by Heliddoros, a Bhagavat, and an inhabitant of Taxila, the son of Dion, and a Greek King Antalkidas to King Bhagabhad."[১])

॥ ভাগবতমেলা নাটক তথা নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গ ॥

ভারতবর্ষে নাটক ও নৃত্যনাট্যের ধারা—প্রাক্-ভরত যুগ, ভরত যুগ এবং ভরতোত্তর যুগ নিয়ে বিধৃত হয়ে আছে। ভাগবত মেলা নাটক তথা নৃত্যনাট্যের ঐতিহ্য যদিও গড়ে উঠেছিল অষ্টম, নবম, ও দশম শতাব্দীতে, তবু এর মূল অনুসন্ধান করতে হবে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ও পরবর্তীকালের নাট্য ঐতিহ্য থেকে।

যাই হোক, ভাগবত মেলা নাট্য প্রক্রিয়া ও কুরুভঙ্গি নৃত্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভবিষ্যতের ভরতনাট্যম্ নৃত্যের মৌল উপাদান বা বুনিয়াদি ভঙ্গিগুলি (Basic Movement) গড়ে উঠেছিল, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ভরতনাট্যম্ নৃত্যের উৎস ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যের কথা আলোচনা করতে গেলে ভাগবত মেলার কথা এসে পড়ে।

১। India Through the Ages—J. Sankar, Page-68, 69.

ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে আমরা প্রাচীনকালের নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা বিষয়ে প্রভূত উপাদান পাই। নাট্যশাস্ত্রে দশ প্রকার নাটকের নাম পাওয়া যায়। এদের বলা হয়, 'দশরূপক'। যেমন, নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভান, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম, ঈহামৃগ—এই দশটি (রূপক) নাট্যলক্ষণ-যুক্ত। এই রূপকগুলি প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

এই নাট্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল নৃত্য প্রক্রিয়া। 'নাট্য' শব্দটির মধ্যেই নৃত্যের ব্যঞ্জন নিহিত রয়েছে। হরিবংশ পুরাণ (দ্বিতীয় শতাব্দী) থেকে রাজ শেখরের লেখা 'কর্পূর মঞ্জরী' (১০০ শতাব্দী) পর্যন্ত এই নাট্য ও নৃত্য প্রক্রিয়ার বিষয়ে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের কথা জানা যায়। বর্তমান ভারতে একক নৃত্য (Solo Dance) ও নৃত্যনাট্য (যৌথ নৃত্য) দেখা যায়।

প্রাচীন নাটককে বলা হয় 'রূপক'। আর পরবর্তীকালে ঐ রূপক থেকেই নৃত্যনাট্য বা 'উপরূপক'গুলির সৃষ্টি হয়েছে। ভরতের পর উপরূপক বিষয়ে সার্থক আলোচনা করেন কোহল। এরপর উপরূপক প্রসঙ্গে জানা যায়—অভিনব ভারতী, শৃঙ্গার প্রকাশ, ভাবপ্রকাশন, নট দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে। এই সকল গ্রন্থে 'কাব্য' ও চিত্রকাব্য' এবং 'উপরূপক'-এর কথা জানা যায়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-কে চিত্রকাব্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। উপরূপকের এই ধারাটি পরবর্তীকালের নৃত্য ও নাট্য প্রক্রিয়াকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। এভাবে এ ধারাকে কেন্দ্র করে অনেক গীতিনাট্য সৃষ্টি হয়। প্রধান নৃত্যনাট্য তৈরী হয় বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায়। ভবিষ্যতে গীতগোবিন্দকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে—আসামের শঙ্করদেব ও বিহারের উমাপতির রচনাবলী, তামিলনাড়ুর 'ভাগবতমেলা নাটক, অন্ধ্রের 'যক্ষগণ' ও 'কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্য', কর্ণাটকের 'যক্ষগণ', কেরালার 'কৃষ্ণ নাট্যম্' ও 'কথাকলি নৃত্যনাট্য' প্রভৃতি।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর নৃত্যনাট্য-ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে গীতগোবিন্দের প্রেরণায়। গীতগোবিন্দকে কেন্দ্র করে যে ভক্তি-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা অন্ধ্র' তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালা অঞ্চলের পারফর্মিং আর্টকে (Performing Act) বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে। আগে ঐ সব অঞ্চলের নৃত্যনাট্যের কাহিনীতেও ছিল শৈব প্রাধান্য। গীতগোবিন্দের প্রভাবে পড়ে এগুলির কাহিনীতে দেখা দেয় বৈষ্ণব প্রাধান্য। শিবের স্থান দখল করেন কৃষ্ণ।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর ভাগবতমেলা নাটক-ঐতিহ্য গড়ে ওঠে ভক্তি

আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এভাবে পুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে কাহিনী নিয়ে তীর্থনারায়ণ যাতি ও সিদ্ধেন্দ্র যোগী ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন নৃত্য-সঙ্গীত-নাট্যধারা। এ সব অনুষ্ঠান যাঁরা করতেন, তাঁদের অন্ধ্রে বলা হতো "ভাগবতুলু" এবং তামিলনাড়ুতে বলা হতো "ভাগবতর"।

কুচিপুড়ি ব্রাহ্মণ ভাগবতুলুরা তামিলনাড়ুতে ভাগবতমেলা নাটককে প্রভাবিত করে। এবং তখন মেলাতুরের কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে তাঞ্জোরের ভরতনাট্যমের টেক্‌নিকের এক অপূর্ব সুন্দর মিশ্রণ দেখা যায়।

ভেঙ্কটরামন শাস্ত্রী মূলতঃ সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও ভাগবতমেলার কাহিনী লেখেন তেলেগু ভাষায়। যদিও তিনি মাঝে মাঝে সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত ত্যাগরাজার সমসাময়িক এবং তাঞ্জোরের মারাঠারাজ রাজা সরভোজি দ্বিতীয় (১৭৯৮-১৮৩২) এবং রাজা শিবাজীর (১৮৩২-১৮৫৫) মধ্যবর্তী সময়ের পণ্ডিত।

ভাগতমেলা নাটক তাঞ্জোর জেলার পাঁচটি গ্রামে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামগুলির নাম **Soolamangolam, Saliymangalam, Oothakadu, Nallur** এবং **Thepetumanallur.** যদিও ভাগবতমেলা নাটকের উৎসভূমি ধরা হয় মেলাতুরকে তবু উক্ত গ্রামগুলির মন্দিরপ্রাঙ্গণেও ভাগবতমেলার প্রচুর অনুষ্ঠান হতে দেখা গেছে।

ভাগবতমেলাতে "নৃত্ত" ও "নৃত্য" এবং "নাট্য"—এই তিনের সমন্বয়ের একটা মিলিত রূপ দেখা যায়। অদাভুযাতি ও তিরমনম্‌ এর প্রয়োগ এতে দেখা যায়। অনুষ্ঠান হতো বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত তালে ও লয়ে। এঁদের অভিনয়ে 'আঙ্গিক' ও 'মুখজ' অভিনয়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই দুইটি প্রক্রিয়াই পরবর্তীকালে ভরতনাট্যম্‌ নাচকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এতে কখনো থাকতো 'বাচিকাভিনয়'। নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্য অনুসারী লোকধর্মী (**Realistic**) ও নাট্যধর্মী (**Stylised**) এই দু'টি রীতিই এতে প্রয়োগ হতো।

ভাগবতমেলা নাটকের পথ ধরেই পরবর্তীকালের বিভিন্ন ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যধারা অগ্রসর হয়েছে। বিশেষভাবে ভরতনাট্যম্‌ কুচিপুড়ি নৃত্যের উৎস ও ঐতিহ্য (**Origin and Tradition**) জানতে গেলে ভাগবত নাটক ধারাকে আমাদের ভালভাবে জানতে হবে। কারণ, ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যের অনেক প্রাচীন

উপাদান উক্ত ভাগবতমেলা নাটকের মধ্যেই সুপ্ত বীজ আকারে রয়ে গেছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও সন্নিহিত অঞ্চলের ভারতীয় নৃত্যপ্রবাহ—

কথাকলি নৃত্যাভিনয়।

কৃষ্ণনাট্যম্ নৃত্যনাট্য।

মোহিনী আট্টম্।

কেরালার 'কলি' নৃত্য প্রসঙ্গ।

(এই **Classico-Folk** ধরনের প্রায় কুড়ি প্রকার 'কলি' নাচের নির্মাণ থেকে পরিমার্জিত 'কথাকলি' নৃত্যের উদ্ভব ধরা যায়।)

॥ কথাকলি নৃত্যপ্রসঙ্গ ॥

সুপ্রাচীনকাল থেকেই কেরালার অধিবাসীরা অভিনয়াদি সম্পর্কীয় শিল্পকলায় প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত, এলানকোভাদিগণের তামিল গ্রন্থ 'শিলপ্পধিকরম্'-এ 'কুথু' ও 'কোদিয়াট্যম্' নামে দুই প্রকার শিল্পের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সময় 'কুথু' ও 'কোদিয়াট্যম্' খুব জনপ্রিয় ছিল। হিন্দুদের মধ্যে 'চাক্কিয়ার' নামক সম্প্রদায় ঐ 'কুথু'র চর্চা করতেন। কুথু মূলতঃ একক অভিনয় সমৃদ্ধ। অভিনেতা এতে পুরাণের কাহিনী বর্ণনা করতেন রসিকতা করে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই হাস্যরসাত্মক অভিনয় হতো। চাক্কিয়ারগণ যে কোন বিষয় বা ব্যক্তির উপর বিষয়বস্তু নির্বাচন করে কৌতুকপূর্ণ অভিনয় করতে পারতেন। স্বভাবতঃই এই জন্য তাঁকে নানা ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। শত শত বছর ধরে ঐ কুথু অভিনয়ের মধ্য দিয়েই 'কথাকলি' নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে।

খ্রীষ্ট জন্মের আগে থেকেই সমগ্র কেরালায় সংস্কৃত ভাষায় চর্চা হয়ে এসেছে। সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কাছে সংস্কৃত নাটকের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তখন। চাক্কিয়ারদের সঙ্গে সহযোগী আরেকটি সম্প্রদায় ছিল, তাঁরা সংস্কৃত নাটক অভিনয় করতেন। এঁদের নাম ছিল—'নাম্বিয়ার'।

কোদিয়াট্যম্-এ পুরুষরা মহিলাদের অভিনয় করতে পারতেন না। শুধুমাত্র নাম্বিয়ার সম্প্রদায়ের মহিলারা, যাঁদের নামগায়ার বলা হতো, তাঁরাই অভিনয় করতেন। কুথু ও কোদিয়াট্যম্ সাধারণতঃ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হতো। কেরলের নামকরা গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলির বাৎসরিক উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রে এই চাক্কিয়ার

কুথুদের নাম দেখা যায়। কোদিয়াট্যম্ ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে। তবু বলা যায় যে, ঐ কুথু ও কোদিয়াট্যম্-এর মাধ্যমেই কেরালায় অভিনয় শিল্পের সার্থক রূপায়ন সম্ভব হয়। তারই ফলশ্রুতি 'কথাকলি'।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই কেরালার লোকেরা নৃত্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। কেরালায় অনেক লোকনৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্যের মধ্যে একটা মূলগত ছন্দ অনুসৃত হতে দেখা যায়। মৃদঙ্গ বা কণ্ঠসঙ্গীতের ব্যবহার প্রাচীন কেরালার লোকনৃত্যে প্রায় অনুপস্থিত হলেও কোথাও কোথাও মৃদঙ্গের ব্যবহার দেখা যেত।

ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে, একদিকে সুবিশাল পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও অপরদিকে বিরাট আরবসাগরের প্রভাব কেরালার শিল্পকলাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। ঐ প্রাকৃতিক পরিবেশ-শিল্পে অতিপ্রাকৃতের প্রভাব এনে দিয়েছে।

আর্য নাম্বুদ্রিদের আগমনের পর স্থানীয় দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এক বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে বিবদমান নায়ার মিশ্রণে এক 'সংকর সংস্কৃতি'র যুগ সুরু হয়। পববর্তীকালে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ এর প্রভাব পড়ে। কেরালার বিখ্যাত মন্দির 'গুরুভায়ুর'তে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির কাছে গীতগোবিন্দের অষ্টপদী অভিনয় সেই যুগে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। নাম্বুদ্রিরা গীতগোবিন্দের সাহিত্য রসেই বিভোর হয়ে থাকেন নি, পরন্তু ঐ বিষয়বস্তু নিয়ে 'ব্যালে' বা নৃত্যনাট্য প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। এরই প্রভাবে কালিকোটের জামরিন রাজা 'কৃষ্ণনাট্যম্' নৃত্যনাট্যের উদ্ভাবন করেন। কথাকলির ক্রম-বিকাশে 'রামনাট্যম্' নামে আরেক প্রকার শিল্পকলার কথা জানা যায়। তবু বলতে হয়, কথাকলিতে সবচেয়ে প্রাধান্য রয়েছে কুথু ও কোদিয়াট্যমের। বর্তমানে আমরা কথাকলির যে রূপ দেখি তার বিকাশ শুরু হয় ৩০০ বছর আগে। ধারাবাহিক প্রথাবদ্ধতায় এই কথাকলি নৃত্য চলে এসেছে। দীর্ঘদিনের অনুশীলনে কথাকলি নৃত্য নানা উপাদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মিশ্রণে এক অপূর্ব নৃত্যকলার সৃষ্টি করেছে (মণ্ডনকলার সুপরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে)। খণ্ড খণ্ড নৃত্যের উপাদান মিলে মিশে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এক সামগ্রিক নৃত্যকলা ধীরে ধীরে রপ লাভ করে। নানা উৎসব অনুষ্ঠানে এর সূচনা হতো উচ্চশব্দবিশিষ্ট বাজনা ও গানের মধ্য দিয়ে। এই বাজনা ও

গান দর্শক ও শ্রোতাদের এক ছন্দময় ফ্যান্টাসির জগতে নিয়ে যেতো। এই নৃত্য, বাদ্য ও সঙ্গীত সকলেরই মনে এক অদ্ভুত কল্পনার জগতের দ্বার খুলে দিত।

যদিও কথাকলি নাচে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এর অনুসরণ দেখা যায় তবু একে ঠিক অনুকরণ বলা যায় না। তার কারণ কথাকলি নাচে নাট্যশাস্ত্রের করণ প্রকরণের কিছু অনুসরণ থাকলেও নিজেই এই শিল্পকলা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। দুর্ধর্ষ যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নাটকীয়তা সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে এই কথাকলি নৃত্যের মধ্যে।

কথাকলি নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্য—এই উভয়প্রকার আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়। তবু বলা যায় লাস্য অপেক্ষা তাণ্ডবাংশের নাচই হলো কথাকলি। কারণ এই নাচে পৌরুষ দরকার। কম করে ১২।১৪ বছর পরিশ্রম করে এই নাচের চর্চা করলে, তা হলে শিল্পীর দক্ষতা জন্মে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গকে ভাবে ও রসপূর্ণ অভিব্যক্তির উপযোগী করে গড়ে তুলতে অনেক সময়ের দরকার হয়। দেহের প্রতিটি অংশকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে রাখতে হয় অভিনয়ের সময়। হাতের মুদ্রা, মুখের ভাব ব্যঞ্জনার দেহের যে ছন্দময় অভিব্যক্তি—তাই কথাকলি নৃত্যের প্রাণসঞ্চার করে। এই নৃত্যনাট্যের অভিনেতা অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রার সাহায্যে অভিনয় করে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গীত শিল্পীরা 'শ্লোক', 'পদ' গান করে থাকে। অশুভ কোন চরিত্র রূপায়ণে শিল্পী প্রয়োজন মতো উচ্চ স্বর অসম্বদ্ধ বিকট চীৎকার বা ঐ ধরনের আওয়াজ করতে পারেন ভাবটিকে সঠিক ভাবে ফোটাবার জন্য।

যেহেতু কথাকলি নাচে পৌরাণিক কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়, সেহেতু চরিত্র চিত্রণে যে মেকাপের আশ্রয় নেওয়া হয় তাতে একটা অতি প্রাকৃতের প্রভাব থাকে। অর্থাৎ এঁরা যেন এ জগতের কোন জীব নয় এমন এক উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত বেশভূষা ও মেকাপ রচনা করা হয়। এতে মুহূর্তের মধ্যে দর্শকও যেন এর পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে মনে মনে সেই পৌরাণিক জগতই চোখের সামনে ভাসতে দেখে। ঐ মেকাপ তৈরী করতে প্রায় তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে। প্রখর রঙে রঞ্জিত করে মুখের সমুন্নতি রেখাগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়।

মুখের মেকাপ ও বেশভূষা দেখে বোঝা যায় কোন চরিত্রটি অভিনীত হচ্ছে। এই জন্যেই পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্রগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন :—

(১) 'ধীরোদাত্ত' অর্থাৎ উন্নত ও মহান চরিত্র। এতে মুখমণ্ডল সবুজ রং-এ চিত্রিত করা হয়। আর যে পোষাক পরা হয় তাকে বলে 'পাচ্চা' (Paccha)। এই চরিত্রের মূল ভাব ও রস শৃঙ্গার। দেবরাজ ইন্দ্র, নলরাজা, যুধিষ্ঠির, রুক্‌মাঙ্গদা, অর্জুন ও ভীমসেন প্রভৃতি চরিত্র এর উদাহরণ। ঐ পাচ্চা পোষাক যাঁরা পরবেন তাঁদের সবুজ রঙের মুকুট 'কিরীটম্' পরতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণ বা রাম চরিত্র চিত্রণে অন্য মুকুট পরতে হবে, যাঁর নাম 'মুদি'। এই পাচ্চা পোষাক পরা চরিত্ররা সত্বগুণ সম্পন্ন এটা ধরে নেওয়া হয়।

(২) 'কথি' এর পরের স্তরের চরিত্রগুলি (যা ধীরোদাত্ত নয়) পরবে 'কথি' নামক পোষাক। এ পোষাক অনেকটা পাচ্চার মতোই দেখতে। তবে মেকাপ অন্য রকমের। এতে গালের দুদিকে চিবুক বিস্তৃত গাঢ় লাল রঙের উঁচু প্যাটার্ণের মেকাপ হয়।

অধিকন্তু নাকের ডগায় একটি সাদা বলের মতো বস্তু দেওয়া হয়। যার নাম 'ছুট্টিপপু'। এবং ঐ ধরনের আরও একটি কপালের উপর স্থাপন করা হয়। এই 'কথি' হলো রজঃগুণের প্রতীক। এই মেকাপ সাধারণতঃ রাবণ, কংস, দুর্যোধন প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজকীয়তা ও অশুভ কিছু বোঝাতে যুগ্মভাবে এই 'কথি' মেকাপ হয়। কুচক্রী চরিত্রগুলি অভিনয়ের সময় মুখে কোন শব্দ না করলেও 'কথি' পরিহিত চরিত্রগুলি অভিনয় উপযোগী শব্দ করতে পারে মুখে।

(৩) তমোগুণ সম্পন্ন চরিত্র চিত্রণে 'থাটি' মেকাপ ব্যবহৃত হয়। এতে লাল, কালো ও সাদা 'থাটি' থাকে। থাটি হল শ্মশ্রু বা দাড়ি। ভয়াল-ভয়ঙ্কর চরিত্রে লাল থাটি ও বড় সাইজের মাথায় মুকুট ব্যবহৃত হয় (পাচ্চা, কিরীট থেকে বড়)। এতে ছোট্টিপপু নাকে ও কপালে লাগানো হয়—তবে সাইজ একটু বড়। বকাসুর, রাক্ষস, দুঃশাসন প্রভৃতি খল বা সয়তান চরিত্রে লাল থাটি লাগে। ধ্বংসের প্রতীক স্বরূপ সুদর্শন চক্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিষ্ণুর শক্তিমান অস্ত্র এই সুদর্শন চক্র। দুষ্টকে ধ্বংস করাই এই চক্রের প্রধান কাজ। বীরভদ্র ও বানর রাজ বালি এবং সুগ্রীবের চরিত্র চিত্রণেও 'থাটি' পোষাক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কালো থাটি নলচরিতে কালীর চরিত্রে দেওয়া হয়। লাল থাটি অশুভ কোন কোন চরিত্রে ব্যবহৃত হলেও, কালো রঙের থাটিই বেশী দেখা যায়।

(৪) কথাকলিতে সম্পূর্ণ কালো পোষাক ও কালো মেকাপ ব্যবহৃত হয়—একেই বলে 'করি'। এতে আদিম পোষাকের অনুকরণে মাথায় মুকুট পরা হয়। আদিবাসী পুরুষ ও মহিলাদের বোঝাতে এই 'করি'র প্রয়োগ হয়। শূর্পনখা, তারকা রাক্ষসী ও কিরাত প্রভৃতি চরিত্রে 'করি' পোষাক অপরিহার্য।

(৫) কোন ভদ্র চরিত্রের জন্য মিনুক্কু মেকাপ নেওয়া হয়। এতে হলুদ মিশ্রিত কমলা রঙে মুখাবয়ব রঞ্জিত করা হয়। এতে কোন ছুটি বা অন্য কোন পোষাক ব্যবহৃত হয় না। স্ত্রীলোকের ঋষি এবং ব্রাহ্মণদের এই মিনুক্কু মেকাপ দেওয়া হয়। তাছাড়া রাজদূত ও সাথীদেরও এই মিনুক্কু মেকাপ নিতে হয়।

॥ কথাকলির কাহিনী ॥

মালয়ালম ভাষায় লিখিত 'অওকথা' থেকেই কথাকলির কাহিনী লেখার সূত্রপাত। এতে শ্লোকে থাকতো বর্ণনাত্মক বিষয়ের অবতারণা আর পদে থাকতো কথোপকথন পদ্ধতি। বিভিন্ন রাগে এই শ্লোক ও পদগুলি পাওয়া হতো এবং তার সঙ্গে থাকতো করতাল ও মৃদঙ্গের বোল। কথাকলি নাচে, চেণ্ডা, মাদলম্, চেংদিলা ও ইলাথালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। দুজন গায়ক চেংগালাই ও ইলাথালাম্ বাজায়। প্রধান গায়ককে বলা হয় 'পুন্নম্'। অপর গায়ককে বলা হয় 'সঙ্গীত'। এই পুন্নম্ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে।

কথাকলি মঞ্চ খুবই সাধারণ ভাবে সাজানো হয়। বিরাট নারকেল তেলের প্রদীপই একমাত্র প্রধান উপাদান থাকে মঞ্চে। এই প্রদীপের কাছেই নৃত্যানুষ্ঠান হয়। মঞ্চে 'তিরশিলা' নামে একটি পর্দা থাকে। কথাকলি নৃত্যে রামায়ণ ও মহাভারত-এর কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়। মুক্তাঙ্গনে খোলা আকাশের নীচে সারা রাত ধরে কথাকলির অভিনয় চলে। প্রারম্ভে 'কেলিকত্তু' নামে একটি অনুষ্ঠান হয় তাতে বাজনা বাজিয়ে জনসাধারণকে জানানো হয় অভিনয়ের কথা। রাত ৯টায় প্রদীপের কাজে মদালম্ বাজানো হয় কিছুক্ষণের জন্য। একে বলা হয় 'আরাংগুকেলি' এর সঙ্গে হয় 'তোড়ায়াম্'। এতে দু একজন অভিনয় করে থাকেন। এই তোড়ায়ামের সময় ঐ তিরশিলা নামক পর্দা দুজনে ধরে থাকেন। পর্দার পেছনেই তোড়ায়াম হয়। তোড়ায়াম এর পর গায়ক সেই রাতের অভিনয়ের কাহিনী শ্লোকাকারে বলে। এর পর অনুষ্ঠিত

হয় 'পরাপ্পত্থু'। ইতিমধ্যে পর্দা সরে গেলে আসল পাত্র-পাত্রীকে দেখা যায়। তখন মৃদঙ্গ ও করতাল ভীষণভাবে বেজে ওঠে। একে বলা হয় 'মেলাপ্পদ'। এই মেলাপ্পদ-এর পর আসল কাহিনীর অভিনয় সুরু হয়।

পাচ্চা ও মিনক্কু ছাড়া অন্য পোষাকে যখন শিল্পী জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন তখন একটি আচার অনুষ্ঠান হয়, যার নাম 'থিরাসোকো'। যাই হোক শিল্পী 'থিরশিলা' নামক পর্দার পেছনে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যের সঙ্গে পর্দা নীচে নামানো হয় খানিকক্ষণের জন্য। এই সময় দর্শক শিল্পীকে দেখতে পান। নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে যাতে দর্শক চরিত্রানুযায়ী মেকাপ দেখে সঠিক ধারণা করে নিতে পারেন সেই সুবিধার জন্যই এটা করা হয়ে থাকে। তারপর চলে আসল কাহিনীর নৃত্যানুষ্ঠান। এ ভাবে কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠান চলে সারারাত ধরে। সুরু হয় 'থিরশিলা' দিয়ে শেষ হয় 'মঙ্গল শ্লোক' দিয়ে ভোরে বা সকালে।

ভাস্কর্যে কথাকলি নৃত্যের কোন মূর্তি চোখে পড়ে না। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। পুরোনো ভাস্কর্যে মণিপুরী কথক প্রভৃতি নৃত্যের ভঙ্গিও দেখা যায় না। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে নৃত্য ভাস্কর্য বা মন্দিরগুলি যে সময় তৈরী হয়েছিল তখন এই সকল নাচের আঙ্গিক ও পদ্ধতিগত রূপের উদ্ভব হয়নি। হলে শিল্পীরা নিশ্চয়ই অন্ততঃ দুই একটি ভঙ্গিমা খোদাই করে রাখতেন। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে নৃত্যের মূর্তিগুলির ভঙ্গিগুলি নাট্যশাস্ত্রের অনেকটা অনুসারী। চিদাম্বরমের নাট্যশাস্ত্রের ১০৮ করণ চমৎকার ভাবে মূর্তিতে খোদাই করা আছে। সুতরাং বলা যেতে পারে ভরতনাট্যম্ উড়িষী, কুচিপুড়ি প্রভৃতি নৃত্যের আঙ্গিকেই বেশীর ভাগ ভাস্কর্য মূর্তিতে রূপ নিয়েছে।

॥ কৃষ্ণনাট্যম্ নৃত্যনাট্য ॥

কেরালায় প্রায় কুড়ি প্রকার 'কলি' নৃত্য প্রচলিত আছে। তার মধ্যে 'কথাকলি' কুলীনকুলে স্থান করে নিয়ে, ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যে উন্নীত হয়ে এখন জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। এই কথাকলি নাচের দুটি উল্লেখযোগ্য উপধারা আছে পদ্ধতিগত দিক দিয়ে। এই উপধারা দুটির নাম—কৃষ্ণনাট্যম্ ও মোহিনী আট্টম্।

দক্ষিণী-গুরুদের মুখে শুনেছি, কেরালাতে একদা আর্য নাম্বুদ্রিদের আগমনের

পর স্থানীয় দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তার অনেক পরে এঁদের সঙ্গে বিবদমান নায়ার সম্প্রদায়ের মিশ্রণের ফলে এক 'সংকর সংস্কৃতির' যুগ সুরু হয়। এঁরা বেশীর ভাগই ছিলেন শাক্ত ধর্মাবলম্বী। তার ফলে কথাকলির ক্রমবিকাশে 'রামনাট্যম' নামে একটি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত শিল্পকলার কথা জানা যায়। যাই হোক পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রাধান্যে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রভাব পড়ে। তারই ফলশ্রুতি কেরালার বিখ্যাত মন্দির 'গুরুভায়ুর'তে (Guruvayur) শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন। এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গীতগোবিন্দের অষ্টপদীর অভিনয় সেই যুগে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নাম্বুদ্রিরা শুধু গীতগোবিন্দের সাহিত্য বা সাঙ্গীতিক রসেই বিভোর থাকেন নি, পরন্তু ঐ বিষয়বস্তু নিয়ে 'ব্যালে' বা নৃত্যনাট্য প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টায় প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা করেন কালিকটের জামরিণ রাজারা। এ ভাবেই 'কৃষ্ণনাটাম্' নৃত্যনাট্যের উদ্ভব হয়।

এই নৃত্যনাট্যের উদ্ভব কাল ধরা হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৬৫২ খ্রীঃ কোজিকোড বা কালিকটের জামরিণ রাজা মানদেবন শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী নিয়ে ৮টি নাটক রচনা করেন। এতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে স্বর্গারোহন পর্যন্ত ঘটনা আটটি খণ্ডে যা পৃথক পৃথক নাটকে রূপায়িত হয়েছে। বছরে একবার ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কৃষ্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গুরুভায়ুর মন্দিরে কৃষ্ণনাটাম্ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া অনেক সময় জামরিণ রাজাদের প্রাসাদের সংলগ্ন প্রাঙ্গনে মঞ্চ তৈরী করেও এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এই অনুষ্ঠান জামরিণ রাজারা উপভোগ করেন প্রাসাদের ওপরের অলিন্দ থেকে। সাধারণ দর্শকরা বসেন মাটিতে মাদুর পেতে। আর সম্মানিত নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরা নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কাছে থেকে দেখে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

রাজা মানদেবন ছিলেন বিখ্যাত গুরু বিল্বমঙ্গলম্ স্বামী আয়ারের ভক্ত শিষ্য। কথিত আছে বিল্বমঙ্গলমকে ছুঁয়ে থেকে কৃষ্ণ ভজনা করলেই নাকি কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যেত। এই প্রেরণায় সংস্কৃতে আটটি নাটক লিখেন— যার একত্র সংযোগে গড়ে উঠলো কৃষ্ণনাট্যম্। এবং এই নাটকগুলি শ্রীকৃষ্ণকেই উৎসর্গ করা হলো। এখনো কৃষ্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গুরুভায়ুর মন্দিরের সন্নিকটে রাজা মানদেবনের সমাধির পাশে মঞ্চ তৈরী করে বিশেষ কৃষ্ণনাট্যম্ অনুষ্ঠিত

হয়। যদিও কথাকলি নৃত্যাভিনয়ের অঙ্গরচনা (makeup) পোষাক পরিচ্ছদ, নাটকীয়তা অনেকটা পরিমাণে কৃষ্ণনাট্যমে অনুসৃত হতে দেখা যায় তথাপি প্রায় তিনশত বছরের পরম্পরাগত (traditional) ঐতিহ্যে কৃষ্ণ নাট্যমে একটি স্বতন্ত্রধর্মী নৃত্যধারা সৃষ্টি হয়েছে। এই কৃষ্ণনাট্যমে নৃত্যই প্রধান আঙ্গিক। চার প্রকার অভিনয়ের মধ্যে বাচিকাভিনয় বাদে আর তিনটি (আঙ্গিকাভিনয়, আহার্য্যাভিনয় ও সাত্ত্বিকাভিনয়) কৃষ্ণ নাট্যমে উপস্থিত।

কথাকলি নৃত্যাভিনয়ের পথ বেয়ে কৃষ্ণনাট্যমের উদ্ভব হলেও কথাকলির সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন—মেকাপ প্রসঙ্গ। কথাকলির সঙ্গে কৃষ্ণ নাট্যমের মেকাপ বিষয়ে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে প্রায় একই রকম। কিন্তু একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে—উভয় রীতিতেই পার্থক্য আছে। পার্থক্য খুবই সামান্য—যেমন কথাকলিতে মুখে মে-কাপ লাগানো হয় কিন্তু কৃষ্ণনাট্যমে মুখোশের আংশিক ব্যবহার হতে দেখা যায়। অবশ্য ছো-নাচে যেমন সকল চরিত্রই মুখোশ ব্যবহার করে অভিনয় করে, কৃষ্ণনাট্যমে ততটা নয়। তাছাড়া কথাকলিতে ব্যবহৃত তীব্রস্বর যুক্ত বাদ্যযন্ত্র 'চেণ্ডা'র ব্যবহার কৃষ্ণনাট্যমে নেই। এ থেকেই বোঝা যায় কথাকলি অপেক্ষা কৃষ্ণনাট্যম্ Soft নাট্যশাস্ত্রের 'পিণ্ডিবন্ধ' রূপ নাচের অনুরূপ ভাব কৃষ্ণমাট্যমে দেখা যায়। চিন্দাম্বরম্ মন্দিরে উৎকীর্ণ করণ এর কিছু কিছু কৃষ্ণনাট্যমে ব্যবহৃত হয়।

॥ **মোহিনী আট্যম্** ॥ (কেরালায় নৃত্য অর্থে 'আট্টম' শব্দ ব্যবহৃত হয়)

ভারতবর্ষের কেরালা প্রদেশ নাচের জন্য বিখ্যাত। এখানে যেমন বিভিন্ন 'কলি' নামে নৃত্য রয়েছে অন্ততঃ কুড়ি প্রকারের, তেমনি বিখ্যাত শাস্ত্রীয় বা ক্ল্যাসিক্যাল নাচ 'কথাকলি' এবং তার বিশিষ্ট তিনটি উপধারা রয়েছে—কৃষ্ণনাট্যম্, রামনাট্যম্ ও মোহিনী আট্টম্—যার প্রচলন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে। তাহলেও এই তিনটি উপধারার অন্যতম মোহিনী আট্টম্ আজও কেরালায় জীবন্ত। শুধু কেরালায় নয়, কোলকাতাতেও আমরা একাধিকবার এই মোহিনী আট্টম্ দেখেছি।

এই মোহিনী আট্টম্‌কে যদিও কথাকলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, আমার কিন্তু মনে হয়েছে, শুধু কথাকলি নয়, ভরতনাট্যমেরও মিশ্রণ রয়েছে এই মোহিনী আট্টমে। কথাকলি ও ভরতনাট্যম্‌কে যদি মহাকাব্যক আখ্যায় ভূষিত করা হয়

তাহলে মোহিনী আট্টমকে বলা যায় গীতিকাব্যিক। কথাকলির গাম্ভীর্য ও ভরতনাট্যমের সৌন্দর্যের নির্যাস মিলবে এই মোহিনী আট্টমের লাস্য অঙ্গের প্রয়োগ কুশলতায়। এই নৃত্যের পদক্ষেপে নারীসুলভ কোমলতার, সঙ্গে পৌরুষ মিশেছে 'ত্রিস্র' ভঙ্গিগুলিতে। তাই মনে হয় ভরতনাট্যম্ ও কথাকলির মিশ্রণ হয়েছে এই নাচে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে। 'পদম্' বিষয়টি কথাকলি ও ভরতনাট্যম্—উভয় নৃত্যে ব্যবহৃত হয়, যদিও আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গি আলাদা। এই 'পদম্' মোহিনী আট্টমেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'বর্ণম্' বিষয়টি কথাকলিতে নেই, ভরতনাট্যম্-এ আছে। তাই মনে হয় মোহিনী আট্টমে ব্যবহৃত পদম্ ও বর্ণম্ এই দুটি বিষয়ে ভরতনাট্যমের প্রভাব বেশী। এই প্রসঙ্গে একটি Souvenir-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি—"Mohini Attam" the famous dance form of Kerala is in a manner similar to Bharat Natyam, on a sensuous, feminine and to an extent, voluptuous note. Wide swing steps and swaying movements of the torso are interesting features of Mohini Attam."[১]

ভরত-নাট্যমের সঙ্গে এই নাচের এক জায়গায় একটু সূক্ষ্ম অমিল ধরা পড়ে, তা হলো মোহিনীআট্টমের দোলায়িত পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গির মধ্যে কামনার উদ্দীপক এমন কতগুলি ইঙ্গিত থাকে যা সচরাচর ভরতনাট্যমে দেখা যায় না। যদিও ভরতনাট্যম নাচের আঙ্গিক একেবারে ইন্দ্রিয়াসক্তি রহিত নয়। তাছাড়া 'মোহিনী আট্টম' এই নামকরণের মধ্যেই উক্ত বক্তব্যটি নিহিত রয়েছে। হিন্দু পুরাণগুলিতে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি ধারণ করে মোহ-মায়াজাল বিস্তার করে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার গতি পরিবর্তনের কাহিনী পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যনাট্যের অনেক জায়গায় নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য এই মোহিনী চরিত্রের নৃত্যাভিনয় হয়ে থাকে। তাহলেও কেরালায় মোহিনী নাট্যম্ একটি বিশেষ নৃত্যপদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। এখানে মোহিনীরূপ নৃত্যনাট্য আংশিক ব্যবহৃত নয়—একেবারে পূর্ণাঙ্গ একটি নৃত্যধারার উপর এই নৃত্যকল্প গড়ে উঠেছে। এই জন্যই দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য ক্ল্যাসিক্যাল নাচের মতো মোহিনী আট্টমের ও একটি স্বতন্ত্র নৃত্যশৈলী নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

১। Kalamandalam—Calcutta, Souvenir—1972 (Programme)

কলকাতার একটি দক্ষিণভারতীয় প্রতিষ্ঠানের (কলামণ্ডলম্—ডোভার লেন) একই নৃত্যের আসরে, ১৯৭২ সালের ৭ই এবং ৮ই অক্টোবর সন্ধ্যায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে, একই সঙ্গে ভরতনাট্যম, মোহিনী আট্টম্, কথাকলি ও কুম্মি নাচের পরিচয় পেয়েছিলাম। নৃত্য পরিচালকরা ছিলেন সবাই কেরালার অধিবাসী। নৃত্যানুষ্ঠানের পর এঁদের কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম—কিভাবে মোহিনী আট্টমে নিঃশব্দে কথাকলি ও ভরতনাট্যমের মিশ্রণ হলো। ভরতনাট্যমের উৎস স্থল যেখানে ধরা হয় অর্থাৎ মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলা এবং কথাকলির উদ্ভবস্থল কেরালা—এই দুই স্থানের ভৌগোলিক ব্যবধান কম নয়। সুতরাং কিভাবে দুটি ধারা সূক্ষ্মভাবে মিশে গেল। বলা বাহুল্য কোন সদুত্তর পাইনি। তবে আমার মনে হয়েছে এর যোগসূত্রটি হয়তো দেবদাসী নৃত্যের মাধ্যমেই স্থাপিত হয়েছিল। কারণ একদা সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়েই মন্দির-কেন্দ্রিক দেবদাসী নৃত্য গড়ে উঠেছিল ভরতনাট্যমের মূলে দেবদাসীদের অবদান ও প্রভাব অপরিসীম। এই মোহিনীআট্টমকে অনেকে কেরালার ভরতনাট্যম্ বলেও উল্লেখ করেন।

মোহিনী আট্টম্ সম্বন্ধে রাগিনী দেবীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—

"A traditional faminine dance of Kerala, Mohini Attam, is one of the parallel forms of South Indian Classical dance, and in ideal examples of lhe erotic form.

According to Hindu mythology Lord Vishnu took the form of Mohini the divine enchantress, in order to decetive the titans and bring about their defeat. The seductive Mohini has an important dramatic role in several mythical episodes of South Indian dance-drama. But it is only in Kerala that Mohini Attam exists as a distinctive dance form.

The swinging movement of the torso from side to side (atibhanga flexion) is a recurrring motif in the Mohini styles, with wide swinging steps. Rhythmic variations (Chollus) are based on patterns of rhythm syllables that

are an integral part of the vocal accompaniment—gracefully rendered by the dancer with plastic fluency, beautiful dance gestures, and footwork. The expression of the wide open is erotic.

The Mohini Attam repertoire of dances includes Cholkettu based on patterns of jati syllables—"Swarajeti interpreting melodic patterns—Talluna in a distinctive rhythmic style—Kanduka Nritta, the mimicry of playing with a ball while dancing Varnam, and Padam (Songs).*

Kanduka Nritta is an ancient art of South India, which has been described by the part of Dandin. There is a sanskrit text in the art called Kanduka Tantra. The dance was a group dance combining ball play with dancing or a mimicry of playing with a ball.

The wave of social prejudice that swept the South about forty years or more ago resulted in a period of recession in the classical dance, Particularly in Devadasi Nṛtya and the erotic Mohini Attam. At that time, the exponents of Mohini Attam in Kerala were Kalyani Amma, Mohini Amma and Chinnamma Amma. They had been trained at an early age by Guru Krishna Panicker of Karathi, near Trichur. He also accompanied their performances as Nattuvans.

When poet Vallathol established the Kerala Kalamandalam for the revival of Kathakali dance drama, he also decided to revive the art of Mihini Attam under the auspices of the same institution. It is due to his devoted patronage that Mohini Attam is a living art today.

* হস্তিনক নৃত্যের মতো অথবা কথাকলির 'পাক্কেরী নৃত্যে'-এর মতো।

Kalyani Amma was the first instructar appointed to teach Mohini Attam at the Kalamandalam. She was an accomplished dancer, though middle aged (I and Thangamani who later married Gopinath, were first students). When the class was finished, Kalyani Amma would somtimes entertain us with an exposition of theme in abhinaya while seated, Her exposition displayed a rich vocabulary of gestures quite different from Kathakali. The rhythm patterns (Chollus) of her dances were also distinctly defferent from Kathakali or Bharst Natyam.

When Kalyani Amma passed away, the old master, Krishna Panickr was appointed in her place. Old age compelled to him to withdraw, and Chinnamm Amma was persuaded to teach the art which she continues to do to this day. She had given up Mohini Attam years ago because of the social stigma attached to it, but she used to dance with Kalyani Amma in festive occassions at the Kalamandalam to please the poet Vallathol who loved the art. She is the last of The senior exponents.

Among the juniors, Kalamandalam Kutty Amma is a well known exponent of Mohini Attam in Kerala. She had the good fortune to be trained for two years by Guru Krishna Panicker, and has been teaching Mohini Attam for the Past nine years at her school of dancing, Kerala Kalalayam, near Ernakulam.

Many well-known dancers have learned Mohini Attam at the Kerala Kalamandalam in Cheruthuruthy, The lyrical eroticism and flowing cadences of this attractive dance form and its beautiful melodic style, are a pleasing contrast to the

more Precise formality of Bharat Natyam. Through the the medium of the younger exponents who have brought the art to the stage, Mohini Attam has become an accepted dance form of Indian Classical dance, having won tributes in India and abroad.*

॥ কেরালার 'কলি' নৃত্য প্রসঙ্গ ॥

'কলি' শব্দের আভিধানিক অর্থ অভিনয় বা নাটক (Play)। কিন্তু কেরালার 'কলি' সাধারণ অর্থে শুধু মাত্র অভিনয় বা নাটক নয়। 'কলি' হল এক ধরনের নৃত্যাভিনয় বা নৃত্যনাট্য ধরণের অর্থাৎ নৃত্যের আঙ্গিক অভিনয়। সুতরাং নাচ এর অপরিহার্য অঙ্গ, প্রধান বাহন। যাঁরা এতে অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের কাছে এই অভিনয় বা নৃত্য অনেকটা চিত্তবিনোদন এবং আমোদজনক ব্যাপার। সমাজের নিম্নকোটি সম্প্রদায়ের একটি প্রধান প্রমোদ উপকরণ এই 'কলি' নাচগুলি। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় একদা যে লোক-নৃত্যগুলি গড়ে উঠেছিল তারই মার্জিত রূপ এই 'কলি' নৃত্যগুলি। একথা প্রায় সকলেরই জানা যে, কেরালার নাচের ইতিহাসে 'কথাকলি' নাচ প্রতিনিধি স্থানীয়। স্বদেশ এবং বিদেশে এই কথাকলি নাচের কারুকুশলতা সর্বজন স্বীকৃত। তাই কথাকলির আলোচনা আপাততঃ এখানে মুলতুবী রেখে, অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত অন্যান্য 'কলি' নৃত্যকেই প্রাধান্য দিয়ে আলোচনার অঙ্গীভূত করা হল। তার কারণ নাচের আলোচনা জগতে এই 'কলি' নাচগুলি এখনো উপেক্ষিত। যদিও এই 'কলি' নাচগুলি কেরালায় সারা বছর ধরেই কোন না কোন সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবু কেরালার বাইরে অনেকেই এই জনপ্রিয় নাচগুলির খবর রাখেন না। অথচ কেরালার জনজীবনে এই নাচগুলির প্রভাব অপরিসীম। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার অবকাশ আছে।

কথাকলি ছাড়া প্রায় কুড়ি রকমের কলি নৃত্য কেরালায় প্রচলিত। এখানে তার মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে নিয়ে আলোচনা করা হল। এই কলিনৃত্যগুলিকে লোকনৃত্যেরই একটি বিশেষ পর্যায় বলা যায়। অথবা বলা যেতে পারে যৌথনৃত্য। যদিও প্রায় সব লোকনৃত্যেই এই যৌথ নৃত্যের

* Dance Dialects of India—Ragini Devi. (1972) Page-116.

(Group বা Community Dances) পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং সঙ্গত কারণেই এইসব নাচে সমাজের সামাজিক চেতনা (Collective emotions) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত।

এই 'কলি' নৃত্যকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথমতঃ কেবলমাত্র পুরুষদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কলিগুলি, যেমন—কোলকলি (Kolkali), ভট্টকলি—(Vottakali), থাত্তিনমেলকলি (Thattinmelkali) এবং চুভত্তুকলি (Chuvathukali)। দ্বিতীয়তঃ মহিলাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কলিগুলির নাম হল—কৈকোত্তিকলি (Kaikottikali) এবং থিরুভদিরকলি (Thiruvadirakrli) প্রভৃতি। তৃতীয়তঃ এ ছাড়া কেরালার নায়ার শ্রেণীর লোকেরা সৈনিক বৃত্তি শিক্ষার প্রথা হিসাবে কয়েকটি কলিনৃত্য অনুশীলন করে থাকেন (Martial Dance)। যেমন—ভেলকলি (Velakali), পুলয়ারকলি (Pulayarkali) প্রভৃতি। অবশ্য এগুলিও পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হয়। চতুর্থতঃ কেরালার নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রচলিত কতগুলি সামাজিক-ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ কলিনৃত্য আছে যেমন—সঙ্ঘকলি (Sanghakali), শাস্ত্রকলি (Sastrakali), স্বস্তিকলি (Swastikali), যাত্রাকলি (Yatrakali) এবং এঝামত্তুকলি (Ejhamathukali)। এ ছাড়া আরও কয়েকটি কলি নাচ আছে যার সঙ্গে কথাকলির নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন পটইয়ংকলি (Pataiyankali) ও পোরাত্তোকলি (Porattukali) ইত্যাদি। পঞ্চমতঃ ভগবতীদেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে আচার-অনুষ্ঠানমূলক (Ritualistic) কয়েকটি কলি নৃত্য আছে, যেমন—কনিয়ারকলি (Kaniyarkali) ও পনন্‌কলি (Panankali) ইত্যাদি।

এবার সংক্ষেপে বিশেষ বিশেষ কলি নাচগুলির পরিচয় দেওয়া হল—

১। কোলকলি—(Kolkali)

কলি নাচগুলির মধ্যে কোলকলিকে অনেকে প্রধান হিসেবে ধরেন। দক্ষিণ মালাবার অঞ্চলের চেরুমাল সম্প্রদায় ও উত্তর মালাবারের পুলয় সম্প্রদায়ই সাধারণতঃ কোলকলি নাচ করে থাকেন। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে ঐ দুই সম্প্রদায় ধর্মান্তরিত হয়ে শেষে মুসলমান হয়ে যায়। এই ধর্মান্তরিত নতুন সম্প্রদায়ের নাম হয়েছে 'মোপ্‌লা—এরা কেরালার

নিম্নকোটি সম্প্রদায়ের মুসলমান। এখানে দুটি ব্যাপার খুবই আশ্চর্যজনক যে, প্রথমতঃ মুসলমান ধর্মানুযায়ী ওসব নাচ গান 'গুণাহ্' বা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এরা চর্চা করে চলেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই সব নাচে যে গান গাওয়া হয় তার বেশীর ভাগই হিন্দু দেবদেবীর বা কোন হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য কীর্তন। এবং মূল মালয়ালম্ শব্দের অনেকগুলিই এঁরা উর্দু ও আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করে নিয়েছেন।

কোলকলি শব্দের মানে হলো 'কাঠিনৃত্য'। এই কাঠি নৃত্য আমরা বাংলা ব্রতচারী নৃত্যে দেখতে পাই অনেকটা গুজরাটের 'দন্তরাসকম্' নৃত্যের মতো। যাই হোক কোলকলি নৃত্যের প্রত্যেক শিল্পীর দু হাতে দুটি কাঠি থাকে। তালে তালে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে কাঠিতে আঘাত করে করে নাচে। এই কাঠি নৃত্যের এক ঘেয়ে কাঠির খট্ খট্ শব্দ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তার সঙ্গে ছোট আকারে ঝুমুর বেঁধে দেওয়া হয়—যাতে বেশ ঝুম্ ঝুম্ হয়।

এই নৃত্য যৌথ নৃত্যে (Group) কম করে ৮ জন থাকে, কোন কোন দলে ৪০ জন পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন। বর্ষাকাল ছাড়া প্রায় সব ঋতুতেই এই নাচ দেখা যায়। তবে শিবরাত্রি উৎসব, বিবাহ উৎসব, নবান্ন উৎসব প্রভৃতি সময়েই এই নাচ বেশী অনুষ্ঠিত হয়।

নৃত্য আরম্ভ হবার আগে বিরাট এক লম্বা পিলসুজ বা দীপাধারকে ঘিরে সকলে দাঁড়ান। প্রথমে এঁরা বসে পড়ে কাঠিগুলি মাটিতে ছোঁয়ায়—এই অধ্যায়কে বলে নীলকলি। এরপর দলপতি গানের প্রথম কলিটি গাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে দোহারের মতো তা গাইবেন কাঠিতে তাল রেখে। এভাবে ধীরে ধীরে গাইতে গাইতে উঠে দাঁড়ান এবং দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ হাতে কাঠি ও পায়ে তাল রেখে নাচেন। এবার তাঁরা একজনের কাঠির সঙ্গে আরেকজনের কাঠি ছুঁইয়ে সুরে সুরে নাচেন। এভাবে একটি গান যখন শেষ হয়ে যায় তখন সকলে দীপাধারের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেন। একটু পরেই দলপতি দ্বিতীয় গান ধরবেন ও নাচের নির্দেশ দেন। এমনি করে গানের পর গান, নাচের পর নাচ তিন চার ঘণ্টা বা তারও বেশী ধরে চলে এই অনুষ্ঠান।

এই নৃত্যে বেশভূষার তেমন পরিপাটি নেই। সব পুরুষ শিল্পীরাই খালি গায়ে কোমরে লুঙ্গির মতো 'ভেস্তি' (Veshti) পরবেন সাদা রঙের। ঠিক এই

কোলকলির মতোই আরেকটি নাচ দেখা যায়, যার নাম 'পুরকলি'। কোলকলির সঙ্গে মৌল পার্থক্য হল এঁরা নাচের সঙ্গে হাততালি দেয় ছন্দ রাখবার জন্য। কিন্তু কোলকলিতে ছন্দ রাখে কাঠির তালে। মালাবার অঞ্চলে প্রচলিত মন্দির কেন্দ্রিক উৎসব 'পুরম্'-এর নামানুসারে এই নাচের নাম 'পুরকলি'।

২। **ভট্টকলি (Vattakali)**

ভট্টকলি পুরুষদের নাচ। বিশেষ করে আদিবাসী (Tribal) সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা একটু উন্নত, এ নাচ তাঁদের। কম করে দশজন এতে অংশ গ্রহণ করেন। এ নাচেও মাঝখানে একটি দীপাধার থাকে। এই দীপাধারকে কেন্দ্র করে স্বরে স্বরে হাতে তালি দিয়ে ধীরে ধীরে নাচেন। এ নাচ তেমন দৃষ্টি সুখকর নয়।

উত্তর মালাবারের পুলয় সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত থাট্টিনমেলকলি নাচ সাধারণতঃ ভগবতী মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গনে নবান্নের সময় হয়ে থাকে। মন্দিরের কাছেই একটি কাঠ ও বাঁশ দ্বারা নির্মিত মঞ্চে এ নাচ হয়। এই নাচেও হাতে তালি বাজিয়ে শিল্পীরা মণ্ডলাকারে ঘুরে নাচে।

কোচিনের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একটি সরল নাচ হচ্ছে চুভত্তিকলি। এই সম্প্রদায়কে বলা হয় 'ভলম্'। এই নাচও গতানুগতিক মণ্ডলাকারে ঘুরে গানের সঙ্গে হাতে তাল রেখে করা হয়। তবে অন্যান্য নাচ থেকে একটু তফাৎ এই যে, এতে নাচের মণ্ডলটি কখনো দূরে যায়, বড় হয়, কখনো বা সামনে এসে ছোট হয়। অনেকটা ছোট বড় জ্যামিতিক ব্যাস রচনার মতো।

৩। **কৈকোত্তিকলি (Kaikottikali)**

কেরালার মহিলা সম্প্রদায় দ্বারা অনুষ্ঠীত দুটি নাচই প্রধান—কৈকোত্তিকলি ও থিরুভদিরকলি। কৈকোত্তিকলি খুব সাধারণ ও অনাড়ম্বর নাচ। মহিলা বা অল্প বয়সের মেয়েরা মিলে একটা বৃত্ত রচনা করে। মাঝে মাঝে থাকে একটা টুলের উপর স্থাপিত প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের পীলসুজ। পীলসুজকে ঘিরেই হাতে তালি দিয়ে নৃত্য। এই নাচগুলির বৈশিষ্ট্য হলো এতে বৃন্দ বাদন বা **Orchestration**-এর বালাই নেই। এতে যে গানগুলি গীত হয় তাতে মহিলা সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ মিশ্রিত একটি ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়।

তাই এই গানগুলির সামাজিক মূল্য অপরিসীম। এ ছাড়া কিছু মালয়ালম্ ভাষার কবিতাও সুর সহযোগে নাচের সঙ্গে গাওয়া হয়। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত 'কুম্মি' (Kummi) নাচের সঙ্গে এই নাচের মিল যথেষ্ট। সাদা অথবা রঙিন্ ব্লাউজের সঙ্গে সাদা ধুতি অথবা ভেস্তি পরেন মহিলারা। এই নাচ যদিও বছরের যে কোন সময় হতে পারে, তবু এর বিশেষ সময় হল মালয়ালীদের 'ওনাম' উৎসব, যা প্রায় দশ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়।

৪। **থিরুভাদিরকলি (Thriruvadirkali)**

এই নাচটিকে শুধু মহিলাদের নাচ না বলে বলা উচিত কুমারীদের নাচ। এর মূল রস শৃঙ্গার অর্থাৎ প্রেম ভালবাসা। বছরে একবারই এই নাচ অনুষ্ঠিত হয় এবং তা থিরুভাদির উৎসবের সময়। এই নাচ অনেক সময় আসামের 'বিহুঁর' নাচকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে কন্দর্পরাজ বা কামদেবের সম্মানার্থে শিব-পার্বতীর মিলন ভালবাসার প্রতীক হিসেবে এই নাচ হয়।

এই উৎসবের সময় কুমারীরা খুব ভোরে উঠে কাছাকাছি কোন নদীতে বা পুকুরে গান গাইতে গাইতে স্নান করে এবং বাড়ী ফিরে এসে ঐতিহ্যানুযায়ী সাজপোষাক পরে। তারপর সুরু হয় নাচ। মেয়েদের মাথায় চুলের খোঁপা উঁচু করে বা যে কোনদিকে হেলানোভাবে বাঁধা থাকবে। ঐ খোঁপার চারদিকে গোঁজা থাকবে চুলির মালা।

যে কোন যৌথ নৃত্য বা Community Dance-এর মতো কুমারীরা একটি বৃত্তের সৃষ্টি করে। অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই সমবেতভাবে গাইবে। গানগুলি খুবই প্রাচীন এবং ঐতিহ্য পরম্পরা চলে এসেছে। এই গানে কিছু কিছু কর্ণাটিক রাগ সঙ্গীতের আভাস মেলে। আধঘণ্টা নাচের পর একটু বিশ্রাম। তারপর আবার যথারীতি গান ও নাচ। মেয়েরা হাতে তাল দিয়ে পায়ে ছন্দ রেখে শরীর এদিক ওদিক আন্দোলিত করে একটি সুচারু ভঙ্গির সৃষ্টি করে। অনেকে আবার এই নাচকে কেরালার 'খারি' নাচ বলেন।

এতক্ষণ আমরা যে কলি নাচগুলির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম সেগুলির বেশীর ভাগই সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক আচার অনুষ্ঠান (Ritual)-মূলক নাচের পর্যায়ে পড়ে। এবার কয়েকটি যুদ্ধবিষয়ক (Martial Dance) কলিনাচের কথা বলবো।

কেরালার যুদ্ধ-বিষয়ক কলি নাচগুলির প্রবর্তন করেন নায়ার সম্প্রদায়ের লোকেরা। এই নায়াররা সুপ্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই বর্তমান বংশধর। অবশ্য এখন নায়াররা ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের পুরুষেরাও এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন। এই নৃত্যের প্রায় সবটা অংশই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কলাকৌশল সমৃদ্ধ এক বিশেষ পদ্ধতি। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এই যুদ্ধনাচ, ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখা যায়। একদা সমগ্র কেরালাতেও বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামের মতো দৈহিক কসরৎ দেখানো নাচ প্রচলিত ছিল—এগুলিকে বলে 'কলরি' অবশ্য বর্তমানে এই কলরির প্রচলন নেই বললেই চলে।

(৫) ভেলকলি (**Bhelakali**)

কেরালায় প্রচলিত সবচেয়ে নামকরা যুদ্ধ-নৃত্য হল 'ভেলকলি'। ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের বিশেষ নায়ার শ্রেণীর লোকেরা এই নাচ বংশ পরম্পরায় চর্চা করে আসছে। প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে ত্রিবান্দ্রমের বিখ্যাত পদ্মনাভস্বামী নামক মন্দিরের বিশেষ অনুষ্ঠান 'উৎসবম্'-এ এই নাচ হয়। এই উৎসবম্ চলে দশদিন ধরে। তার মধ্যে অন্ততঃ দিনে দুবার এই ভেলকলি নাচ হবে। মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথে এই নাচ হয়ে থাকে। এই যুদ্ধ-নৃত্যের মূল আখ্যান মহাভারতের সেই বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এতে নায়ার শ্রেণীর লোকেরা কৌরবদের চরিত্রগুলির অভিনয় করেন। পাণ্ডবদের অভিনয় কোন মানুষ করে না। তার পরিবর্তে কাঠের তৈরী উঁচু কতকগুলি পাণ্ডব চরিত্রের প্রতিমূর্তি (effigy) থাকে। এই কৃত্রিম যুদ্ধ-নাচ হয় মানুষ ও কাঠের প্রতিমূর্তির মধ্যে।

এই সামরিক প্রদর্শনী সুলভ নাচ সুরু হয় বাঁশী ও চেণ্ডা জাতীয় বাদ্য-সঙ্গীত সহকারে। নৃত্যশিল্পীরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে মার্চ করে মন্দিরের কাছাকাছি। এঁদের সঙ্গে কিছু সাধারণ মানুষ নিশান ও পশুপক্ষীর প্রতীক নিয়ে পেছনে অনুগমন করেন। পুরোনো দিনের যুদ্ধের একটা কাল্পনিক চিত্র এভাবে দর্শকদের সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রত্যেক ভেলকলি নাচিয়ে বাঁ হাতে ঢাল এবং ডান হাতে কাঠের কাঠি তরবারির প্রতীক হিসেবে নেন। এটা অনেকটা আমাদের বাংলার ঢালি নৃত্যের মতো। এঁদের নাচের পোষাক—সাদা রঙের ঘাঘরা, লাল ও সোনালী কাজ করা কাপড় দিয়ে কোমরে দৃঢ় করে বাঁধা, মাথায় লাল পাগড়ি।

খালি গায়ে থাকে অজস্র ঝক্ ঝকে পুঁতির মালা। কখনো এককভাবে যুদ্ধের নানা প্রকার ভঙ্গি করে কেউ নাচেন অথবা দুজনে মুখোমুখি কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করেন। একেকটি যুদ্ধ-নৃত্য চলে প্রায় এক ঘন্টা। এতে শিল্পী যুদ্ধ নৃত্যের নানা কলাকৌশল, দৈহিক কসরৎ, তরবারি চালনা প্রভৃতি প্রদর্শনের অবকাশ পান। বাজনা ও নাচ চরম দ্রুতলয়ে উঠবার পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিল্পীরা প্রত্যাবর্তন করেন।

(৬) পুলয়্যারকলি (Pulayarkali)

এই নাচ অনেকটা ভেলকলির মতোই যুদ্ধনাচ। কেরালার হরিজন বা ব্রাত্যদের বলা হয় পুলয়্যার। এঁদের নামানুসারে এই নাচের নাম হয়েছে। যদিও এই নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য আলাদা কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, তবু সাধারণতঃ দেখা যায় 'ওনাম' ও 'বিশু' উৎসবেই এই নাচের প্রকৃষ্টকাল। পোষাক-পরিচ্ছদ ভেলকলির মতো হলেও একটু তফাৎ আছে, এই তফাৎটুকু হলো পাগড়ীর পরিবর্তে ছোট একখণ্ড কাপড় মাথায় জড়িয়ে নেয়। বাঁ-হাতে ঢাল ও ডান হাতে কাঠি—তরবারির প্রতীক। প্রতিপক্ষে থাকে অপদেবতাদের রঙিন্ প্রতিমূর্তি—যেমন ভেলকলিতে পাণ্ডবদের প্রতিমূর্তি, এতে নৃত্যশিল্পীরা নিজেরাই গান গেয়ে নাচেন।

এই নাচের অন্তর্গত আরও দুটো কলিনাচ—পিটিছুকালি এবং পরিকাথলম্-কলি, পানিক্কর সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশ গ্রহণ করেন। পিটিছুকলি আসলে তরবারি নৃত্য। এতে প্রচণ্ডভাবে চেণ্ডা বাজে। এছাড়া কোচিন অঞ্চলের যুবকেরা গ্রামীন পরিবেশে যে নৃত্যনাট্য করে থাকে তার নাম পরিশথলম্কলি। এ নৃত্যানুষ্ঠান সাধারণতঃ রাত্রেই হয়ে থাকে।

(৭) শাস্ত্রকলি (Sastrakali)

সুপ্রাচীনকালে কেরালায় অর্যীকরণের ফলশ্রুতি হল নাম্বুদ্রি সম্প্রদায়ের উদ্ভব। দীর্ঘদিন ধরে এই সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু সামাজিক ও ধর্মকেন্দ্রিক নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে এসেছেন, এই ধরনের একটি নাচ হল 'শাস্ত্রকলি'। এই নাচকেই আবার বলা হয় 'যাত্রাকলি'। এবং এই ধরনের আরও দুটি নাচ হল—'সজ্ঘকলি' ও 'স্বতিকলি'। এই সজ্ঘকলি নাচ আঠারটি সজ্ঘ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক সজ্ঘের দায়িত্ব থাকে একজন

নাম্বুদ্রির উপর। তাঁর নাম বাকাবৃত্তি, তাঁকে বৈদিক স্তোত্রে পারঙ্গম হতে হয়। সাধারণতঃ ভদ্রকালী, সুব্রাহ্মণীয়াম্ ও শাস্ত্র নামক দেবতাদের সম্মনার্থেই নাম্বুদ্রিরা এই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

নাচ আরম্ভ হবার আগে একটি প্রজ্জ্বলিত বাতির চারিদিক ঘিরে সকলে সমবেত হয়ে গণপতি, কালী এবং শিবের উদ্দেশে সুর সহযোগে শ্লোকম্ শুরু করে। এরপর জয়সূচক ধ্বনি উচ্চারিত করে—'শেম্বি কোটি আরপু'। তারপর প্রচণ্ড বাজনার সঙ্গে শুরু হয় তরবারি কসরৎ। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরা এই নৃত্যকে আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে অনেকটা যোগাভ্যাস বলে মনে করে।

এভাবে সজ্ঘকলি, শাস্ত্রকলি, স্বস্তিকলি এবং যাত্রাকলি প্রভৃতি নাচ নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরা করে থাকেন, তেমনি ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয় ও হরিজন সম্প্রদায় 'এবাক্ষটুকলি'-তে অংশগ্রহণ করে। এ সব নাচ অনেক সময় পেশাদার শিল্পীরা করে থাকে, কোন কোন সম্প্রদায় বিবাহ উৎসবেও এই নাচ হতে দেখা যায়। বিশেষ করে 'উনি' ও 'পিশারোতি' নামক সম্প্রদায়ের মধ্যে।

(৮) পনন্-কলি (Panankali)

পনন্ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই নৃত্যানুষ্ঠান করে বলে এর নাম হয়েছে পনন্‌কলি। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন—হলো এই নাচের মূল উপপাদ্য বিষয়। এতে পুরুষেরা নাচেন, মহিলারা সঙ্গে গান করেন। কচি নারকেল পাতায় এক ধরনের পোষাক এ নাচে ব্যবহৃত হয়। এই পনন্‌কলিতে আবার পুরুষ-মহিলারা মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে নৃত্যনাট্যের আকারে এই পনন্‌কলি অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের এই কেরালা রাজ্যটি নৃত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। কেরালার নৃত্য, নৃত্যনাট্য ও নৃত্যক্রীড়া এত বিচিত্র ধরনের আছে যা অল্পকথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

।। কথক নৃত্য ।।

আমাদের দেশে লোকশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে কথকতার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। পৌরাণিক কাহিনীকে কথকরা সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করতেন। এই কথকতাকে আরও বেশী উপাদেয় করার জন্য কি কিছু অঙ্গভঙ্গির সাহায্যও

নেওয়া হতো। এই অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার পরে আরও পরিশীলিত হয়ে 'নৃত্ত' এবং 'নৃত্যে' রূপান্তরিত হয়।

এই কথক নাচ গ্রাম থেকে মন্দির, মন্দির থেকে রাজ দরবার, এবং রাজ-দরবার থেকে বর্তমানে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে চলে এসেছে। আধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, কথক নৃত্যের উৎস শুধুমাত্র 'কথকতা' নয়। এই উৎসের মূলে রয়েছে 'আভীর' নামে এক উপজাতীর লোকায়ত নৃত্য, যা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে এসেছে, তাই পরবর্তী কালে কথকতার আঙ্গিকে মিশ্রিত হয়ে নৃত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে।

ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে কথক নৃত্যের দুটি পীটস্থানের (জয়পুর ও লক্ষ্ণৌ) অবস্থান প্রায় একই অক্ষাংশে। দ্রাঘিমাংশের দূরত্বও খুব কম। উভয় জায়গাতেই মুসলমান এবং হিন্দু প্রাধান্য বিদ্যমান। তবে পরিমাণগত পার্থক্য আছে।

একই নৃত্যধারা দুটি আলাদা জায়গায় যে পৃথক নৃত্যশৈলীতে পরিণত হয়। তার মূলে দুটি কারণ—

(১) আশেপাশের, লোকনৃত্যগুলির প্রভাব (Localised influence)।

(২) বিভিন্ন শিল্পী-গুরুদের নিজস্ব চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ নৃত্যশৈলীর প্রভাব। সুতরাং জয়পুরী ও লক্ষ্ণৌ-এর কথকে যে পার্থক্য তার মূলেও এই দুটি কারণ অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে। যেমন রাজস্থানের স্থানীয় লোকনৃত্যের আঙ্গিকগত পদ্ধতি, জয়পুরী কথককে প্রভাবিত করেছে তেমনি রয়েছে স্থানীয় নৃত্যশিল্পীগুরুদের ব্যক্তিগত শৈলী স্বাতন্ত্র্য। এর থেকেই ঘরোয়ানার সৃষ্টি। ঘুমর (Ghumar), গীর (Geer), ডাংলীলা (Danglila), পাণিহারী (Panihari), মারোয়ারী প্রভৃতি লোকনৃত্যের প্রভাব রয়েছে জয়পুরী কথক নৃত্যে।

॥ কথক নৃত্য ও তার ঘরানা ॥

ঘরানা দুই ভাবেই হয়। এক, শিল্পীর **ব্যক্তিগত** শৈলী স্বাতন্ত্র্য। দুই **স্থানগত**। অর্থাৎ ব্যক্তিক ও স্থানিক।

যারা কথকতা করেন তাদের বলা হয় কথক। এই কথক সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব বোঝা যায় যখন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তার বহুল উল্লেখ দেখি। ব্রহ্মপুরাণে অভিনেতা, গায়ক ও নর্তকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারত ও

নাট্যশাস্ত্রের 'কথক' শব্দের উল্লেখ আছে। পালি ও নেপালী শব্দকোষে আছে 'কথিকা'। সপ্তদশী শতাব্দীতে রচিত শাহজীর গ্রন্থে যে ধ্রুবপদ নৃত্যের উল্লেখ আছে, অনেকের অনুমান সেই নৃত্যই নাকি অধুনা প্রচলিত কথক। এইভাবে দেখা যায়, প্রাচীনকালে যারা ভাবাভিনয়, গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে দেবদেবীদের লীলাকীর্তন করতেন বা পৌরাণিক গাথা, উপাখ্যান, ইত্যাদি পাঠ করতেন, তারা পরিচিত হতেন কথক, গ্রন্থিক, পাথাকার, পাঠক, বৈতালিক প্রভৃতি বিভিন্ন নামে। কথক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত বলেই এই নৃত্যশৈলীর নাম হয়েছে কথক বা কত্থক নৃত্য।

ভারতবাসী চিরকালই ধর্মপ্রাণ। তাই এদেশের সঙ্গীত সংস্কৃতিও ধর্মভিত্তিক। নটবরী বা কত্থক নৃত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এখনকার কথক নৃত্যও সেকালের কথক শৈলীর মধ্যে গুণগত ভফাৎ বর্তমান।

কথক নৃত্যকে আগে বলা হত নটবরী নৃত্য। কারণ, এই নৃত প্রদর্শিত হত দেব-মন্দিরে—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান-এর সামনে। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী নটবর রূপে কল্পনা করা হত এবং এর নৃত্যকাহিনী রচিত হত রাধাকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য থেকে। পূজার্চনা ও আরতির পর পবিত্রতা ও শুচিতার সঙ্গে এই নৃত্য বিগ্রহের সামনে—তাঁর মনোরঞ্জনার্থে প্রদর্শিত হত। আজও যাঁরা বিশুদ্ধতার সঙ্গে কৃষ্ণলীলাকে কথক নৃত্যের দ্বারা রূপদান করেন, তাঁরা একে নটবরী নৃত্য নামেই অভিহিত করেন।

এখনকার কথক নৃত্যের মধ্যে বৈদেশিক (ইসলাম) প্রভাব পড়েছে অনেক বেশী। যদিও এর কাহিনী আজও সেই রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়, তবু তার পোষাক পরিচ্ছদ ও আঙ্গিকের পরিভাষাগুলি বিদেশী প্রভাবে প্রভাবান্বিত। যেমন—রাধা হলেন 'সাকী' আগমন হল 'আমদ', প্রস্তুত হল 'অদা', নমস্কারী বা প্রণামী হল 'সেলামী' ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আনুমানিক ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকে (ইসলামীক যুগে) পারস্য ও খোরোসান থেকে বিপুল অর্থব্যয়ে বহু সুন্দরী নর্তকী আমদানী করা হত ভারতবর্ষে। মুঘল দরবারে নৃত্যের প্রভাব—প্রতিপত্তির কথা জানা যায় আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে। যে নৃত্য একদা প্রধানতঃ দেবতাদের তুষ্টি বিধান করত, সেই নৃত্যে তখন পরিণত হল বিলাসের সামগ্রীতে। ফলে তার মধ্যে ধীরে ধীরে—অনুপ্রবেশ

করতে লাগলো মানবিক প্রবৃত্তিগুলির উগ্রতা—ইন্দ্রিয়াসক্তির উপকরণ হিসাবে। অতঃপর উভয় সংস্কৃতির মিলনে কথক নৃত্যশৈলীতে যে রূপান্তর ঘটল, তারই প্রতিফলন দেখা যায় এখনকার কথক নৃত্যে।

ভরতনাট্যম, কথাকলি প্রভৃতি নৃত্যে যেমন মুদ্রার সাহায্যে ভাব অভিব্যক্ত হয়, বর্তমান কথক নৃত্যে—তেমনি পদাঘাত ও লয়কারীর দ্বারা তা প্রদর্শিত হয়। এতে নৃত্তাংশ বেশী। অবশ্য 'গৎভাও' ও 'অভিনয়'ও এতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নি। এ দুটি প্রদর্শিত হয় রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা ও ঠুমরী গানের ভাব ব্যঞ্জনার সময়। তবলা, মৃদঙ্গ, সারঙ্গী বা হারমনিয়ামের লহরার সঙ্গেই এই নৃত্য বেশী প্রচলিত।

বর্তমানে কথক নৃত্যের প্রধানতঃ দুটি ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায়।

একটি লক্ষ্ণৌ, অপরটি জয়পুর ঘরাণা। বেনারস ঘরানা বলে যে আরেকটি ঘরানার নাম শোনা যায়—তা, ঐ জয়পুর ঘরানারই উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সৃষ্ট। সঙ্গীতশাস্ত্রের যাবতীয় নিয়ম কানুন পালন করেও নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা কোন শৈলীকে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করাকেই সাঙ্গীতিক ঘরানা বলে চিহ্নিত করা হয়। যিনি এক্ষেত্রে বিশেষ মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন, তাঁরই নামে ঐ ঘরানার পরিচয় বহন করেন তাঁর বংশ ও শিষ্য পরম্পরা। এমনি ভাবেই গীত, বাদ্য ও নৃত্য বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া পরবর্তীকালে কথক নাচের 'বিহার ঘরানা' নামে কেউ উল্লেখ করেছেন। যথাস্থানে তা আমরা আলোচনা করেছি।

॥ লক্ষ্ণৌ ঘরানা ॥

কথক নৃত্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ ঘরানাই আজ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতকে এই ঘরানার পত্তন করেন এলাহাবাদের নৃত্য সাধক ঈশ্বরী-প্রসাদের প্রপৌত্র নৃত্যাচার্য ঠাকুর প্রসাদ। ঈশ্বরী প্রসাদ এই ঘরানার—আদিগুরু বলে পূজ্য। বংশপরম্পরায় এরা সকলেই সঙ্গীত জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

ঈশ্বরীপ্রসাদ ছিলেন এলাহাবাদের—হন্ডিয়া তহশিলের বাসিন্দা। ইনি পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সে সময়ে নটবরী নৃত্যের দুর্দশা দেখে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নাকি তাকে স্বপ্নাদেশ দেন তার পুনরুদ্ধার-এর

জন্য—, তাঁর তিন পুত্র অড়গু, খড়গু ও তুলোরাম—তিনজনকেই তিনি উত্তমরূপে—নৃত্য শিক্ষা দেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর—শুধু অড়গুজীই নৃত্যচর্চা বহাল রাখেন। অন্য দুই ভাই পিতৃশোকে এই চর্চা ত্যাগ করেন। অড়গুজীরও তিনটি পুত্র প্রগাস (প্রকাশ) দয়াল ও হরিলাল। এঁরাও পিতার নিকট যথাযোগ্য শিক্ষা দ্বারা নৃত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। আড়গুজী দেহত্যাগের পর—প্রগাসজী ভাইদের নিয়ে চলে যান লক্ষ্ণৌতে। এই সময় লক্ষ্ণৌই-এর নবাব ছিলেন আসফউদ্দৌলা (১৭৭৫-৯৫)। প্রগাসজী তার দরবারে নৃত্যবিদ হিসাবে নৃত্যবিদ নিযুক্ত হন। প্রগাসজীর তিন পুত্রও নৃত্যে নিপুণ হয়ে ওঠেন। তিন পুত্রের নাম দুর্গাপ্রসাদ, ঠাকুর প্রসাদ ও মান (মানসিংহ)।

কথক নৃত্যের উন্নতি বিধানে ঠাকুর প্রসাদের অবদান সমস্ত নৃত্যবিদরাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। ইনি নটবরী নৃত্য নামে কথক নৃত্যের নতুন নামকরণ করেন। ঠাকুর প্রসাদজীর নৃত্যধারা আজও যারা রক্ষা করে আসছেন তারা নৃত্য ক্ষেত্রের দিক্‌পাল বিশেষ। নৃত্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখেন অথচ মহারাজ কালিকা, বিন্দা দিন তথা ভৈরো প্রসাদের নাম জানেন না, এরূপ একজনও নেই। এরা তিনজনই ঠাকুরপ্রসাদজীর সহোদর দুর্গাপ্রসাদের যোগ্য পুত্র। ঈশ্বরীপ্রসাদ থেকে দুর্গাপ্রসাদ পর্যন্ত সকলেরই তিনটি করে পুত্র। আবার কালিকা প্রসাদেরও তিন। এই তিন পুত্রের নাম অচ্ছন, লচ্ছু, ও শম্ভু মহারাজ। কিন্তু অচ্ছন মহারাজের আবার তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র—তিনি হলেন ভারতের জনপ্রিয় শিল্পী বিরজু মহারাজ। কথক নৃত্যে লক্ষ্ণৌ ঘরানার ক্রমবিকাশের ঐতিহ্য এইভাবেই আজও চলে আসছে উক্ত নৃত্যাচার্যদের শিষ্য-প্রশিষ্য নির্বিশেষে পরম্পরাগতভাবে। ভাবপ্রধান নৃত্যের জন্যই এই ঘরানা সমধিক প্রসিদ্ধ।

॥ জয়পুর ঘরানা ॥

জয়পুর ঘরানার গোড়া পত্তন করেন ভানুজী—প্রায় দেড়শো বছর আগে। ইনি ছিলেন শিবভক্ত এবং জনৈক শৈব সন্ন্যাসীর কাছ থেকে তিনি নিপুণভাবে শিবতাণ্ডব নৃত্য শিক্ষা করেছিলেন বলে জানা যায়।

লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্গে এই ঘরানার নৃত্যশৈলীতে বেশ বড় রকমের পার্থক্য আছে। এই ঘরানার নৃত্য লক্ষ্ণৌয়ের মত ভাবপ্রধান নয়। লয়কারীর দিকেই এদের

লক্ষ্য বেশী এবং সেগুলি শুধু দুটি পায়ের সাহায্যেই প্রদর্শিত হয়। কঠিন কঠিন সূক্ষ্ম লয়ের কাজ এরা অতি সরলতা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রদর্শন করেন। তবলা-পাখোয়াজের বোলগুলিকে এরা বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখান শুধু পদযুগল দিয়ে। এই ঘরানার যা কিছু বৈশিষ্ট্য তা প্রধানতঃ এই ক্রিয়ার মধ্যেই সীমিত। অধুনা এই ঘরানার শিল্পীদের কাছ থেকে কিছু গৎভাও এর প্রদর্শন দেখা যাচ্ছে। এই ঘরের তাণ্ডব নৃত্য বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

ভানুজী তার পুত্র মালুজীকেও শিব-তাণ্ডবের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু মালুজীর দ্বিতীয় পুত্র কানুজী তাদের ঘরানার নৃত্য ছাড়াও লাস্য নৃত্যের পাঠ নিয়েছিলেন বৃন্দাবনে গিয়ে। অতঃপর এই ঘরানায় তাণ্ডব ও লাস্য উভয় প্রকার—নৃত্যেরই প্রচলন হয়। কানুজীর পৌত্র ও গীধজীর পুত্র হরিপ্রসাদ ও হনুমান প্রসাদ ভ্রাতৃদ্বয়ও তাদের ঘরানার ঐতিহ্য বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। এই দুই ভাইয়ের নৃত্য সেই সময় এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে সারা ভারতে এরা 'দেওপরী কি জোড়া' (দেবপরীযুগল) নামে পরিচিত ছিলেন।

জয়পুর ঘরানার শিল্পীরা কয়েকটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। এরা সম্ভবতঃ ভানুজীরই বংশ পরম্পরা। এঁদের মধ্যে যারা সারা দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন—তাঁরা হলেন—চুন্নীলালজী এবং তাঁর পুত্র জয়লাল, সুন্দর প্রসাদ ও জয়লালজীর কন্যা জয়কুমারী ও পুত্র রাম গোপাল। এছাড়া হাজারীলাল, রতনলাল, সোহনলাল, রোশনকুমারী, রেখা অর্ণব, ঝর্ণা সাহা প্রভৃতি। এই ঘরানার বিকাশে রাজস্থানী—রাজন্যবর্গের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

॥ বেনারস ঘরানা ॥

রাজস্থানী নৃত্যকার—শ্যামলদাস ঘরানার জানকীপ্রসাদের শিষ্য তথা ভাই দুহারাম ও গণেশীলাল, রাজস্থান থেকে বসবাস তুলে বারাণসীতে গিয়ে অবস্থান করেন। এদের দ্বারাই নাকি কথক নৃত্যের বেনারসী ঘরানার প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঘরানার নৃত্যে—তবলা পাখোয়াজের বোল অপেক্ষা নৃত্যের বোলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

লয়কারীর এই অঙ্গটা জয়পুর ঘরানার সঙ্গে খানিকটা মিললেও বেনারস ঘরানার বৈশিষ্ট্য শুধু লয়কারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লক্ষ্ণৌ ঘরানার মত

সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসও তার মধ্যে বিদ্যমান। তাছাড়া উক্ত দুটি—ঘরানা থেকে এই ঘরানার শৈলীর মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য প্রতিভাত হয়। সেই জন্যই এই ঘরানাকে চিহ্নিত করা হয় পৃথকভাবে।

॥ কথকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অঙ্গ ও সংজ্ঞা ॥

কথকের যখন বিধিবদ্ধ শিক্ষা সাধারণো সুরু হলো তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ, নাম ইত্যাদি গুরু মুখ থেকে ক্রমে লিপিবদ্ধ হতে লাগলো। কথকের নৃত্যানুষ্ঠানকে মোটামুটি চারভাবে ভাগ করা যায়। প্রথমে প্রারম্ভিক, বন্দনাদি, —গণেশবন্দনা ও সরস্বতী বন্দনা বা নটরাজ বন্দনা (সাম্প্রতিককালে করা হয়), আসা—'আমদ', থাট্—দাঁড়ানো—আন্দাজ দাঁড়িয়ে ভঙ্গীসহ কিছু করা, এর বোল প্রদর্শনী অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের বোল পায়ের কাজে (অঙ্গ চালনাসহ) দেখানো—যেমন নটবরী বোল—শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বোলের কাজ, পরমেলু (পর-ভিন্ন, মেলু—মিলন)—ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা বোলের কুশলী সমন্বয়ের প্রদর্শনী, 'পরণ'—পাখোয়াজের বোলের সংগে তেজদীপ্ত নৃত্য, মিশ্রলয়ের বোল, 'চক্রধর' —একই বোল আবর্তিত করে দেখানো, 'বেদম চক্রধর' কোন দম বা বিরতি না দিয়ে বোল আবর্তিত করে দেখানো, 'তোড়া' টুকড়া'—সেতারের বোল তানের মত ঘোরানো ছন্দের বোল্ (তোড়া) ও তার ছোট ছোট টুকরা (টুকড়া) এবং এই বোলটুকড়া নটবরী সুরের সঙ্গে গেয়ে 'সঙ্গীত'-এর সঙ্গেও নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। এই সমস্ত দেখিয়ে আসর জমিয়ে কিছু অভিনয়ধর্মী ভাবব্যঞ্জনা (যাকে সাধারণভাবে ভাও বাৎলানো বলা হয়। এতে বিভিন্ন প্রকার ভাব চাহনি ও নৃত্য ক্রিয়ার হস্ত ভঙ্গী ও চলন সহকারে দেখানো হয়। ছোট ছোট টুকরো টুকরো ভাবের অভিব্যক্তির নাম 'গৎ' কতকগুলি গৎ-এর সমন্বয়ে যখন কোন ঘটনা বা ছোট কাহিনীর রূপ দেওয়া হয় তখন তার নাম 'গৎভাও' আর যখন পদের সঙ্গে ভাও বাৎলানো হয় তখন তাকে 'পদভাও' বলে। গজল, ঠুংরী ইত্যাদির সঙ্গে ভাও বাৎলানো অবশ্য নবাব আমীরদের ইচ্ছায় পরে সংযোজিত। ধ্রুপদ, ধামার, হোরী, পদভজন, দাদরা ইত্যাদি গীতের সঙ্গে নৃত্য ও নৃত্ত ক্রিয়া দেখানো হয়ে থাকে। এরপর অনুষ্ঠানের পরিণতিতে হয় ক্রমবর্ধমান লয়ে 'তৎকার' বা পায়ের শব্দ, বিভিন্ন তাল, লয়, ছন্দে দেখানো হয়। কথকের তাল পাঁচ জাতিতে বিভক্ত : চতস্র বা চতুরস্রা, তিস্র, খণ্ড, মিশ্র

ও সংকীর্ণ (এ হচ্ছে মাত্রানুসারে ভাগ : চতুরস্রাতে চার মাত্রার চার ভাগ, তিস্র তিন মাত্রার ভাগ, খণ্ড পাঁচ মাত্রার ভাগ, সংকীর্ণতে সাত মাত্রার ভাগ এবং মিশ্রতে বিভিন্ন প্রকার বিভক্তির মিশ্রণ)। (বর্তমানকালে ত্রিতাল—১৬ মাত্রা, ঝাঁপতাল—১০ মাত্রা, দাদরা—৬ মাত্রা, ধামার—১৪ মাত্রা, চৌতাল—১২ মাত্রা। একতাল—১২ মাত্রা, সুর ফাঁক তাল—১০ মাত্রা। পঞ্চম সোয়ারী—১৫ মাত্রা এবং গণেশতাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল ইত্যাদি তালে কথক নৃত্য করা হয়) তার লয় হচ্ছে পাঁচপ্রকার : সম, গোপুচ্ছ, চস্রাগতা; মৃদঙ্গ পিপিলিকা (একে 'যতি' নামাঙ্কিতও করা হয়।) কিন্তু সাধারণভাবে—মধ্য লয় বা সাধারণ লয়, বিলম্বিত বা টিমা, দ্রুত বা দুন্ বা জলদ, অতিদ্রুত বা চৌগুণ, ও অতিবিলম্বিত বা অর্ধার্ধ নামেই প্রচলিত। ছন্দ ও চলে বিভিন্ন রকমের : সমান ছন্দ দেড়ি বা দেড়মাত্রার ছন্দ, সওয়া মাত্রার ছন্দ, আড়ির ছন্দ, এবং চলে একটি তালের মধ্যেই বিভিন্ন তালের ছন্দ প্রদর্শনও কথকের তৎকারের অঙ্গীভূত। (সব তালেই সম ও ফাঁক পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়, ঠিক সম থেকে সুরু করার নাম নিকাস্) এই তৎকার পদাঘাতের সংযম ও নৈপুণ্য প্রদর্শনের এক বিশেষ অঙ্গ। এইভাবে তৎকারে লয় ও উদ্দীপনা চরমে উঠিয়ে তেহাই দিয়ে বা তেহাইকে তিনবার আবর্তিত করে সমে এসে নৃত্য সমাপ্তি করা হয়। (সম—অনাঘাত ও আঘাত দিয়ে হতে পারে।) এই নৃত্য হস্ত ও মুদ্রা বিভিন্নভাবে সংযুক্ত হয়—কথনও বা নৃত্য সৌকর্য বিধানের জন্য অর্থহীনভাবে সুন্দর কিছু হস্ত সংযুক্ত হয়—কখনো বা ভাব প্রকাশে সহায়তা করার জন্য কিছু অর্থব্যঞ্জক স্বাভাবিক হস্ত ক্রিয়া সংযোজিত হয়। এগুলি শাস্ত্রোল্লিখিত পতাক, ত্রিপতাক, শিখর, কপিত্থ, কটকা, কর্তরী, অর্ধচন্দ্র, চতুর, হংহাস্য, অঞ্জলি, মুকুল, সর্পশির, অলপদ্ম ইত্যাদি হস্তের অনুরূপ হলেও ঠিক শাস্ত্রবিধি মতো প্রযুক্ত হয় না—কখনো সংযুক্ত কখনো অসংযুক্ত বা কখনো মিশ্রভাবে বিভিন্ন বস্তু ও ক্রিয়ার প্রতিরূপ প্রকাশে স্বাভাবিক ক্রিয়াত্মকভাবেই প্রযুক্ত হয়। যেমন হয় ফুল, পুষ্পাঞ্জলি, বংশী (মুরলী), ঘোমটা (ঘুঙট) চটকলি, পিচকারী, গাগরী ইত্যাদি বোলেতে। এই সমস্ত নৃত্যানুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা যেমন—পান্ ঘটলীলা, রাসলীলা, মান, ছেড়, ছাড়, নন্দী, হোলি, কালীয়দমন, গোষ্ঠে, কংসবধ প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা লক্ষণের রসভিব্যক্তি এবং শিবতাণ্ড বাদেও উর্বশী

মেনকাদের পৌরাণিক কাহিনীও প্রদর্শিত হয়। পূর্বে এ সমস্তই একজন শিল্পী বিভিন্ন চরিত্রে ভাব ও ক্রিয়া দেখাতেন। এবং নাচের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর মুখ বাজানো (লহরা) হতো, মেনকাদেবী তাই একঘেয়েমি দূর করে নৃত্যে বৈচিত্র্যবিধান করতে বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণে বিভিন্ন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটান এবং ভাব ও পটের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবহ সঙ্গীত সংযোজনার রীতি প্রবর্তন করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কথকনৃত্য নৃত্য (ভাববাহী) নৃত্ত (পাদকর্ম ও অঙ্গ-চালনা প্রধান), নাট্য (নাটকীয়তা ও কাহিনী) এবং ভাব রস-শিল্পকর্ম সবকিছুই আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ নৃত্যের ভাবরস ব্যঞ্জনা দুঃসাধ্য ও মুষ্টিমেয় রসিকজনের বোধগম্য বলে সুলভ বাহবা অর্জনের আশায় নৃত্য-শিল্পীগণ কর্তৃক বর্জিত হয়ে শুধু পায়ের দ্রুত লয়ের কাজও ছন্দবোলের লড়াই দেখিয়ে চটুল চাহনি ও লঘু ভঙ্গিমায় কথককে বর্তমানে স্বল্প প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরা স্থূল ও চটুল প্রমোদ ধর্মীয় নৃত্যে পর্যবসিত করেছে—অবশ্য আশার কথা যে, সাম্প্রতিককালে কিছু উচ্চাঙ্গের রুচিজ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ও স্রষ্টা এ নৃত্যে আবার ভারতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক যথার্থ রূপ দিতে চেষ্টিত হয়েছেন।*

কথক নৃত্যের পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে রাগিনী দেবী উল্লেখ করেছেন—

The decade that began in 1930 marked the revival of Bharat Natya and Kathakali in South India, and the emergence of Kathak dance as a contemporary dance form.

The first to appreciate the richness and lyric beauty of Kathak dance was the well known dancer Menaka an educated Brahmin girl who took up dancing as a profession. She became a qualified exponent of Kathak dance and created several ballets in Kathak style with a professional Kathak dancer as her male partner. The musical setting of the ballet was classical. Menaka presented her ballet in India and toured Europe. Later she established a school

* এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগুণী প্রয়াত নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিন্দুস্থানী নৃত্যশৈলী কথক' উৎসাহী পাঠকরা দেখে নিতে পারেন।

of Kathak dance. The Kathak masters associated with her have continued to teach traditional Kathak dance in the expressive and pure dance form (Menaka passed away in 1947).

The most ambitious effort in the recent years to adapt Kathak chorography to ballet was sponsored by the Bharatiya Kala Kendra a dance and music centre in New Delhi where Kathak dance is taught by Shambhu Maharaj of the Lucknow Gharana.

Sanskrit classics in poetic form were selected for two ballet Kalidasa's Kumar Sambhava, a Siva Parvati Drama and Malati Madhava, a romantic drama of Bhavabhuti. These two ballets were beautifully choreographed by Birju Maharaj and Lacchu Maharaj of Lucknow Gharana.

The third ballet, Shan-e-oudh outlined the fusion of Mughal and Hindu cultures through the medium of the court dances and gestures songs of Nawab Wajid ali Shah's durbar. The performance began with an overtures 'Bahar a Rahi' rendered by vocalist and Orchestra. The splendid durbar of the first scene evoked memories of 17th century paintings —of white pavitlions and spacious gardens, and the noble decorum of courtiers. Wajid Ali Shah entered to the strains of the shahanai and received the solutions of his courtiers and the Basant offerings of the Rasadharis who danced before him. The court dancer of the period was impersonated by Birju Maharaj who composed the ballet assisted by Shambhu Maharaj. Authentic costumes and decor and the original songs, and dances composed by the Nawab and court dancers involved considerable research.

The music for the three ballets was composed by Aminuddin, Dagar, celebrated Dhruvapad singers. The Classical Dhruvapad and Dhamar songs personally sung by them and other vocalists accompanied by the orchestra were a perfect media for Kathack dance.

The three ballets brought about the fusion of the Kathak styles of the Jaipur and Lucknow Gharanas, the forms specialising in pure dance (Nritta) and the latter in expressive dance (Nritya). The ettempt to re-create Kathak dance in the musical setting of tradition revealed the inherent classicism and versatility of Kathak, and infused the art with a new spirit.[১]

।। মণিপুরী নৃত্যপ্রসঙ্গ ।।

ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলির মধ্যে মণিপুরী নাচ আপন স্বাতন্ত্র্যে দেদীপ্যমান। একদা সারাভারত জুড়ে যে মূকাভিনয় প্রচলিত ছিল তার থেকেই দেখা দিয়েছে উত্তর ভারতে পায়ের কাজ (পাদকর্ম) দক্ষিণ ভারতে হাতের কাজ (মুদ্রা) যা নাচের মধ্যে প্রধান স্থান জুড়ে থাকে। কিন্তু মণিপুরীতে অঙ্গভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়েছে। কথক ও ভরতনাট্যমের মতো এতে পায়ের কাজ এবং কথাকলির মতো মুদ্রাভিনয় নেই বল্লেই চলে। দেহের নিম্নাঙ্গ প্রায় সবটাই ঢাকা থাকে। দেহের উর্দ্ধাঙ্গের গতিভঙ্গিই মণিপুরী নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মণিপুরী নাচ কাব্যধর্মী, সৌন্দর্য্য মণ্ডিত, কোমল ও লাবণ্যময়। আমাদের ধারণা কাব্যধর্মী কোমল ও লাবণ্যময় বলেই হয়তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে এই নাচ অভিভূত করেছিল এবং তিনি নৃত্যনাট্য রচনায় শেষ পর্বে নৃত্যাভিনয়-এর জন্য যেমন কথাকলিকে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি নৃত্যে লাবণ্য সৃষ্টির জন্য মণিপুরীর আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণেই মণিপুরী নাচের প্রতি সুধীজনের

১। Dance Bialeets of of India—Ragini Devi (Vikash Publication. 1972, Page 172).

দৃষ্টি পড়ে। মূলগতভাবে মণিপুরী নাচের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করলে হরিবংশ পুরাণের সময়ের 'হল্লিসক' নাচের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাভারত ও হরিবংশ পুরাণের সময় ভৌম স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা যে 'হল্লিসক' নাচ করতেন, মণিপুরী রাস নৃত্য যেন তারই নব্য সংস্করণ।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে চারিদিক পাহাড় ঘেরা অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান বলেই হয়তো এই নাচের নান্দনিক দিকটা মানুষের মনকে এত গভীর করে নাড়া দেয়। তাছাড়া দীর্ঘদিন মণিপুর রাজ্য স্বাধীন ছিল তাই বাইরের তথাকথিত সাংস্কৃতিক মিশ্রণ কম হয়েছে, তাতে সুবিধে এই হয়েছে যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এই নাচ দীর্ঘদিন অনুশীলিত হয়ে আসতে পেরেছে।

ধর্মীয় দিক থেকে আগে ছিল শাক্ত প্রাধান্য—তাই শিব পার্বতী ছিল নাচের প্রধান দেবতা। পরবর্তীকালে বাংলার গৌড়ীয় ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব প্রাধান্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার লীলা সুরু হয়। এই ব্যাপারে জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থটির প্রভাব অপরিসীম। অবশ্য এই গ্রন্থটির ভাবরস ভারতীয় নৃত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাকেই রস সিক্ত করেছে। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রাধান্যে শাস্ত্রগত গোড়ামী অনেকটা দূর হয়েছে। তবু বলতে হবে মণিপুরীরা বেশ রক্ষণশীল।

মণিপুরী নৃত্যকে সংস্কৃতে বলে 'মণিপুরী নর্তন', আর মণিপুরী ভাষায় বলে 'জগোই'। এই জগোই শব্দটি এসেছে চৎ+কোই (চৎ—যাওয়া, কোই—ঘোরা) থেকে। শাস্ত্রীয় মতে মণিপুরী নাচে যে বাহ্যভ্রমরী ও অন্তর্ভ্রমরী ব্যবহৃত হয় তা অনেকটা anti-clockwise circular movement—এর মতো। ঋক্‌বেদের আদিত্যস্তুতি বর্ণনার অনুসরণে নাকি এই গতিভঙ্গির সৃষ্টি-একথা মণিপুর থেকে প্রকাশিত একটি নৃত্য পুস্তিকায় লক্ষ্য করা গেছে।

মণিপুরী নাচ মূলতঃ চারভাগে বিভক্ত—লাইহরোবা, অস্ত্রবিদ্যা, চলন গাথন ও রাসলীলা। এই চার ভাগ আবার আটভাগে বিভক্ত—মণিপুরী ভাষায় এদের নাম—ঔগ্রিহেঙ্গল, চিংখৈয়োল, কে-কে-কে-যত্রগা বা আবলচোংবী, লাইহরাউবা, নটপালা কীর্তন, রাস, যণশেলক বা খুবাক ই'শৈ, অসিনচিংবা।

মণিপুরী নাচ গোষ্ঠী নৃত্যের অন্তর্গত। এতে কম বেশী দশ থেকে চল্লিশজন অংশ গ্রহণ করে। সব রকমের মণিপুরী নাচই বৎসরের বিভিন্ন সময় ধর্মীয়

অনুষ্ঠানে বিশেষ করে দেবযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষ্যে দেখা যায়। লাইহরোউবা নাচ এখন তেমন দেখা যায় না। অস্ত্রবিদ্যা বেশ পুরোনো দিনের তরবারী নৃত্য। চলন-গাথন হলো অনেকটা কীর্তনের আঙ্গিকে খোল, করতাল, মঞ্জিরা সহযোগে নৃত্য। মণিপুরী নৃতে কীর্তন ও ভক্তিমূলক গান গাওয়া হয়। মণিপুরী নৃত্যের মূল প্রাণ ধর্ম।

ঔগ্রিহেঙ্গল শব্দের অর্থ—ঔগ্রি + অঙ্গহার অর্থাৎ ঐগ্রির (শিব) অঙ্গহার—শিবের দেহের গতিভঙ্গি। এই নাচ অনেকটা তাণ্ডবাঙ্গের। এই নাচে হাতে থাকে তরবারী, ত্রিশূল অথবা বর্শা। চিংখৈয়োল নাচ মূলতঃ লাস্য অঙ্গের। এতে ভোরের পৃথিবীতে উষবন্দনার মতো। কে-কে-কে বা অবল চোংবী নাচে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নারী-পুরুষ মিলে অংশ গ্রহণ করে। এই নৃত্য রাস নৃত্যের এক অংশ। লাইহরোউবা নৃত্যে শাস্ত্রীয় মতে পূর্বরঙ্গ করে, রঙ্গপীঠ পরিক্রমার পর আসল নাচ সুরু হবে। এই নাচ যে খুবই প্রাচীন তার প্রমাণ শাক্ত প্রাধান্য-পার্বতী-পরমেশ্বরের স্তুতিই এই নাচের মূল কথা শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধার প্রধান্য তখনো আসেনি। নটপালা কীর্তন নাচ মূলতঃ ভক্তিমূলক গান বা কীর্তনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিস্তন, মেল, মেনকাপ, এবং তাঞ্চপ-প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। এক কথায় কীর্তনাঙ্গের নাচ।

রাসলীলা নাচই মণিপুরের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রচলিত নাচ। এই রাসনৃত্য গড়ে ওঠে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। রাসনৃত্য চার প্রকার। কুঞ্জরাস, বসন্ত রাস, মহারাস ও নিত্যরাস। আশ্বিনে কুঞ্জরাস, বৈশাখে-বসন্ত রাস, এবং কার্তিকে মহারাস অনুষ্ঠিত হয়। নিত্যরাস বছরের যে কোন সময় বা যে কোন উৎসবে হতে পারে! গীত গোবিন্দ ও গোবিন্দলীলামৃতকে কেন্দ্র করে এই রাস নৃত্যগুলি গড়ে ওঠে। সূত্রধর প্রথমে নাচের বক্তব্য বর্ণনা করবেন তারপর শিল্পীরা নাচ সুরু করবেন। কার্তিক মাসে গোষ্ঠলীলা নৃত্য অনুষ্টিত হবে।

মণিপুরী নৃত্যের পোষাক খুবই মহার্ঘ, জমকালো এবং পবিত্র সুন্দর। পুরুষেরা বাহুতে 'হরিনাম মুদ্রা' ছাপ লাগাবে, কপালে আঁকবে গোপী চন্দনের উর্ধপুণ্ড্র তিলক। পুরুষরা পবিত্র উপবীত বা পৈতা পরিধান করে। তাছাড়া উত্তরীয় ব্যবহার করে। ফেনেক ও কুমিল হলো মণিপুরী নাচের প্রধান দুই পোষাক। লাইহরোউবাতে ফেনেক ও রাসনৃত্যেকুমিল ব্যবহৃত হয়। এর কারু-কার্য ঐতিহাসিক যুগে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের অলংকরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফেনেক লাল ও কালো রঙের বর্ডার, রাত্রি ও উষার প্রতীক। কেশবিন্যাসে বুদ্ধ মূর্তির অলংকরণের ছাপ রয়েছে। একমাত্র কালীয়দমন নাচ ও গোষ্ঠলীলায় মুখোশ ব্যবহৃত হয়।

উল্লিখিত মণিপুরী ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলির সঙ্গে আরেকটি নাচ চলে আসছে যাকে ঠিক ক্ল্যাসিক্যাল বলা সঙ্গত নয়। নাচটি হলো মণিপুরী—নাগা নৃত্য। নাগানৃত্য প্রধানতঃ আদিবাসী-উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নাচ। বরং এ নাচকে **Quasi-Folk** বলা যায়, কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল কখনোই না। অথচ কোলকাতার আসরে অনেক সময় মণিপুরের ক্ল্যাসিক্যালের সঙ্গে এক পংক্তিতে এই নাচ দেখানো হয়। অতি সংক্ষেপে মণিপুরী নৃত্যের রূপ-রেখাটি বিবৃত হলো মাত্র।

॥ আসামের নৃত্য প্রসঙ্গ ॥

আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক নাচ 'বিহু নাচ'। এই বিহু নাচের নানা দিক আছে। অঞ্চল ভেদে বিহু নাচের নানা নামকরণ হয়েছে। যেমন, 'মুকলি বিহু', 'রঙ্গালী বিহু', 'গাঙরু বিহু', প্রভৃতি। বৈশাখ মাসে সুরু হয় বিহু উৎসব। মেখলা-চাদর পরা তরুণীরা এবং ধুতি জামা (পাঞ্জাবী) পরা তরুণদের প্রাণোচ্ছল নাচ বিহু। এই নাচ মূলতঃ গান ও বাজনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রদেশ আসামকে নৃতাত্বিক বা মনোবিজ্ঞানীদের স্বর্গরাজ্য বলা হয়। কথাটিতে একটু অতিশয়োক্তি থাকলেও বক্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের মণিপুর অঞ্চলতো রাসনৃত্য এবং লাইহরোউবা নৃত্যের জন্য ভারত ও বিদেশে সমধিক পরিচিত। এ ছাড়া নাগাপাহাড় অঞ্চলের গোষ্ঠীনৃত্য ও সারা আসামে ছড়িয়ে থাকা অজস্র লোকনৃত্যের জন্যও ভারতের নৃত্যের ইতিহাসে আসামের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা আসামের উল্লেখ আছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ্‌ সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার রাজদরবারে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে অতিথি আপ্যায়ন করতে দেখেছেন। এছাড়াও জানা যায়—

"On the authority of the Kuttanimatam or Shambhalimatam, a didactic poem composed about 755-786 A-D-Damodar Gupta, the Chief Minister of King Jayapida of Kashmir,

that a courtesan, who was adapt in these arts, died on the funeral pyre of Bhaskaravarman, himself a great lover of fine things in life."[১]

নবম শতাব্দীতে রাজা বাণমল বর্মণ কামরূপে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত রাজার তাম্রলিপি (Copper plate inscription) থেকে জানা যায়—"the boats trembling of the waves of the Lauhitya or Brahmaputra are likened to dancing women agitated at the approach of men dancers" (Ibid). উক্ত লিপিতে বেশ্যা, বারস্ত্রী, নটী, দালু অঙ্গনা (temple-women) প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান হয় তদানীন্তনকালে হয়তো দাক্ষিণাত্যের মতো পূর্বাঞ্চল আসামেও দেবদাসী নৃত্যের প্রচলন ছিল। বরগাঁও-এ প্রাপ্ত শিলালিপিতে যে ভাস্কর্য নিদর্শনটি রয়েছে তাতে দেখা যায়—কামরূপের জনৈক রাজা, রত্নপাল নটেশ্বর শঙ্করকে প্রণাম করছেন—নটেশ্বরের ভঙ্গি তাণ্ডবনৃত্যের। ঐ বংশেরই আরেক রাজা, ইন্দ্রপালকে দেখা যায় বিদ্যাধর রূপে (ānavadya-vidyādhara) এছাড়া অনেক ভাস্কর্য্য রয়েছে যাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মৃদঙ্গ, বাঁশী, বীণা, প্রভৃতি বাজাতে দেখা যায়। আজকের যুগে কোন কোন মহিলা শিল্পীকে বাঁশী এবং বীণা জাতীয় যন্ত্র, সেতার সরোদ প্রভৃতি বাজাতে দেখা গেলেও কিন্তু এযুগের কোন মহিলা শিল্পীকে মৃদঙ্গ বাজাতে দেখা যায় না বল্লেই চলে। অথচ কোনারকের স্থর্য মন্দিরের উপর তলায় যতগুলি ভাস্কর্য নারামূর্তি রয়েছে তাঁদের দেখেছি মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদন রত। এ থেকে অনুমান করলে বোধহয় ভুল হবে না, যে নবম শতাব্দীতে ভারতের প্রায় সর্বত্রই মহিলা শিল্পীরা নৃত্যে এবং মৃদঙ্গ ও অন্যান্য ছন্দবাদনে অংশ গ্রহণ করতেন।

একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা তান্ত্রিক গ্রন্থ 'কালিকা পুরাণ'-এ বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে (rituals) কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবহারের কথা জানা যায়। এমন কি উক্ত সময়ে রাজাদের রাজনীতি ও সমরনীতিতে শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উত্তম বেশভূষায় অলংকৃতা মহিলা নৃত্যশিল্পী ও সঙ্গীত শিল্পীদের প্রয়োজন হতো।

১। Dance Tradition in Assam—by Dr. Maheswar Neogy. Seminar paper, Sangeet Natak Academy, New Delhi, 1958, Page-2.

(A king seeking great political and military strength, it is prescribed, should have the army adorned by well-dressed dancing women with music and dancing." (Ibid. page-3)

এছাড়া উক্ত উপপুরাণে ১০৮ প্রকার মুদ্রা বা নৃত্যহস্তের বিস্তৃত বিবরণ আছে। যেমন—ধেনুমুদ্রা, সম্পূর্ণ মুদ্রা, প্রাঞ্জলি মুদ্রা, বিল্বমুদ্রা, পদ্মক মুদ্রা, যোনি মুদ্রা, মহামুদ্রা প্রভৃতি। এগুলি যে ধর্মীয় আচরণ বা পূজাতে ব্যবহৃত হতো তা মুদ্রার নাম দেখলেই বোঝা যায়। নাচে এই মুদ্রা অবিকল ব্যবহৃত হত কিনা সঠিকভাবে জানা যায় না। পরবর্তীকালে অবশ্য উক্ত মুদ্রাগুলিকে নৃত্যহস্তের সগোত্রীয় ধরা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে 'হিল্লোক' 'নাটকশাখা' (নাটক ও নৃত্যের স্থান বা মঞ্চ) প্রভৃতি শব্দ নাটকেশ্বর শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। পৌরাণিক মতে এই 'হিল্লোক অঞ্চল দ্বিতীয় 'কৈলাস' নামে অভিহিত হয়।

আসামে প্রচলিত নাচকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন 'নটী নৃত্য', ওঝাপলী নৃত্য' এবং 'সাত্রা নৃত্য'।

'নটীনৃত্য' প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হতো আসামের শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে। 'ওঝাপলী নৃত্য' মূলতঃ মনসার পূজাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় পুরাণগুলির বিভিন্ন সংস্করণে) আবৃত্তি, গান ও নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান। এ নৃত্যধারা খুবই প্রাচীন। আর 'সাত্রা নৃত্য'-এর উদ্ভব হয় নব্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান থেকে।

উক্ত 'নটীনৃত্য' এখন প্রায় দেখাই যায় না—পুরোনো লোকনৃত্যের মধ্যেই যেন ক্ষয়িষ্ণু আকারে রয়ে গেছে। কিন্তু 'ওঝাপলী নৃত্য' এখনো দৃশ্যমান, আসামের কামরূপ জেলা, দরং জেলার মঙ্গলদই প্রভৃতি স্থানে। আর 'সাত্রা নৃত্য' ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিভিন্ন গ্রামে বৈষ্ণব মঠগুলিতে দেখা যায়। ওঝাপলী নাচের বিশেষজ্ঞরা তৌর্যত্রিকা-সরা বা মুদ্রা নামে কিছু কিছু অনুষ্ঠান করতেন যা আজকাল প্রায় নেই বল্লেই চলে। শুধু শুভঙ্কর কবি রচিত 'হস্তমুক্তাবলী' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে মাত্র। উক্ত তিনটি নৃত্যধারাই পরিপূর্ণ ধর্মকেন্দ্রিক।

॥ নটীনৃত্য পদ্ধতি ॥

একদা সারা ভারত জুড়ে মন্দিরকেন্দ্রিক যে নৃত্যধারা 'দাসী আট্টম্' নামে পরিচিত ছিল তারই এক সংস্করণ যেন আসামের নটীনৃত্য। দাক্ষিণাত্যের

দেবদাসীদের প্রসঙ্গে যেমন নানা দিক থেকে তথ্য জানা যায়, আসামের নটী-নৃত্যের ক্ষেত্রে সেই সুবিধে নেই। তথ্যের অপ্রতুলতা এই নৃত্যধারাকে ভালভাবে জানবার প্রধান অন্তরায়। আসামের শিবমন্দির গুলিকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে দরং জেলার বিশ্বনাথ ঘাট, শিবসাগর জেলার দেয়গাঁও, কামরূপ জেলার হুবি—প্রভৃতি স্থানে উক্ত নটীনৃত্য বা দেবদাসী নৃত্য একদা অনুষ্ঠিত হতো এটুকু জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে ডঃ এস. কে. ভুঁইয়া সম্পাদিত প্রাচীন কালানুযায়ী লিখিত বিবরণযুক্ত একটি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—"That Satrajit Barua of Dacca, in subordinate command of Mughul force of Aurangazeb took away by force, three natis or temple dancers from the Biswanathghat Siva Shrine. A Vishnuite temple, namely the Hayagriva madhava mandira of Hayo (Kamrup District), 15 miles from Gauhati). also had its natis, probably in conformity with a similar custum in the Jagannath temple, which is considered as an ideal in other matters also. This temple was rebuilt on the ruins of an old construction by the king, Raghudevanarayana of Kamrupa in 1583 A. D."

(Idid-page-9)

আসামের নটীনৃত্যশিল্পীরা অবিবাহিতা থাকতেন। তারা বাবা-মা বা কোন আত্মীয়ের সঙ্গে বসবাস করতেন এবং সময় মতো মন্দিরে গিয়ে নৃত্যানুষ্ঠান অংশ গ্রহণ করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিদেশী শাসনের প্রভাবে মন্দির কেন্দ্রিক নটীনৃত্য প্রথা ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এবং সমাজের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীতে এই প্রথা অচল হয়ে পড়ে।

নটীদের পোষাকে থাকতো লাহাঙ্গা (loose skirt), রিহা (wrapper) প্রভৃতি রিহা বুকের উপর জড়ানো থাকতো। লম্বা হাতা ব্লাউজ এরা পরিধান করতেন। মাথায় খোপায় থাকতো ফুল এবং একটি পাতলা ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা থাকতো। এই ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকার প্রথা এখন মণিপুরী নাচে দেখা যায়। এছাড়া সোনার ও অন্যান্য গহনা এঁরা পরতেন নাচের সময়। এই

নাচে প্রধানতঃ খোল ও করতাল বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই নাচের বাজনাকে 'আমজানি, ও 'খট' এই দুই নামে অভিহিত করা হতো।

॥ পুরাতন বৈষ্ণব ওঝাপালী নাচ ॥

এই নৃত্যে মূলতঃ মনসামঙ্গলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দেবী মনসার স্তবগাথা সমবেত কণ্ঠে সুর সহযোগে গাইবার প্রবণতা আমরা পূর্ববঙ্গে দেখেছি। এই মনসার আরেক নাম পদ্মা। তাই পূর্ববঙ্গে এর নাম 'পদ্মপুরাণ'। সারা শ্রাবণ মাস ধরে এই পদ্মপুরাণকে কেন্দ্র করে যে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয় তাকে বলে 'রয়ানি গান'। পূর্ববঙ্গ এবং আসাম অঞ্চল সর্পসঙ্কুল এলাকা। সুতরাং সর্পপূজা বা মনসাপূজা এই এলাকার স্বাভাবিক উৎসব। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করেছি কামরূপের দেবী কামাখ্যাকে সর্পের অধিষ্ঠাত্রীরূপে একদা পূজা করা হতো। ঐ সময় সুদূর উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের ওঝারা বা সাপুরের দল পায়ে হেঁটে বছরে একবার কামাখ্যা দেবীর কাছে যেতেন। পথে বাংলাদেশের (অবিভক্ত বাংলা) উপর দিয়ে যাবার সময় তারা পাথেয় খরচ তুলতেন সাপ খেলা দেখিয়ে এবং মনসার গান গেয়ে। ঐ সকল ওঝা—সাপুরের দলের গানের সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচের আয়োজন থাকতো। এই ভ্রম্যমান ওঝা-সাপুরেদের সঙ্গে আসামের ওঝাদের 'ওঝাপালী' নাচের পুরোনো অবস্থায় বাংলা বিহার উত্তর প্রদেশের প্রভাব পড়াটা অস্বাভাবিক নয়।

আসামের 'ওঝাপালী' নৃত্য, নানা ভাগে বিভক্ত। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে ওঝাপালী নাচে বৈষ্ণবরা এলেন কি করে। যেই দেবীকে কেন্দ্র করে এই ওঝাপালী নাচ, তিনি তো শাক্ত দেবী মনসা। তাহলে কি শাক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে সকলেই সাপের ভয়ে মনসার স্তব গান করতেন? এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে কোন গবেষক আলাদাভাবে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন। যাই হোক, পুরাতন বৈষ্ণব-ওঝা-পালী নাচে সর্পদেবী মনসার স্তব গান হতো সমবেত কণ্ঠে (chorus)। এই ঐকতান সঙ্গীতে মূল গায়েনের সঙ্গে সমস্বরে ধুয়া ধরতেন গায়ক দল। এই সকল গানের বিষয়বস্তু চয়ন করা হতো রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির 'আসামী সংস্করণ'

থেকে। একদিকে দেবী মনসার স্তব গাঁথা, অপর দিকে রামায়ণ প্রভৃতির কাহিনী নিয়েই ওঝাপালী নাচের দুটো ধারা চলে এসেছে।

মনসার স্তব গাঁথা নিয়ে ওঝাপলী নাচের, অপর নাম 'শুকনান্নি' (Suknanni) এতে আসামী চারন কবি শুকদেব নারায়ণের লেখা মনসার কথা ব্যবহৃত হয়। আর দ্বিতীয় ওঝাপালীকে বলা হয় 'বিষাহার গীত'। এতে মহাভারতের কথা ও কাহিনী ব্যবহৃত হয়। এর অপর নাম আসামী ভাষায় 'বেয়া গোরা-ওঝাপালী'।

ওঝাপালীর পুরোধাকে বলা হয় 'ওজা' বা 'ওঝা'। সংস্কৃত উপাধ্যায় শব্দ থেকে এই ওঝা শব্দের উৎপত্তি ধরা হয়। আর সংস্কৃতে পালিত (subordinates) থেকে পালী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। মূল ওঝা এবং তাঁর দলে আশ্রিত বা পালিত লোকদের নিয়েই ওঝাপালী নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ মন্ত্র-তন্ত্র, ঝার-ফুঁক করে সর্প দংশনের রুগীকে যাঁরা ভাল করেন তাঁদেরই বলা হয়ে থাকে ওঝা। উক্ত দুই প্রকার ওঝাপালী ছাড়াও আরেক প্রকার আছে, তার নাম 'দৈনা-পালী' (সংস্কৃত 'দক্ষিণ' শব্দ থেকে 'দৈনা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরা হয়।)

ওঝা, হলেন মূল গায়েন। তিনি মুখে গান করবেন, পায়ে তাল রাখবেন, হাত নেড়ে করতালের লয় ঠিক করে দেবেন। তাঁকে অনুসরণ করবেন দোহারের দল। মাঝে মাঝে তিনি নৃত্যভঙ্গি করবেন হাতে মুদ্রাসহ। এঁদের অনেক নৃত্যভঙ্গির মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্যের ভঙ্গি আজও দেখা যায়। গরুড় পাখীর মতো গতিভঙ্গি করে ওঝারা মুখে গান, হাতে মুদ্রা, পায়ে তাল রেখে ঘুরে ঘুরে নাচে।

(...With songs on his lips, gestures in his hands, and musical tuning on his feet, goes round and round like the bird, Garuda." (Ibid Page-11.)

আসামী ভাষায় লেখা দুই চরণের এই শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

"মুখে গীত হাতে মুদ্রা পায়ে ধরে তাল,
গরুর সদৃশ্য ভ্রমে সেহি অজা মাল ॥

এখানে 'অজা' মানে ওঝা। ঠিক এই রকমই একটি শ্লোক আছে 'অভিনয় দর্পণ'-এ। যেমন,

'আস্যেন্যালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ। ৩৬।'[১]

অর্থাৎ মুখে গান করবে, হাতের ভঙ্গি দিয়ে গানের অর্থ বোঝাবে, যুগল নয়ন ভঙ্গি দিয়ে গানের অর্থ বোঝাবে, যুগল নয়ন ভঙ্গি দিয়ে ভাব দেখাবে এবং চরণযুগল দিয়ে তাল দিতে থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আসামী শ্লোকটিতে 'অভিনয় দর্পণের' প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। অতএব ওঝাপালী নৃত্যের রূপকে অনেকটা শাস্ত্রীয় নৃত্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। শুধু তাই নয়, ওঝারা বলে থাকেন তাঁদের ঐ নাচের উৎস নাকি 'ত্রৌর্যত্রিক সরা' নামক এক ধরণের শিল্পকলা। তবে সঙ্গীত শব্দের সঙ্গে 'ত্রৌর্যাত্রিকতা' শব্দটি প্রাচীন শাস্ত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে নৃত্যনাট্য হিসেবেও 'ত্রৌর্যত্রিক' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। যথা স্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

॥ শুকনান্নী ও ওঝাপালী নৃত্য ॥

শুকনান্নী ওঝাপালী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, তাঁদেয় শিল্পকলা এসেছে ইন্দ্রের স্বর্গসভা থেকে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বৃহন্নলা রূপধারণের মাধ্যমে। এবং এই শিল্পকলা দরং জেলার প্রধান রাজপুত্র দরঙ্গী রাজার দ্বারা হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়। মারাই গাঁও নামক স্থানে কিছু মুসলমান শুকনান্নী ওঝা আছেন, যাঁরা ভাল বাজনা বাজাতে পারেন। সু কবি নারায়ণ রচিত মনসার গাঁথা অবলম্বম করে শকনান্নী ওঝারা নৃত্যানুষ্ঠান করেন।

উক্ত মনসা গাঁথাটি তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন, দেবখণ্ড, বেনিয়াখণ্ড ও ভাটিয়ালী বা বেথেলী খণ্ড। দেবখণ্ডে আছে শিবদুর্গার বিবাহ, মনসা বা পদ্মার জন্ম এবং এই দেবদেবীদের কেন্দ্র করে অন্যান্য সব কাহিনী। বেনিয়াখণ্ডে রয়েছে শৈব বণিক চন্দ্রধরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বের কাহিনী ভাটিয়ালী বা বৈথেলী খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে চন্দ্রধরের পুত্র লখিন্দরের মৃত্যু এবং বেহুলার প্রচেষ্টায় আবার তাঁর পুনর্জন্ম লাভ প্রভৃতি।

শুকনান্নী ওঝপালী নৃত্যে ওঝারা পরিধান করেন আসামী সাদা রঙের শিল্কের ধূতি, চাপকান, চাদর পাগড়ি গলায় মালা, কানে ফুটি (ear-pins) প্রভৃতি। কিন্তু বালারা পরিধান করেন খুবই সাধারণ কাপড়ের কুর্তা, ধুতি,

১। অভিময় দর্পণ—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী অনুদিত। পৃঃ ১১ মডার্ণ বুক এজেন্সী ১৩৪৪।

চাদর। এতে অংশগ্রহণকারী মহিলা নৃত্যশিল্পীদের বলা হয়—'দেওধামী' (God's women) এঁরা পরিধান করেন মেখলা (skirt) এবং হলুদ রঙের সিল্কের বক্ষবন্ধনী। হাতে রূপার বালা, গলায় রূপার মালা এবং মাথায় চুল থাকে খোলা। নাচের সময় খোলা চুল আন্দোলিত হয়। মহিলা নৃত্য-শিল্পীদের বেশভূষার মধ্যে একটা পবিত্রতার ভাব আনবার চেষ্টা করা হয় এবং এবং এঁরা কখনো মুখে 'মেকাপ' করে না।

বর্তমানে শুকনান্নী ওঝা পালী নাচে প্রধানতঃ সঙ্গীতের তিনটি স্থর বা রাগ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, ভাটিয়ালী, আহীর ও সন্ধ্যা।

॥ মহীশূরের যক্ষগণ গান ও নৃত্যনাট্য ॥

কর্ণাটীয় মেলানাট্য পরম্পরায় যক্ষগণের উদ্ভব হওয়ায়, এ বিষয়ের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক ভাবেই ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্য গোষ্ঠীর কুচিপুড়ি প্রসঙ্গ এসে যায়।

সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে যেমন 'রামলীলা' লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি দক্ষিণ ভারতের মহীশূর কানাড়া (কর্ণাটী) অঞ্চল এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও 'যক্ষগণ' গান ও নৃত্যনাট্য প্রচলিত আছে। যক্ষগণের মেকাপ্, পোষাক পরিচ্ছদ, বাচিকাভিনায় প্রভৃতিতে আমাদের লোকনাট্য যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলার যাত্রা, নেপালের গন্ধর্ব গানের সঙ্গে যক্ষগণের সাদৃশ্য বিদ্যমান। অন্ধ্রের একদা অবহেলিত নাচ কুচিপুড়ি যদিও এখন ক্ল্যাসিক্যাল-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে—তবু কিন্তু যক্ষগণ এখনো (Quasi-Folk) পর্যায়ে রয়ে গেছে। অন্যান্য ক্ল্যাসিক্যাল নাচের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করে হয়তো বলা যায় Classico-Folk পর্যায়ে এসেছে।

বর্তমানে মহীশূর রাজ্য যক্ষগণ গান ও নৃত্যনাট্যের পীঠস্থান।

॥ ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্য ॥ (কর্ণাটক মেলানাট্য পরম্পরা)

'সাহিত্য দর্পণ' মতে নাট্য হচ্ছে 'দৃশ্যকাব্য'। ভারতীয় নাট্যকাব্যের আঙ্গিকে লেখা এবং ছন্দে অভিনীত, এমনি মুখের কথা বলা থেকে যেমন কবিতা আলাদা, তেমনি সাধারণ ক্রিয়া-কর্ম থেকে নাট্য আলাদা। লোকধর্ম হল যা বাস্তবানুগ জনপ্রিয়। আর 'নাট্যধর্ম' হল এমন কতগুলি প্রচলিত রীতিসিদ্ধ বিষয় যা নানা শাস্ত্রীয় আইনকানুনে বাধা।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের উৎস খুঁজতে হবে নৃত্য ব্যাখার মধ্যে। কারণ একজন অভিনেতা শুধু অভিনেতা নয়—নৃত্যশিল্পীও বটে। একজন অভিনেতা নৃত্যশিল্পী নাটকের বক্তব্য প্রকাশ করেন বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য, গান ও যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে। শাস্ত্রীয় মতে নাটক হবে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমাহারে প্রস্তুত। প্রাচীন ভারতীয় নাটকে তাই কথার থেকেও অর্থাৎ বাচিকাভিনয় অপেক্ষা আঙ্গিকাভিনয়ের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী। নাটকে কানে শোনা অপেক্ষা দেখার গুরুত্ব বেশী। তাই নাটক 'দৃশ্যকাব্য'।

অবশ্য ঐ ধরনের প্রাচীন নাটক এখন আর দেখা যায় না। সংস্কৃত নাটক পরম্পরাগতভাবেই কেরলের মন্দিরে ব্রাহ্মণ অভিনেতা চাক্কিয়ার (Chhakkiyars) দের দ্বারা অভিনীত হতো। এ থেকেই পরবর্তীকালে মালয়ালম্ ভাষায় কথাকলি—নৃত্যনাট্য তৈরী হয়েছে। মালয়ালম ভাষায় লেখা কথাকলি—নৃত্যনাট্যের মতো, অন্ধ্রের দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ তেলেগু ভাষায় লেখা নাটক এবং ব্রাহ্মণ ভাগবতদের দ্বারা অভিনীত কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্য, তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তাঞ্জোর জেলার ভাগবতমেলা নাট্য, এবং পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলের (মহীশূর) যক্ষগণ নৃত্যনাট্য প্রধান।

॥ **কুচিপুড়ি** ॥ (অন্ধ্র পরম্পরা)

অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত কৃষ্ণা নদীর তীরে কুচেলাপুরম্ নামে যে গ্রাম আছে, তার ব্রাহ্মণ ভাগবতেরা কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যকে বংশ পরম্পরায় চর্চা করে এসেছেন এবং বর্তমানে যে কুচিপুড়ি নাট্যকে তেলেগু ভাষায় পাচ্ছি তাও এদেরই কীর্তি। কুচিপুড়ির ব্রাহ্মণ অভিনেতারা এই কুচিপুড়ি নাট্যের উদ্গাতা। মুক্তাঙ্গণে খোলা আকাশের নীচে রাতভর নাটক অভিনয় চলে। এই নাটকগুলির মধ্যে 'উষা কল্যাণম্', প্রহ্লাদ চরিতম্', ভাম-কল্পম্' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। প্রথমে বিষ্ণুর দশাবতারের অভিনয় হয় নৃত্যের আঙ্গিকে। অভিনেতাদের সামনে থাকে পর্দা। মশাল ব্যবহৃত হয় আলোর কাজে। সমস্ত অভিনয় করেন পুরুষেরা। নারী চরিত্রও পুরুষেরাই অভিনয় করে থাকেন।

প্রত্যেক অভিনেতা প্রথমেই বিশেষ ধরনের প্রবেশ-নৃত্য 'দারু' (Daru) অভিনয় করে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, পাদকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে। নানা রকমের পুরুষ ও নারীদের 'দারু' অভিনীত হয় গান ও তালের যোগের সঙ্গে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কুচিপুড়ির ক্ল্যাসিক্যাল

নৃত্যশৈলী। অবশ্য কুচিপুড়ির ভাগবতেরা বলেন, তাঁরা 'অভিনয় দর্পণ'কেই প্রামাণিকভাবে অনুসরণ করেন। মূলগতভাবে এই কুচিপুড়ি নৃত্য দেবদাসী নৃত্যেরই এক অংশবিশেষ॥ এবং বলা যেতে পারে কুচিপুড়ি এবং দেবদাসী পদ্ধতিগত ও শৈলীগত দিক দিয়ে সমান্তরালভাবেই চলেছে। দক্ষিণ ভারতের নাট্যে বাচিকাভিনয় থাকলেও কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে কথা, (বাচিকাভিনয়) অঙ্গভঙ্গি, গান, নৃত্য প্রভৃতি সবই প্রায় দেখা যায়।

তাঞ্জোর জেলায় নাট্য অভিনীত হয় 'মেলাতুর' ও সোলমঙ্গলম্' (Solamangalam) নামে বিষ্ণুর বসন্ত উৎসবে। প্রায় ১৬০ বছর আগে তাঞ্জোরের ভেঙ্কটস্বামীগল নামে এক মুনি অনেকগুলি ধর্মীয় নাটক রচনা করেন— উষা কল্যাণম্, প্রহ্লাদ, ভামকল্পম্, রুক্মিণী-কল্যাণম্, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি তেলেগু ভাষায় লেখা। পরম্পরাগতভাবে নাটকের কাব্য অংশ স্বর সহযোগে গাওয়া হয় এবং তাতে থাকে নৃত্য ও অভিনয়। নাচ-গান ও অভিনয়ে পারদর্শী ব্রাহ্মণরাই ভাগবতমেলা নাট্যের প্রধান অভিনেতা।

প্রত্যেক অভিনেতাকেই 'দারু' বা প্রবেশ নৃত্য করতে হয়। দেবদাসীদের ভরতনাট্যম্ নাচের মতো আলারিপু, বর্ণম্, পদম্, অদাভুজাতি (dance pattern) এবং তিরমন (fine sequence) প্রভৃতি আঙ্গিক পদ্ধতি মূলত একই— কুচিপুড়ি নাচেও ঐগুলিই প্রায় ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ভরতনাট্যম্ নাচের নারী ও পুরুষের নৃত্য প্যাটার্ণ আলাদা হয়েছে পরবর্তীকালে। তবে মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায় মেলাতুব ও কুচিপুড়ি নৃত্যের নাট্যের মধ্যে। এবং এই দুটি নৃত্যধারার উৎস একই।

দেবদাসীরা অব্রাহ্মণ নত্তুভানদের কাছে নাচ শিখতো। আর ব্রাহ্মণ-ভাগবতেরা চর্চা করতো কুচিপুড়ি নাচের।

'বসন্ত উৎসবম্' নাট্য অর্থনৈতিক কারণে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যথাযথ গুণীসধারণের অভাবে, নানা রূপ অবহেলায়, অর্থনৈতিক কারণে এবং প্রচারের অভাবেও এই ভাগবতমেলা নৃত্যনাট্যের ধারা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে।

॥ **যক্ষগণ** ॥ (নৃত্যনাট্য)

দক্ষিণ কানাডার পশ্চিম উপকূলে (মহীশূর) বিভিন্ন ঋতুতে যক্ষগণ নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ করে স্থানীয় মন্দিরগুলিতে দেওয়ালীর সময়। এই নৃত্যনাট্য

কানাড়ী ভাষায় লেখা এবং এতে বাচিকাভিনয়ও রয়েছে। নাটকের গানগুলি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় এবং এর সঙ্গে চলে তাৎক্ষণিক কথোপকথন (অনেকটা কবিগান, তরজার মতো)। এগুলি লোকনাট্যের মতো অভিনীত হয়। অভিনেতারা খুব সুচতুর হন কথাবার্তায়॥ নাট্যশাস্ত্রের ট্র্যাডিশনকে রেখেও এঁরা মনোমত কণ্ঠস্বরের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ধ্বনিভঙ্গি করে অভিনয় করে। অভিনেতারা উপস্থিত বুদ্ধিমত্ত কথা দিয়ে মালা গাঁথতে পারে।

'যক্ষগণ'-এর অভিনেতারা দাবী করেন যে তাঁদের নাচ নাকি ইন্দ্রের নাচের মতো অর্থাৎ ইন্দ্রের নাচের আঙ্গিকেই যেন এঁরা নাচে। যক্ষগণ নৃত্যনাট্যে প্রত্যেকটি দৃশ্য শেষ হয় স্ফূর্তিযুক্ত নাচ দিয়ে। এই সব নাচে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, দুর্ধর্ষ ঘূর্ণন প্রভৃতি নানা চমকপ্রদ দেহভঙ্গি ব্যবহৃত হয়।

যক্ষগণ নাচের প্রধান আকর্ষণ হল তার পোষাক-পরিচ্ছদ ও 'মেকাপ'। নানা প্রকারের মাথায় বিরাট মুকুট পরে। মুকুটগুলি জমকালো করে সাজানো। আলোতে ঝল্‌মল্ করে। বুকের পোষাক, কোমরবন্ধ, ও অন্যান্য কাঁচের চুমকি বসিয়ে করা হয়। রঙিন পোষাকগুলি ট্র্যাডিশন বজার রেখে চলেছে।

কথাকলির অসুর ও অপদেবতাদের মতো যক্ষগণের মুখের মেকাপ্-এ মিল আছে। ঐতিহাসিক চরিত্র—ইন্দ্র, ভীম ও অর্জুন প্রভৃতির মুখ চিত্রিত করা হত পাতলা রং দিয়ে অনেকটা মুখোশের ধরনে। কালো দাড়িও দেওয়া হয়। তবে যুবক চরিত্রের মেকাপে দাড়ি দেওয়া হয় না। সবকিছু মিলিয়ে যক্ষগণ নাটক অন্যান্য নাটক থেকে একটু স্বতন্ত্রধর্মী। বিশেষ করে যে নাটকগুলি পোষাকে, মেকাপে, অলঙ্কারে আধুনিক হতে চাইছে।

অভিনেতা প্রথমে এসে ভূমি স্পর্শ করে। দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে নাচে। নাচের শেষ দিকে কৌণিকভাবে মুখ ফেরায় দর্শকদের দিকে।

অনেকসময় বালগোপাল, ইন্দ্র, অর্ধনারী প্রথমদিকে বাদ দেওয়া হয় অনুষ্ঠান সূচী সংক্ষেপ করার জন্য। পুরুষরা যে যক্ষিনী সেজে অভিনয় করে তাও অনেক সময় বাদ দেওয়া হয়। নারী চরিত্রগুলি আধুনিক শাড়ী পরে এবং তাঁদের চর্চার অভাবে তেমন ভালো হয় না। সাধারণতঃ নাচগুলি বীররসাত্মক। এই নাচগুলি ঠিক ভরতনাট্যম্ ও কথাকলির মতো হুবহু এক নয়। বিশেষ করে হাঁটু ভেঙে যে ভঙ্গিগুলি হয় সেগুলিতো বটেই।

কেউ বলেছেন যে যক্ষগণ নাট্য খুবই প্রাচীন এবং তা একদা ছিল উত্তর

ভারতে প্রচলিত। পরে তা কোন কারণে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় নাট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

বর্তমানে যে যক্ষগণ প্রচলিত রয়েছে তার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় 'বহু নাটক' নামক একটি গ্রন্থে। আনুমানিক ১২৫০ খ্রীঃ নাগাদ পক্কুরিকা সোমনাথ নামে জনৈক লেখক এটি রচনা করেন এবং তাতে দশপ্রকার শিব-লীলার উল্লেখ আছে। শৈব-প্রাধান্য থেকেই যক্ষগণ গীতিনাট্যের উদ্ভব হয়েছে। যক্ষগণ মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় বলে এর আরেক নাম 'ব্যায়ালতা'। প্রথমাবস্থায় একজন অভিনেতা গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু আঙ্গিক ও বাচিকাভিনয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করতো—অনেকটা আমাদের কথকতা ও রামায়ণ গানের মতো।

যক্ষগণ গীতিনাট্যের প্রধান তিনজন রচয়িতাকে পাওয়া যায় ১৫শ ও ১৬শ শতকের মধ্যে। যেমন ওবেয়া মন্ত্রী রচিত 'গরুর চলম্', সিদ্ধ রচিত 'কৃষ্ণ হীরামণি' এবং 'রুদ্রকৈর' রচিত 'সুগ্রীব বিজয়ম্'।

অন্ধ্রের যক্কুলাভরু সম্প্রদায়ের মহিলারা যক্ষ সেজে অভিনয় করতেন বলেই নাকি এর নাম যক্ষগণ হয়েছে। এতে 'যেরুকলাশান' নামে একটি ভবিষ্যৎ-বক্তার চরিত্রও অভিনীত হয়। কল্যাণ-মণ্ডপে যক্ষগণ অনুষ্ঠিত হয়। একদা কুচিপুডির ব্রাহ্মণমেল্যর ভাগবতুলুরা এই যক্ষগণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। এবং এরাই এই নাচকে classical level এ উত্তীর্ণ করে নাট্যশাস্ত্রের অঙ্গহার করণ, মুদ্রা প্রভৃতির ব্যবহার করে। অভিনয়ের চারটি পর্যায় এতে ব্যবহৃত হতো।

যক্ষগণ রচিত হতো দেশী ছন্দ, দ্বিপদ্, কদম্, শিসম্ প্রভৃতিতে এবং বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর সুরের ব্যঞ্জনায় তা মূর্ত হয়ে উঠতো। যক্ষগণ মূলতঃ গান, পরে এর সঙ্গে নাচ ও নাটক যোগ হয়ে এসে নৃত্যনাট্যের স্তরে উত্তীর্ণ করেছে।

পেশাদার যক্ষগণ দল দুই ভাগে বিভক্ত। একদল ভ্রাম্যমান—বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করে থাকে। আরেকদল থাকে এক একটি মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। কাউর অসুখ বিসুখ করলে আরোগ্য কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যে, তাঁরা রোগমুক্ত হলে যক্ষগণ অনুষ্ঠান করে দেবতার তুষ্টি বিধান করবে।

যক্ষগণ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বিষয়ে রাগিণী দেবী উল্লেখ করেছেন—[১]

১। Dance Dialects of India—Ragini Devi—(Vikash Publications-1972, Page-133.)

"A Yakshagana performance begins with the preliminary worship of Gonesha off-stage. The Ganesha image is then brought to the stage by the Hanuman Nayak, the buffoon, who performs the Ranga Puja with a lighted lamp, A song describing the story of the play is sung. Then there is a dance of Bala-goplas repesenting Krishna and Balarama. Two actors impersonating women enter the stage dancing, and, after this, a stage curtain is held up for the oddalaka, the first presentation of the principal male characters, one by one Partly concealed by the curtain, each actor, touches the ground in obeisance, turns his back and profile, then faces forward as the curtain is lowered. When the five Pandavas of the Mahabharata are the Chief characters, they are presented together."

॥ বিহারের নৃত্যপ্রসঙ্গ ॥

আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে বিহার অঞ্চলের নৃত্যধারাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়।[১] বিদেহ বা বর্তমান মিথিলা অঞ্চলের বৈষ্ণবভাবাপন্ন কাব্যসঙ্গীতকেন্দ্রিক নৃত্যধারা। (২) দক্ষিণ বিহার অঞ্চলের আদিবাসী নৃত্যধারা। (৩) কথক নৃত্যধারা।

সুপ্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ মুনি ভৃগু, গৌতম এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখরা বিহারের অধিবাসী ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেছেন। তাঁদের যুগে মুক্তি সাধনায় অঙ্গ হিসেবে নৃত্য ও সঙ্গীত যে অপরিহার্য ছিল, এই প্রসঙ্গে জানা যায়—

"It was the sage Yagnabalka, an inhabitant of Mithila (Videh), who promoted out that devotion to music and dance was one of the means of salvation."[১]

১। Dance tradition in Bihar—by Hari Uppal. Dance Souvenir papers Sangeet Natak Acad emy, New Delhi-1958, Page-2.

যাইহোক পৌরাণিক সাহিত্য অনুযায়ী বর্তমান বিহার তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলির নাম—মগধ (দক্ষিণবিহার), অঙ্গ (পূর্ববিহার) এবং বিদেহ (মিথিলা)। সারা ভারতে একদা যে ষোড়শ জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে মগধ ও অঙ্গ অঞ্চল রয়েছে। সুতরাং এই সকল অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ধারা খুবই প্রাচীন।

বিহারের সঙ্গীতের ইতিহাসে একাদশ শতাব্দী থেকে কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়। এর আগের উপাদান খুব একটা পাওয়া যায় নি। সঙ্গীত বিষয়ে মহারাজা মান্যদেবের সময়কাল ১০৯৭ খ্রীঃ-১১৩৩ খ্রীঃ ধরা হয়। তাঁর বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। উনি ছিলেন মিথিলায় রাজা। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে ঐ সময় মিথিলায় প্রভূত সঙ্গীত চর্চা হয়েছিল। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে 'গীতগোবিন্দ'-এর লেখক জয়দেবের ভক্তিরসের প্রভাবে মিথিলায় যে সঙ্গীত ও নৃত্যের চর্চা সুরু হয়েছিল তার সুদূর প্রসারী প্রভাব পরে ভবিষ্যতে মণিপুরী নাচে, অন্ধ্রের কুচিপুড়ি নাচে এবং ভারতীয় অন্যান্য ক্ল্যাসিক্যাল নাচে। ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে গীতগোবিন্দের প্রভাব অপরিসীম। এই গীতগোবিন্দের ধারা আরও বেশী প্রাণবন্ত করে তোলেন মরমী কবি সাধক বিদ্যাপতি। মিথিলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এঁরা অমর হয়ে আছেন।

এর পর মহারাজা হরিসিংহদেবের রাজত্বকালে (১২৯৬ খ্রীঃ-১৩২৩ খ্রীঃ) মিথিলায় সঙ্গীত চর্চা আরম্ভ হয় ব্যাপকভাবে। তিনি সঙ্গীত ও নৃত্য-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সভা গায়ক জ্যোতিশ্বাতার বর্ণনায় জানা যায় তাঁর সময়কার মিথিলার সঙ্গীতের উৎকর্ষের কথা। মহারাজার লেখা 'বর্ণরত্নাকর' নামক বইটি প্রসঙ্গে শ্রীজয়কান্ত মিশ্র লিখেছেন—"in the Varna-Ratnakar there are three sections describing or enumerating the various kinds of Nritya—like Nritya-Varnana and Prerana Nritya Varnana."[১]

এই বইয়ের সঙ্গীত ও নৃত্যের উপাদান বিষয়ে অতি সংক্ষেপে হরি উপ্পাল তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন—"The 10 qualifications of the drumpl

১। The History of Mithila—Literature—Sri Jayakanta Misra (Vol. 1, page-333).

ayer are mentioned. The 12 kinds of drum music are also mentioned, Tal, Rag, and 32 kinds of movements and 32 kinds of graces are also .eferred. There is a list of 27 kinds of Vinas also."*

উক্ত রাজা হরিসিংহদেব নেপালে চলে যান ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে। এভাবে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত সঙ্গীত চর্চার ধারাও স্থানান্তরিত হয়।

এরপর জগজ্জ্যোতির্মাল্য (১৬১৭ খ্রীঃ—১৬৩৩ খ্রীঃ) রচিত 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' নামক বইটিতে তদানীন্তনকালের গান-নাচ ও নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। ঐ সময়েই লেখা শুভঙ্কর ঠাকুরের নৃত্যবিষয়ক একটি বই নেপালের পাঠাগারে রক্ষিত আছে। মিথিলার সঙ্গীত ও নৃত্যের স্বুবর্ণযুগের অনেক উপাদান হয়তো ঐ সকল পুস্তক বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' যেমন নেপালের লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে, তেমনি কোন উৎসাহী গবেষক চেষ্টা করলে সেখানের প্রাচীন পাঠাগার থেকে ভারতীয় সাহিত্য সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন বলে আমার মনে হয়। সেখানে 'রাজগুরু হেমরাজ শর্মা' নামাঙ্কিত পাঠাগারের আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ মৈথেলী ভাষায় অনূদিত 'মালতী মাধব'-এর ১৭৭৪ সালের সংস্করণটি রক্ষিত আছে। বইটি অনুবাদ করেন জগদ্ধারা নামক মিথিলার জনৈক সঙ্গীত প্রেমিক। ইনি 'সঙ্গীত সর্বস্ব' লেখার পর উপাধ্যায়' ও 'রাঘব ভট্ট' উপাধিতে ভূষিত হন। এসব দেখে আমাদের ধারণা হয় রাজা হরিসিংহ দেবের প্রভাবই বোধহয় উক্ত লেখক ও বইগুলি নেপালে যায় এবং সেখানে রক্ষিত হয়।

মহারাজা শিবসিংহের আমলে (১৪১২-১৫ খ্রীঃ) বিত্থাপতির কবিতাকে নৃত্যে রূপ দেবার জন্য বিখ্যাত কথক সুমতির পৌত্র জয়ন্তকে নিয়োগ করা হয় রাজদরবারে। এদের প্রচেষ্টায় মিথিলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে গানে ও নাচে। এই নৃত্যসঙ্গীতে যে সকল রাগ ব্যবহৃত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান 'নাচাড়ী', 'ফাগ', 'চৈত' ও 'পূর্বী'। নাচারী গানের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিত্থাপতির কাব্য সঙ্গীতে। বিদ্যাপতি রচিত শিবস্তোত্রকে কেন্দ্র করে তখনকার দিনে একপ্রকার 'ভাবনৃত্য'-এর সৃষ্টি হয়।

* **Dance Tradition in Bihar Hari Uppal, page-3.**

এতে থাকতো নাচারী গান। এখনো উত্তর বিহারের কোন কোন অঞ্চলে এই ধারা লক্ষ্য করা যায়। আবুল ফজলের 'আইনি-আকবরি' গ্রন্থেও নাকি এর উল্লেখ আছে। তাহলে অনুমান করা যায় যে মুঘল আমলেও 'নাচারী' গানের যথেষ্ট কদর ছিল। নইলে উক্ত গান উক্ত গ্রন্থে স্থান পেল কি করে। এ ছাড়া বিদ্যাপতি রচিত লগ্নি গান উত্তর বিহারে বিরাজ উৎসবে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই সঙ্গীত ও নৃত্যধারা পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

পাটনার সঙ্গীত জগতে ১৮১৩ খ্রীঃ খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ এ সময়েই প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মহম্মদ বাজে সবে ভারতীয় রাগ ও রাগিণীগুলিকে পুনর্গঠিত করে যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নাকি এক নূতন ঠাটের প্রবর্তন করেন। তাঁর লেখা সঙ্গীত বিষয়ক বইটি 'নাজামৎ আসফী' (Nazamat Asfi).

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বিহার অঞ্চলের গান এবং নাচ প্রসঙ্গে উক্ত প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে—

"The accounts of European travellers in India during 18th and 19th centuries show clearly that music and dancing were the principal amusement of the people in the 18th century. Crauford, an eighteenth century writer, observed—they will spend the whole night in singing, dancing and hearing music. Musical entertainments and folk dances formed necessary features of social or religious ceremonies. The European accounts of the period to "Nach" as a very popular amusement in the 19th century. Referring to the district of Bhagalpur in the 19th century, Buchanan wrote—of music and dance there is extraordinary abundances."[১]

ইউরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনা থেকে তখনকার বিহারে প্রচলিত নাট্যানুষ্ঠান, ভ্রাম্যমান নাট্যগোষ্ঠী (Strolling players), গ্রাম্য দর্শকদের প্রবণতা প্রভৃতির বিষয়ে জানা যায়। বাংলার 'যাত্রা' কর্ণাটকীয় 'যক্ষগণের' মতো

১। Ibid—Page-5.

'রাসলীলা' 'পুতুল নাচ' প্রভৃতি ছিল বিহারের সাধারণ মানুষের আনন্দানুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ। বিহারে প্রচলিত পুতুল নাচ প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

দক্ষিণ বিহারের নৃত্য বলতে সাধারণতঃ আদিবাসীদের নৃত্যকলাকেই বোঝায়। ইংরেজ রাজত্বের সময় ইংরেজী শিক্ষায় উত্তর বিহার যতটা প্রভাবিত হয়েছে দক্ষিণ বিহার তার তুলনায় কম। যদিও আদিবাসীদের অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তবুও তারা নিজেদের সংস্কৃতিধারার প্রধান অঙ্গ গান ও নাচের নিজস্বতা থেকে দূরে সরে যায় নি। বিহারের আদিবাসী জেলা বলতে প্রধানত সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি জায়গাকে ধরা হয়। বিহারের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মতো আদিবাসীরাও মূলতঃ কৃষিজীবী। সুতরাং তাঁদের জীবনচর্যার ধারা কৃষিভিত্তিক সমাজের অনুগামী। চৈত্র মাসের সবচেয়ে বড় পরব হলো শরহুল (Sarhul) উৎসব। এই সময়েই শালগাছগুলি পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়। এই উৎসব অনেকটা হিন্দুদের বসন্তোৎসব-এর মতো। আদিবাসীদের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা তিনদিন ধরে এই উৎসবে মেতে থাকে। দুদিন দুরাত অবিরাম নৃত্যানুষ্ঠান চলে, অবশেষে তৃতীয় দিনে শালগাছের ফুল দিয়ে নৃত্যসহযোগে শোভাযাত্রা হয় এবং ঐ ফুল গ্রামের বাইরে কোনও জায়গায় ফেলে আসে।

যে কোন আদিবাসী গ্রামে একটি করে মুক্তাঙ্গন নাচের জায়গা নির্ধারিত থাকে বড় কোন গাছের নীচে। আদিবাসীরা যে শুধু উৎসবের সময়েই নাচে, তা নয়, যখন খুশি তখন নাচের অনুষ্ঠান করতে পারে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আদিবাসীদের জীবনচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ হলো নাচ। এই নাচ কোন পেশাদার নাচ নয়, অথবা অন্যান্য লোকদের দেখাবার জন্যও এই নাচ নয়। এই নাচ তাদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। ওদের সমগ্র সমাজ যেন নাচের তালে মেতে ওঠে।

বিহারের সাঁওতালরা যেন জন্মগত নাচিয়ে গাইয়ে। তাদের নাচে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ভালবাসা, প্রকৃতির রূপ প্রভৃতি সব বিষয়ই আছে। সাঁওতাল নারী-পুরুষেরা হাত ধরাধরি করে, বৃত্ত রচনা করে যে নাচে, তার নাম 'হো-কোলি' (**Ho-Koli**)। এই নাচে মৃদঙ্গ, নাগারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। একজন পরিচালক থাকে—আর সকলে নিজেদের আবেগ-অনুভূতি মতো হাত

পা ও শরীরের ভঙ্গি করে তালে তালে। এই 'হো-কোলি' নৃত্য ছাড়া, ভুজঙ্গ-নৃত্য, শবর নৃত্য প্রভৃতি এদের সমাজে প্রচলিত।

সাঁওতালদের নাচ দেখে মনে হয়েছে, এরা যেন শুধু উৎসবের জন্যই নাচে না, নাচের জন্যই যেন উৎসব করে। উৎসবটা উপলক্ষ, নাচটাই প্রধান। প্রায় সকল প্রকার আদিবাসী নাচেই, এযুগেও এটা লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, আদিবাসীদের নাচ নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

বিহারের নৃত্যধারায় সেরাইকেলার 'ছৌ' নাচ খুবই প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলের ছৌ-নাচ নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। বিহারে যে কথক নৃত্যের আলাদা একটি ধারা বর্তমান তাকে ঠিক অস্বীকার করা যায় না। প্রচলিত ধারণা মতে জয়পুরী-কথক, লক্ষ্ণৌ-কথক ও বেনারসী-কথক প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিহারেও ফল্গুধারার মতো এই কথক নৃত্যের ধারাটি বয়ে চলেছে।

।। বিহারের কথক নৃত্য প্রসঙ্গ ।।

বিহার অঞ্চলে কথক নৃত্যের আমদানি হয় এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ থেকে। তার আগে ওখানে 'বাঈ' নাচের প্রচলন ছিল। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক Francis Buchanan তাঁর 'পাটনা-গয়া-রিপোরটস্'-এ লিখেছেন—

"Music in respect to quantity, is on a very thriving footing. The wives of men who beat Nahabat, are in general 'Mirasins' and are much employed. Some of them are called Rajpatras, and are of dignity superior to the common. There are five or six girls in each set, part singing and dancing and part performing on musical instruments. A set receives from 2 to 10 rupees for an evening's performance, and their songs are chiefly of an amatory nature. At Patna five sets of dancing girls called "Bai" have considerable celebrity and are considered by the natives as very accomplished. Two of them are Hindus and three Moslems."
(Ibid page-10)

উক্ত বাঈদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই থাকতো।

পাঁচ ছয়টি মেয়ে নিয়ে এক একটি দল গড়ে উঠতো। এদের মজুরী ছিল দুই টাকা থেকে দশ টাকা। এক শ্রেণীর মহিলারা 'নহবত' বাজাতেন। 'রাজপাত্র' নামধারী কিছু লোক এদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ ভাবেই তখনকার সমাজে বাঈনাচের আসর বসতো। এ ছাড়া মহতাব নামধারী প্রধান গায়ক ও নর্তকরা দুর্গাপূজার সময় কলকাতা এসে তিন রাত নাচ-গান করে অন্ততঃ এক হাজার টাকা পেত। এ ছাড়াও Francis Buchanan আরও লিখেছেন—

"Bai, it must be observed although in common use is rather a degrading title, and is only given with propriety to upstart sets, who are also sometimes called "Natin". There are other, who have been continued by adoption for long period and whose predecessors obtaind a certain rank from former princes. Some of them, if not all, were allowed small endowments in land, which in the S. E. part of these districts still retain. These enabled ladies of easy virtue and enticing manners were, by imperial authority reduced to four classes-Domini, Hurkini, Kangchani and Ramjani. The last are Hindu and the three first are Muhammaden."

(Ibid—page-11)

বুকাননের উক্ত প্রতিবেদনে সমাজের নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পরিচয়ের সঙ্গে 'বাঈ', 'নটিন' প্রভৃতি শব্দ মিশে আছে। এ ছাড়াও 'নাচুয়া' নামধারী একশ্রেণীর বালক নৃত্যশিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের নাচের জন্য নিয়ে যাওয়া হতো বিভিন্ন জায়গায়। ভাগলপুর-পুর্ণিয়া প্রভৃতি জেলায় এ নাচুয়ারা রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক ভক্তি-রসাত্মক গানের সঙ্গে নাচতো। এরা কিন্তু ঠিক পেশাদারী নয়। এদের মধ্যে আরেক সম্প্রদায় রয়েছে তাদের বলা হয় 'ফলায়ন্ত'। ভগবানের নামে নৃত্য গীত করাই এদের কাজ।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বিহার অঞ্চলে গল্পকার বা কথক সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দু ব্রাহ্মণরা 'গীত গোবিন্দ'-এর ভক্তি রসের কথা সারেঙ্গী, মঞ্জিরা ও ঢোলক সহযোগে গান ও নাচের মাধ্যমে প্রচার করেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে যে, আধুনিক কালে কথক নাচে পুরুষ ও নারী—উভয়েই

অংশ গ্রহণ করলেও, অষ্টাদশ শতকে একমাত্র পুরুষ শিল্পীরাই নাচে অংশগ্রহণ করতেন। এই নাচ ছিল সেই যুগে নারী বর্জিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাটনা অঞ্চলে 'গন্ধর্ব' নামধারী এক সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। এই গন্ধর্বরা দক্ষিণভারত এসেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তবে কখন এঁরা এসেছিলেন তার সঠিক সময় জানা যায় না। এই গন্ধর্ব সম্প্রদায় মূলতঃ গান-বাজনা-নাচ নিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। অন্ততঃ আকাশবাণী পাটনার শিল্পী শ্রীলালু লাল গন্ধর্বের মততো তাই (for generation his ancestars lived in Patna and have been living on dance and music.)

এঁদের দাক্ষিণাত্যের দেবদাসী—নত্তুভান সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে যোগ থাকতে পারে। একটা দেবদাসী নৃত্যপদ্ধতি সমগ্র ভারত জুড়েই তো ছিল। তা ছাড়া উত্তর ভারতের অনেক প্রাচীন দেবমন্দিরে দক্ষিণী ঢং-এর 'নাটমন্দির' লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া 'নায়ক' ও 'রমজান' নামে দুটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্ভবতঃ এখনো খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে— যাঁদের একমাত্র জীবিকা নাচ ও গান।

যাই হোক বিহারের নৃত্যকলায় বিশেষ করে 'বিহারী কথক নৃত্য' বলতে যা বোঝায় তার মূলে রয়েছেন এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ এর কথক নৃত্যগুরু— আপাগুরু ও সাতারামগুরু। এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ থেকে ১৮৭৫ খ্রীঃ-এ পাটনায় এসে ১৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত কথক নৃত্যের অনুশীলন করে এঁরা দুজনেই পাটনায় মারা যান। অতঃপর ১৯১৫ খ্রীঃ বুনিয়াদী হোসেন নামে জনৈক নৃত্যশিল্পী পাটনায় এলেও কিছুদিনের মধ্যে তিনি লক্ষ্ণৌ ফিরে যান। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮-৫০ খ্রীঃ ভাগবত গুরু নামে একজন নিজেকে কথক নৃত্যশিল্পী বলে পরিচয় দেন। ইনি জাতিতে 'ভাট'। এ ছাড়া 'হোরিলগুরু' নামে আরেকজন গৌড় ব্রাহ্মণ কথক নাচতেন। তবে তিনি শেষপর্যন্ত কথক নাচ ছেড়ে 'কথক-বাচক' হিসেবেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এঁরা সকলেই কিন্তু লক্ষ্ণৌ ঘরানার অর্থাৎ কালিকা-বিন্দাদিন-এর কথক নৃত্য শৈলীই অনুসরণ করেন। সুতরাং বিহারের কথককে আলাদা ঘরানা বলা বোধ হয় ঠিক নয়। যেমন জয়পুর, লক্ষ্ণৌ ও বেনারসের ঘরানার কথা আমরা বলে থাকি। তবে মনে হয় বিহারের কথক নৃত্য ঘরোয়ানায় ওখানকার স্থানীয় 'বাঈ' প্রভৃতি নৃত্যের প্রভাব পড়েছে।

১৯৩৪ খ্রীঃ থেকে বিহারে দক্ষিণী 'ভরতনাট্যম' নৃত্যের প্রভাব পড়ে। কারণ ঐ সময়ে মুজাফফরপুরে যে সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভরতনাট্যম্ নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী বালাসরস্বতী। বিহারবাসীরা এই নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন। এবং এরই প্রভাবে বিহারে ভরতনাট্যম্ নৃত্যের প্রচার প্রসার ঘটে। এভাবে অঞ্চলভিত্তিক নাচগুলি নিজস্ব অঞ্চল ছাড়িয়ে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা শুভ লক্ষণ।

।। বাউল নৃত্য ।।

আমরা 'বাউল' এবং 'ছৌ' নৃত্যকে "আধালোক—আধা উচ্চাঙ্গ" বা **Classico-Folk** বলতে চাই কারণ এতে নাট্যশাস্ত্রের নৃত্যব্যাকরণের অনেক প্রয়োগ সুষ্ঠুভাবে দেখা যায়, যা অন্য লোকনৃত্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

বাংলা দেশের "ক্ল্যাসিকো-ফোক" (Classico-Folk) নৃত্যের মূল্যবান 'বাউল নৃত্য' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় নৃত্যবিদ্ মণি বর্ধন উল্লেখ করেছেন—[১]

'গাজনের দেবতা শিব—বাউলদের দেবতা নেই। বাউলেরা তীর্থ, প্রতিমা, শাস্ত্রীয় বিধি কিছুই মানে না, মন্ত্র উচ্চারণ করে না—মন্ত্রের পরিবর্তে গায় গান। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাচে আর তন্ময় হয়ে খুঁজে বেড়ায় মনের মানুষ—শুদ্ধ মনের মানুষ। জাতিভেদ মানে না, পান-ভোজনের ছোঁয়াছুয়ি নেই, বেশভূষাও অদ্ভূত, পরনে শততালি যুক্ত আলখাল্লা, মাথায় ধম্মিলা, দীর্ঘ কেশ চূড়া বেণী করে বাঁধা, ডান হাতে কারো একতারা, কারো দুতারা, কটিতে বাঁধা বায়া—বায়াতে ছন্দ তোলে—'ধারি নাক্তি নাধিন ধিনা ধিন। 'ডান হাতের একতারাতে তোলে শব্দ ঝঙ্কার—রং গুরু, রং গুরু—নিজেই বাজায়, নিজেই গায়, নিজেই নাচে।

জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেম সমাধিই (জ্যান্তে মরা) বাউলদের কাম্য। ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধিতে অন্তর্মুখীন করাই তাদের সাধনা। আছে দেহতত্ত্বের সাধনা, শরীরকে পরিপক্ক করার ব্যবস্থা, আছে গুহ্যসাধনার অঙ্গরূপে প্রকৃতিসাধনা—রতিসাধনা। সাধনায় গুরুর নির্দেশ অপরিহার্য। আছে গুরু সাধন, গুরুবাদ।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে উদ্ভূত হয় বাউল সম্প্রদায়—বিভিন্ন ধর্মের সাধনা-রীতির মিশ্রণে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধনপদ্ধতি, ক্রিয়াকাণ্ড, সূফী ও বৈষ্ণবদের

১। বাঙলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য—শ্রী মণিবর্ধন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬১।

প্রেমোন্মত্ততা, শ্বাস সাধনের যৌগিক ক্রিয়া, সহজিয়া সাধন পদ্ধতির মিশ্রণে উদ্ভূত এই বাউল সম্প্রদায়—উদ্ভূত হয়েছে সর্বধর্মের সমন্বয় ভূমি এই সুজলা, সুফলা বাঙলাদেশে।

যেসব বৌদ্ধ ও সহজিয়া পন্থী বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল কিন্তু নিজেদের বিশ্বাস সংস্কারমত পূর্ব সাধনরীতি বজায় রাখল—তারাই হল ন্যাড়ার ফকির—বেশরা ফকির। তারা ইসলাম ধর্মবিরোধী আচার-আচরণ পালন করে। তাদের একটি অংশ প্রকৃতি-পুরুষকে রাধাকৃষ্ণ রূপে গ্রহণ করে হল বৈষ্ণব বাউল—তারা আখড়াতে আখড়াতে রাধাকৃষ্ণ বা চৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা করে, ভোগ সাজায়, মহোৎসব করে—দেহতত্ত্ব, রতি সাধনের গানও করে, আর করে নৃত্য।

জাত না মানলেও মানে শ্রেণীভেদ। আছে আউল, বাউল, সাই দরবেশ, কর্তা-ভজা। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের বলা হয় 'আউল', যাঁরা দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁদের বলা হয় 'সাই'।

সাধনরীতিতেও আছে স্তরভেদ। আছে প্রবর্ত্ত অবস্থা, সাধক অবস্থা, আছে সিদ্ধ অবস্থা।

(১) প্রবর্ত্ত অবস্থা—প্রথম স্তরভেদ। গুরুর নাম ও গুরু প্রদত্ত মন্ত্র আশ্রয় করে চলে সাধনা।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা—সাধক অবস্থা। সাধনা চলে গুরুর নির্দেশ অনুসারে।

(৩) তৃতীয় অবস্থা—সাধক অবস্থা। প্রেমাশ্রয় করে, ভাবে প্রবেশ করে, দেহকে পরিপক্ক করতে করা হয় প্রকৃতি-সাধন। নিত্যানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে সত্তার উপলব্ধি ঘটে—এ অবস্থায় ঘটে আত্মবিস্মৃতিময় অনুভূতি—এ অবস্থাকেই বাউলেরা বলে 'জ্যান্তে মরা।'

নৃত্যগীতের মাধ্যমে সাধনরীতিকে সুফীরা বলে 'সমা'। সুফীদের মত বাউলেরাও তেমনি মন্ত্র উচ্চারণের পরিবর্তে গান গায়, আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' করে। 'নৃত্ত' করে শুধু বাজনার সঙ্গে, নৃত্য করে গানের ভাবব্যঞ্জনা করে।

মেলার পথে চলতে চলতে গায় পথ চলার ভাব-ছন্দ উপযোগী গান, গৃহস্থের আঙ্গিনায় গায় দেহতত্ত্বের গান—মেলার জমায়েত গায় সাধনরহস্য, গুরুবাদ ও রতি-সাধনের রহস্যরীতির প্রতীকাত্মক হেয়ালী গান। সে সব গানের প্রকৃত

অর্থ বোঝা শক্ত—গান কথ্য ভাষায় কিন্তু ভাব দ্ব্যর্থক—উপরে থাকে একভাবের অর্থ, প্রচ্ছন্ন থাকে ভিন্ন অর্থ, থাকে তত্ত্ব কথা। এমনি সাধকদের অনুভূতিলব্ধ তত্ত্ব বাঙলাদেশের মাঠে-বাটে, নদীতে মাঝির গানে এক সময় ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সকল গান দ্ব্যর্থকভাবে—'আছে গুরুবাদ ও দেহতত্ত্বের গানে।

বাউলদের নৃত্যের দুই ভাগ। 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য'।

নৃত্তের অঙ্গকর্ম হয় শুদ্ধ আঙ্গিকে—অঙ্গকর্ম ব্যঞ্জনাবিহীন। এবং নৃত্যের অঙ্গকর্ম ব্যঞ্জনাত্মক। নৃত্যে আঙ্গিক গৌণ, মুখ্য হচ্ছে গানের কথার অন্তর্নিহিত ভাবের রূপায়ণ ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত হলেও—বাউল নৃত্যের রীতি-পদ্ধতি শাস্ত্রীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যের অনুরূপ। উচ্চাঙ্গ নৃত্যেও আছে তেমনি দুই ভাগ—নৃত্তাংশ ও নৃত্যাংশ। কথক নৃত্যে নৃত্ত ভাগ বোল পরনের অংশ, নৃত্যভাগ ভাও বাৎলানা। নাট্যমের নৃত্তভাগ—যতিস্বরম্, তিলানা', নৃত্যভাগ—পদম্, বর্ণম্, মণিপুরীতে নৃতাংশ চলে পদাবলী গানের সঙ্গে, আর নৃত্ত চলে শুধু মৃদঙ্গ বাদ্যের সঙ্গে ব্যঞ্জনাহীন শুদ্ধ আঙ্গিকে। কথাকলি নৃত্যনাট্যে নৃত্ত হচ্ছে 'তোডোয়াম' ও পুরাপাডু অংশ, আর অভিনয়কালে মুদ্রাসংযোগে চলে অঙ্গ-ভঙ্গিতে ব্যঞ্জনা।

বাউলদের নৃত্যে ব্যজনাহীন নৃত্ত আঙ্গিক ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ নৃত্য আঙ্গিকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের অঙ্গকর্ম দৃষ্ট হয়। গানের বিরতিতে ক্লান্তি অপনোদনে যখন শুধু একতারা বা দুতারা বাজিয়ে নৃত্ত করে—একই স্থানে ঘুরে অন্তভ্রমরী ও বাহ্যভ্রমরী করে। এই বাহ্যভ্রমরীর ব্যবহার কথক, নৃত্যে হয় 'তাথেই থেই তৎ' এর সঙ্গে, মণিপুরে নৃত্যের এই ব্যবহারকে বলে 'লোংলৈ' এবং কথাকলি নৃত্যে বিষ্ণুপদারীতিতে পদসংস্থানে দূরত্বের জন্য ভিন্ন রেখায় স্ফুট হয়—নামও ভিন্ন। শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে বলা হয় 'অলগ' ভ্রমরী। মণিপুরী নৃত্যরীতি সুষমার সঙ্গে বাউল নৃত্যের ঐক্য থাকায় মণিপুরী লোংলৈ—বাহ্যভ্রমরীরূপে গৃহীত হয়েছে বাউলদের নৃত্যে। এমনি বহুপ্রকার উচ্চাঙ্গ নৃত্ত আঙ্গিকের ব্যবহার, প্রয়োগ বাউলদের নৃত্তে দৃষ্ট হয়। অশ্বোৎপ্লাবন করে এগোয় কেউ বা এগোয় অর্ধাকাচারীতে—তাও আবার নর্তকের নৃত্যের অনুকূল করার উপযোগী করে নিতে কথনও একটু বদল করে নেয়। তবে সবার এগোন বা পশ্চাতে যাওয়ার নৃত্ত আঙ্গিক এক-প্রকারের নয়—কারণ নৃত্ত আঙ্গিকের প্রয়োগ নির্ভর করে আঙ্গিক নির্বাচনের উপর। প্রত্যেকেরই স্ব স্ব সুবিধার্থে অঙ্গকর্মের নির্বাচন ও গ্রহণ চলে—দুতারা

বাজিয়ের পক্ষে যে আঙ্গিক উপযোগী, খঞ্জনী বাজিয়ের পক্ষে তা হয়তো প্রতিকূল। আবার আনন্দলহরী বাজিয়ের নৃত্যভঙ্গি বা পাদকর্ম, গ্রীবাভঙ্গি—দুয়াধারীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। অঙ্গকর্ম গৃহীত হয় প্রত্যেকের বাদ্যযন্ত্রের বাদন প্রণালী ও গঠন আকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে।

বাউলেরা নৃত্য করে এককভাবে, দ্বৈতভাবে, কখনওবা ত্রয়ী হয়ে। একতারা বাজিয়ের শব্দ ঝঙ্কারে তন্ময় হয়ে হয়তো বাউল চলল গেয়ে নেচে—পেছন থেকে দুতারাধারী উঠে সুর মিলাল—শুরু করল নাচতে ভিন্ন পাদকর্মে, পরিবেশ সৃজনে—চলল দ্বৈত নৃত্য।

সারিন্দাধারী হয়তো বসেই বাজাচ্ছে, গাইছে গান। কারণ গতিবৈচিত্র্যে তার বাজানো সম্ভব নয়—তাই বলে কণ্ঠ মেলাচ্ছে—কিন্তু হঠাৎ খঞ্জনীধারী অধীর হয়ে উঠল দাঁড়িয়ে—তারপর খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে কখনও মৃগীগতির উৎপ্লাবন করে কখনও বা বৃশ্চিকচারীতে মণ্ডল করে চক্রাকারে ঘুরে এসে দাঁড়িয়ে আকাশিকীচারীতে অন্তর্ভ্রমরী করে গানের কলির শেষে তেহাই দিয়ে গানের সমাপ্তি ঘটাল। এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে দর্শকবৃন্দের অন্তরেও দোলা লাগে।

বাউলদের সকলের হাতেই যন্ত্র থাকে। নৃত্যভঙ্গি নির্ভর করে যন্ত্রের গঠন ও বাদন পদ্ধতির উপর। আনন্দলহরী ও খঞ্জনী-বাজিয়ের উপযোগী স্থানক বিষ্ণুপাদ। উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ ও লালিত শিরকম ব্যবহারে তাদের অসুবিধা নেই। বলিতা ও বিবৃতা গ্রীবাভঙ্গির দোলা তাদের পক্ষেই সম্ভব—কিন্তু গ্রীবাচালনের সে দোলা বা পার্শ্বে বা সম্মুখে সর্পবৎ বা কপোতবৎ চালনা সারিন্দা বা দুতারা বাজিয়ের পক্ষে সম্ভব নয়—তাহলে ঝাঁকুনিতে তাদের সুরে যে ছেদ ঘটবে।

সারিন্দা বা দুতারা বাজিয়ের পক্ষে অধিকাংশ পাদকর্মই ভৌমাচারীর অন্তর্ভুক্ত সম্পাদা, জনিতা, অর্ধাধিকা, অড্ডিতা প্রভৃতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়—উৎপ্লাবন নেই। তেমনি আবার উৎপ্লাবন ও ভ্রমরী কর্মের ব্যবহার, খঞ্জনীবাদক ও গাবগুবি (আনন্দলহরী) বাদকের অতি প্রিয় অঙ্গকর্ম। নৃত্যের গতিও চলনের সহায়ক ও পরিপূরক। চক্রাকারে মণ্ডলকালে খঞ্জনীবাদকের শকটী শ্যাচারীর ব্যবহার দেখছি। পার্শ্বে যায় বেণিনীচারীতে। কুট্টনপাদ কর্ম,

উরুপাশ্বৰ্দ্ধমণ্ডলী একই স্থানে থেকে নৃত্যকালে প্রয়োগ করে বিচ্যবা ও স্থবর্ত্তাচারী 'আনন্দলহরী বাদকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

একতারা বাজিয়ের উর্ধ্বে একতারা সহ হস্তক্ষেপণরীতি দণ্ডপক্ষ নৃত্য হস্তের অনুরূপ—পাদকর্মে তখন প্রযুক্ত হয় জনিতাচারী। এক পার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্বে গমনকালে ব্যবহার করে উদ্বৃত্তহস্ত। পাদচারীতে প্রযুক্ত হয় একচরণাঞ্চিত।

বাউল নৃত্যে অর্ধবিকশিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, আলোকিত, প্রলোকিত প্রভৃতি অক্ষিকর্মের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অক্ষি কর্মের বিবিধ ব্যবহার প্রযুক্ত হয় নৃত্যকালে, আর গানের ভাব অভিনয় করার সময়ে। বাউল নৃত্যের সে অংশ "নৃত্যাংশ"। নৃত্যাংশ চলে গানের সঙ্গে। আর মাতনের সময় "নৃত্তাংশ"।

সে গান হয় নানা ভাবের। বাউলদের আছে দেহতত্ত্বের গান, আছে গুরুবাদের গান, আছে অনিত্যতার গান, আছে সাধন রহস্য। —প্রকৃতি সাধন, রতি সাধনের সাধনরীতি ও রহস্য সম্পর্কে হেঁয়ালী গান। গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে রূপায়িত করে তোলে দেহের ভঙ্গিতে—অক্ষি ও হস্ত চালনার বিভিন্ন নৃত্যহস্তের ব্যবহারে। নৃত্য স্বতঃস্ফূর্ত। যখন যে ভাব মনে জাগে—যে রসের উদয় হয়, তারই ব্যঞ্জনা দেয়। সে নৃত্যের বাঁধা ছক থাকে না। কল্পিত জ্যামিতির রেখা অবলম্বঠে ছকবন্দী অঙ্গকর্মের নৃত্যের বাউলেরা বিরোধী। নৃত্যে অঙ্গকর্ম গৌণ, ভাব-রূপায়ণই মুখ্য। এই একই গানের সঙ্গে বিভিন্ন মেলায় ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যছকে ও বিভিন্ন অঙ্গকর্মে নৃত্য করতে দেখা যায়। সে নৃত্যছক স্বতঃস্ফূর্ত, ভাঙ্গ, রেখা ও গতি চলনে পুষ্ট। প্রতি মুহূর্তে বাউল নৃত্যছক সৃষ্টি করে চলে। নাট্যম্ নৃত্যের গতানুগতিক প্রথানুসারী বাঁধা ছক, অলারিপু বর্ণম্, কথক নৃত্যের বোল পরনের বাঁধা ছক বাউলদের নৃত্যে নেই—বাউলনৃত্য, শৃঙ্গার-রসবর্জিত। ব্যঞ্জনাস্ত শান্ত ও মধুর রসের দ্যোতনা থাকে।*

॥ ছৌ-নৃত্যপ্রসঙ্গ ॥

পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য ইদানাং গুণীদের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই নৃত্যের উপাদানগুলি Classical Folk পর্যায়ের।

ইংরেজ যুগ শুরু হবার আগে নবাবী আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ছিল

* বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য - শ্রীমণি বর্ধন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ১৯৬১ পৃঃ ৭৭-৭৯।

একই সেরেস্তার অধীনে একটা অখণ্ড প্রদেশ। ইংরেজ আমলে শাসনের সুবিধার জন্য তা তিন ভাগে ভাগ হয়—বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নামে। দেশের রাজনৈতিক ভাগ হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছু মিল থেকে যায়। বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন (Socio-economic back-ground) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন অবদান সৃষ্টি করে। এর পরিচয় পাওয়া যাবে ছৌ-নাচ বিশ্লেষণ করলে।

।। ছৌ-নৃত্যের ভৌগোলিক সংস্থান ।।

উড়িষ্যার—ময়ুরভঞ্জ, কেউনঝার, বালেশ্বর, নীলগিরি।

বিহারের—সেরাইকেল্লা, খরসোয়ান, ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের—পুরুলিয়া জেলা, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার—এই তিন প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতেই কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ছৌ-নাচের প্রচলন দেখা যায়। বিহারের দক্ষিণ অঞ্চল, উড়িষ্যার উত্তর অঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল—এই হলো ছৌ-নাচের কেন্দ্রিভূত ভৌগোলিক সংস্থান।

পুরুলিয়ায় ছৌ-নৃত্য প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন[১]

'ভারতের প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোরের ভরত-নাট্যম্, কেরলের কথাকলি, ওড়িশার ওড়িশী, উত্তর ভারতের কথক এবং আসামের মণিপুরের নৃত্যই স্থান পেয়েছে, তাতে বাংলাদেশের কোন নৃত্যই স্থান লাভ করে নি। তা থেকে অনেকেই এ কথা মনে করেন, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙালীর যে স্থানই থাক না কেন, নৃত্যে তার কোন স্থান নেই। কিছুকাল ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃত্য-শিক্ষাকেন্দ্রে যে নৃত্যনাট্যের প্রবর্তন হয়েছে, তা কোন বিশিষ্ট বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নৃত্যপদ্ধতি নয়, তা ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন ও লোকনৃত্যের মিশ্ররূপ মাত্র, তা বিশ্লেষণ করলে তাতে উপরোক্ত বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতির বিভিন্নরূপের সন্ধান পাওয়া যাবে। তা নিয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব বলে কিছু গর্ব করবার মত নেই।'

কিন্তু তাই কি সত্য? গীত এবং নৃত্য ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট

১। রবীন্দ্রসদন পুস্তিকা—এপ্রিল ১৯৭২

রূপ। দুটিতে মিলে একটি রূপ বলছি এ জন্য যে, গীত প্রায় সর্বত্রই নৃত্যের সম্পর্কযুক্ত। ভরতনাট্যম্, কথাকলি কিংবা ওড়িশীর পটভূমিকায় সঙ্গীত অপরিহার্য, কথক এবং মণিপুরীর সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিহার্যভাবে না হলেও একভাবে না একভাবে সঙ্গীত যুক্ত আছে। সুতরাং যে বাংলাদেশ একদিন সঙ্গীতের চর্চায় এতখানি অগ্রসর হয়েছিল, তার মধ্যে নৃত্যের কি কোন সংস্কার প্রচলিত ছিল না? তা অবশ্যই ছিল, কিন্তু চর্চার অভাবে তা আজ আপাতদৃষ্টিতে অবলুপ্ত বলে মনে হচ্ছে। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের যে অবশেষ এখনো বাংলার পল্লী অঞ্চলে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তার ভিতর অনুসন্ধান করলে তার সাংস্কৃতিক জীবনের সেই সকল বিস্মৃতপ্রায় উপাদানের এখনো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কারণ, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে নৃত্যের বিস্তৃত উল্লেখ আছে, সে উল্লেখ কবির কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত হতে পারে না, প্রত্যক্ষ জীবনে যদি তার ব্যবহার না থাকত, তা হলে তার উল্লেখের মধ্যে এত জীবন্ত এবং বাস্তব রূপ ফুটে উঠতে পারত না।

জয়দেবের গীতগোবিন্দকে যদি বাঙালীর আদি গীতগ্রন্থ বলা যায়, তাতেও দেখা যায় যে গীত এবং নৃত্যের সহযোগে তা একদিন পরিবেশন করা হতো এবং তার কবি স্বয়ং পদ্মাবতী নাম্নী একজন নর্তকী তাল রক্ষা করতেন বলে নিজেই গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্যেও নৃত্যগীত সহকারে বুদ্ধ নাটক অভিনয়ের কথার উল্লেখ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দেরই' অনুকারী রচনা, সুতরাং তাও যে নৃত্যগীত সহকারে পরিবেশন করা হতো তাও সহজেই বুঝতে পারা যায়। মধ্যযুগের বাংলাজাতীয় কাব্য মঙ্গলকাব্য। জাতির জীবনসংস্কারের বহুমুখী পরিচয়ে তা সমৃদ্ধ। তাতে নানাভাবে প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যের উল্লেখ আছে। মনসামঙ্গলের নায়িকা বেহুলা আজীবন নৃত্যগীত শিক্ষা করে অবশেষে দেবতাদের নৃত্য দেখিয়ে তৃপ্ত করে স্বামীর প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে নৃত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে এর চাইতে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আর কোথাও নেই। এই নৃত্যের তাল-লয়ের যে বর্ণনা আছে, তাতে একথা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, তা কখনও লোকনৃত্য নয়, বরং বিশিষ্ট কোন প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে হরপার্বতীর নৃত্যের যে

বর্ণনা পাওয়া যায় তা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্যপর হরপার্বতীর মূর্তির সম্পূর্ণ অনুরূপ। সুতরাং নদীমাতৃক বাঙলার পলিমাটির উপর কোন প্রাচীন মন্দির নির্মিত না হলেও কিম্বা হয়ে থাকলেও তা নদীগর্ভে বিলীন হওয়া সত্ত্বেও বাংলার প্রাচীন সাহিত্য থেকে এখনও প্রমাণ পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে, এ দেশে দাক্ষিণাত্যের কিংবা ওড়িশার অনুরূপই প্রাচীন এক বিশিষ্ট পদ্ধতির নৃত্যও প্রচলিত ছিল। তা আজ প্রকাশ্যত লুপ্ত হয়েছে এবং লুপ্ত হবার তার ঐতিহাসিক কারণও আছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের পর বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবন যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তা সকলই জানেন। সেই সূত্রেই দেবমন্দির সম্পর্কিত যাবতীয় অনুষ্ঠানই বিলুপ্ত হতে আরম্ভ করেছিল। দেবমন্দিরে যারা নর্তকী ছিল, তারা তখন কেউ কেউ নবাবের দরবারে নর্তকী হলো, কেউ বা ব্যবসায়ী নর্তকীরূপে পরিণত হয়ে পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হলো। মুসলমান ধর্ম নৃত্যগীতের বিরোধী ছিল। তখন থেকেই তা কোনদিক দিয়েই আর উৎসাহ লাভ করতে না পেরে নানাভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী হয়ে পড়তে লাগল। দীর্ঘদিনের মধ্যে বাইরে থেকে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তার সংস্কার বাঙালীর হৃদয় অধিকার করে ছিল বলে একভাবে না একভাবে তার ধারা তারা বাঁচিয়ে চলল। সেই জন্য এখনও বাঙলার পল্লী অঞ্চলে গিয়ে পল্লীবাসীর কোন নৃত্য অনুষ্ঠান যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায় তবে তার মধ্যে সেই প্রাচীন রূপের কোন কোন সময় আভাস পাওয়া যায়।

এমনই প্রাচীন একটি নৃত্য পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য। কেন তার আজ এত নাম হলো. তা বলা আজ কঠিন। হয়ত এর একটি প্রাচীন রাশভারি নাম ছিল তা আজ নিতান্ত নিরক্ষর জনসাধারণের মুখে এই প্রকার একটি আঞ্চলিক কিম্বা গ্রাম্য নাম নিয়েছে। নৃত্য সম্পর্কে 'ছৌ' শব্দটি কেবল পুরুলিয়াতেই প্রচলিত নেই, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ এবং সেরাইকেলায় এক শ্রেণীর নৃত্যকে ছৌ নৃত্য বলা হয়, কিন্তু পুরুলিয়ার নৃত্য থেকে তা স্বতন্ত্র। হয়তো মূলে সবই অভিন্ন ছিল। কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত হবার ফলে বিভিন্ন স্থানে তারা স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। কিন্তু নানা কারণেই মনে হতে পারে যে পুরুলিয়ায় এখন তা যেভাবে রক্ষা পেয়েছে, তাই হচ্ছে তার প্রাচীনতম রূপ। কারণ ব্যক্তিবিশেষের পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে এখানে তা নিতান্ত জনসাধারণের মধ্যেই

বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে। দেবদেবীর লীলা এর সঙ্গে যুক্ত আছে বলে নিরক্ষর জনসাধারণ তার বিকৃতি ঘটাতে সাহস পায়নি—যথাসম্ভব তার ঐতিহ্যের প্রবাহকে রক্ষা করেই চলেছে।

কিন্তু ছৌ নৃত্য সেই ধারারই কোন প্রাচীন নৃত্য কিংবা বাঙলার স্বতন্ত্র কোন নিজস্ব পদ্ধতির প্রাচীন নৃত্যের অবশেষ, তা বলা বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত কঠিন। কারণ ছৌ নৃত্য প্রধানত তাণ্ডব নৃত্য, অর্থাৎ পুরুষের নৃত্য। এই নৃত্যের মধ্যে স্ত্রী চরিত্র যে নেই তা নয়, তবে স্ত্রীচরিত্রের কোন নৃত্য অর্থাৎ লাস্য প্রকৃতির কোন নৃত্য নেই। দুর্গা কিংবা কালী পুরুষের অনুরূপ তাণ্ডব নৃত্যই করে থাকেন, অন্যান্য স্ত্রীচরিত্র যেমন কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা কিংবা সীতা চরিত্রের নৃত্য বলতে যা বুঝায় তা নেই, তবে সামান্য নৃত্যের ভঙ্গি আছে মাত্র। সেজন্যই এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আদিবাসীর কোন যুদ্ধ-নৃত্যের (Martial Dance) উপর ভিত্তি করে এই নৃত্য গড়ে উঠেছে। এবং তারই সংস্কারের উপর পরবর্তীকালে তা পূর্ণতর বিকাশ লাভ করেছে। যে অঞ্চলে এই নৃত্য প্রচলিত আছে, সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রধানতঃ ভারতীয় আদিবাসীর কতকগুলি প্রাচীন শাখা প্রশাখা দ্বারা গঠিত। সুতরাং এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আদিবাসীর কোন যুদ্ধনৃত্য পরবর্তীকালে হিন্দু প্রভাববশতঃ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে নূতন রূপ লাভ করেছিল এবং সেই সময়ই তার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পদ্ধতির মধ্যে আঞ্চলিক আদিবাসী সংস্কৃতির উপাদান কতখানি ছিল, কতখানিই বা ভারতীয় বিভিন্ন পদ্ধতির নৃত্যের উপকরণ ছিল, তা বিশ্লেষণ করে বলা আজ অত্যন্ত কঠিন। তবে এ কথা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দক্ষিণ ভারতে মালাবারের কথাকলি নৃত্যের সঙ্গে পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে।

কথাকলি নৃত্য দক্ষিণ ভারতের যে অঞ্চলে প্রচলিত ছিল তাতে একদিন দ্রাবিড়ভাষী জাতি বাস করত, কিন্তু তার সংলগ্ন পার্বত্য এবং অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন আদিবাসী জাতিরও বাস ছিল, ক্রমে সেই বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করে, তার ফলেই সেই অঞ্চলে কথাকলি নৃত্যের জন্ম হয়। আদিবাসী, দ্রাবিড় এবং আর্য তিন সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলেই সেখানে কথাকলির আবির্ভাব সম্ভব হয়ে ছিল। দ্রাবিড়ভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের চারিপার্শ্ববর্তী যে আদিবাসী জাতি সেখানে বাস করত, তাদের পরস্পরের মধ্যে

যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সেখানেও আদিম যুদ্ধনৃত্যের একটি রূপ আত্ম-প্রকাশ করেছিল, তার ওপর হিন্দু পৌরাণিক সংস্কৃতি বা রামায়ণ মহাভারতের সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করবার পর সেখানে তাই ভিত্তি করে কথাকলি নৃত্যের জন্ম হয়েছিল এবং তখনই সেই নৃত্যপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়েছিল। ছৌ-নৃত্যের উদ্ভবের ইতিহাসও সম্পূর্ণ অনুরূপ। পুরুলিয়া জেলা ভৌগোলিক দিক থেকে ছোটনাগপুরের অরণ্য এবং পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যবর্তী ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থাতেই সেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসী বাস করত। তাদের মধ্যে আষ্ট্রিকভাষী মুণ্ডা এবং দ্রাবিড়ভাষী ওরাওঁ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও আষ্ট্রিকভাষী ভূইঞাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সময়ও বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে পরস্পর গোষ্ঠীসংগ্রাম চলত। ক্রমে এই অঞ্চলের দলপতি বা ভূস্বামীগণ যখন ইংরেজ শাসনের ফলে কতকটা যুদ্ধবিগ্রহ-হীন শান্ত সমাজজীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন, তখন তারা ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে হিন্দু সমাজের আচার আচরণগুলো পালন করতে লাগলেন। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে রামায়ণ এবং মহাভারতের যে সকল অংশে যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রাধান্য লাভ করেছে প্রধানতঃ সেগুলোই অবলম্বন করা হলো। এই সময় থেকেই পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যে মুখোস ব্যবহার করবার রীতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হলো বলে মনে হয়। কাহিনীর পৌরাণিক চরিত্রের বিশেষতঃ দেবদেবীর চরিত্রের নৃত্যাভিনয় করবার জন্য আদিবাসীর কৃষ্ণবর্ণ এবং কুরূপ মুখ অনুকূল নয় বলে তা দেবদেবীর চরিত্রানুযায়ী মুখোস দিয়ে আবৃত করে নেবার রীতি গৃহীত হয়েছিল। সেই সময়ে নূতন হিন্দু ধর্ম এবং আচারে দীক্ষিত আদিবাসী দলপতি এবং ভূস্বামিগণ দেবপূজার প্রতিমা নির্মাণ করবার উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের মধ্যভাগ থেকে প্রতিমা নির্মাণকারী শিল্পীদের ভূমিদান করে সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করবার সুযোগ দিয়েছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজা কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' সময় কৃষ্ণনগর থেকে কিছু মৃৎশিল্পী সেখানে গিয়ে বসবাস করে। এবং এদের দ্বারাই মুখোশের আদল তৈরী হয়। হয়তো পশু-পক্ষীর মুখোস নির্মাণ করবার একটা সহজ পদ্ধতি সে অঞ্চলে তখন থেকেই প্রচলিত ছিল, প্রধানতঃ তাই অবলম্বন করে তারা ছৌ-নৃত্যের মুখোসেরও প্রবর্তন করলেন।

অনেকে ছৌ-শব্দটিকে 'ছাউনী' শব্দ থেকে জাত বলে মনে করেন। সৈন্যদের

বাসস্থানই ছাউনী। ছাউনীতে বাস করে পাইক বা দলপতির সৈন্যগণ অবসর সময়ে যে নৃত্যের অনুশীলন করতো তাই যদি ছৌ-নৃত্য হয়ে থাকে তবে ছৌ-নৃত্য যে যুদ্ধ-নৃত্য সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না এবং ছৌ-নামটিও যে ছাউনী শব্দ থেকেই এসেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবারও কিছু নেই। কিন্তু তবু ঐ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকু বলা যায়, কেরলের কথাকলি এবং পশ্চিম বাঙলায় পুরুলিয়ার ছৌ-একই অবস্থার ভিতর থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তাই তাদের রূপায়ণের মধ্যেও অনেকটা ঐক্য আছে।

কথাকলি নৃত্যও ছৌ-নৃত্যের মতই লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী হয়ে গিয়েছিল। শ্রীনারায়ণ মেনন ভাল্লাথোল এই লুপ্তপ্রায় ভারতীয় নৃত্যপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট রূপকে নিজের পরিশ্রমে পুনরুজ্জীবিত করে আজ বিশ্বের শিল্প রসিকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য সে সৌভাগ্য থেকে এখন পর্যন্ত বঞ্চিত আছে, তবে তারও যে এই বিষয়ে পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় বর্তমানে ছৌ-নাচ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে)।

ছৌ-নৃত্যের সঙ্গে কথাকলির কোন তুলনামূলক আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের সাধারণ একটি পরিচয় দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবাঙলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী পুরুলিয়া জেলা কিছুকাল পূর্বেও মানভূম জেলা বলে পরিচিত ছিল। তখন তা বিহারের অন্তর্গত ছিল। বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে মানভূম জেলার পুরুলিয়া বা সদর মহকুমার ঘনিষ্ঠ যোগ দেখতে পেয়ে ১৯৫৪ সনে যে সীমানা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার সুপারিস অনুযায়ী তা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নূতন একটি জেলায় পরিণত হয়েছে, তাহাই পুরুলিয়া জেলা বলে পরিচিত। পূর্ববর্তী মানভূম জেলার সমগ্র বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলই যে আজ পুরুলিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নয়, বঙ্গভাষাভাষী এবং সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত একটি বিস্তৃত অঞ্চল এখনও বাঙলার পশ্চিম সীমান্তের বাইরে পড়ে আছে। সেই সকল অঞ্চলেও আজও ছৌ নৃত্যের প্রচলন আছে। তথাপি বর্তমান পুরুলিয়া জেলার প্রায় সর্বত্রই ছৌ-নৃত্যের প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক। পুরুলিয়ার পূর্ব সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী কোনো কোনো গ্রামেও তার প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু এই সব জেলার অভ্যন্তরে তার প্রসার হতে পারে নি।

চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজনের সময় এই নৃত্যের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসব্যাপী অর্থাৎ বর্ষাগমের পূর্ব পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। এই নৃত্যে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলেই গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা প্রধানতঃ মুণ্ডা শ্রেণীভুক্ত আদিবাসী 'কুর্মক্ষত্রিয়' বা 'কুর্মি' জাতীয় লোকও কিছু আছে। শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এই সকল সম্প্রদায় অত্যন্ত অনগ্রসর।

এই নৃত্যের আরও দুটি নিতান্ত অপরিহার্য দিক আছে। একটি বাদ্য, আর একটি মুখোশ। এই নৃত্যের যারা বাদ্যকর তারা সাধারণতঃ ডোম। ভাণ্ডবাদের মধ্যে 'ধামসা' প্রত্যেক দলে তিনটি বা দুটি করে (Drum), দুটি ঢোলক এবং একটি সানাই ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। কোন বিদেশী বাদ্যযন্ত্র আজ পর্যন্ত এতে ব্যবহার করা হয় না, এমন কি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং নৃত্যে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাও এতে ব্যবহার করার রীতি নেই। এই জন্যই পুরুলিয়ার ছৌ-নাচকে আদি ছৌ-নাচ বলা হয়। সেরাই কেলার ছৌ-নাচে মুখোশ ব্যবহার হলেও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে অনেকটা আধুনিক হয়েছে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আর ময়ুরভঞ্জের ছৌ-তো আধুনিক হয়ে গেছে। তার কারণ এতে মুখোশের ব্যবহার নেই। মুখ চিত্রিত করা হয় মাত্র। বাদ্যযন্ত্রে আধুনিকতা এসে গেছে। ধামসা ঢোলের সঙ্গে হারমোনিয়াম, বেহালা, সেতার, বাঁশী, গীটার ইত্যাদি বাজানো হয়। সেদিক থেকে একমাত্র পুরুলিয়ার ছৌ-নাচই এখনো পুরোনো ধারাটি রেখেছে তার বিষয়সূচী (Item) থেকে শুরু করে বৃন্দবাদনে ধামসা-ঢোল ও সানাই জাতীয় শুষির বাদ্য অবলম্বনে। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার যে, প্রত্যেকটি নাচের আগে একজন সূত্রধর এসে সুর সহযোগে কাহিনীর সারমর্ম বর্ণনা করে মঞ্চ থেকে চলে গেলে তারপর নৃত্যশিল্পীরা মঞ্চে প্রবেশ করেন।

কলকাতায় যে বিখ্যাত ছৌ-নাচের উৎসব (Festival) হয়েছিল সেখানে রবীন্দ্রভারতীয় তরফ থেকে বালকৃষ্ণ মেনন, আমি ও অসীম ঘোষ observer হিসেবে সেমিনারে রোজই উপস্থিত ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে তখন ডঃ কপিলা বাৎসায়ন ও সুরেশ আওয়াস্তি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মাষ্টার মশায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ে একই

স্থানে ময়ূরভঞ্জের ছৌ, সেরাই কেলার ছৌ ও পুরুলিয়ার ছৌ-দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে ঐ তিন অঞ্চলের নাচে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখেছিলাম।

ছৌ-নাচের জন্য যারা মুখোশ নির্মাণ করে, তারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের লোক। তারা সকলেই বর্ণহিন্দু (Caste Hindu) বাঙালী সূত্রধর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এই নৃত্যানুষ্ঠানে তিনটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংস্কৃতির একত্র সমন্বয় হয়েছে, ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয়ের এমন অভাবনীয় নিদর্শন কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ছৌ-নৃত্যের বাদ্যভাণ্ড ডোমজাতির, নৃত্য প্রধানতঃ মুণ্ডা আদিবাসীর, মুখোশ নির্মাণ বর্ণহিন্দুর দান। এইভাবে একটি অখণ্ড শিল্পরূপ এই অঞ্চলে জন্ম লাভ করেছে। যে যুদ্ধ নৃত্যের উপর ছৌ-নৃত্যের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা আদিবাসীর দান, যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় তা হিন্দু সভ্যতার দান। তারপর নৃত্যপদ্ধতির মধ্যেও আদিবাসী এবং হিন্দু পদ্ধতির সংমিশ্রণ রয়েছে। কোনদিক থেকেই এর মধ্যে বৈদেশিক কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না। আদিবাসী হলেও যন্ত্রশিল্পীরা বাংলাদেশেরই আদিবাসী। এমন কি, যে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর এতে অভিনয় হয়, তাও বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস কিম্বা কবিচন্দ্রের রামায়ণ এবং পুরোপুরি কাশীরাম দাসের মহাভারত না হলেও বেদব্যাসের মহাভারতেও নয়, তারই একটা বাঙ্গালীরূপ মাত্র। এমন কি ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতির অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে যেমন উড়িষ্যার ওড়িশী এবং কেরলের কথাকলি নৃত্য গঠিত হয়েছে, পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের তেমন কোন বহিঃপ্রভাবও প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। বাঙলার বিশিষ্ট ভক্তিবোধ এবং সৌন্দর্য পরিকল্পনা দ্বারাই তা গঠিত হয়েছে।

সাধারণভাবে দেখলে ছৌ-নৃত্যকে লোকনৃত্যেরই একটি রূপ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। লোকনৃত্যের যেমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি এবং নিজস্ব ধারায় স্বাধীন বিকাশ আছে, ছৌ-নৃত্যে তা নেই। তার একটি সুদৃঢ় পদ্ধতি আছে, একটি সুসংবদ্ধ ধারা আছে, একটি অবিচল আদর্শ আছে। এবং যদিও তার জন্য কোন লিখিত শাস্ত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, তথাপি তার একটি সুনির্দিষ্ট শাস্ত্র (Code) আছে—তার ব্যতিক্রম করার কোন উপায় নেই। (এই জন্যই পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যকে Classico-Folk বলে আমরা উল্লেখ করতে পারি।) একথা স্বভাবতঃই মনে হয় এই নৃত্য-পদ্ধতির

একদিন বিশেষ কোন শিল্পী কিম্বা পৃষ্ঠপোষকের তত্ত্বাবধানে গভীর অনুশীলন হয়েছিল এবং তার ফলেই এই বিষয়ে বিশিষ্ট একটি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নিরক্ষর জনসাধারণ-এর মধ্যে তা বিস্তার লাভ করেছে। আঞ্চলিক জীবন সংস্কারের ভিত্তির উপর এই নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছিল বলে এবং তার মধ্যে কালক্রমে দেবদেবীর পবিত্র সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বলে তা ধর্ম এবং আচার ভীরু নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিকৃতভাবে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এ কথাও সত্য, সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হবার ফলে তার মধ্যে যে সকল নীতি অত্যন্ত আয়াস এবং ব্যয়সাধ্য ছিল, তা হয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, এর প্রস্তাবনায় যেমন আজ রাগরাগিনীহীন লোকসঙ্গীত, প্রচলিত কথায় ঝুমুর গান শুনতে পাওয়া যায়, একদিন হয়ত এর মধ্যে তা ছিল না, হয়ত কথাকলির মতই রাগরাগিনীযুক্ত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই তাতে ব্যবহৃত হোত, কিন্তু কালক্রমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চার অভাবে এই নৃত্যানুষ্ঠান থেকে আজ সে অংশ পরিত্যাগ করে, সে স্থলে লোকসঙ্গীত সংযোগ করা হয়েছে।

বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা এবং পূর্ববর্তী মানভূম জেলার বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের সর্বত্র ছৌ-নৃত্যের প্রচলন থাকলেও পুরুলিয়া জেলার চারটি থানাতেই প্রধানতঃ এর প্রচার ব্যাপকতম, যেমন বাগমুণ্ডী, আরশা, ঝালদা এবং বান্দোয়ান। বাগমুণ্ডীর মাত্র দুই মাইলের মধ্যেই ছৌ-নৃত্যের মুখোশ-শিল্পীদের বাস, তাদের গ্রামের নাম চড়িদা। সমগ্র ছৌ-নাচের মুখোশ, এই গাঁয়ের প্রায় চল্লিশটি পরিবার এখন নির্মাণ করে থাকে। বহু দূরবর্তী গ্রাম থেকেও এসে এখান থেকেই মুখোশ কিনে নিয়ে যাওয়া হয়। সুতরাং একথা মনে করা স্বাভাবিক, এই গ্রামের নিকটতম অঞ্চলেই এই নৃত্য একদিন পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। বর্তমানে ভগ্নদশাগ্রস্ত বাগমুণ্ডীর রাজপরিবারের বিষয় যতটুকু জানতে পারা যায় তাতে মনে হয়, এই রাজপরিবারই একদিন ছৌ-নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, হয়ত তার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি এই পরিবারেই কোন উৎসাহী রাজা নিজেই হোক কিংবা তাঁর নিযুক্ত কোন শিল্পীই হোক একদিন স্থির করে দিয়েছিলেন, তাঁরই ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত হয়ে সে অঞ্চলের সমাজের মধ্যে চলে এসেছে। এই রাজপরিবারই যে বাংলাদেশের ভিতর থেকে আনিয়ে দেবপূজার প্রতিমা নির্মাণের জন্য শিল্পীদের নিষ্কর ভূমি দান করে সেই অঞ্চলে

বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন, তার, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ রাজা কোন সময়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে ছৌ-নৃত্যের বর্তমান পদ্ধতিটির প্রবর্তন করেছিলেন, তার সন্ধান লাভ করা আজ কঠিন হয়ে পড়েছে, এই বিষয়ে রাজ পরিবারের বর্তমান বংশধরদের কাছে অনুসন্ধান করেও কোন সুফল লাভ করা যায় নি।'[১]

॥ **পুতুল নাচ প্রসঙ্গ** ॥

ভারতবর্ষে অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে পুতুল নাচের চর্চাও হয়ে এসেছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। প্রায় সকল প্রদেশেই এই শিল্পকলা দেখা যায়। তবু কয়েকটি প্রদেশে বেশী প্রচলন লক্ষ্য করা যায়—যেমন অন্ধ্র, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে। অন্ধ্রে তৈরী চামড়ার পুতুলের সঙ্গে জাভা-বলির পুতুলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। আমাদের মনে হয় একদা বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেন-দেনের মাধ্যমে ভারতের অন্ধ্র অঞ্চলের চামড়ার পুতুলের কারু কুশলতা জাভা-বলিতে গিয়েছে। জাভা-বলির 'ওয়েয়াঙ্'-এ ব্যবহৃত চামড়ার পুতুল (Leather-puppet) অন্ধ্রের চর্মনির্মিত পুতুলের অনুরূপ। তবে পার্থক্য হল জাভা-বলির পুতুলে নাসা লম্বা, হাত-পা সরু ও লম্বা। যাই হোক, ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষায় পুতুল নাচের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই অতি সংক্ষেপে কিছু পর্যালোচনা করা হল।

রাজস্থানের পুতুল নাচ প্রসঙ্গে শ্রী দেবীলাল সমর লিখেছেন—

"It is the most ancient art of India. Though these puppet players have very low social status, they are very skilful in their art. These people also call themselves Kathputli—Bhat and Nats. They are found as nomads in Kachaman and Pooansar. Most of them are out on their professional travels. They are very well-versed in puppet playing. Wooden puppets dressed in clothes art tied with many strings, with the movement of these strings they move their limbs as living beings. Two cots serve as the stage.

১। রবীন্দ্র সদন পুস্তিকা -১৯৭২, এপ্রিল। পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (অবলম্বনে)।

A bamboo is tied on the sides of the two, and a coloured curtain is hung at the back. Men manipulate the puppets while women play the Dholak and sing the running comentary. There is complete co-ordination before them and these women are largely responsible for bringing out the story clearly and effectively. The main play of Rajasthani puppets is "Amar Sing" In between some side stories are also taken up. Now this art is gaining popularity throughout the country, and new experiments are being done in this connection.*

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে :—

প্রাচীনকালে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মানুষেই খুব আগ্রহ সহকারে পুতুল-নাচ দেখতে জমায়েত হতেন। সম্ভবতঃ সেকালের পুতুলদের গড়ন, সাজপোষাক আর ভাবভঙ্গি আজকালের মত ছিল না। কিন্তু তাদের তখন যে কাজ ছিল তা আজও আছে—অর্থাৎ মানুষকে হাসানো, কাঁদানো, তার মনোহরণ করা।

পুতুল-নাচের ইতিহাস অনেক পুরোনো। প্রাচীনভারতে এর চর্চা ছিল। পুতুলগড়া আর তাদের নাচ দেখানোর এক বিশেষ কলা এ দেশে প্রচলিত ছিল।

পুতুল-নাচ সম্পর্কে কিছু পণ্ডিতের এই মত যে, মানুষ অভিনয় করার কলাবিদ্যা আবিষ্কার করারও আগে পুতুল-নাচ আবিষ্কার করেছিল। আর অনেকে মনে করেন পুতুল নাচের জন্মও এই ভারতবর্ষে। যাইহোক আমাদের হাতে এমন প্রমাণ আছে যা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে একশো বছর আগেও বিভিন্ন প্রদেশে পুতুল-নাচের চল ছিল। আজকাল দুনিয়ার সব দেশেই পুতুল তৈরী আর পুতুল-নাচের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দেশের সংস্কৃতিতে পুতুল-নাচ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে।

*The Fotk Dances of Rajasthan—by Sri Devilal Samar. Seminar papers-(Dance) Sangeet Natak Academy, New Delhi 1958, Page—15.

॥ গ্রামের জন্য পুতুল-নাচ বিশেষ উপযোগী ॥

১। কারণ—খুব গরীব গ্রামেও পুতুল-নাচের জন্যে একটা রঙ্গমঞ্চ, পুতুল গড়বার মালমশলা আর তার সাজ-পোষাক তৈরীর জিনিষ পাওয়া সম্ভব।

২। সকল মানুষের মনে নাটকে একটা পার্ট অভিনয় করার ইচ্ছা সুপ্ত থাকে। গ্রামের ছেলে বুড়ো প্রত্যেকেই পুতুল-নাচের খেলায় একটা স্থান পেতে পারেন।

৩। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই চান কি নাটকের নায়কের জিত হোক। সকলেই দুঃখের কথায় ব্যথা পান, সুখের কথায় খুশি হন। নাটকেতে যে সমস্ত ফুটিয়ে তোলা হয় তা সকলের মনেই এক ও অভিন্নরূপে প্রভাব বিস্তার করে। এইসব নাটক দেখে মানুষ দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়।

এই জন্যে আমি বলতে পারি যে পুতুল নাচ গ্রামবাসীদের জন্যে বিশেষ উপযোগী। এর চারটি প্রধান উপকারিতা আছে :

১। মনোরঞ্জন

২। শিক্ষা

৩। অভিব্যক্তি

৪। সামাজিক কল্যাণ।

॥ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-ভাবনা ॥

কোনো ভূমিকা না করেই বলা যায়—বাঙালিকে নৃত্য-মনস্ক করার মূলে রয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে আরও দুজনের নাম করা যেতে পারে, যেমন বিশ্ববরেণ্য নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর এবং ব্রতচারী আন্দোলনের স্রষ্টা গুরু-সদয় দত্ত। তাছাড়া আরেকজনের নাম আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। তিনি হলেন বিখ্যাত 'ইম্প্রেসারিও' (Impresario) হরেন ঘোষ। এঁদের মিলিত চেষ্টাতেই মার্জিত নৃত্যকলার বর্তমান জগৎটা গড়ে উঠেছে। এখানে শুধু ভারতীয় নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা অতি সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি।

সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল শিল্পকলা ভারতীয় সমাজে জীবন্ত রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো নৃত্যকলা। মানুষের মুখে যখন ভাষা

ফোটেনি, তারও আগে নৃত্যের জন্ম। বোবা যেমন নিজের মনের কথা আকারে-ইঙ্গিতে নানা ভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করে থাকে, তেমনি আদিম যুগের মানুষও নানা অঙ্গভঙ্গি ও আকারে-ইঙ্গিতে মনের ভাব ব্যক্ত করত। তাইতো নৃত্যের আর এক নাম 'ইঙ্গিতকলা'। এই ইঙ্গিতকলা বা নাচই হলো ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মূল্যবান এবং প্রাণবান শাখা। এই নৃত্যকলা শাখার ধারাটি কয়েক হাজার বছর ধরে প্রবাহমান রয়েছে। এই ক্ষয়িষ্ণু, অবহেলিত শাখাটিকে রবীন্দ্রনাথ বিরাট মর্যাদা দিয়ে গেছেন।

এই শতকের গোড়ার দিকে নানা কারণে শিক্ষা-ভিমানী সম্প্রদায়ের কাছে নাচের কদর কমে গিয়েছিল। কলকাতায় তখন নাচ বলতে যা প্রচলিত ছিল তা বাইজী নাচেরই রূপান্তর বিশেষ। কাজেই ওসব বিকৃত রুচির নাচকে স্বীকৃতি দিতে তখনকার শিল্পরসিক চিত্ত কুণ্ঠিত হয়েছে। নৃত্যের সেই চরম দুর্দিনে ভাবতেই অবাক লাগে, প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষ রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে বসে, তাঁর প্রয়োজনীয় আর দশটি কাজের মধ্যেও নব-নৃত্যান্দোলনের কথা ভেবেছেন। শুধু ভাবেন নি, তাকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে গেছেন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে। এজন্যই নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। একটি প্রায় অবহেলিত শিল্পকলাকে বাইজীদের কবল থেকে মুক্ত করে এনে, নব ব্যঞ্জনায় পরিশীলিত করে পবিত্র আসনে বসালেন। যে নাচ ছিল দেহ-সর্বস্ব রূপজ ব্যাপার, তাকেই তিনি রূপান্তরিত করলেন আত্মনিবেদনের মহার্ঘ উদ্দেশ্যে 'নটীর পূজা'র শ্রীমতীর নৃত্য পরিকল্পনার মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা এভাবে যা কিছু স্পর্শ করেছে, তাকেই সজীব করেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আমাদের দেশে যে নব-নৃত্যান্দোলন শুরু হয়েছিল, তার মধ্যমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণে (Revivalist Movement) এবং নব মূল্যায়নে তাঁর অবদান অপরিসীম। আধুনিক যুগে কেরালার কথাকলি নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে কবি ভালাথোলের অক্লান্ত চেষ্টা, বাংলার লোকনৃত্যের উন্নয়নে গুরুসদয় দত্তের আন্তরিক প্রয়াস, ভারতীয় নৃত্যকে দেশে-বিদেশে প্রচার করতে উদয়শঙ্করের নিরলস সাধনা—এ সব কিছুর পশ্চাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য বিষয়ক প্রেরণা।

বৃটিশ যুগে গান, বাজনা, নাচ, নাটক, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পচর্চাকে আমাদের দেশে শিক্ষা বিবিক্ত ব্যাপারে (Extra-Curricular activities) বলে ধরা হতো। অর্থাৎ এগুলি যেন শিক্ষাধারার বাইরের ব্যাপার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঐ শিক্ষা বিবিক্ত ব্যাপারটাকে শিক্ষা সম্পৃক্ত (Co-curricular) করলেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পকলাকে স্থান দিলেন অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে একই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে। এরই সুদূরপ্রসারী ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজ যে ভদ্রঘরের উচ্চশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা, এমন কি, কুলবধূরাও যে নাচের চর্চা করতে পারছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে নৃত্যের যে বিশেষ স্থান হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা হচ্ছে—তারও মূলে রবীন্দ্র-নাথের ঐ উদার দৃষ্টিভঙ্গি।

শিল্পচর্চার নানা প্রকার উদ্দেশ্য আছে—যেমন মানুষের সর্বাঙ্গীন শিক্ষাধারায় সুরুচি বা মার্জিত রুচি তৈরি করা, চিন্তা-চেতনার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জীবনবোধে শোভন শালীনতা জাগ্রত করা, জীবনকে সুস্থ চিন্তার নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মতো প্রবণতা সৃষ্টি করা, চিন্তা ও সমাজ পরিমিতিবোধের উদ্বোধন, বোধ-বোধি ও বুদ্ধির স্বাঙ্গীকরণ, সর্বোপরি মনের পরিমণ্ডলকে আনন্দময় আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ করে তোলা—প্রভৃতি ব্যাপার বলা যায়। আমাদের দেশের শিল্পকলা চর্চায় একদিকে যেমন রয়েছে বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য আহ্বানের প্রবণতা, তেমনি অপর দিকে আছে আধ্যাত্মিকতার সুসম বিকাশের অভীপ্সা। এই দুইয়ে মিলে এক বিস্ময়কর শিল্প ধর্ম গড়ে উঠেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই আমাদের মর্মে মর্মে ধর্ম, তাই কোনো কিছুকে মর্মাশ্রয়ী করে গড়ে তুলতে হলে তাকে ধর্মাশ্রয়ী হতে হতো। এ জন্যই বোধহয় ভারত শিল্পের বৃহৎ অংশ ধর্ম-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল।

যাই হোক—শিল্পকলাচর্চাকে আকাদেমিক পর্যায়ে উন্নীত করতে রবীন্দ্র-নাথকে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। সেই ইতিহাস ব্যাপক ও বহুধা বিভক্ত। শিক্ষা সাধনা, শিল্প সাধনা ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে কোনো মৌল প্রভেদ নেই। সবটাইতো সাধনা। সব সাধনাই সিদ্ধিলাভ করে সুষ্ঠু শিক্ষার মধ্য দিয়ে। সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় পরিশীলিত হয়, চিত্র-ভাস্কর্য প্রভৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে দর্শনেন্দ্রিয় আরও সজাগ হয়ে ওঠে—এ

ভাবেই একটি পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করতে শিল্পকলা সাহায্য করে। শিল্পচর্চাটা করতে পারলে মনে উদারতা আসে, জাতিভেদ দূর হয়, দেশের সংহতি বাড়ে—কারণ সার্থক শিল্পীর তো কোনো দেশ-কাল-জাতি নেই, সে সর্বকালের সর্ব সমাজের, শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে এইভাবে মানুষ জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। মন বন্ধন মুক্ত হয়। সুতরাং আধুনিক যুগে শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র চিত্ত বিনোদন নয়, চিত্ত উন্নয়নও বটে। এই চিত্ত উন্নয়নের জন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে শিল্পকলাচর্চাকে এত উঁচু স্থান দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন—আজকে পৃথিবীতে যে দুর্দৈব দেখা দিয়েছে তার কারণ মানুষের দেহবুদ্ধির ও স্বার্থ বুদ্ধির প্রবলতা। অর্থ নৈতিক বা রাজনৈতিক উপায়ে তার সামাজিক যে প্রতিকারই সম্ভব হোক, স্থায়ী ও গভীর প্রতিকার হলো—কেবল প্রাণধারণ ও স্বার্থসাধন এই উভয়ের অতীত যদি কোনো প্রেরণা মানুষের থাকে তারই অনুশীলন, তারই সাধনা।

সাহিত্য ও শিল্প সেই জাতের জিনিস। মানুষের চিত্তবৃত্তির সংস্কার এতে হয়, ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনে ছন্দ, সুর ও সামঞ্জস্য তার দান।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু সংক্ষিপ্ত উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয় বা বিশ্বভারতীর শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা কালে একাধিক বার যে কথাগুলি বলে গেছেন, তা হলো—

'আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র, তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা, মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।'

'ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তি-নিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র

তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্য-গীত-বাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণতা বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি।'

আবার বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলেছিলেন—'Our education should be in full touch with our complete life, economical, intellectual aesthetic, social and spiritual ; connected with it by the living bonds of co-operations.'

'The mutilation of life owing to this narrowness of culture must no longer be encouraged. In the proposed centre of our cultures, music and art must have their prominent seat of honour and not merely a tolerent nod of recognition'.

'The different systems of music and different schools of art which lie scattered in the different ages and provinces of India and in the different strata of society, have to be brought there together and studied."

এই প্রসঙ্গে আবার পিয়ার্সন সাহেব লিখেছেন—'...the songs and dance reveal the spirit of the play to the delighted audience. In this way the ideas of the poet are assimilated by the boys, without their having to make any conscious efforts. In fact they are being educated into the sub-concious mind, and this is one of the main principles of Rabindranath Tagore's method of education.'

উক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শের রূপরেখাটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। যাই হোক আধুনিক যুগের নৃত্যবিকাশের মূল ধারাটিকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন—

(১) প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত যে পর্বটি রয়েছে, তাতে নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রাধান্য।

(২) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে দেখা যায়, এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে সরকারি প্রয়াস এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রেরণা। এভাবে ব্যক্তিগত ও সরকারি প্রচেষ্টায় আমাদের নৃত্যজগতে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করেই নৃত্যচর্চা আবর্তিত হয়েছে। এই আবর্তনে একদিকে যেমন রয়েছে গুরুমুখী নৃত্যচর্চার আয়োজন, তেমনি অপর-দিকে রয়েছে আকাদেমিক নৃত্যচর্চা। সুতরাং ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের দেশের নৃত্যকলা চর্চার রূপরেখাটি অনুধাবন করে দেখতে হবে। উক্ত 'আকাদেমিক' নৃত্যচর্চার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর শান্তি-নিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ভাবনা একদিনের ঘটনা নয়। তাঁর গীতিনাট্য পর্ব থেকে নৃত্যনাট্য পর্বে উত্তরণের সময়কাল দীর্ঘায়িত। গীতিনাট্য পর্ব শুরু হয় 'বাল্মীকি প্রতিভা' দিয়ে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তারপর 'কাল মৃগয়া', 'মায়ার খেলা', 'ঋতুরঙ্গ', 'নবীন' ও 'শ্রাবণ গাঁথা' পর্যন্ত এই পর্বের সময়কাল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নৃত্যনাট্য পর্বের সূচনা হয় 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য দিয়ে। মাঝে 'চণ্ডালিকা' এবং শেষে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের সময়কাল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্বের ফসল এই নৃত্যনাট্যগুলি। এই গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—তাঁর সমগ্র সৃষ্টি প্রবাহের সূত্রেই তা গাঁথা।

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে নৃত্যনাট্য পর্বে এমন একটি শিল্পরূপে এসে পৌছুলেন, যেখানে কথা, সুর, নৃত্য ও অভিনয় স্বাঙ্গীকৃত হলো এক অবিভাজ্য ছন্দোময়তায়। এর ইতিহাস ব্যাপক ও বহুধা বিভক্ত। তবে এটুকু লক্ষ্য করা গেছে যে, রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বস্তুজগৎ থেকে সরে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত সংকেতময় জগতে নিমগ্ন হয়েছেন। বাইরের দৃশ্যমান জগতের অন্তরে যে জগতের অস্তিত্ব, তাকে রূপ দেবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। হয়তো কবির মতে সেইটেই বস্তুজগতের সত্যরূপ। তাছাড়া কাব্যলোক থেকে সুরলোকে, সুরলোক থেকে রূপলোকে এবং রূপাতীত লোকে কেমন করে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তা ধীরে ধীরে সমুত্তীর্ণ হয়েছে—তা যেমন গভীর বিস্ময়কর তেমনি গভীর পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ রহস্যময় ব্যাপার। এই বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এ ভাবে কবিতা থেকে গান, গান থেকে নাচে এসে শেষ বয়সে তিনি স্থিতধী হলেন। নানা মাধ্যমে নিজেকে ক্রমাগত প্রকাশ করে গেলেন অনুভূতির সূক্ষ্ম থেকে

সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনায়। যাই হোক, দীর্ঘদিন ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে বিশেষ নৃত্য পদ্ধতির প্রচলন করলেন, তাকে নানা নামে নামাঙ্কিত করা হলো। কেউ বললেন 'শান্তিনিকেতনী নাচ', কেউ বললেন **'Tagore School of Dance'** আবার কেউ বা বললেন, 'ইম্প্রেশানিস্ট' ধরনের নাচ' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নৃত্যের সংজ্ঞা প্রকরণ এবং মান নির্ধারণ নিয়ে নানা মতপার্থক্য আছে। তবু বলা যায় সর্বজনগ্রাহ্য মান নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন এবং তা অবিলম্বে। নইলে রবীন্দ্রনৃত্যের নামে যা চলছে তা কতখানি রবীন্দ্রভাবে অনুভাবিত, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ যে বিকল্প সমালোচনায় দৃক্‌পাত না করে, ভারতীয় নৃত্যের প্রতি গভীর ক্ষমতা ও অনুরাগবশতঃ রক্ষণশীল প্রথাবদ্ধ নৃত্যধারায় প্রথম মুক্তি আনলেন এবং এক অভিনব সৌন্দর্যমণ্ডিত নৃত্যধারার প্রবর্তন করলেন, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অন্যান্য ধ্রুপদী ও আঞ্চলিক নাচগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলো এই নাচ। ভাবের গাম্ভীর্যে, রসের মাধুর্যে, নান্দনিক বিশুদ্ধতায় এ এক অভিনব সৃষ্টি। এইভাবে নাচকে গণ্ডীমুক্ত করার ব্যাপারটা তখনকার 'পিউরিটানদের' অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। তবু রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে বন্ধনমুক্ত করলেনই।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ কোনো মৌলিক নৃত্যধারার প্রবর্তন করেন নি, তবু বলতে দ্বিধা নেই, দীর্ঘদিন ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার সার্থক স্বাঙ্গীকরণ অনেকটা 'রাসায়নিক' মিশ্রণের মতো। এতে একদিকে যেমন রয়েছে ভারতীয় ধ্রুপদী নাচগুলির আঙ্গিক প্রকরণসহ নৃত্যাভিনয় পদ্ধতির আভাস, তেমনি রয়েছে নানা আঞ্চলিক লোকনৃত্য ও বিদেশী নৃত্যের পরোক্ষ নির্যাস। এই নৃত্য সমাবেশ বা মিশ্রণ এত সূক্ষ্মভাবে হয়েছে যে, তাতে নবরূপটির কাছে আগের রূপটি যেন হারিয়ে গেছে। এ এক অভিনব সৃষ্টি। নৃত্যাভিনয়ে ওজঃগুণ সৃষ্টির জন্য তিনি দক্ষিণ ভারতীয় কথাকলি নৃত্যের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কথাকলি নৃত্যের জটিল অঙ্গরচনা (Make-up) পোশাক এবং নিছক মুদ্রাভিনয় বাদ দিলেন। তেমনি নৃত্যে লাবণ্য সৃষ্টির জন্য মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণ করলেও তাঁদের পোশাক ইত্যাদি গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া ওসব নাচের তালবাদ্যের অতিরিক্ত শাসনও তিনি মানেন নি। এভাবে প্রচলিত নৃত্যধারার গণ্ডী ভেঙে দিয়ে নতুন ধারার

সৃষ্টি করলেন। এবং এভাবেই অন্যান্য নৃত্যধারা থেকে রবীন্দ্র নৃত্যধারা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে মণ্ডনকলার সুপরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য রচনায় তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। যেমন জাপানের প্রাচীন নাট্যকলা 'নো' (NOH) ও 'কাবুকি' নাচ, জাভা ও বালিদ্বীপের বিভিন্ন ধরনের 'ওয়েয়াঙ' (Wayang) নাচ, সিংহলের 'কাণ্ডি' নাচ, ইউরোপের 'ব্যালে' (Ballet) কবির মনে প্রভাব ফেলেছে। তবে রবীন্দ্র-নৃত্যধারা যে পাশ্চাত্য 'ব্যালে' থেকে আলাদা তা অনুধাবন করে দেখা দরকার।

শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় প্রচলিত কোনো পদ্ধতিকেই অবিকল মেনে চলবার রক্ষণশীলতার পরিচয় নেই। বরং তার মূল কথা হলো নানা রীতির মিশ্রণে একটি যৌগিক বা স্বতন্ত্র প্রকৃতির নৃত্যধারা সৃষ্টি করা। মিশ্রণের এই রীতিতে অনেকে ব্যালের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকেন। কিন্তু ব্যালে ও রবীন্দ্র নৃত্যে পার্থক্য আছে। আসলে 'ব্যালে' হলো এক যৌথ রূপবাদী শিল্পকলা। এর প্রক্রিয়া অনেকটা শ্রম বিভাগের মতো। ব্যালেতে একটি কাহিনীকে খাড়া করে সেই অনুযায়ী সঙ্গীত, মঞ্চ, রূপসজ্জা, নৃত্য প্রভৃতি গড়ে ওঠে পৃথক পৃথক প্রচেষ্টায়। কোরিওগ্রাফারের (choreographer) ওপর দায়িত্ব থাকে দৃশ্যগুলিকে যথাযথ ভাবে বিন্যাস করে নৃত্য প্যাটার্ন তৈরি করা। ব্যালে শিল্পকলার এই দিকটা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু তবু বলব ইউরোপীয় ব্যালে ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়েছে। ইউরোপে বিশুদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীতের উৎকর্ষ ও উপযোগিতার জন্যই ব্যালের উদ্ভবের কারণ ধরা হয়। সেই জন্যই বোধ হয় ইউরোপিয় নৃত্যনাট্য 'বাণীহীন' হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য সেদিক থেকে স্বতন্ত্র। প্রথমত ব্যালেতে বিষয় নির্বাচন, সঙ্গীত, রচনা, নৃত্যের প্যাটার্ন বা কোরিওগ্রাফি রচনা করে থাকেন আলাদা আলাদা লোকেরা। কিন্তু রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মুখ্য দুটি বিষয়ের পরিকল্পক ও স্রষ্টা। তিনিই এককভাবে নৃত্যনাট্যের বিষয়টি লিখেছেন, তিনিই সুর দিয়েছেন, আবার তিনি কোথায় কোন নাচের সমাবেশ ঘটবে তার নির্দেশ দিয়েছেন—ইত্যাদি। অনেকটাই একক ব্যাপার। দ্বিতীয়ত ব্যালে বিশুদ্ধ যন্ত্র সঙ্গীতের ওপর নির্ভরশীল আর রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য মূলত কণ্ঠসঙ্গীতের ওপর

ভিত্তি করেই রচিত। সুতরাং ব্যালে ও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের মূলগত পার্থক্য কোথায়, সংক্ষেপে বোঝা গেল।

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের মূল লক্ষ্য গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা, তা যেকোনো আঙ্গিকেই হোক না কেন। মূল কথা তো ভাব প্রকাশ ও রস সৃষ্টি।

ভারতীয় নৃত্যের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্র নৃত্যধারাকে 'নিও-ক্ল্যাসিক্যাল' (Neo-Classical) বলাই বোধহয় সঙ্গত। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতীয় নৃত্যের যে বিপুলায়তন ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তার গতি প্রকৃতি অনেকটা এই রকম—

আদিবাসী নৃত্য (Tribal Dance), আধা লোকনৃত্য (Quasi Folk Dance), লোকনৃত্য (Folk Dance), আধালোক আধা শাস্ত্রীয় নৃত্য (Clasico-Folk Dance), শাস্ত্রীয় নৃত্য (Classical-Dance), নব্য উচ্চাঙ্গ (Neo-Classical)—এই ভাবেই চলে এসেছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায়—আদিবাসী নৃত্য থেকেই লোকনৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং লোকনৃত্য পরিশীলিত হয়ে ক্ল্যাসিক্যাল বা উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পরিগণিত হয়েছে। আদিবাসী নৃত্য ও লোকনৃত্যের মাঝখানে সংযোগ রক্ষাকারী রয়েছে Qasi-Folk-Dance এবং লোক নৃত্য ও ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের মাঝখানে সংযোগ রক্ষাকারী Classico Folk Dance। পৃথক পৃথক ভাবে উক্ত নাচগুলির সংজ্ঞা প্রকরণ ও বিশ্লেষণ আগেই করা হয়েছে

ক্ল্যাসিক্যাল নাচ ও অন্যান্য নাচের আঙ্গিকের সমবায়ে আধুনিককালে যে স্বতন্ত্রধর্মী এক নাচের সৃষ্টি হয়েছে তাকেই 'নিও ক্ল্যাসিক্যাল' বলা যায়। রবীন্দ্র নৃত্যকে 'নিও ক্ল্যাসিক্যাল বলছি এই কারণে যে আভিধানিক অর্থে 'নিও' (Neo) উপসর্গটির অনেক অর্থ থাকলেও তার মধ্যে দুটি অর্থ খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। এই দুটি শব্দ হলো 'Revived in modified form' এবং 'Based upon'। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্য ও লোকনৃত্যকে রবীন্দ্র নৃত্য 'modify' করে ব্যবহার করা হয়েছে এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য, ভারতীয় নৃত্যের ওপর ভিত্তি (Base) করেই নবনৃত্য সংঘটিত হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, তিনি মূলত কবি, তবু আমরা লক্ষ্য করেছি—

তিনি সুরকার, নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, এবং সর্বোপরী নব-নৃত্যান্দোলনের উদ্গাতা, নব ভারতীয় নৃত্যধারার পথিকৃৎ, ভারতীয় নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে তিনিই পুরোধা।

নৃত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার। আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনের লীলায়িত হয়, তখন জাগে নাচ। দেহের ভাবটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ তাকে বলি নৃত্য'—নৃত্যের এমন একটি সুন্দর সংজ্ঞা দেওয়া বোধহয় ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

শিল্প সাধনার মূল কথা বলতে গিয়ে ১৩৩৮ সালে পঁচিশে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে কবি জানালেন—'জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায় কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম' তখন একটি কথা বুঝতে পেরেছি, একটি মাত্র পরিচয় আছে, সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র।'—একথা বলার পরেও আবার বলেছেন—'আমি সেই বিচিত্রের দূত।... যে বিচিত্র হয়ে খেলে বেড়ায় দিকে দিকে, সুরে, গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখ-দুঃখের আঘাতে-সংঘাতে ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তার বিচিত্র রসের বহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তার রঙ্গ-কাণিকার বিচিত্র রূপগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই আমার একমাত্র পরিচয়।'

আমাদের মতে এই দুর্বহ ভার তিনি সারাজীবন বহন করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্র শিল্পসাধনায় সেই বিচিত্র রূপ ও রসের প্রকাশ ঘটেছে কাব্যে, নাটকে, গানে, নৃত্যে, চিত্রে। রবীন্দ্র শিল্পচেতনার মূলে রয়েছে অবিভাজ্য ছন্দবোধ। তাঁর কাব্য, নাটক, চিত্র, নৃত্য—এই বোধের দ্বারাই বিধৃত। এই বোধটিকেই তিনি শিক্ষার নানা স্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

সাহিত্যকীর্তি ছাড়া সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে যুগান্তর এনেছেন, তা আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোচনায় মুখ্য স্থান পেতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস। নৃত্য আর এখন শুধু মাত্র লোকরঞ্জনের খোরাক নয়—আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এবং এটা সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই জন্য।

॥ কবি ভাল্লাথোল ॥

(কথাকলি নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে কবি নারায়ণ মেনন ভাল্লাথোলের অবদান)

আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনে যে কয়জন গুণীব্যক্তির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে পড়ে, তাঁদের মধ্যে কবি ও বিদ্বান নারায়ণ মেনন ভাল্লাথোলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরই ভাল্লাথোলের নাম করতে হয়। ভাল্লাথোল কথাকলি নৃত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। কারণ কবিগুরু **রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকলার শুধু পুনরুজ্জীবনই ঘটাননি, পরন্তু সর্বভারতীয় নৃত্যকলার নির্যাস নিয়ে যে রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তাকে বলা যায় ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণ তথা সার্থক স্বাঙ্গীকরণ।** ভারতীয় নৃত্য শিল্পকে এত বড় মর্যাদা দিতে, কবিগুরু ছাড়া আর কোন মনীষীকে দেখা যায় না। ভাল্লাথোলের কথা বলতে গেলে কবিগুরুর কথাও এসে যায়। কারণ উভয়েই সমসাময়িক ছিলেন। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে দক্ষিণী নাচের প্রসঙ্গে, বিশেষ করে কথাকলি নৃত্যাভিনয়ের ব্যাপারে, ভাল্লাথোলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই, একথা জোর করে বলা যায় না। আমরা শুনেছি কবিগুরুর সঙ্গে ভাল্লাথোলের এ বিষয়ে যোগাযোগ হয়েছিল। এবং কবি ভাল্লাথোল যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

যাই হোক ভাল্লাথোল প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নৃত্য-সমালোচক ফেবিয়ান বাওয়ার্স (Faubion Bowers) লিখেছেন*

"Like India's other dance arts, Kathakali had fallen into oblivion. A few itinerant troupes of the lowest artistic standard occasionally performed in remote villages when the rare opportunities presented themselves. Out of these disintegrated traditions, (poet Vallathol, some twenty years ago, began an ardent, revival and repurification of Kathakali.

*The Dance in India—Faubion Bowers. (New York, 1959. First edition—Page—92, 93, 95, 96.)

Almost single-handed, he brought about Kathakali's present fame and responsibility.)

(ফেবিয়ান বাওয়ার্স এই বই লিখেছেন ১৯৫৩ সালে, তার কুড়ি বছর আগে যদি কবি ভাল্লাথোল কথাকলির পুনরুজ্জীবন ঘটান, তাহলে সময়টা দাঁড়ায় ১৯৩৩ সালের কাছাকাছি ।)

Vallathol himself had already been acclaimed for his Malayali poetry as Mahakabi (poet laureate) of Kelarala. By fortunate coincidence his growing deafness found in the dance-drama remanents of Kathakali not only one of India's richest art hetitage but a sing language and mute art form which seved as a useful source of communication not only for the intellectual artist but also for the deaf. He turned his poetic talent to writing new plays on the old themes and thereby enriched the stagnating repertoire.

His distinguished personal position made his proselytizing and encouragement extremely effective and attracted the attention of influential patrons in Malabar. Finally he was able to open a school called Kerala Kalamandalam (Academy of Kerala's Arts.) at Cheruthuruthi, near Shoranur, Cochin State in north Malabar. With the assistance of the Government, which technically owns the school and gives it an annuity, Vallathol was able to muster around him the few remaining teachers who knew the traditions of the art. The School began to offer scholarships to interested sttdents. The widespread publicity which South Indian scholars and writers gave Vallathol's "new-found" art form, reached the ears of outsiders, several of whom, among them Srimathi Shanta, came to study of the school. In the wake of Vellathol's revivalist activities, the Maharaja of Trivancore established a

small troupe of palace dancers at Trivandrum in Trivancore. The troupe was recently dissolved as a result of the merging of princely states with the Republic of India and resultant curtailment of privy purses Kathakali was first performed outside Malabar by Gopinath. Others followed and Kathakali today is recognised although unfortunately not supported as one of India's most important arts.

"Vallathol's school is the only hope and saving grace. As long as it exists at least the technique and principles of Kathakali will continue. In addition the school is not caught in the past to the exclusion of progress and change. It is rapidly becoming a proving ground for new experiments, and through them, perhaps. new rapprochment between the extremely limited public and the greatness of the art can be found. But there are problems within the school. **Vallathol as was Tagore of Shantiniketan**, is the guiding genius and inspiration ; but he is now seventy-three. (1953-ঘটনা) what will become of the school is a question. Even now it is under fire from the government because of Vallathola's Communist leanings."*

কবি ভাল্লাথোল সম্পর্কে রাগিণী দেবী বলেছেন—"I had heard the story of how the Kerala Kalamandal had been established by the great Kerala poet, Narayan Menon Vallathol, with funds derived from a lottery organised by the poet. His unceasing efforts to rescue Kathakali dance-drama from obscurity had brought about a revival the art in Kerala."[1])

*Ibid-Page—95.

1. Dance Dialects of India - Ragini Devi (Vikash Publication, Delhi. 1972. Page—21.)

'কেরালা কলামণ্ডলমের' মতো একটি বৃহৎ নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে কবি ভাল্লাথোলকে অর্থের জন্য লটারী করে টাকা তুলতে হয়েছে। তাছাড়া তিনি স্থানীয় জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকেও কৌশলে অনুদান গ্রহণ করেছেন এমন চমকপ্রদ কাহিনীও শোনা যায়। কথাকলি নৃত্যকে অবক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে নতুন রূপে গড়ে তুলবার জন্য তিনি অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের গোড়ার দিকের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের মধ্যে একজনের কাছে শুনেছি (বিশেষ করে কেরালা কলামণ্ডলমের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাকলির প্রাক্তন অধ্যাপক কে. পি. জি. কুট্টি)—একদা কেরালার জমিদারদের অনাবশ্যক অত্যাচারের ফলে বহু নৃত্যশিল্পীকে নৃত্যচর্চা ছেড়ে দিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কোন কারণে কোন নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে কোন জমিদারের যদি বনিবনা না হতো বা কোন কারণে মতান্তর ঘটতো, তাহলে সেই জমিদার উক্ত শিল্পীকে শুধু বরখাস্ত করেই রেহাই দিতেন না, পরন্তু যাতে সেই শিল্পী অন্য কোন জমিদারের কাছে আশ্রয় না পায় সেজন্য বিভিন্ন জমিদারের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তার রোজগারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হতো। এতে অনেকে নৃত্যচর্চা ছেড়ে দিয়ে চাষ-আবাদ করে কোন রকমে দিন কাটাতেন। এতে ধীরে ধীরে নৃত্যশিল্পের ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি অবক্ষয়ের হাত থেকে কথাকলি নাচকে বাঁচালেন কবি ভাল্লাথোল। তিনি একে একে ঐ বিতাড়িত শিল্পীদের সংগঠিত করে তাঁদের নৃত্যচর্চার সুযোগ দেবার জন্য এবং কথাকলির উন্নতির অভিপ্রায়ে 'কেরালা কলামণ্ডলম্' প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনা করেন। সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ওখানে কথাকলি ও লুপ্তপ্রায় মোহিনী আট্টমের চর্চা নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবার ফলে কথাকলি নৃত্যশিল্পীও বাঁচলো এবং শিল্পীদেরও বাঁচানো গেল। শুধু যে শিল্প এবং শিল্পীই বাঁচলেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কৃতি ছাত্রদের প্রচেষ্টায় কথাকলি নাচের প্রচার ও প্রসার বাড়তে থাকলো। এ ভাবেই প্রতিষ্ঠানটির সুনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং আশ্চর্যের কথা যে, এই প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য আর্থিক সাহায্য আদায় করলেন ঐ সব জমিদারদের কাছ থেকে, যাঁরা একদা শিল্পীদের অকারণে বিতাড়িত করেছিল খেয়াল খুশি মতো। সুতরাং এই দিক থেকে কবি ভাল্লাথোলের তুলনা হয় না। কিন্তু জমিদারদের প্রচ্ছন্ন রাগ ছিল কবি ভাল্লাথোলের উপর। এজন্য তাঁকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। শিল্পীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন বলেই হয়তো তাঁকে উক্ত

অপবাদ সহ্য করতে হয়েছিল। একদা কবিগুরুর শান্তিনিকেতনকেও তো ব্রিটিশরা সুনজরে দেখেন নি।

যাইহোক মাত্র তিরিশ বছর বয়সে কবি ভাল্লাথোল বধির হয়ে যান এবং এই বধিরতার জন্য তার কণ্ঠস্বরের মধ্যেও জড়তা দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে রাগিণী দেবী লিখেছেন—"Vallathol had become deaf in his thirties, and that he communicated by means of Kathakali gestures and writing on the palm of the hand with a finger. His speech was not very distinct because of deafness."[1]

এর পরেই রাগিণী দেবী ছোট্ট একটি বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন কিভাবে কলামণ্ডলমে তাঁর সঙ্গে কবি ভাল্লাথোলের পরিচয় হলো। তিনি লিখেছেন—

At the Kalamandalam I was introduced to Vallothol, a tall man, who smiled warmly and led me into the bare white-washed building that housed the school. A group of boys clad in white mundus (wrapped around the lower body) gazed at me curiously. Mukunda Raja introduced me to the three gurus whom he discribed as the best experts in the art of Kathakali. Gurus are called ASAN in Kathakali centres."[2]

॥ কবি ভাল্লাথোলের জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ॥

কেরালার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি চারুকলাবিশারদ ভাল্লাথোল ছিলেন কেরালা কলামণ্ডলমের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। পরবর্তীকালে কোচিন রাজ্যসরকার সংস্থাটি অধিগ্রহণ করলে তিনি শিল্পনির্দেশক পদে স্থলাভিষিক্ত হন। দক্ষিণ ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যে তিনি ছিলেন এক স্তম্ভপ্রতিম ব্যক্তিত্ব।

ভাল্লাথোলের জন্ম হয় ১৮৭৮ সালে উচ্চ নায়ার বংশে। শৈশবে তাঁর মাতৃবিয়োগের পরে দরদী পিতা ও বিদগ্ধ কাকার কাছে মানুষ হন। ভাল্লাথোলের শিক্ষা

1. Ibid. Page—21.
2. Ibid. Page—21.
*Poet Vallathol by Santosh Chatterjee

ছিল গৃহসম্পৃক্ত। সংস্কৃত ও পুরাতন গ্রন্থানুরাগী ভাল্লাথোল চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছায় আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র আনুপূর্বিক অধ্যয়ন করেন কিন্তু সাহিত্যানুরাগী হওয়ায় তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র বর্জন করেন।

ভাল্লাথোলের পিতা ছিলেন কথাকলি নৃত্যে অনুরক্ত। শোনা যায় যে একবার তিনি টানা চল্লিশরাত্রি কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠান দেখার পর একচল্লিশতম অনুষ্ঠানটি দেখার মানসে বারো মাইল পথ হাঁটতে গিয়ে পথেই ঘুমিয়ে পড়েন এবং দিবালোকে তাঁর ঘুম ভাঙে। তিনি পুত্র ভাল্লাথোলকে তাঁর সাথে প্রতিটি জায়গাতেই নিয়ে যেতেন। এইভাবেই মানবজীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উৎসাহের ফলশ্রুতি হিসেবে ভাল্লাথোল পরিণত হন।

তখনকার যুগ ছিল রাজকীয় পৃষ্ঠপোশকতার যুগ। কালিকটের জোমোরিন প্রাসাদে তৎকালীন সকল পণ্ডিত ব্যক্তিরা মিলিত হতেন। এই স্থানে ভাল্লাথোলের নিয়মিত যাতায়াত ছিল ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে ভাল্লাথোলকে যুবসমাজের কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং তিনি বহু সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন।

ভাল্লাথোল পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করে। পুরাণের কিছু অংশও তিনি অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে যে লেখাগুলি তিনি লেখেন সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই বইগুলিতেই (সংখ্যা প্রায় দশ) ভাল্লাথোলের চিন্তাধারার সারবস্তু নিহিত আছে। এছাড়াও ভাল্লাথোল ভাসের চারটি নাটক, কালিদাসের শকুন্তলা অনুবাদ করেন। বইগুলি মালাবার পাঠককুলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।

পরবর্তীকালে ভাল্লাথোল তাঁর কাকার কন্যাকে বিবাহ করেন (এ প্রথা তখন কেরালায় ছিল।) ও পঁচিশ বছর বয়সেই সন্তানের পিতা হন। ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সমৃদ্ধ করে—তিনি তাঁর শ্রবণশক্তি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেন কিন্তু অন্ধ মিল্টন অথবা হোমারের মতো অথবা বধির বিঠোভেনের মত তিনি আত্মবিশ্বাসে অটুট থাকেন ও স্বীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ভারতীয় জাতীয়তার পুনর্নবীকরণে সচেষ্ট হন। উনিশশো কুড়ি সাল থেকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবিতা লিখতে থাকেন।

উনিশশো তিরিশ সালে তিনি কেরালা কলামণ্ডলম প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেরালার মুমূর্ষু শিল্পগুলির পুনর্নবীকরণে বিশেষ উদ্যোগী হন।

উন্নয়নকামী ভাল্লাথোল সর্বদাই শ্রমজীবী ও কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন— শোষণ ও স্বৈরাচারীতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ সর্বদাই সোচ্চার হয়েছে। অমানিশার বিরুদ্ধাচারী ভাল্লাথোল মূলতঃ মানুষেরই জয়গান গেয়েছেন তাছাড়াও তাঁর লেখায় ভগবান বুদ্ধ, শংকর, যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদ এবং হুমায়ুনের বীরত্ব তথা শিবাজীর শৌর্যের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর রচিত বিবিধ কবিতা বর্তমানে কেরালার লোকগীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভাল্লাথোলের ছোট কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর রচিত "আমার গুরু" কবিতাটি এক অনন্য সৃষ্টি।

॥ উদয়শঙ্করের নৃত্যকল্প ॥

ভারতীয় নৃত্যজগতের প্রবাদপুরুষ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাধর নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্করের সার্থক মূল্যায়ণ কিন্তু আমাদের দেশে এখনো হয়নি। কিন্তু হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় নৃত্যের প্রবহমান ধারাটিকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিরাট মর্যাদা দিয়ে গেছেন উদয়শঙ্কর, তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা দিয়ে। অন্ততঃ সেই কারণেই এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র গবেষণা হওয়া দরকার।

বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালীকে 'নৃত্য-মনস্ক' করেছেন মূলতঃ তিনজন— রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর ও গুরুসদয় দত্ত। তাই ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণে (Revivalist Movement) এই তিন জনের অবদান তিন দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে আরেকজন বাঙালীকে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি, যিনি নিজে নৃত্যশিল্পী না হয়েও এই শিল্পকলার প্রচার ও প্রসারে জীবনপাত করেছিলেন, তিনি বিখ্যাত প্রমোদ পরিচালক (Impresario) হরেন ঘোষ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, উদয়শঙ্করের কলকাতা মহানগরীতে পরিচিতির মূলে হরেন ঘোষের অবদান অনেকখানি। এই হরেন ঘোষকে ইউরোপের ব্যালে জগতের প্রবাদ পুরুষ সার্জ দ্য দিয়াঘিলেভ (Serge de Déaghilev) সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ হরেন ঘোষের মত দিয়াঘিলেভও ছিলেন—"Non-dancer, non-composer, non-artist who influenced the Ballet, the music and the art of his whole period".

কলালক্ষ্মীর বরপুত্র উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা-কৈবল্য বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিক ভাবেই আধুনিক যুগের নৃত্য বিকাশের মূল গতি-প্রকৃতির রূপরেখাটির

কথা এসে যায়। আধুনিক যুগের নৃত্যবিকাশের মূলধারাকে দু'টি পর্বে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ**—এই যুগ পর্যন্ত যে পর্বটি রয়েছে তাতে নৃত্য-চর্চার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় **ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রাধান্য**। (যেমন—রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর, গুরুসদয় দত্ত, কবি ভাল্লাথোল, রুক্মিনীদেবী আরুণডেল্ প্রমুখ কবি-শিল্পী-মনীষীদের প্রচেষ্টা।)

(২) **স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ**—এই পর্বে দেখা যায় নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা সরকারী প্রয়াস এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রেরণা (যেমন—'সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য ও নানা বেসরকারী প্রচেষ্টা।)

এইভাবে ব্যক্তিগত ও সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় আমাদের নৃত্য জগতে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করেই নৃত্যচর্চা আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তনে একদিকে যেমন রয়েছে 'গুরুমুখী' নৃত্যচর্চার বিশেষ প্রবণতা, তেমনি অপরদিকে রয়েছে 'আকাদেমিক' নৃত্যচর্চার আয়োজন। সুতরাং ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নৃত্যকলাচর্চার রূপরেখাটি বিচার করে দেখতে হবে। বর্তমান কালেও নৃত্যজগৎ অগ্রসর হচ্ছে এই ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই।

একক প্রচেষ্টায় উদয়শঙ্কর ভারতীয় নৃত্য-জগতে যে যুগান্তর এনেছেন তার মূল্যায়ণ (Evaluation) আমাদের দেশে এখনো সঠিকভাবে হয়নি। এ ক্ষেত্রে শুধু মূল্যায়ণই নয়, খানিকটা পুনর্বিচারও বোধহয় হওয়া দরকার। কারণ, একদা ইউরোপ-আমেরিকার কলা-সমালোচকরা উদয়শঙ্করকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাকে অস্বীকার না করেও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা যেতে পারে। তাঁকে তো প্রথম দিকে 'Oriental' নৃত্যশিল্পী বলা হতো। তিনি কতখানি 'oriental' এবং কতখানি 'Occidental' সেই কূট তর্কে না গিয়ে, সোজাসুজি বলা যায়, তাঁর নৃত্য বিষয়ক চিন্তা-চেতনার শিকড় প্রোথিত ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে। তাঁর সম্প্রদায়ের নৃত্য পরিকল্পনা, বৃন্দবাদন, বেশভূষা, নৃত্যের আঙ্গিক, বিষয়সূচী (Item) প্রভৃতি সব কিছুর মূলেই ছিল ভারতীয় চিন্তা-চেতনার স্ফূরণ। সুতরাং সৃষ্টিশীল (creative) জগতে তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে ভারতীয়। সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেও তিনি ছিলেন 'ভারতমুখী'। এখানেই তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য।

ইউরোপ-আমেরিকার একজন 'ব্যালেরিনা' বা নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে যত আলোচনা বা বই প্রকাশিত হয়, আমাদের দেশে কিন্তু সেই তুলনায় নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে সেই ধরনের গঠনমূলক আলোচনা তেমন চোখে পড়ে না! পড়বে কি? অন্যান্য শিল্পকলার তুলনায় আমাদের নৃত্যশিল্প এখনো অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত। সুতরাং এই শিল্পের চর্চা যাঁরা করে থাকেন, তাঁরাও খানিকটা উপেক্ষিত থেকে যান সমাজে। বিশ্বজোড়া খ্যাতি নিয়েও উদয়শঙ্কর যেন উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছেন নাকি? আমাদের ধারণা, ভারতে না জন্মে তিনি যদি ইউরোপে জন্মাতেন, তাহলে হয়তো ইতিমধ্যেই তাঁকে নিয়ে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হতো। বা মৌলিক গবেষণা হতো। আমাদের দেশে তাঁকে নিয়ে কিছু গ্রন্থ যে না বেরিয়েছে, তা নয়। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। সুতরাং উদয়শঙ্কর বিষয়ে আলাদা ভাবে ব্যাপক ও সাবিক ধরনের গবেষণা হওয়া উচিত এবং তা অবিলম্বে। নইলে অনেক উপাদান হারিয়ে যাবে। বিশেষ করে উদয়শঙ্করের নৃত্যসঙ্গী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এখনো অনেকে আমাদের মধ্যে আছেন। তাদের সাহায্য নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হতে পারে। এ ব্যাপারে উদয়শঙ্করের নৃত্যসঙ্গিনী তথা জীবন-সঙ্গিনী অমলাশঙ্কর হলেন উদয়শঙ্কর প্রবর্তিত নৃত্যধারার সার্থক অনুগামিনী। তাঁর মূল্যবান সাহায্য বিশেষ ভাবে অপরিহার্য, উদয়শঙ্করের নৃত্যশৈলী বুঝবার পক্ষে।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের নৃত্যশিল্পীরা সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছেন উদয়শঙ্করের নৃত্যশৈলীর দ্বারা। চারিদিকে এখন সৃষ্টিশীল নৃত্য (Creative Dance) বা আধুনিক নৃত্য (Modern Dance) অথবা 'Innovative Dance-এর নামে যা চলছে, তা উদয়শঙ্কর প্রবর্তিত নৃত্যশৈলীর অপভ্রংশ মাত্র। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, অমলাশঙ্কর ও মমতাশঙ্করের নৃত্যে উদয়শঙ্করের নৃত্যশৈলীকে যতটা জীবন্তভাবে পাওয়া যায়, অন্যদের নাচে তেমনভাবে পাওয়া যায়না। কথাটি অনেকের মনঃপূত না হলেও, কিন্তু সত্য। অন্ততঃ যাঁরা উদয়শঙ্করের নাচ স্টেজে দেখেছেন, তাঁরা আশাকরি আমার সঙ্গে একমত হবেন।

ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে, আধুনিক যুগে উদয়শঙ্করের নৃত্যশিল্পী রূপে আবির্ভাব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এদেশে নৃত্যের পুনর্নবীকরনে (Revivalist Move-mment) যাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে উদয়শঙ্করের একটি বিশিষ্ট

স্থান রয়েছে। বিশেষ করে নৃত্যের যে পুনর্নবীকরন সম্ভব হয়েছে, তাতে উদয়শঙ্করের অবদান অনেকখানি। একদা এদেশে শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের কাছে অবহেলিত নৃত্যকলাকে দেশে গ্রহণীয় ও বিদেশে বরনীয় তিনিই করেছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিদেশে ভারতীয় নৃত্যকে প্রচার করতে অন্যান্য নৃত্যশিল্পীদের অবদান নেই, তা বলছি না। কিন্তু এ ব্যাপারে কৃতিত্বের সিংহভাগ উদয়শঙ্করের প্রাপ্য। আমাদের দেশে আগের তুলনায় নাচের প্রচার ও প্রসার অনেক বেড়েছে। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে এই বৃদ্ধি পরিমানগত 'quantitative), গুণগত (qualitative) নয়। এই qualitative দিকটার উপরেই উদয়শঙ্কর নজর দিয়েছিলেন বেশী। তাঁর সৃষ্টকর্মগুলি বিশ্লেষণ করলেই তা বোঝা যাবে। এই গুণগত ব্যাপারটার জন্যই সেই যুগে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন।

॥ উদয়শঙ্করের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন পত্র ॥

এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী রবীন্দ্রনাথ, এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর সম্বন্ধে কি ধরণের মনোভাব পোষন করতেন, তা অভিনন্দন বাণীতেই প্রকাশিত হয়েছে। উদয়শঙ্কর শান্তিনিকেতনে প্রথমবার এসেছিলেন ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সেবারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মিস্ বোনার ও খ্যাতনামা অনুষ্ঠান পরিচালক হরেন ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন উদয়শঙ্করের দেখা হয়নি, কারণ রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। জানা যায়, উদয়শঙ্কর সেবারে শান্তিকিকেতনের পার্শ্ববর্তী সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে তাঁদের নানা প্রকার নাচ দেখেছিলেন। উদয়শঙ্কর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষবারের জন্য দেখা করতে আসেন ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে। এই ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে আরেকবার উদয়শঙ্কর শান্তিনিকেতনে আসেন। ঐ বৎসর ৮ই জুলাই এবং ৯ই জুলাই "বর্ষামঙ্গল" দেখে রাত্রেই কলকাতায় ফিরে যান। ঐ সময়ই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন পত্রটি দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

"উদয়শঙ্কর,

তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী করে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা করে রেখেছেন জয়মাল্য নয়,— আশীর্বাদপূতঃ বরণমালা। বাংলার কবির হাত থেকে আজ তুমি তা গ্রহণ করো।

…তুমি দেশ-বিদেশের নৃত্যরসিকদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান পেয়েছ, কিন্তু আমি জানি তুমি মনে মনে অনুভব করেছ যে, তোমার সামনে সাধনার পথ এখনো দূরে প্রসারিত, এখনো তোমাকে নতুন প্রেরণা নিতে হবে; উদ্ভাবনা করতে হবে নব নব কল্পমূর্তি। আমাদের দেশে নব নব উন্মেষশালিনী বৃত্তিকেই প্রতিভা বলে। তোমার প্রতিভা আছে, সেই কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে তোমার সৃষ্টি কোনো অতীত যুগের অনুভূতিকেই বা প্রাদেশিক অভ্যস্ত সংস্কারের জড়িত হয়ে থাকবে না। প্রতিভা কোন সীমাবদ্ধ, সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট থাকে না; অসন্তোষেই তার জয়যাত্রা পথের সারথি: সেই পথে যে সব তোরন তা থামার জন্য নয়, পেরিয়ে যাবার জন্য।

একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রভাব ছিল উদ্বেল। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ শুষ্ক। তার শুষ্ক স্রোতঃ পথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে, সে যে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি এই নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্বাহিত করে আনন্দের এই বাণীকে আবার ছাপিয়ে তুলেছ।

নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণ মাত্র নয়। মানব সমাজে নৃত্য সেইখানেই বেগবান, গতিশীল, সেইখানেই বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য আছে।…

…বসন্তের বাতাস অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্য ও সফলতায় সমুৎসুক করে তোলে, তোমার নৃত্যে ম্লানপ্রাণ দেশে সেই বসন্তের বাতাস জাগুক, তার সুপ্ত শক্তির উৎসাহের উল্লাসের ভাষায় সতেজে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে উঠুক, এই কামনা করি। ইতি ২৯শে আষাঢ় ১৩৪০ সাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ যা কামনা করেছিলেন উদয়শঙ্করের জীবনে তার অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়ে পূর্ণতায় বিকশিত হয়েছিল।

*** *** ***

উদয়শঙ্কর মূলতঃ শিল্পী, সুতরাং স্রষ্টা। Creative Art বা সৃজনশীল শিল্প-জগতে তাঁর মানস-সঞ্চরণ। এই সঞ্চরনে প্রথম প্রেরণা যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁদের

মধ্যে স্যার উইলিয়াম রোদেনষ্টাইন (Sir William Rothenstien) ও বিখ্যাত রাশিয়ান নৃত্যশিল্পী আনা পাভলোভার (Anna Pavlova) নাম করা যেতে পারে। এই পাভলোভাই সম্ভবতঃ প্রথম, যিনি ভারতীয় নৃত্যশিল্পকে ইউরোপের দরবারে উপস্থিত করান এবং তাতে ঐ দেশের সুধীজনের এ বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। পাভলোভার সংস্পর্শে এসেই উদয়শঙ্করের জীবনের গতি, বিশেষ করে শিল্পচর্চার গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। চিত্রশিল্পী থেকে তিনি নৃত্যশিল্পীতে রূপান্তরিত হন। তারপর মাদাম সিম্‌কি (Madam Simkie) এবং শেষে অমলাশঙ্কর এসে, তাঁর এই রূপান্তর-বৃত্তের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই প্রসঙ্গে শিল্পতাত্ত্বিক জি ভেঙ্কটচালমের (G. Venkatachalam) উক্তিটি যথেষ্ট তাৎপর্যবহ। তিনি লিখেছেন—"Like Tagore, he was discovered first in Europe, Rothenstein spotted his genius, Pavlova fanned it to bursting flame, Simkie shared his first triumps."

এই প্রসঙ্গে আরও দু'জন ভারতীয় মনীষীর কথা মনে পড়ে যায়। তাঁরা দু'জনেই ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ এবং ডঃ জাকির হোসেন। ডঃ হোসেন সরাসরি বলেছিলেন—Udayshankar is our cultural Ambassador.

এই বক্তব্যকেই আরেকটু প্রসারিত করে বলেছিলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্। তিনি লিখেছেন—"Among those successful children of India who have been established the culture of the Motherland to the world's Durbar, the names of Swami Vivekananda, Rabindra Nath Tagore and Udayshankar, are worth mentioning." এভাবে উদয়শঙ্কর বিষয়ে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তবে এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতির উল্লেখ করলাম।

॥ উদয়শঙ্করের জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ॥

(জন্ম ৮ই ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রীঃ—মৃত্যু ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রীঃ) বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কথা। ১৯১৭ সনে উদয়শঙ্কর বোম্বাই যান আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখতে। ওখানে তিন বছর শিক্ষা লাভ করে ঐ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি লণ্ডনের "রয়েল কলেজ অব্ আর্ট"-এ ভর্তি হন। বিখ্যাত

শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইন তখন রয়েল কলেজের শিল্প শিক্ষক। উদয়শঙ্কর তাঁর প্রিয় ছাত্র। ঐ সময় রুশ ব্যালেরিনা পাভলোভা লণ্ডনে আসেন এবং রোদেনষ্টাইনকে অনুরোধ করেন, একজন উপযুক্ত ছাত্রকে দিতে যিনি ভারতীয় অজন্তার দেওয়াল চিত্র (Mural Painting) এবং ইলোরা মন্দিরের পাথর খোদাই ভাস্কর্যের সার্থক 'কপি' করতে পারবেন। রোদেনষ্টাইন তাঁর প্রিয় শিষ্য উদয়শঙ্করকে এই কাজের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন। অচিরেই অজন্তা ও ইলোরার নৃত্যভঙ্গিগুলি উদয়শঙ্করের হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। পাভলোভা তাঁকে ঐ ভঙ্গির অনুসরণে বিভিন্ন মুদ্রার ব্যঞ্জনায় নৃত্য গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেন। পাবলোভার সংস্পর্শে এসে নৃত্যশিল্পের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। এবং তার পর থেকেই নৃত্যশিল্পকে তিনি জীবনের মূলমন্ত্র ও ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।

উদয়শঙ্করের জন্ম হয় ১৯০০ খ্রীঃ-এর ৮ই ডিসেম্বর রাজপুতানার মেওয়ার অঞ্চলের বিখ্যাত উদয়পুরে। তাঁর মৃত্যু হয় ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রীঃ কলকাতায়। তাঁর পিতা শ্যামশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন বিদ্বান এবং উদয়পুর রাজদরবারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

উদয়শঙ্কর মাত্র ১৭ বছর বয়সে বোম্বাই আর্ট কলেজে এবং ২০ বছর বয়সে লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব্ আর্ট-এ চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য যান এবং রয়েল কলেজ থেকে আর্টে স্নাতক হয়ে বিখ্যাত Spencer এবং George Clausen-এর নামে প্রদত্ত দু'টি পুরস্কার পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আহত ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যের জন্য উদয়শঙ্করের পিতা লণ্ডনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণই তাঁর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। নৃত্যশিল্পী হিসেবে রঙ্গমঞ্চে তাঁর এই প্রথম আবির্ভাব। এরপর বন্ধুদের বিভিন্ন ক্লাবে তিনি নাচের অনুষ্ঠান করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ খ্রীঃ উদয়শঙ্কর আনা পাভলোভার ব্যালে দলের সঙ্গে যোগদান করেন। ঐ ব্যালেতে ভারতীয় নৃত্য হিসেবে 'রাধাকৃষ্ণ' বিষয়ক নাচে, উদয়শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণ এবং আনা পাভলোভা শ্রীরাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই নাচ 'কম্পোজ' করেন উদয়শঙ্কর। আমেরিকাতে ঐ দ্বৈত-নাচ খুবই আদৃত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯২৪ খ্রীঃ-এ উদয়শঙ্কর পাভলোভার দল ছেড়ে ভারতে চলে আসেন। ১৯২৯ খ্রীঃ-এ কলকাতায় প্রথম একক নৃত্য (Solo Dance) প্রদর্শন করেন। এই সময়েই তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। তারপর পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি নিজের নৃত্য ও সঙ্গীত দল গঠন করেন। তাঁর

সঙ্গীতদলে ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, তিমিরবরণ, বিষ্ণুদাস শিরালী, কেলকার, কারেন্দিকার প্রমুখ সঙ্গীত গুণীরা। তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী ছিলেন পাভলোভা ছাড়া কনকলতা, অপরাজিতা নন্দী (?) অমলা নন্দী, সিম্‌কী, জহোরা সেগাল প্রভৃতি। তারপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নৃত্যসঙ্গিনী বলতে অমলা নন্দী তথা অমলাশঙ্কর ছিলেন। এই অমলা নন্দীই বিবাহের পরে অমলাশঙ্কর নামে দেশে-বিদেশে বিখ্যাত হন।

এরপর উদয়শঙ্কর নাচের দল নিয়ে ইউরোপ পরিভ্রমণে যান। তিনি একে একে ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, স্পেন, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, এস্থোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটাভিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানেই গেছেন, সেখানেই প্রভূত সমাদর ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছেন। তিনি অনেকবার সারা পৃথিবী পরিক্রমা করেন। পরবর্তীকালে রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশে নৃত্যদল নিয়ে পরিভ্রমণ করেন। ভারতের প্রধান প্রধান প্রায় সব শহরেই তিনি নৃত্য প্রদর্শন করে সুখ্যাতি লাভ করেন। শেষের দিকে দেখেছি মফঃস্বল সহরেও নৃত্যানুষ্ঠান করে সকলকে আনন্দ দিয়েছেন!

ইউরোপের মানুষেরা তার নাচ দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। ইউরোপের একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক জেমস্ জয়েস, উদয়শঙ্কর প্রসঙ্গে তাঁর কন্যাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার কিয়দংশ তুলে দিলেই বোঝা যাবে উক্ত কথার যাথার্থ্য! জেমস্ জয়েস তাঁর কন্যাকে লিখেছেন—

"I send you the programme of the Indian dancer Uday-shankar. If he ever performs at Geneva don't miss going there. He leaves the best of the Russians far behind. I have never seen anything like it. He moves on the stage floor like a **semi-divine** being. Altogether, believe me, there are still some beautiful things in poor old world."

জেমস্ জয়েস যথার্থই লিখেছেন **"semi-divine"** শব্দটি। আমরাও তাঁর নাচ যখন মঞ্চে দেখেছি তখন ঐ 'দিব্যকান্তি' চেহারা দেখে শুধু মুগ্ধই হইনি। পরন্তু এক ঐশী ভাব যেন অনুভব করেছি। আমাদের ছাত্র জীবনে তাঁর নাচ যখন দেখেছি, তখন কেমন যেন একটা শিহরণ জাগতো!

উত্তর প্রদেশের আলমোড়াতে এক অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে তোলেন তাঁর বিখ্যাত নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্র। তখনো আমাদের দেশে নৃত্যশিল্পকে খুব সমাদরের দৃষ্টিতে দেখা হতো না। উদয়শঙ্করের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নানা গুণী-গুরুরা ঐ নৃত্যকেন্দ্রে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ইংলণ্ডের এলমহার্স্ট পরিবার তাঁকে এই কেন্দ্র চালাতে আর্থিক সাহায্য দেন। ভারত বিখ্যাত নৃত্য ও সঙ্গীতগুরুরা এখানে সমবেত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করেন। কথাকলিতে নৃত্যগুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রিপাদ, ভরত নাট্যমে কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই ও আরও অনেকে যোগদান করেন। অর্কেস্ট্রা বা বৃন্দবাদনে ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, তিমিরবরণ, বিষ্ণুদাস শিরালী প্রমুখ গুণী শিল্পীরা এত সব গুণী শিল্পীদের নিয়ে যে আলমোড়া কেন্দ্র তৈরী করেছিলেন, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আর্থিক টানাটানিতে বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের পর তাঁর অমর সৃষ্টি ভারতের প্রথম নৃত্যবহুল ছায়াচিত্র কল্পনা নির্মানে মনোনিবেশ করেন। তাছাড়া "ছায়া নৃত্যনাট্য" (Shadow play—অনেকটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার Leather puppet-wayang" এর মতো) "রামলীলা" প্রদর্শন করেন প্রচুর শিল্পী সমাবেশে। জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে পুতুলদের দিয়ে নানা কাহিনী ছায়া-নাটকের আঙ্গিকে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। কিন্তু উদয়শঙ্কর ছায়া-নাটক করালেন জীবন্ত মানুষদের দিয়ে। এভাবে নাচ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সারাজীবন ধরে। (এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, শ্রদ্ধা শান্তি বর্দ্ধনও জীবন্ত মানুষকে দিয়ে পুতুলের মতো কাঠ-কাঠ ভঙ্গি দিয়ে নৃত্যনাট্য করিয়েছেন। অনেকটা যেন "তাশের দেশে"র ষ্টাইলে।) এককালে অন্ধ্রপ্রদেশে এই Leather puppet এর চল ছিল। সেই ধারাই হয়তো কোন কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার Shadow play—Wayang Wang-এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যেমন জাপানের 'Noh' ও 'Kabuki'র সঙ্গে আমাদের কাথকলির মিল আছে।

॥ উদয়শঙ্করের নৃত্যকল্পের শিল্পমূল্য বিচার ॥

উদয়শঙ্করের নৃত্যকল্পকে তখনকার দিনের সমালোচকরা 'Oriental Dance' বা 'প্রাচ্য নৃত্য' রূপে আখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু উদয়শঙ্করের সমগ্র 'জীবনের শিল্পসাধনার' স্বরূপ উপলব্ধি করলে দেখা যাবে, তাতে 'Oriental' এবং 'Occidental'—উভয় প্রভাবই বিদ্যমান। এই মিশ্রিত নৃত্যকল্পকে "Neo-

classical" বা 'নব্য-উচ্চাঙ্গ' বলাই সঙ্গত। কেন Neo-classical বলছি তা একটু অনুধাবন করলেই হয়তো বিষয়টি পরিস্কার হবে।

আমরা জানি, ভারতীয় নৃত্যের প্রবহমান গতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে এসেছে নানা পর্যায় অতিক্রম করে। এই পর্যায়গুলি এইরকম।

আদিবাসী নৃত্য (Tribal Dance)	>	আধা-লোকনৃত্য (Ouasi-Folk Dance)	>
লোক নৃত্য (Folk Dance)	>	আধালোক-আধা শাস্ত্রীয় নৃত্য (Classco-Folk Dance)	>
শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ নৃত্য (Classical Dance)	>	নব্য উচ্চাঙ্গ (Neo-Classical Dance)	

[এই পর্যায়গুলি নিয়ে গ্রন্থের সূচনা পর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আরেকবার তা স্মরণ করা হল]

নব্য-উচ্চাঙ্গ বা Neo-classical নৃত্যরূপ, সময়গত দিক থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দ্বিতীয় / তৃতীয় পাদ অর্থাৎ আধুনিক যুগের বলা যায়। ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল ও লোকনৃত্যের উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এক অভিনব নৃত্যকলার জন্ম হয়, যা আধুনিক ভাবধারায় সৃষ্ট ও পুষ্ট। এতে একদিকে যেমন রয়েছে পশ্চিমী ব্যালের প্রভাব, অপরদিকে আছে জাপানের নো (Noh) এবং কাবুকি (Kabuki), জাভা-বলির নাচ, সিংহলের কাণ্ডিনাচ প্রভৃতির প্রভাব। উদয়শঙ্কর প্রবর্তিত নৃত্যধারাকে Neo-classical বলতে গেলে, Neo-classical বলতে আমরা কি বুঝি তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

বাংলা ও ইংরেজী অভিধান মতে '**নিও**' (Neo) শব্দের অর্থ—নতুন, New, আধুনিক, Modern, তাছাড়া 'Neo' উপসর্গের অনেক মানে আছে, যেমন New, Later, "Revived in modified form", "Based upon" ইত্যাদি। এখানে '**Modified form**" এবং "**Based upon**" শব্দ দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উপরোক্ত আভিধানিক তথ্য থেকে বোঝা গেল Neo-classical বা নব্য-উচ্চাঙ্গ এমন একটি নৃত্যধারা যাতে ভারতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গনৃত্যগুলির সঙ্গে লোকনৃত্য ও অন্যান্য দেশীয় নৃত্য পদ্ধতির এক অপূর্ব স্বাঙ্গীকরণ ঘটেছে। এই

নৃত্যের আঙ্গিক প্রকরণে উদয়শঙ্করের নিজস্ব নৃত্যধারার রূপটি বিধৃত। বিভিন্ন নৃত্যের আঙ্গিক নির্যাসের সমবায়ে এই নৃত্যপদ্ধতি গঠিত। উদয়শঙ্কর তাঁর নিজের প্রতিভার গুণে, প্রচলিত নাচগুলিকে 'Modify' করে রূপান্তর ঘটিয়েছেন এবং ভারতে প্রচলিত নৃত্যের উপরেই তিনি **বেশী নির্ভর** করেছেন (Based upon)। একটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে। যেমন, তাঁর বিখ্যাত "কার্তিকেয়" নৃত্য। এই নৃত্যটি মূলতঃ কথাকলি নৃত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি কথা-কলিকে হুবহু নকল করেননি। অথবা বলা যায়, তিনি কথাকলির কার্বন কপি করেন নি, যা তাঁর নৃত্যগুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রিপাদ কম্পোজ করে দিয়েছিলেন। তাকে নিজের মতো করে রূপ দিয়েছিলেন। বড় বড় শিল্পীরা তাই করেন। অর্থাৎ Tradition বা পরম্পরা রেখেও নতুন কিছু সৃষ্টি করেন। কথাকলিকে তিনি এখানে 'Modify' করে নিয়েছেন। এখানেই উদয়শঙ্কর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যের বিষয়বস্তুতেও অভিনবত্ব এনেছেন। যদিও তাঁর সমগ্র সৃষ্টি প্রবাহের মূল্যায়ন স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, তবু কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই উদয়শঙ্করের নাচের নতুনত্ব ও অভিনবত্ব বোঝা যাবে।

তিনি, একদিকে যেমন Traditional বা ঐতিহ্যবাহী পৌরাণিক কাহিনীকে নৃত্যের উপজীব্য বা বিষয়সূচীতে (Item) স্থান দিয়েছেন, তেমনি অতি আধুনিক যান্ত্রিক ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগের বিষয়বস্তুও তাঁকে ভাবিত করেছে। আবার এও দেখা গেছে যে, দেশে নতুন কোন কিছু ঘটেছে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছে, তার উপরও তিনি নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন। সমসাময়িক ঘটনার নৃত্যরূপ তিনি বার বার দিয়েছেন।

উদয়শঙ্করের আঙ্গিক অভিনয়ের Modification-এ [কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) ও কেন্দ্রাভিগ (Centripetal)] কেন্দ্রাভিগ গমনশীলতা; যৌগতি ভঙ্গির সৃষ্টি করেছে তাঁকে ঠিক নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত অন্তর্ভ্রমরী ও বাহ্যভ্রমরীর কার্বন কপি বলা যায় না। এই অন্তর্ভ্রমরী ও বাহ্যভ্রমরীর স্বরূপকে তিনি নিজের মতো করে modify করে নিয়েছেন। এটি আমরা ষ্টেজে তাঁর নাচ দেখার সময়েই অনুভব করেছি। এই Modification-এর ব্যাপারটা তিনি আহার্য-অভিনয়ের ব্যাপারেও করে নিয়েছেন। যেমন, তার শিবের পোশাক, ট্রাডিশনাল শিবের জটাজুটধারী বাঘছাল পরিহিত নয়, তা ছিল সম্পূর্ণ ঐশ্চর্যপূর্ণ অজন্তা ইলোরার ধরনের অলঙ্করণ-সমৃদ্ধ এক অপরূপ হ্রস্ব পোশাক, যা পরে তিনি শিবনৃত্যে অংশ গ্রহণ করতেন।

॥ উদয়শঙ্করের নৃত্যের বিষয়সূচী (Item) ॥

উদয়শঙ্কর সারাজীবনে অসংখ্য বিষয়ের উপর নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়সূচীর কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেওয়া হল। যা আমরা ষ্টেজে দেখেছি। (নিউ এম্পায়ার ও অন্যান্য মঞ্চে)।

(১) উদয়শঙ্করের "কল্পনা" ভারতের প্রথম নৃত্যবহুল ছায়াচিত্র। এতে শিল্পী জীবনের কল্পনার বাস্তবায়ন ঘটেছে দৃষ্টিনন্দন, মনোহর নৃত্যদৃশ্যগুলির মধ্য দিয়ে। চল্লিশের দশকের শ্রোতা ও দর্শককে নৃত্যের যে মহান ঐতিহ্য দেশে রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় করান তাঁর 'কল্পনা'র মাধ্যমে। ছাত্র-জীবনে 'কল্পনা' দেখেছি অন্ততঃ দশবার। 'কল্পনা'-তে বিভিন্ন দৃশ্যে প্রতীকের (Symbol) ব্যবহার করেছেন উদয়শঙ্কর। যেমন, বলা যায় স্বপ্ন দৃশ্যে পাতালগুহার সাধুরা যখন অচৈতন্য উদয়শঙ্করের ডান হাতটি টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন, তখনই দেখা গেল জীবন্ত ডান হাতে নাচের তরঙ্গ সুরু হলো। এতে পরিষ্কার বোঝা গেল তিনি চিত্রশিল্পী থেকে নৃত্যশিল্পীত রূপান্তরিত হলেন। অর্থাৎ যে ডান হাতে একদিন ছবি আঁকার জন্য তুলি ধরে ছিলেন, সেই হাতই নাচের তরঙ্গে নতুন ভাবে দোলায়িত হলো। এ ছাড়া আরেকটি দৃশ্যে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে নাচ দেখতে গিয়ে কতিপয় দর্শকের মনে বিশুদ্ধ আনন্দের পরিবর্তে রিরংসাবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে, তা একটা মীটারের পারদের ওঠানামা এবং শেষে বিস্ফোরণের প্রতীকের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করে কৌতুক অনুভব করেছেন। এই নব্বুয়ের দশকে এসেও চল্লিশের দশকের সেই প্রতীকী দৃশ্যগুলি এখনো চোখে ভাসে। এমন অনেক দৃশ্য বর্ণনা করা যায়। এখানে আমার বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই, আমি যে নাচের দিকে আকৃষ্ট হলাম, তার মূলে এই "কল্পনা" ছায়াচিত্রের প্রভাব সব চেয়ে বেশী।

(২) ভগবান বুদ্ধের আড়াই হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সিংহল থেকে তখন বুদ্ধের শিষ্য মোদগল্লায়ন ও সারিপুত্তের ভস্মাধার কলকাতায় আনা হয়। এ সময়েই উদয়শঙ্কর "মহাভিনিষ্ক্রমন্" (The great Renunciation) নাম দিয়ে একটি নৃত্যানুষ্ঠান করেন। তাতে বুদ্ধ হয়েছিলেন উদয়শঙ্কর স্বয়ং। এটা মূলতঃ ছায়া নৃত্যনাট্য। এই অনুষ্ঠানে দর্শকরা প্রথম রঙিন (Technicolour) ছায়া-নৃত্য দেখার সুযোগ পেল। আমার ধারণা, রঙিন্ ছায়া নৃত্যনাট্যে এদেশে তিনি পথিকৃৎ।

(৩) প্রচলিত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে "রামলীলা" ছায়া নৃত্যনাট্য

তাঁরই প্রতিভার আরেক স্বাক্ষর। এটা অনেকটা জাভা-বলির 'ওয়েয়াঙ্' ছায়া নাট্যের মতো। তবে পার্থক্য হলো ওয়েয়াঙ হয় Leather Puppet দিয়ে। আর উদয়শঙ্কর তা করলেন জীবন্ত মানুষদের পাত্র-পাত্রী সাজিয়ে, পর্দায় ছায়া প্রতিফলিত করে। অভিনয় শেষে পাত্র-পাত্রীরা রঙ্গমঞ্চের সামনে এসে দেখা দিতেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি হতো পর্দার আড়ালে। এতে আরেকটি চমকপ্রদ ব্যাপার ছিল—অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে পাত্র-পাত্রীরা যেমন, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি দর্শকদের গ্যালারীর মধ্য দিয়ে পদচারন করতেন সঙ্গীতে ও ভঙ্গিতে। এটা হয়েছিল তখন অসমাপ্ত রঙ্গিষ্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠান শেষে উদয়শঙ্কর অমলাশঙ্কর সকল পাত্র পাত্রীদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে দাড়িয়ে দর্শকদের অভিনন্দিত করতেন। ('এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো শান্তিবর্দ্ধন একদা এই রামায়ণই করিয়েছিলেন মানুষদের দিয়ে পুতুলের মতো কাঠ্-কাঠ্ ভঙ্গি করে। যেমনটা আমরা 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে দেখে থাকি।)

(৪) উদয়শঙ্কর পরিকল্পিত "Labour and Machinery" নৃত্যকল্পনার মধ্যে অদ্ভুত মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্পে যেমন এক ট্যাক্সি চালক যন্ত্রের সঙ্গে একাত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন, এই নৃত্য পরিকল্পনাতেও কিন্তু একটু অন্য দৃষ্টিকোন থেকে দেখানো হয়েছে যে, এই যান্ত্রিক যুগে কাজ করতে-করতে মানুষ কেমন যেন যন্ত্র হয়ে যায়, যন্ত্রের মতো আচরণ করে (ভাব ভঙ্গি করে), তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি ঐ নাচে রয়েছে। যন্ত্রের সঙ্গে কাজ করতে-করতে মানুষ যেন যন্ত্রের দ্বারা সম্মোহিত (Hypnotised) হয়ে যায়। অর্থাৎ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এবং যন্ত্রের মতোই হস্তপদ সঞ্চালন করে।

(৫) সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে (সালটি সম্ভবতঃ ১৯৫৩) "প্লাবন" নামে একটি অপূর্ব নৃত্য তিনি দেশবাসীকে উপহার দেন। এতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে জলের ঢেউ ও স্রোতের 'ইমেজ' তৈরী করা হয় অপূর্ব দক্ষতায়। মঞ্চে মানুষের হাতের তরঙ্গের উপর আলোকসম্পাত করে ঢেউ ও স্রোত দেখান হয়। উদয়শঙ্কর যেন ঐ স্রোতে ভেসে-ভেসে যাচ্ছিলেন অপূর্ব দেহের ছন্দে ঠিক মনে হয়েছিল স্রোতের ভেতরে ভেসে চলেছেন তিনি। যতদূর মনে পড়ে, সেবার আসামের ব্রহ্মপুত্র নদে প্রচণ্ড ভাঙনে প্লাবন হয়েছিল। তারই সম্ভাব্য নৃত্য-রূপ উদয়শঙ্কর দেখিয়েছিলেন। এই নৃত্যানুষ্ঠানের 'কোরিওগ্রাফি'র কোন তুলনা নেই। এ এক অসাধারণ, অনুপম সৃষ্টি।

(৬) উদয়শঙ্করের নৃত্যদলের প্রোগ্রামের বিখ্যাত নাচগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো যা বিশ্ববন্দিত হয়েছে বার বার। যেমন 'অনন্ত সুর মাধুর্য' (Eternal Melody) 'কার্তিকেয়', 'গন্ধর্ব্য', 'গজাসুর বধ', 'ইন্দ্র', 'অস্ত্রপূজা', 'শিব তাণ্ডব', 'নিরীক্ষণ', 'ভরতনাটম্‌', 'বর্ণম' (ভরতনাট্যম্‌), 'তিলোত্তমা', 'উর্বশী', 'নাগানৃত্য', 'রাজপুতবঁধু'. 'পুংচলম্‌', 'ইয়ং ফাদার', 'মণিপুরী রাস', 'মন্দিরা', 'সূর্যপূজা', 'স্নানম্‌', 'গ্রাম্য-উৎসব', 'বিলাস', 'Grass Cutters' 'ভিল্‌ নাচ', 'বিদায়', 'নিরাশা', 'রাসলীলা', 'শিব-পার্বতী নৃত্যদ্বন্দ্ব' ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৭) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটির তিনি নৃত্যরূপ দিয়েছেন অতুলনীয় দক্ষতায়। এবং 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের মূল বক্তব্য ঠিক রেখে কাহিনীকে ঈষৎ পরিবর্তন করে 'প্রকৃতি ও আনন্দ' নাম দিয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে নতুন ভাবে নৃত্য পরিকল্পনা করেন।

(৮) উদয়শঙ্করের শেষ বয়সের অমর কীর্তি—'শঙ্করস্কোপ'। Stage ও Screen-এর সমন্বয়ে এক অভিনব শিল্প-কলার সৃষ্টি করলেন। এতে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের চমৎকারিত্ব বেশী। তাছাড়া Reality ও Fantacy-র মধ্যে যেন যুগল-মিলন ঘটেছে।

উদয়শঙ্কর তাঁর নিজস্ব প্রতিভার বলে ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য ও লোক-নৃত্যের মর্মে প্রবেশ করেছিলেন এবং তারই নির্যাস নিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নৃত্যধারার প্রবর্তন করলেন, যাকে "Udayshankar School of Dance" বলা যায়। যেমন আমরা "Tagore School of Dance" বলে থাকি। অথবা, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলা যায়—'Neo-classical' বা 'নব্য উচ্চাঙ্গ'।

উদয়শঙ্কর তাঁর নৃত্যানুষ্ঠান বিষয়ে যা লিখেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন—"For the artiste the whole universe is a source of unending inspiration. The truth hidden in the depths of your heart finds expression through our efforts in dance, music and poetry. Today I feel I should give more to the public; there is so much for the artiste to give, so much for him to take from the people. I fervently believe that we can come closer and unite through art, for does it not bring out the subtle bond that deep down unites us?

No living artiste can help being swoyed by the rising forces of the age. The ancient class art, with all its sophistry, its refinement and its ideology is there ; but then there is also, and more evident today than ever, the life of the masses with its vigour, vitality, simplicity and the generative progressive spirit into some aspects of which I have striven to best of my ability to give you some glimpses.

While you watch the programme unfolding, you may possibly feel confused. You may not find a meaning to each movement or note. But if you take it in its entirety, you will find it welded together by the everpresent vein that pulsates in life with unabated vigour.

In the programme we try to voice our cultural aspirations, our dreams, where strife is subordinated to the demands of the spirit of beauty in life. That is our humble contribution, our loving offering to you."

Udayshankar

[পঞ্চাশের দশকে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অনুষ্ঠিত উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠানের "সুভেনির" থেকে উক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।]

উদয়শঙ্করের জীবনে তাঁর শিল্প-শিক্ষক উইলিয়াম রোদেনষ্টাইনের প্রভাব বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

"William Rothenstein had a perfect understanding of what I was doing. He was the first to open my eyes to the culture and beauty of India and her arts."

॥ উদয়শঙ্করের নৃত্য-বৈশিষ্ট্য ॥

(ক) উদয়শঙ্কর চিত্রশিল্পী হলেও তাঁর নৃত্যের দেহ ভঙ্গিমায় ভাস্কর্যের প্রাধান্য বেশী। চিত্রে যেখানে তিনটি 'ডায়মেনশান্' পর্যন্ত দেখানো যায়, সে ক্ষেত্রে ভাস্কর্যে

চতুর্মাত্রিক 'ডায়মেনশান্' দেখানো সম্ভব। নৃত্যের 'fourth dimension' তাঁর একটি প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

(খ) পাশ্চাত্য কোরিওগ্রাফির চিত্রধর্মীতার সঙ্গে ভারতীয় ধ্রুপদী নাচের আঙ্গিকে যে নৃত্যাভিনয় ও লাবণ্য সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে, তার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। তাছাড়া, অবয়ব-সংস্থানের রেখা-জ্ঞান তাঁর ছিল প্রবল।

(গ) তাঁর নৃত্যে ছিল দেশজ শিল্পের প্রাধান্য। যেমন, বলা যায়, এতে ছিল অজন্তা-এলোরার প্রভাব।

(ঘ) উদয়শঙ্কর যে এত বিখ্যাত হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল পাশ্চাত্য 'শ্যোম্যানশিপ' এবং প্রাচ্য "পরিমিতিবোধ" (যেমন গন্ধর্ব্য, ইন্দ্র ইত্যাদি নৃত্যে কয়েক মিনিটের সৃষ্টিতে মানুষকে অভিভূত করেছে।)

(ঙ) প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে তাঁর নৃত্যে ইউরোপীয় 'Expressionist' এবং 'Impressionist' নৃত্যের সূক্ষ্ম প্রভাব রয়েছে।

(চ) পাশ্চাত্য Ballet-এর প্রভাব। অর্থাৎ তাঁর নাচ ছিল বিশুদ্ধ যন্ত্র-সঙ্গীতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া নৃত্য-নক্সা (choreography) মঞ্চকলা, আলোকসম্পাতে বর্ণালী সৃষ্টি—প্রভৃতি ছিল উচ্চ মার্গের।

(ছ) তাঁর নৃত্যে জাভা-বলির ছায়ানৃত্যের (Wayang) প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন, 'রামলীলা' ছায়া নৃত্যনাট্যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।)

(জ) ভারতীয় শিল্পকলার প্রধান দু'টি গুণ—ওজঃগুণ ও প্রসাদ গুণ। এই দু'টি গুণই তাঁর নৃত্যে ছিল নানা ব্যঞ্জনার মধ্যে।

(ঝ) ভারতীয় মার্গ নৃত্যের আঙ্গিক সর্বস্ব প্রথাবদ্ধতা অনেক সময় নতুন শিল্প সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই প্রতিবন্ধকতা তিনি দূর করেছেন।

(ঞ) নৃত্য সৃষ্টিতে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাকে Magnetic Personality বা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলা যায়। তার কারণ, আমার মতো অনেকেই যে নৃত্যজগতে এসেছেন বা নাচকে ভালবাসতে শিখেছেন, তার মূলেও উদয়শঙ্করের বিপুলায়তন প্রভাব রয়েছে। তাঁর নাচ দেখে আমরা যে শুধু মুগ্ধ হয়েছি তাই নয়, আমরা অনুপ্রাণিতও হয়েছি। এখানেই উদয়শঙ্করের মহত্ব ও বিরাটত্ব। আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন উদয়শঙ্কর তাঁর প্রতিভার মধ্য গগনে বিরাজমান। সে সব দিনের স্মৃতিচারণে এই প্রবীন বয়সেও কেমন একটা

'নষ্টালজিয়া' বা স্মৃতি-কাতরতা যেন আমাদের অভিভূত করে। তাঁর নাচের প্রতিটি অঙ্গ বিক্ষেপের ব্যঞ্জনা যেন ছবির মতো মনে ভেসে ওঠে আজও।

॥ গুরুসদয় দত্ত ও লোকনৃত্য চর্চা ॥

ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণ পর্বের (Revivalist Movement) একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনে গুরুসদয় দত্তের "ব্রতচারী আন্দোলন"। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, বৃটিশ যুগের একজন আই. সি এস. অফিসার হিসেবে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলার লোকনৃত্য চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন "ব্রতচারী" আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ ভাবে তিনি একটি অবহেলিত শিল্প-কলাকে মর্যাদার আসনে বসালেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবান্ ও প্রাণবান শাখা যে লোকনৃত্যকলা, সেই শাখাটিকে তিনি বিরাট মর্যাদা দিয়ে গেছেন।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যশিল্পী বুদ্ধিমন্ত সিংকে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে নৃত্যশিক্ষার যে আয়োজন করেন, তখন তা ঐখানেই (শান্তিনিকেতনে) সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায়। শান্তিনিকেতনের বাইরে, ওসব নাচের চর্চা তখন ছিল না বল্লেই চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায়, ১৯৩২ সাল নাগাদ গুরুসদয় দত্ত যে লোকনৃত্যের শিক্ষন-শিবির খুলেছিলেন এবং যেখানে ব্রতচারী আন্দোলনের বীজ উপ্ত বলা যায়, সেই নৃত্য আন্দোলন কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকলো না। তা অবিভক্ত বাংলার সারা জেলায়-জেলায় ছড়িয়ে পড়লো।

শারীর শিক্ষা (Physical Education) ও আনন্দের মধ্য দিয়ে লোকনৃত্য-কেন্দ্রিক ব্রতচারী নাচ আর সীমাবদ্ধ রইলো না। গুরুসদয় দত্ত তাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলেন। এবং ঘোষণা করলেন—যে সব নাচ জাতির নিরক্ষর সাধারণের মধ্যে জাতির আত্মার স্বধর্মের জীবন্ত প্রবাহরূপে ধারাবাহিক ভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে—যাকে আমরা বাংলার লোকনৃত্য বলে অনুকম্পার চোখে দেখি, তার স্থান হওয়া উচিত জাতির শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঊর্ধে। এখানে শিক্ষাক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

ইউরোপে যেমন ৯ বছর বয়স থেকে সাধারণতঃ ব্যালে নৃত্যের (Ballet) চর্চা সুরু হয়, গুরুসদয় দত্ত মনে করতেন, জাতির প্রত্যেক বালক-বালিকাকে বাল্যকাল থেকেই দেশের এই ঐতিহ্যময় (Traditional) লোকনৃত্যধারার সঙ্গে

পরিচয় করে দিতে পারলে, তার মধ্যে জাতির চরিত্র ও ভাবধারা সুস্পষ্ট হবে, দেশকে জানতে, বুঝতে ও ভালবাসতে পারবে। এই মানসিকতা থেকেই তিনি লোকনৃত্যচর্চাকে co-curricular activities-এর মধ্যে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন দেশের ছেলেমেয়েরা লোকনৃত্যচর্চার মাধ্যমে আনন্দের সঙ্গে শারীরিক ব্যায়ামের কাজটাও করে স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে ভারতীয় অন্যান্য নাচের সঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল নাচগুলির চর্চা যেমন কথাকলি, মনিপূরী নৃত্যের চর্চাকে মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে গুরুসদয় দত্তকে দেখা যায় অবহেলিত লোকনৃত্যগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে, তাকে শিক্ষার কাজে ব্যাপক ভাবে লাগাতে চেয়েছেন ব্রতের ছাঁচে ঢেলে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির সৃষ্টির পশ্চাতে যেমন তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় (জাপান, জাভা-বলি, সিংহল ইত্যাদি) তেমনি গুরুসদয় দত্তের নৃত্যান্দোলনের পশ্চাতেও বিদেশ ভ্রমণের একটি ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় গুরুসদয় দত্ত, লণ্ডন রয়াল এ্যালবার্ট হল-এ যে "All England Folk Dance Festival" হয়েছিল, তাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। জানা যায়, ঐ সময় ও দেশের লোকনৃত্যগুলি দেখে নাকি তাঁর দেশের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি হঠাৎই যেন অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন—আমাদের দেশের নানা আচার-অনুষ্ঠান, গ্রামের উৎসব, খেলনা, ছবি, নানাবিধ লোকশিল্প নিদর্শন সবই যেন এক মুহূর্তে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ভেসে উঠেছিল। ঐ বছরেই দেশে ফিরে এসে মৈমনসিংহে (বর্তমান বাংলাদেশ) গড়ে তোলেন "The Folk Dances and Song Society"। এই সোসাইটির তখন উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের অবহেলিত লোকনৃত্যগুলি প্রথমে আবিষ্কার করা, সংগ্রহ ও চর্চার মধ্য দিয়ে সেগুলিকে সংরক্ষণ করা, ক্ষয়িষ্ণু নৃত্যগোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত গুরুসদয় দত্ত নিজের পদ মর্যাদা ভুলে গিয়ে নিজে নাচে অংশগ্রহণ করায় সাধারণ লোক এতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এখানে মনে রাখা দরকার যে, তিনি ছিলেন সেই যুগের একজন সরকারী উচ্চপদস্থ আই.সি.এস. অফিসার। এমন একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের উৎসাহ দেখেই বোধহয়, তদানীন্তনকালের "Director of Physical Education" এই নৃত্যপ্রচারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এরপরই তিনি ১৯৩২ খ্রীঃ লোকনৃত্যের শিক্ষা-শিবির খোলেন ব্যাপকভাবে এই নৃত্যচর্চাকে ছড়িয়ে দিতে। একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা একটু সংক্ষেপে বলে নিচ্ছি। আমি যখন ঢাকা জেলার (তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ) বিক্রমপুর পরগণার পদ্মাপাড়ের লৌহজং হাই ইংলিশ স্কুলে পড়ি, তখন আমাদের স্কুলের অঙ্কের স্যার পুলীনবিহারী নন্দী ঢোল কাঁধে নিয়ে, খেলার মাঠে গিয়ে আমাদের ব্রতচারী নাচ শেখাতেন। "চল্ কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই" ইত্যাদি গান গেয়ে গেয়ে তিনি মাঠ পরিক্রমা করতেন। আমরা ছাত্রের দল তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর মতো ভঙ্গি করে নাচতাম। এটা সম্ভবতঃ ১৯৪৫ সালের কথা। তখন ক্লাশ সেভেনে পড়ি সম্ভবতঃ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। তখনো বিক্রমপুর তো বটেই, পূর্ববঙ্গের সব স্কুলেই তখন 'ব্রতচারী নাচ' শেখানো হতো Physical Education এর ক্লাশে। এ প্রজন্মের ছাত্ররা তা কল্পনাও করতে পারবেন না সেই উন্মাদনা। যে অঙ্ক-স্যারকে আমরা যমের মতো ভয় করতাম, তিনিই যখন ঢোল সহ মাঠে নামতেন, তখন তাঁর চেহারাই যেন পাল্টে যেত। আমাদের আর তখন ভয় করতো না নাচতে। এটাও মনে আছে, ঢোলটা আমাদের বিজ্ঞানের প্র্যাকটিকাল ক্লাশের চালার ভেতরে ঝোলানো থাকতো। এটা আমার পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতি।

যাই হোক পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এর পর ১৯৩৩ সালে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হল—"The All India Folk Dance Society" এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন জায়গায় নানা শাখা-প্রশাখায় তার বিস্তার ঘটলো। ১৯৩৪ সাল থেকেই তাঁর নৃত্যচিন্তা একটা ব্রতের আকার ধারন করলো। এই ব্রতকে বলা যেতে পারে দেশ গড়ার ব্রত, মানুষ গড়ার ব্রত। গুরুসদয় দত্তই প্রথম, যিনি নৃত্য চর্চাকে ব্রতে মর্যাদা দিলেন। জানা যায়, ব্রতচারী সংস্থার আগের নাম ছিল "পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি।" গ্রাম বাংলার জীবন্ত সম্পদ লোকনৃত্য ও লোক সঙ্গীত সারা জীবন ধরেই তিনি সযত্নে চর্চা করিয়েছেন লোকনৃত্য রায়বেঁশে, ঢালি, পাইকান, জারি, কাঠি, বাউল প্রভৃতি এবং সযত্নে সংগ্রহ করেছেন লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ কাঁথা, পট, কাঠের কাজ, শোলার কাজ, ধাতুর কাজের কত নিদর্শন। এগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। এগুলি রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের। ডায়মণ্ড হারবার রোড অবস্থিত ব্রতচারী গ্রাম তথা গুরুসদয় দত্তের

সংগ্রহ শালায় যে কত মহার্ঘ্য লোক-সংস্কৃতির নিদর্শন রয়েছে, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

নৃত্যকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ আদর্শকে জীবন্ত করে তুলতে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যে আন্দোলনের সূচনা তিনি করেছিলেন, তা আজও জীবন্ত আছে। এই জীবন্ত রূপটি হল "ব্রতচারী নৃত্যান্দোলন।" ব্রিটিশ যুগে পূর্ববঙ্গের স্কুলগুলিতে তখন ব্রতচারী নাচ শেখানো হতো। এখনো বিভিন্ন স্কুলে এবং প্রতিষ্ঠানে ব্রতচারী নাচ শেখাবার আয়োজন আছে। এই আয়োজনকে ব্যাপক করা দরকার।

খুব অল্প কথায় বলা যায়, একটা ভূমিবাদ ও ছন্দবাদের উপর ভিত্তি করেই এই নৃত্যান্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই নৃত্যধারার মূল আদর্শ রূপায়ণে ছিল পাঁচটি মহান ব্রত--জ্ঞানব্রত, শ্রমব্রত, সত্যব্রত, ঐক্যব্রত, ও আনন্দব্রত। এর ভেতর দিয়ে শরীর গঠন, চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলাবোধ ও সৌন্দর্যবোধ জাগানো এবং সর্বোপরি দেশের গ্রামীন সংস্কৃতির প্রতি যুব সমাজকে সচেতন করার একটা আয়োজন আছে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়বার একটা মূল্যবান হাতিয়ার তিনি দিয়ে গেছেন এই নৃত্যান্দোলনের মধ্য দিয়ে। এবং ব্রতচারীদের কল্যাণেই এখনো সেই গ্রাম বাংলার বলিষ্ঠ নাচগুলি বেঁচে আছে সমাজে। এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে নৃত্যবিদ্ মণিবর্ধন ১৯৫৫ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবাংলার লোক-নৃত্য ও গ্রাম্য গাঁথা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোক-নৃত্য চর্চার একটি বিবরণ দেন। সেই বিবরণ পরে সরকারের দ্বারা প্রকাশিতও হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে সরকারী অর্থানুকুল্যে কত বড় মাপের কাজ করা যায়।

বাংলার লোকনৃত্যগুলির মধ্যে ওজঃগুণ সম্পন্ন নৃত্যগুলি, বিশেষ করে রণনৃত্যের (Martial Dance) অঙ্গীভূত নৃত্যগুলির কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই বোঝা যাবে, কেন গুরুসদয় দত্ত দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী করতে এই সব বলিষ্ঠ নৃত্যগুলির আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিশেষ করে ঢালি নৃত্য, পাইকান নৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য ইত্যাদি।

॥ ঢালিনৃত্য ॥ (Martial Dance)

অবিভক্ত বাংলায় মূলতঃ যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত

এই ঢালি নৃত্য প্রচলিত ছিল। যদিও সারা বাংলা দেশ জুড়েই ছিল মধ্যযুগীয় ঢালি নৃত্যের বহুল প্রচলন। এই নৃত্য বীর ও রৌদ্র রসাত্মক উদ্ধত অঙ্গচালনার নৃত্য। ঢালী নৃত্য আক্রমণ ও প্রতিরোধমূলক ভঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হয়। এর পাদকর্মে থাকে উন্মাদনার প্রকাশ। মোটামুটি জ্যামিতিক প্যাটার্ণে দলের অগ্রগতি, পশ্চাৎ অপসরণ, পাশে যাওয়া প্রভৃতি রীতি লক্ষ্য করা যায়।

এই নৃত্যে প্রতিঘাত বা আত্মরক্ষা থেকে বাঁচবার জন্য হাতে থাকে ঢাল। এই ঢাল সাধারণতঃ বেত, কাঠ অথবা চামড়া দিয়ে খুব শক্ত করে তৈরী করা হয়। এই ঢাল নাগা নৃত্যেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ঢালি বলতে আমাদের দেশের হাড়ী-বাগদী, ডোমেদের নিয়ে মধ্য যুগে জমিদারদের প্রয়োজনে স্বষ্ট এক বিশেষ যোদ্ধা সম্প্রদায়কেই বোঝায়। ডান হাতে বর্শা ও বাম হাতে ঢাল নিয়ে তারা যুদ্ধের মহড়া দেখায় নৃত্যের পদক্ষেপে তালে তালে। এই নৃত্যে উৎপ্লবন প্রয়োগ লক্ষণীয়। এক সময় ঢালিদের খুব খ্যাতি ছিল। জানা যায়, বাংলার ঢালি যোদ্ধাদের প্রতাপেই প্রতাপাদিত্য দিল্লীর হুকুম নামাকে অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। এই নৃত্যে সজাগ ও সন্ধানী দৃষ্টিতে নৃত্যদল আক্রমণাত্মক এবং আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে সাপের মতো ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। এঁদের পরণে থাকে মালকোচা মারা ধুতি, মাথায় লাল ফেট্টি, হাতের মনিবন্ধে লাল কাপড় জড়ানো, হাতে বর্শা ও ঢাল। এই বীর রসাত্মক যুদ্ধনৃত্য গুরুসদয় দত্ত-কে মুগ্ধ করেছিল বলেই ব্রতচারী আন্দোলনের অন্যতম নৃত্য মাধ্যম হিসেবে এই ঢালি নৃত্যের ব্যাপক চর্চার আয়োজন করেছিলেন।

পাইকান নৃত্য (Martial Dance)

অবিভক্ত বাংলার পদাতিক যোদ্ধাদের মূলতঃ পাইকান আখ্যা দেওয়া হতো। এরা ছিল তখনকার জমিদারদের আশ্রয় পুষ্ট। এদের হাতিয়ার ছিল লাঠি। এক অর্থে এদের লেঠেল বলা যায়। মেদিনীপুর ও গড়বেতা অঞ্চলের পাইক নাচ মূলতঃ রুখ্মার আক্রমণ ও প্রতিশোধের ভঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হয়। আক্রমণের আগে লাঠি নিয়ে এরা পাঁয়তারা করে এবং লাঠি খেলায় নানা কৌশল দেখায়। এদের লাঠি চালানা এত দ্রুত যে, ঢিল মারলেও তা গায়ে না লেগে ফিরে আসতো লাঠিতে ঘা খেয়ে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় এই নাচের প্রচলন বেশী। ডোম-হাড়ী

প্রভৃতি জাতির লোকেরা এই নৃত্যের মাধ্যমে শক্তি চর্চা করতো। দেশবাসীকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার জন্যই সম্ভবতঃ গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারী আন্দোলনে এই পাইকান নাচকেও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন।

রায়বেঁশে বা রায়বেশে (Martial Dance)

বীরভূম জেলার বিখ্যাত নাচ রায়বেশে বা রাবেঁশে। বীরভূমের তাঁতিপাড়া ও চারকল গ্রামের দুর্ধর্ষ লেঠেল রায়বেশে সম্প্রদায় প্রাচীন নর্তকদের মধ্যে এখনো হয়তো কেউ কেউ বেঁচে থাকতে পারেন। অনেকে মনে করেন পাইকান নাচ থেকেই রায়বেশে নাচ এসেছে।

এই নাচের নামকরণ প্রসঙ্গে দু'ধরনের কথা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন রায়বেশে নাচের নামকরণের মূলে আছে—নাচের সময় হাতে পাকা বাঁশের লাঠি ধারণের রীতি থেকেই নাকি "রায়বেঁশে" কথাটি এসেছে। আবার অনেকের মতে 'বিট' শব্দের অর্থ শক্তিশালী জনগোষ্ঠী। 'বিট' থেকে 'বিশ' শব্দ এবং বিশ থেকে 'বেশে' শব্দের উৎপত্তি। শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর আচরণীয় কৌশলকে বলা হল 'বিশ'। রাজকীয় সম্মান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বলা হতো 'রায়'। এই 'রায়' অর্থাৎ জমিদারদের আশ্রিত ও পুষ্ট জনগোষ্ঠীই রায়বেশে গোষ্ঠী রূপে পরিচিত। যাই হোক, তখনকার দিনে প্রত্যেক জমিদারেরই থাকতো আশ্রিত রায়বেশে গোষ্ঠী। পালা-পর্বনে, বিবাহ-উৎসবে শক্তির খেলা দেখিয়ে এরা সকলকে মাতিয়ে রাখতো। শোনা যায়, বীরভূমে থাকাকালীন গুরুসদয় দত্ত নাকি কোন এক বিবাহ-উৎসবে গিয়ে এই রায়বেশে নাচ দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। তাঁরই উদ্যমে এই নাচ লোক-সমাজে আদৃত হয়।

এই নাচের আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র হলো ঢাক ও ঢোল। এই নাচের দু'টি ভাগ লক্ষ্য করা যায়—

(১) মূলতঃ এটা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সমবেত হয়ে হস্ত ও পাদচালনার দ্বারা বীর রসাত্মক নাচ। নাচবার সময় বাহুমূলের কর্ম 'ধনুর্বাণ চালনার' ভঙ্গিযুক্ত। নৃত্যে মণ্ডলকালে বিভিন্ন চারী—যেমন, বৃশ্চিকচারী, অপক্রান্তাচারী, বিদ্যুৎভ্রান্তাচারী প্রভৃতি দেখা যায়। বিশেষ করে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কিছু করণ-প্রকরণ এতে লক্ষ্য করা যায়।

(২) এই নাচের মাধ্যমে শক্তি পরীক্ষা ও শক্তিচর্চার অঙ্গরূপে ঢোলের বাজনার

তালে তালে চলে বিভিন্ন প্রকার দেহভঙ্গির কসরত ও কৌশল প্রদর্শনী। সাধারণতঃ আমোদ-প্রমোদের অঙ্গরূপেই উৎসবে চলতো এই নাচ। এই নাচের ওজঃগুণ দেখেই গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী আন্দোলনের অংশ হিসেবে মর্যাদা দেন এই রায়বেশে নাচকে।

গুরুসদয় দত্তই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি অতি সূক্ষ্মভাবে বাংলার প্রচলিত সমগ্র লোকনৃত্যধারাকে মূলতঃ এগারটি "অভিপ্রায়" বা "Motive"-এ ভাগ করে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"The motive and content of the various folk dances of Bengal constitute an extremely interesting field for study and also furnish a basis for their classification. The following classification will help to distinguish the characteristics and the basic feature of the various folk dances of Bengal. In each case an attempt has been made to distinguish the motive on the one hand and the content on the other."

শিল্পতত্ত্বের ভাষায় যেমন—'Form' and 'Content' নিয়ে বিতর্ক আছে, তেমনি গুরুসদয় দত্ত Form-এর জায়গায় Motive এবং যথারীতি Content শব্দটি রেখে যে নৃত্য বিচারের চেষ্টা করেছেন, তাও অবিসংবাদিত নয়। এতেও বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ এই ভাগাভাগিগুলি হয়েছে প্রধানতঃ নৃত্যপ্রকরণ, আঙ্গিক রূপসজ্জা প্রভৃতি ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া উক্ত Motive-এ বিধৃত নাচগুলির সবই লোকনৃত্যের পর্যায়ে পড়ে কিনা, এতেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তবু আমরা বলবো, এই Motive ভাগের প্রয়োজন আছে। এবং কেন প্রয়োজন আছে, তা তিনি উক্ত কথায় ব্যক্ত করেছেন। যাই হোক তিনি যে অভিপ্রায় বা Motive ভাগ করেছেন, তা নিম্নরূপ :—

(১) **যুদ্ধ অভিপ্রায় (War Motive)**

রায়বেশে, পাইক, ঢালি, ছৌ নাচ প্রভৃতি এই পর্যায়ের নাচ।

(২) **ক্রীড়া অভিপ্রায় (Play Motive)**

কাঠি নাচ, লাঠি নাচ, ধামালী নাচ, কোরা ঝুমুর নাচ, (তাছাড়া পুরাণের যুগের দণ্ডরাসকম্ আসারিত, হল্লিসক প্রভৃতি নাচে এই ক্রীড়া-অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। কারণ ঐ সব নাচকে বলা হয়েছে 'Sportivi Play')।

(৩) (ক) **আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন, বর দেওয়া ও প্রার্থনা করা অভিপ্রায়** (Ceremonial greetings, Boon Giving and Boon asking Motive)

বরণ নৃত্য, আরতি নৃত্য ইত্যাদি।

(খ) **আদর্শের পরিপুর্তি এবং একান্তভাবে আত্ম-প্রকাশক অভিপ্রায়** (Ideal fulfilment and complete self-expression Motive) ব্রত নৃত্য ইত্যাদি।

(৪) **সামাজিক অনুষ্ঠান এবং শুভাকাঙ্ক্ষা অভিপ্রায়** (Social ceremony and well-wishing Motive) বিবাহ উৎসবের নৃত্য ইত্যাদি।

(৫) **আনন্দাত্মক ভাব-সম্মিলন অভিপ্রায়** (Joyous self-union Motive) বাউল নাচ, মুর্শিদি নাচ ইত্যাদি।

(৬) **আধ্যাত্মিক বিনতি এবং আত্মশুদ্ধি অভিপ্রায়** (Spiritual supplication and self-purification Motive) সংকীর্তন নাচ ইত্যাদি।

(৭) **নীতিমূলক অভিপ্রায়** (Didactic Motive) রামায়ণ, সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, পদ্ম পুরাণ, গাজীর গান, মানিক পীর, বোলান, বংশী নাচ ইত্যাদি।

(৮) **স্মৃতিরক্ষার্থক অভিপ্রায়** (Commemoration Motive) সারি নাচ, দধি নাচ ইত্যাদি।

(৯) **প্রতিনিধিত্বক এবং ভাবান্তরাত্মক অভিপ্রায়** (Representational and Interpretative Motive) মুখোশ নৃত্য ইত্যাদি।

(১০) **উপযুক্ত প্রমাণাত্মক অভিপ্রায়** (Fitness Proving Motive) ধর্ম পূজা, চড়ক, গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি নৃত্য।

(১১) **প্রসন্ন-ক্রিয়াত্মক অভিপ্রায়** (Propitiation Motive) মনসা ভাসান, রয়ানি নৃত্য ইত্যাদি।

যদিও লোকনৃত্যের এই অভিপ্রায় বিভাগ নিয়ে মত পার্থক্য আছে, তবু বলবো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে লোকনৃত্যের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে বিশ্লেষণে এই 'অভিপ্রায়' বিভাগের আলোচনার গুরুত্ব নৃত্য-গবেষকদের কাছে কম নয়।

অবিভক্ত বাংলার লোকনৃত্যের অনেকটাই চর্চার অভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাংলার লোকনৃত্যের ওজঃগুণসম্পন্ন নাচগুলির মধ্যে পাইকান, ঢালি, রায়বেঁশে

প্রভৃতি নাচকে গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'ব্রতচারী' আন্দোলনের মাধ্যমে অমর করে রেখে গেছেন।

বাংলার নৃত্যের ঐতিহ্য অনেক দিনের। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে সুরু করে চর্যাপদ' বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মঙ্গলকাব্য' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাংলার নৃত্যচর্চার একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনেই লোকনৃত্য চর্চায় গুরুসদয় দত্তের বিশিষ্ট অবদান বিষয়ে অচিরেই একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হওয়া দরকার। তাই দেশের সকল নৃত্যশিল্পী নৃত্য গবেষক, নৃত্য শিল্পকে যাঁরা আন্তরিকভাবে ভালবাসেন, তাঁরা এগিয়ে আসুন। তাহলেই গুরুসদয় দত্তের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে। অন্যথায় মহতী বিনষ্টি।

॥ রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেলে ও ভরতনাটম্ ॥

আধুনিক যুগে ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেলের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতীয় নৃত্যের পুনর্নবীকরণে (Revivalist Movement) যাঁদের অবদান ভারতীয় নৃত্যশিল্পকে উন্নত করেছে, বিশেষ করে ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারায় এক নবতর রূপের সৃষ্টি করেছে, তাঁদের মধ্যে রুক্মিণী দেবী অন্যতমা।

১৯০৪ খ্রীঃ ২৯শে ফেব্রুয়ারী, তামিলনাড়ুর অন্তর্গত মাদুরাই নামক স্থানে এক পুণ্য লগ্নে. 'মহামগম্' উৎসবের সময়, এক রক্ষণশীল উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেলে। তাঁর পিতার নাম নীলকান্ত শাস্ত্রী। নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্ব ছিল।

রুক্মিণী দেবীরা ছিলেন আটজন ভাই-বোন। যথা—**শ্রীরাম, শুভলক্ষ্মী, শিবকামু, পদ্মনাভন্, যজ্ঞেশ্বরণ, রুক্মিণী দেবী, বিশালাক্ষী, সুব্রাহ্মনিয়ম্।** রুক্মিণী দেবীর মাতা ছিলেন সঙ্গীতানুরাগিণী। খুব ছোটবেলা থেকেই রুক্মিণী দেবীর পারিবারিক জীবনে সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়েছিল তাঁর চিন্তন ও মননে। তাঁর শেষ জীবনে এসে তারই ফলশ্রুতি দেখতে পাই তাঁর জীবনবেদের তিনটি মূল্যবান ছত্রে—

"Education without fear
Art without vulgarity
Beauty without cruelty."

তাঁর ৮২ বছরের জীবনের মূলমন্ত্র আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি।

শৈশব কাল থেকেই তিনি ভারতীয় নৃত্যকলার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সারাজীবন নৃত্য ও অভিনয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের প্রতি ব্রতী ছিলেন।

১৯২৬ খ্রীঃ তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না রাশিয়ার বিখ্যাত ব্যালেরিনা আনা পাভলোভার (Anna Pavlova) সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় নৃত্যের চর্চায় বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হন। ঐ সময়েই তিনি বিখ্যাত নর্তক Cleo Nordi-র কাছে পশ্চিমী ব্যালের শিক্ষা গ্রহণ করেন। আনা পাভলোভার সঙ্গে তিনি নৃত্য-শিল্পী রূপে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে সুখ্যাতি লাভ করেন। পরে তিনি নৃত্য ও অভিনয় কলা নিয়ে প্রভূত গবেষণা করেন। এরপর তিনি জর্জ, এস্‌ আরুণ্ডেলকে বিবাহ করেন। জর্জ আরুনণ্ডেল ছিলেন ভারতীয় Theosophical Society-র সভাপতি। মাদ্রাজের তিরুপতিতে ১৯৪০ খ্রীঃ যে ভরতনাট্যমের দশম "ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স" হয়, তাতে তিনি সভানেত্রী ছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীঃ তাঁর জীবনের অমর সৃষ্টি "কলাক্ষেত্র" নামক প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক শিল্পচর্চা কেন্দ্র হিসেবে মাদ্রাজের আদিয়ারে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর 'কলাক্ষেত্র' সারা পৃথিবীর শিল্পরসিকদের কাছে এখন সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চার সুযোগ করে দেন, কবি ভাল্লাথোল যেমন কেরালার কথাকলি নাচের পুনরুজ্জীবনে "কেরালা কলামণ্ডলম্‌" স্থাপনা করেন, তেমনি রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেলের 'কলাক্ষেত্র' এক আদর্শ ভরতনাট্যম্‌ চর্চা-কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দক্ষিণ ভারতের ক্ষয়িষ্ণু ভরতনাট্যম্‌-কে তিনি পুনরুজ্জীবিত করে, তাকে বিশ্বের কাছে প্রচার করেছেন।

'কলাক্ষেত্র' তার এক মহান কীর্তি। এই কলাক্ষেত্র থেকেই পরবর্তীকালে অনেক নামকরা নৃত্যশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে।

মীনাক্ষি সুন্দরম পিল্লাই-এর মতো প্রসিদ্ধ নৃত্যগুরুর কাছে তিনি ভরতনাট্যম্‌ নৃত্য শিক্ষা লাভ করেন। পরে গৌরী আম্মালের কাছে নৃত্যের অভিনয় কলার দিকটা বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন।

১৯৩৫ খ্রীঃ মাদ্রাজের আদিয়ারের আন্তর্জাতিক Theosophical Society-র Conference-এ তিনি নৃত্য প্রদর্শন করে শত শত দেশী বিদেশী দর্শকের প্রশংসা

* Kalakshetra Quaraterly Vol-VIII No—3—4 (Introduction).

অর্জন করেন। তিনি সব সময়েই চাইতেন, মানুষ আরও বেশী করে নৃত্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হোক। তিনি যথার্থই মনে প্রাণে নৃত্যকলা ও অভিনয় শিল্পকে ভালবাসতেন এবং এই শিল্পের প্রচার ও প্রসারে সারা জীবন কাজ করে গেছেন। কুরুভঞ্জী ও ভাগবত মেলা নাটকাভিনয়কে তিনি নতুন ভাবে জাগ্রত করে প্রচার করেন।

১৯৫২ খ্রীঃ তিনি রাজ্য সভার সম্মানিত সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ খ্রীঃ পুনঃরায় তিনি রাজ্য সভার সদস্যা হন। এটাই প্রমাণ করে তাঁর কর্মদক্ষতা ও জনপ্রিয়তা। তাঁর শেষ জীবনে তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপতি (President) হবার জন্য অনুরোধ করা হলে, তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি রাজনীতি অপেক্ষা শিল্পকে বেশী ভালবাসতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বলিষ্ঠ উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন—"No political leader can bring about the integration that a supreme artist can, because true art alone can build, harmonise and unite. That is its power."

তিনি আরও বলেছেন—"To express truly, you must appreciate life. If you desire to create, appreciate the creation around you. To be true artist you must first appreciate, then live, and then express or create."

উক্ত কথাগুলি থেকে এটুকু অন্ততঃ বোঝা গেল যে, দেশের সংহতি রক্ষায় রাজনীতিবিদদের ভূমিকার থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা অনেক বেশী কার্যকরী।

রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেলে ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী। তিনি প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী, উচুদরের 'কোরিওগ্রাফার' আদর্শ শিক্ষয়িত্রী এবং সর্বোপরি উদার মানবতাবাদী।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে প্রতিষ্ঠিত 'কলাক্ষেত্র' তাঁর জীবন ও সাধনার এক অমূল্য সম্পদ। ভারতবর্ষে যে কয়েকটি নৃত্য প্রতিষ্ঠানে এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হয়, 'কলাক্ষেত্র' তার মধ্যে অন্যতম। অনেকটা শান্তিনিকেতনের আদর্শেই কলাক্ষেত্রের পঠন-পাঠন-শিক্ষার আদর্শ ও উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অতি সহজ সরল জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারায় 'Tradition and modernity'-র মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন তেমনি রুক্মিনীদেবীও দেশের ঐতিহ্যপূর্ণ নৃত্যধারা ও আধুনিক চিন্তায় তা রুচিসম্মত শিল্পায়নের মাধ্যমে তাকে রূপদান করেন। সাদির নাট্য ও কুরুভঞ্জীর খোলশ ছাড়িয়ে ভরতনাট্যমকে একটি অভিনব শিল্পমণ্ডিত নৃত্যে নব রূপায়নের মাধ্যমে এই নৃত্যের বলিষ্ঠতার প্রমাণ দেন। ভারতীয় নৃত্যের গুরুগুণ ও

প্রসাদগুণ—এই দুইয়ের মূর্ত প্রতীক রুক্মিনী দেবী আরুণ্ডেল প্রবর্তিত ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারায় উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এ যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতার শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর, রুক্মিনীদেবী সম্বন্ধে যেটুকু বলেছেন,তা প্রণিধানযোগ্য। রবিশঙ্কর রুক্মিনী দেবীকে 'A Great Indian' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন—"All I can say about Srimati Rukshmini Devi, restraining myself from becoming emotional, is that she was a very special person !

Though I have known her for about 40 years, I came into close contact with her within the last ten years of her life. Her creation of "Kalakshetra" and contribution to Indian dance, music and allied cultural tradition is well known.

She is the only other great personality after Rabindranath Tagore (who created Shantiniketan), to have achieved and contributed to her country and people so much in her own life time. Though I know that it is meant for political Stalwarts only, still how I wish she had got the recognition 'Bharat Ratna' from our government before she died "*

১৯৫৪ থেকে ১৯৮৪ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি অনেকগুলি নৃত্যনাট্য, নৃত্যলেখ্য, নৃত্যানুষ্ঠান করেন। তাঁর দ্বারা পরিচালিত নৃত্যনাট্যগুলি হলো—

(1) The Valmiki Ramayana (in six Parts)

Sita Swayamvaram—	1954
Sri Rama Vanagamanam—	1960
Paduka Pattabhishekam—	1960
Sabari Moksham—	1965
Choodamani Pradanam—	1968
Maha Pattabhishekam—	1970

(2) Bhagavata Mela

Usha Parinayam—	1959
Rukmangada Charitam—	1959
Rukshmini Kalyanam—	1964
Dhruva Charitam—	1971

(3 Kuruvanji—

Kutral Kuruvanji—	1944
Kannappar Kuruvanji—	1962
Krishnamari Kuruvanji—	1971

(4) Other Productions--

Kalidasa's Kumarsambhavam—	1947
Jaydeva's Gita Gobindam—	1959
Rabindranath Tagore's Shyama—	1961

*Kalakshetra Quarterly—Vol. VIII No. 3-4 Page 95

Andal Charitam—	1961
Kalidasa's Abhijnana Sakuntalam—	1967
Kuchelopakhyanam—	1972
Matsya-kurma Avataram—	1974
Meenakshi Vijayam—	1977
Damayanti Swayamvaram—	1978
Buddha Avataram—	1979
Ajamilopakhyanam—	1980
Meera of Mewar—	1984

List of Honours—

1956—Padma Bhusan award from the government of India presented by the President.

1957—Award from the Sangeet Natak Akademi as the foremost dancer.

1958—Queen Victoria silver medal of the Royal Society for the Preservation of Cruelty to Animals, London.

1960—Doctorate in Humanities, Wayne State University, U.S.A.

1968—Fellowship of the Sangeet Natak Akademi.

1968—Prani Mitra award of the Animal Welfare Board.

1969—Doctorate from Rabindrabharati University, Calcutta.

1972—Desikottama (Doctorate) from Vishwabharati University, Santiniketan.

1977—Award for outstanding achievement in the field of arts from the Fuel. Instrument Engineers Ichalkaranji.

1977—Was invited to become the President of India. Did not accept.

1980—D. Litt. from Indira Kala Sangeet University, Khenragarh, M. P.

1980—Thamipperum Kalaiguar (Doctorate) award from the Tamil Nadu Eyal Isai Manram

1982—Rabindranath Tagore Plaque-Asiatic Society.

1982—Hon. Doctorate—Benaras Hindu University.

1984—Kalidasa Sanman Award—Madhya Prodesh Government.

1984—Mankar Award—U. S. Service to Animals (International Vegetarian Union).

সহায়ক গ্রন্থ

|| ENGLISH ||

1. An Advanced History of India—Majumder, Roy Chowdhury and Dutta.
2. The Art of Indian Asia—Vol. I
3. The Art of Indian Asia—Vol. II
   Dr. Heinrich Zimmer.
4. Aeschylus and Athens—George Thomson.
5. Ancient Art and Rituals—J. E. Harrison.
6. Aristotle's Poetics S. H. Butcher.
7. The Andaman Islanders—A. K. Brown.
8. Ancient Society—Morgan.
9. The Art of Kathakali—A.C. Pandey.
10. Atharvaveda—Translated by Macdonell.
11. Aradhana Nritymulu—(Telegu) C. R. Acharulu.
12. Bharat Natya (a critical study—R. Satyanarayan.
13. The Book of Dance (Hist)—De, Mille Agnes.
14. The Brief Description of Manipuri Dance—Panditraj Atombapu Sarma
15. A Bibliography of Dancing—Paul David Magrial,
16. Classical Indian Dance in Literature and the Arts—Dr. Kapila Vatsyayan
17. Classical and Folk Dances of India—Bombay, Mary Publications.
18. Classical Indian Dancing—Manda Kranta Bose.
19. Civilization and Culture—C. F. Richard.
20. Dance Dialects of India—Ragini Devi.
21. Dance and Magic Drama in Ceylon—Beryl de Zoete.
22. The Dance in India—Enakshi Bhavani
23. Devdasi—Santosh Chatterjee.
24. The Dance in India—Faubian Bowers.
25. The Dance of Shiva—A. Coomarswami.
26. Dance of India—Projesh Bannerjee.
27. Dance in India—Publication Divition, Govt. of India.
28. Development of Hindu Iconogrophy—Dr. J. N. Bannerjee.

29. Development of Hindu Iconography—Gopinath Rao.
30. The Dance Encyclopaedia—Anatole Chujoy.
31. Epigraphia Indic—Govt. Publications. Vol. 20. (Inscription of Kharvela)
32. Epics, Myths and Legends of India—P. Thomas.
33. Epic Mythology—Haupkins (Strassburg—1915).
34. Folk Dance of India—Projesh Bannerjee.
35. Folk Dances of Bihar—Hari Uppal.
36. The Folk Dances of Bengal—Gurusaday Dutta.
37. The Golden Bough—Sir James George Frazer. (Abridged)
38. The History of Mithila (Literature)—Sri Joykanta Misra (Vol. I, page—333)
39. A Historical Study of Indian Music—Swami Prajnanananda.
40. Hindu Civilization—Dr. Radhakumud Mukherjee.
41. A History of Sanskrit Literature—Macdonell.
42. History of India – Elliot.
43. Hymns from the Rgveda—Macdonell.
44. History of South India—Nilkanta Shastri.
45. The Hathi Gumpha Inscription of Kharvela— P. Jayaswal & R. D. Banerjee
46. The History of Mithila (Vol. 1)—Jaykanta Misra.
47. India Through the Ages—Jadunath Sarker.
48. The Imperial Gazetteer of India (Vol 4)—Hunter W.W.
49. Indian Puberty Rites—Dr. N. Bhattacherjee.
50. Illusion and Reality—C. Caudwell.
51. Introduction to Benesh Dance Notation—J. Benesh.
52. Indian Philosophy—Dr. S. Radhakrishnan.
53. The Ideals of Indian Art—E. B. Havell.
54. Introduction to Indian Art—A.K. Coomarswami.
55. Introduction to Indian History—E. D. Kosamby.
56. Journey from Madras—F. Buchanon.
57. Kuchipudi and Temples Rhythm of Andhra— C. R. Acharulu.
58. Kathakali, the Sacred Dance Drama of Kerala— Bharatha, Iyer. K.

59. Kuchipudi Aradhana Nrityamulu—C R. Acharulu.
60. Kautilya's Arthasastra—Edited by R. Shyama Sastri.
61. Labanotation—Ann Hutchinson.
62. The Mirror of Jesture—A.K. Coomerswami.
63. The Necessity of Art—Ernst Fischer.
64. Natya, Nritta and Nritya—K. M. Varma.
65. The Natyashasra (Bharat Muni)—M. M Ghosh.
66. The Natyasastra (Royal Asiatic Scociety of Bengal).
67. The Origin of the Family, Private Property and the State—Engels.
68. Preliterate Man—Gisbert Pascaul.
69. Prehistoric Religion—E. O. James.
70. Psycho : Analysis of Dances—D. Das Gupta.
71. Pears Cyclopaedia—L. Mary Barker.
72. Prehistoric India—Stuart Piggot.
73. Prihistoric Civilization of the Indian Valley—Roy Bahadur Dikshit.
74. Primitive Art—Boas Franz.
75. Race, Language and Culture—Boas Franz.
76. Rgveda (Vol. II)—Wilson. H.H.
77. The Sanskrit Drama - Keith.
78. Studies in Ancient Greek Society—G. Thomson.
79. Social Evolution—Gordon Childe.
80. Sacred Book of the East—(Vol. 1.)—Max Muller.
81. South Indian Inscription—Edited by E. Hutzsh.
82. The Saiva School of Hinduism—S. Sivapada Sundaram.
83. Social Dance (Hist)—F. A. Henry.
84. Studies in Indian Dance—R. Satynarayan.
85. Tribal Dance and Social Development—W. D. Hambly.
86. Translation and Commentary of VaJsenaya, Book. 1.
87. Theatre in the East—Bowers Faubion
88. Travels in India—V. Ball.
89. The Vedic Mahabrata—Dr. Keith.
90. Vedic Index (Vol. 11. —Kaith. and Macdonald.
91. V. S. Mulmantra—Prizilashky.

92. World Hist. of the Dance—Sachs Curt.

93. What happened in History—Gordon Childe.

94. The Art of Hindu Dance—Santosh Chatterjee & Manjulika Bhaduri.

॥ বাংলা ॥

১। অভিনয় দর্পণ (নন্দিকেশ্বর)—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী অনূদিত।

২। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১ম সংস্করণ)

৩। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। শিল্পতত্ত্ব পরিচয়—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

৫। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

৬। গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য—শান্তিদেব ঘোষ।

৭। বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য—মণি বর্ধন।

৮। নৃত্য—প্রতিমা ঠাকুর।

৯। রবীন্দ্ররচনাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চতুর্দশ খণ্ড)—জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ।

১০। রবীন্দ্ররচনাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০ম খণ্ড)—

১১। ভারত জনের কথা—বিনয় ঘোষ।

১২। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

১৩। নাচের ইতিকথা—গোপী ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ বসু।

১৪। সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার।

১৫। শিল্পকথা—নন্দলাল বসু।

১৬। অভিনয় দর্পণ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত।

১৭। ঐতিহাসিক সময়রেখা ও দিগ্‌দর্শন—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী।

১৮। ঋক্‌বেদ সংহিতা—(অনুবাদ) রমেশ দত্ত।

১৯। বেদের পরিচয়—ডঃ যোগীরাজ বসু।

২০। মূর্তি ও মন্দির—রায় বাহাদুর চন্দ।

২১। নাট্যশাস্ত্রম্ (কাশী সংস্কৃত সিরিজ পুস্তকমালা)—পণ্ডিত বলদেও উপাধ্যায়।

২২। সঙ্গীত রত্নাকর—(পুণা সংস্করণ)

২৩। পৃথিবীর ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী।

২৪। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা—মনোমোহন ঘোষ।

২৫। বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত।
২৬। হিন্দুস্থানী নৃত্যশৈলী (কথক)—শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৭। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য—ডঃ প্রণয়কুমার কুণ্ডু।
২৮। ভারতীয় সংস্কৃতি—ক্ষিতিমোহন সেন।

॥ সাময়িক পত্রিকা ॥

১। Nritya Niketan—Souvenir (Hydrabad).
২। Indian Culture (Magazine) Vol. IV Oct. 1937.
৩। Indian Historical Quaterly, Vol. VIII. (March 1932 —Dr. Laha's article.
৪। Kalakshetra Quarterly Vol. III No. 3-4.
Golden Jubilee Year, 1936—86
৫। মাসিক বসুমতী—মাঘ—১৩৫৮ (চর্যাপদ লৌকিকতা প্রবন্ধ—অবন্তী সান্যাল)।
৬। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা—(১৩৭৬—কার্তিক—পৌষ)
৭। ,, (একাদশ বর্ষ—২য় সংখ্যা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৮০).
৮। সাপ্তাহিক বসুমতী—(১৯৬৯, সেপ্টেম্বর)
৯। The Visva Bharati Quarterly (Vol. XXV. No. 3, 4).
১০। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা—৩১শে জানুয়ারী, ১৯২৩ সাল।
১১। রবীন্দ্রসদন পুস্তিকা—এপ্রিল, ১৯৭২—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
১২। Sangeet Natak Academy—Dance Seminar Papers, 1958. (New Edition)
১৩। U.S.I.C. Centre News—Almora, Vol. V. No. 50 April, 1943.
১৪। The Probudho Bharat—Vol. LXVL. March, 1961.
১৫। The Journal of the Music Academy—Madras, (1932) Vol. III.
১৬। The Four Arts Annual, 1935.
১৭। মদীয় প্রবন্ধ—এ যুগের নৃত্য ভাবনা : একটি খসড়া
,, ,, —নৃত্যলিপি প্রসঙ্গ :
১৮। সাপ্তাহিক বসুমতী—১৮ই সেপ্টেম্বর—১৯৬৯
,, ,, —২৫শে সেপ্টেম্বর—১৯৬৯

Siva Nataraja.

Amarāvati. Slab depicting the Stupa. Late 11 Century A. D.
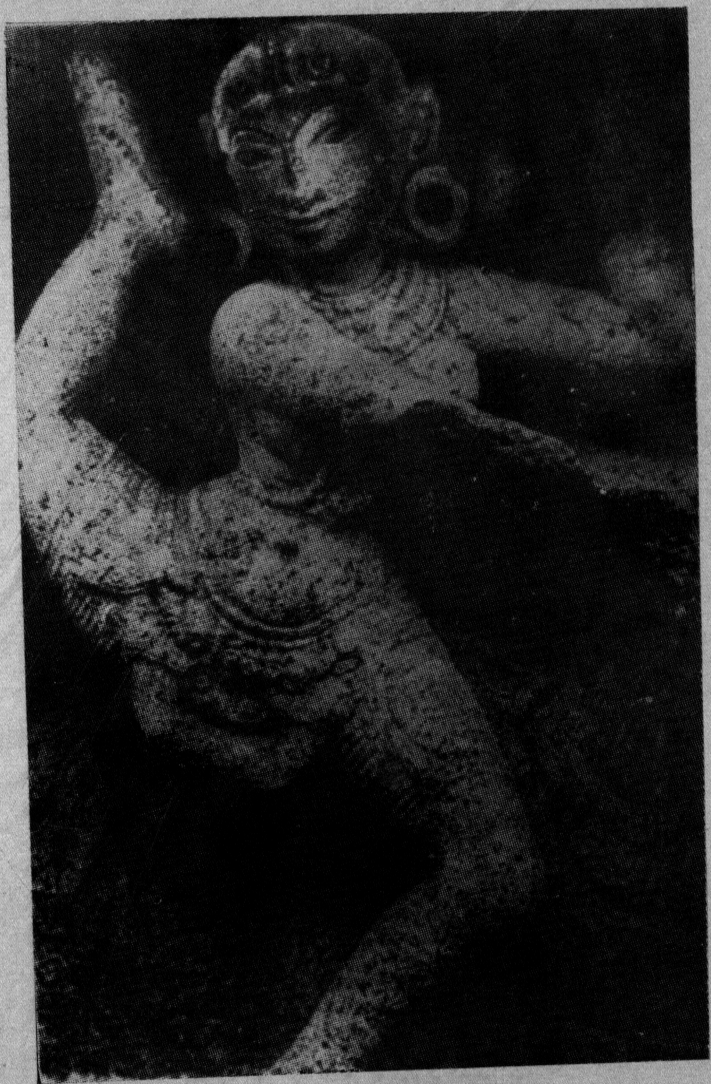
From Ajanta and Bagh Caves.

Karihasta and Tripataka according to Natyasastra.
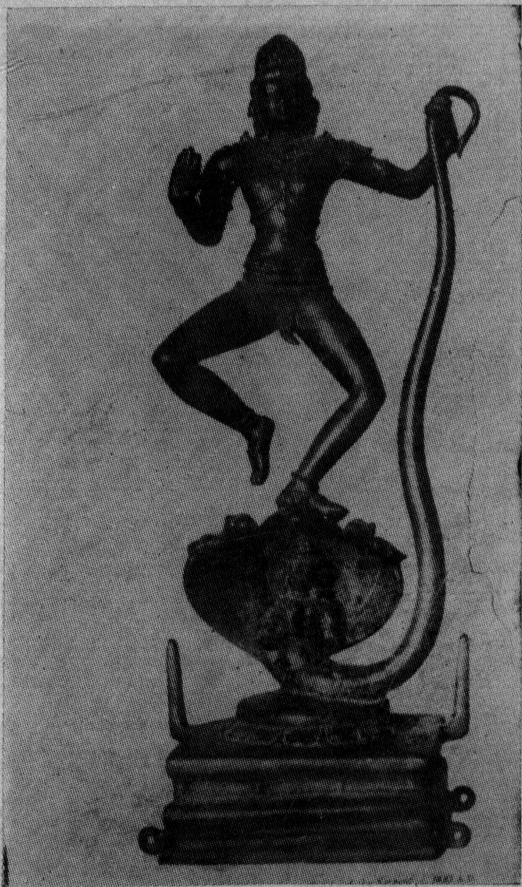
South India, Krishna, Tamer of the Serpent. 900 A. D.

Samabhanga.
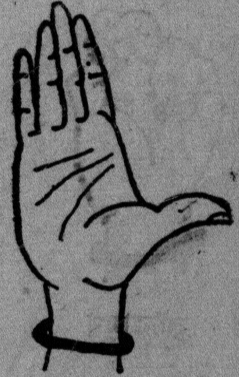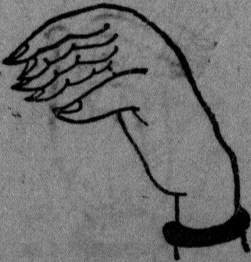
পতাক
ত্রিপতাক
অৰ্দ্ধপতাক
কত্তরীমুখ
ময়ূর
অর্দ্ধচন্দ্র
অৰ্দ্ধচন্দ্র
(নাট্যশাস্ত্র)
অরাল
শুকতুণ্ডক
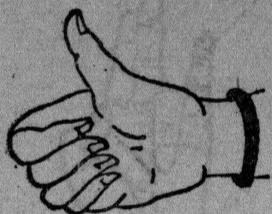
মুষ্ঠি
শিখর
কপিত্থ
কটকামুখ
সূচী
চন্দ্রকলা
পদ্মকোশ
সর্পশীর্ষ
মৃগশীর্ষ

সিংহমুখ
(পার্শ্ব)
সিংহমুখ
(সম্মুখ)
কাঙ্গুল
(পার্শ্ব)
কাঙ্গুল
(সম্মুখ)
অলপদ্ম
চতুর
(পার্শ্ব)
চতুর
(সম্মুখ)
চতুর
(নাট্যশাস্ত্র)
ভ্রমর
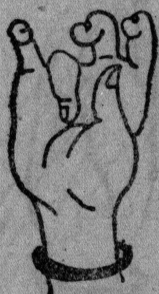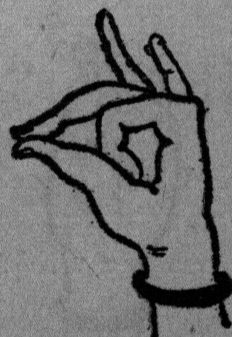
হংসাস্য
(পার্শ্ব)
হংসাস্য
(সম্মুখ)
হংসপক্ষ
হংসপক্ষ
(নাট্যশাস্ত্র)
সন্দংশ
সন্দংশ
(নাট্যশাস্ত্র)
মুকুল
তাম্রচূড়
তাম্রচূড়া
(নাট্যশাস্ত্র)
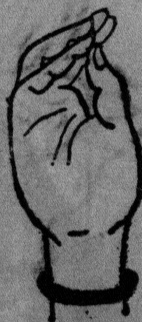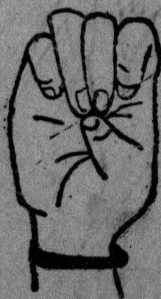
ত্রিশূল
ব্যাঘ্র
অৰ্দ্ধসূচী
কটক
পল্লী
অঞ্জলি
কপোত
কৰ্কট

স্বস্তিক

পুষ্পপুট

শিবলিঙ্গ

কটকাবৰ্দ্ধন

কত্তরীস্বস্তিক

শকট
শঙ্খ
চক্র
সম্পুট
পাশ

কীলক

মৎস্য

কূৰ্ম্ম

বরাহ

গরুড়

নাগবন্ধ

খট্বা

ভেরুণ্ড

সূচ্যাস্য
(নাট্যশাস্ত্র)

খটকামুখ
(নাট্যশাস্ত্র)

ঊর্ণনাভ
(নাট্যশাস্ত্র)